এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

(প্রথম খন্ড)

হুজ্জাতুল ইসলাম

ইমাম গায্যালী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

সহযোগিতায় ঃ মাওলানা মুঃ আবদুল আজিজ

প্রকাশক

মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

১ম খন্ড

ইমাম গাযযালী (রাহঃ)

প্রকাশক
মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে
মোস্তাফা মঈনউদ্দীন খান
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১ম প্রকাশ
রমযান ঃ ১৪০৭ হিঃ
২য় সংস্করণ ঃ
রবিউল আউয়াল ঃ ১৪১০
আশ্বিন ঃ ১৩৯৬
অক্টোবর ঃ ১৯৮৯
৩য় সংস্করণ ঃ
আষাঢ় ঃ ১৪০৫
জুলাই ১৯৯৮ইং

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদিয়া ঃ ১৪০.০০ টাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদকের আরজ

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল্‌-গায্‌যালী রচিত 'এহইয়াউ উলুমিদ্দীন' বিগত আট শতাধিক বছর ধরে সমগ্র মুসলিম জাহানে সর্বাধিক পঠিত একটি মহাগ্রন্থ। তাঁর এ অমর গ্রন্থ যেমন এক সময় পথভ্রান্ত মুসলমানদের মধ্যে নতুন জাগরণের সৃষ্টি করেছিল, তেমনি আজ পর্যন্তও মুসলিম মানসে দ্বীনের সঠিক চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ গ্রন্থটিকে অনন্য এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করা হয়।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ইমাম গাযযালী (রাহঃ) জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন শাসন কর্তৃপক্ষের নৈকট্যপ্রাপ্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। অন্যান্য আমীর-ওমারাহ্‌গণের মতই তাঁরও জীবনযাত্রা ছিল বর্ণাঢ্য। কিন্তু ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যেও তাঁর ভেতরে লুকিয়ে ছিল মুমিনসুলভ একটি সংবেদনশীল আত্মা, যা সমকালীন মুসলিম জনগণের ব্যাপক স্খলন-পতন লক্ষ্য করে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করতো। ইহুদী-নাসারাদের ভোগসর্বস্ব জীবনযাত্রার প্রভাবে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত মুসলিম জনগণকে ইসলামের সহজ-সরল জীবনধারায় কি করে ফিরিয়ে আনা যায়, এ সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতেন। কোন কোন সময় এ চিন্তা তাঁকে আত্মহারা করে ফেলতো। ভাবনা-চিন্তারই এক পর্যায়ে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো যে, বর্তমানে মৃতকল্প মুসলিম জাতিকে নবজীবনে উজ্জীবিত করে তোলা একমাত্র দ্বীনের স্বচ্ছ আবে হায়াত পরিবেশনের মাধ্যমেই সম্ভব। আর তা বিলাসপূর্ণ জীবনের অর্গলে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখে হাতে পাওয়া সম্ভব নয়। এ উপলব্ধি তাড়িত হয়েই ইমাম সাহেব একদিন পরিবার-পরিজন এবং ঘর-সংসারসহ সবকিছুর মায়া ত্যাগ করে নিরুদ্দেশের পথে বের হয়ে পড়লেন। একদা বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা ছিল যাঁর সর্বক্ষণের অভ্যাস, সে ব্যক্তিই মোটা চট-বস্ত্রে আব্রু ঢেকে দিনের পর দিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জীবনে ইমাম সাহেব পবিত্র মক্কা, মদীনা, বাইতুল মোকাদ্দাসসহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন। দামেশকের জামে মসজিদের মিনারার নীচে নিতান্ত অপরিসর একটি প্রায় অন্ধকার কামরায় তিনি

অনেকগুলি দিন তপস্যারত অবস্থায় কাটিয়ে দেন।

ইমাম সাহেবের এ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ তাপস জীবনেরই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ফসল এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন বা দ্বীনী এলেমের সঞ্জীবনী সুধা। এ গ্রন্থে ইসলামী এলেমের প্রতিটি দিক পবিত্র কোআন-সুন্নাহ, যুক্তি ও অনুসরণীয় মনীষীগণের বক্তব্য দ্বারা যেভাবে বোঝানো হয়েছে, এমন রচনারীতি এক কথায় বিরল। বিশেষতঃ এ গ্রন্থটির দ্বারাই ইমাম সাহেব 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা ইসলামের যুক্তিঋদ্ধ কণ্ঠ উপাধিতে বরিত হয়েছেন। সমগ্র উম্মাহ তাঁকে একজন ইমামের বিরল মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

এ মহাগ্রন্থের প্রভাবেই হিজরী ৬ষ্ঠ শতকের সূচনাকালে ইসলামের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহউদ্দীন আইয়ূবী প্রমুখ ইসলামের বহু বীর সন্তান– যাঁদের নিয়ে মুসলিম উম্মাহ গর্ব করে থাকে, এঁরা সবাই ছিলেন ইমাম গাযযালীর ভাবশিষ্য, এহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন-এর ভক্ত পাঠক।

এ অমর গ্রন্থটি এ পর্যন্ত বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাভাষায় এর একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ছাড়া আরও একাধিক খণ্ড প্রচেষ্টা লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অগ্রপথিকগণের সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে চাই, এ মহাগ্রন্থটি বাংলাভাষাভাষীগণের সামনে নতুন করে পরিবেশন করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেই আমরা এ কষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছি। অবশ্য আমাদের সে উপলব্ধির যৌক্তিকতা বিজ্ঞ পাঠকগণই উদঘাটন করতে পারবেন।

খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে দেখে আমরা আনন্দিত। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের কিছু ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সংস্করণে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। যারা এ ব্যাপারে কষ্ট করে আমাদেরকে অবহিত করেছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক সংশ্লিষ্ট সকলকে এর সুফল দান করুন। এ সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে মদীনা পাবলিকেশন্স থেকে। আল্লাহ পাক কবুল করুন।

বিনীত
মুহিউদ্দীন খান
মাসিক মদীনা কার্যালয়, ঢাকা

ভূমিকা

সর্বপ্রথম আমি আল্লাহ্ তা'আলার অসংখ্য প্রশংসা করছি, যদিও তাঁর অপার মহিমা ও প্রতিপত্তির সামনে সকল প্রশংসাকারীর যাবতীয় প্রশংসাই নিতান্ত তুচ্ছ। দ্বিতীয়তঃ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শক উপাধিতে ভূষিত রসূল শ্রেষ্ঠ (সাঃ)-এর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নবী-রসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করছি। তৃতীয়তঃ এলমে দ্বীনকে জীবিত করে তোলার লক্ষ্যে একখানা গ্রন্থ রচনার যে ইচ্ছা আমার অন্তরে উদিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তার জন্য তৌফীক কামনা করছি। চতুর্থতঃ হে নিন্দুক ও গাফেল অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীদের অন্যতম, অধিকতর অস্বীকৃতি ও নিন্দা জ্ঞাপনকারী! তোমার আত্মম্ভরিতার অবসান কামনা করি। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা আমার জবান থেকে নীরবতার গিঁঠ তুলে নিয়েছেন এবং আমার গলায় কথা ও যুক্তির মালা পরিয়ে দিয়েছেন। কাজেই আমাকে সে কথা বলতে হল যাতে তুমি নিরত। অর্থাৎ, ন্যায় ও সত্য থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়ে অন্যায়ের সহায়তা ও মূর্খতার প্রশংসায় আত্মনিয়োগ করছ। যদি কোন লোক সৃষ্টির নিয়ম নীতি থেকে সামান্যও সরে আসতে চায়, কিংবা নীতির অনুবর্তিতা পরিহার করে জ্ঞানানুসারে কাজ করতে আগ্রহী হয় এমন আশায় যে, নফসের পরিশুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতাকে আল্লাহ যে এবাদত বলে গণ্য করেছেন, তা হাসিল করতে পারবে এবং সারাটা জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার প্রতিকারে যত্নবান হবে। যেসব আলেম সে বিষয়ের প্রতি উদাসীন তাদের সম্পর্কে শরীয়ত প্রবর্তক হযরতে ফখরুল মুরসালীন (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله سبحانه بعلمه -

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন সে আলেমই সর্বাধিক কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেমের কোন উপকারিতা দান করেননি।

তুমি সে ব্যক্তির ব্যাপারে হৈ-হাঙ্গামা শুরু করে দাও, অথচ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অস্বীকৃতিতে বাড়াবাড়ির কারণ তোমার এ রোগ ছাড়া আর কিছু নয় যা অধিকাংশ লোকের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে; বরং বলা যায়, সারা বিশ্বে ব্যাপ্তি লাভ করে চলেছে। অর্থাৎ, আখেরাত সংক্রান্ত বিষয়ের মাহাত্ম্য অবলোকনে মানুষ দিন দিন অপারগ হয়ে যাচ্ছে। তারা বুঝতেই পারছে না বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও অভিযান বিরাট। আখেরাত ক্রমাগত এগিয়ে আসছে আর দুনিয়া পিছিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু নিকটবর্তী এবং যাত্রা দীর্ঘ। পাথেয় অল্প অথচ প্রয়োজন বিপুল। পথও বন্ধ। আর যে জ্ঞান ও কর্ম আল্লাহর অস্তিত্বের বাইরে, তা পর্যালোচক বুদ্ধির সামনে প্রত্যাখ্যানযোগ্য। বহুবিধ ধ্বংসাত্মক বিষয়ের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আখেরাতের পথচলা কোন পথপ্রদর্শক ও সঙ্গী ছাড়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ, এ পথের পথপ্রদর্শক সেসব আলেমই হতে পারেন যাঁরা নবী-রসূলগণের যথার্থ ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী। অথচ দুনিয়া এসব লোক থেকে শূন্য হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রথাগত লোকই রয়ে গেছে। আবার এদেরও বেশীর ভাগের উপরই শয়তান প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। ঔদ্ধত্য তাদেরকে পথহারা করে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকেই নিজের সাময়িক লাভের পেছনে পড়ে আছে। এ কারণেই তারা অধিকাংশ ভাল বিষয়কে মন্দ ও মন্দ বিষয়কে ভাল বিবেচনা করে। এমনকি দ্বীনী এলেম পুরানো হয়ে গেছে, হেদায়েতের চিহ্ন পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে। তারা মানুষকে একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এলেম হয় হবে রাষ্ট্রীয় ফতোয়া, যার মাধ্যমে শাসকবর্গ ইতর-চন্ডালদের বিবাদ-বিসংবাদের মীমাংসা করতে গিয়ে সাহায্য গ্রহণ করে, আর না হয় হবে বাহাস-মুবাহাসা তথা তর্ক-বিদ্যা, যাতে করে দাম্ভিক অহংকারীরা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে নিজেদেরকে বিজয়ী করার উপায় বানাবে। অথবা এলেম হবে সেসব ছন্দপূর্ণ মসৃণ সংলাপ, যেগুলো ওয়ায়েযরা সাধারণ মানুষকে পদস্খলিত করার অবলম্বন সাব্যস্ত করবে। কারণ, এই তিন প্রকার এলেম ছাড়া তারা হারাম এবং দুনিয়াদারদের মালামাল আয়ত্ত করার আর কোন ফাঁদ খুঁজে পায়নি। পূর্ববর্তী নেক ও সৎ মানুষেরা আখেরাতের যে পথে চলতেন, সে পথের জ্ঞান মানুষের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, তার নামগন্ধও আর নেই। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সে জ্ঞানকেই তাঁর কিতাবে ফেকাহ, হেকমত, প্রজ্ঞা, আলো, জ্যোতি,

হেদায়েত ও পথপ্রাপ্তি প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। যেহেতু এ অবস্থা দ্বীনের উপর একটা বিরাট আঘাত ও মহাবিপদ, কাজেই আলোচ্য এ গ্রন্থ প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছি, যাতে করে দ্বীনের জ্ঞানসমূহ পুনরুজ্জীবিত হতে পারে, পরবর্তী পথপ্রদর্শকদের পথ সুগম হয় এবং নবী-রসূলগণ ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দের কল্যাণকর জ্ঞান অবগত হওয়া যায়। এ গ্রন্থটি আমি চার খন্ডে রচনা করেছি। প্রথম খন্ডে রয়েছে এবাদত-উপাসনা, ২য় খন্ডে স্বভাব-প্রকৃতি ও শিষ্টাচার, তৃতীয় খন্ডে ক্ষতিকর বিষয়াদি, অর্থাৎ, যেসব বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে দেয় এবং চতুর্থ খন্ডে রয়েছে ত্রাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি। অর্থাৎ যেসব বিষয় নফসের কারাগারে বন্দীকে মুক্তি দান করবে। সর্বাগ্রে আমি জ্ঞান অধ্যায় এজন্য রচনা করছি যে, সেটি অত্যন্ত জরুরী। তা ছাড়া এ অধ্যায়টি সর্বাগ্রে সংযোজনের আরেকটি কারণ হল, যাতে প্রতিটি লোকের সামনে সে জ্ঞান বিকশিত হয়ে যায়, যা অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য আল্লাহ তাঁর রসূলে মকবুল (সঃ)-এর মাধ্যমে এবাদত হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কল্যাণহীন জ্ঞান থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা এ অধ্যায়ে মানুষের সঠিক পথ পরিহার করে মরীচিকার চাকচিক্যে প্রতারিত হওয়া এবং জ্ঞানের নির্যাস ফেলে তার ছাল-বাকলে পরিতৃপ্ত হওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরব। এখন জানা প্রয়োজন, এ গ্রন্থের প্রতিটি খন্ড দশটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত। অর্থাৎ, এবাদত খন্ডের দশটি অধ্যায় ঃ জ্ঞান, আকীদা-বিশ্বাস, পবিত্রতার তাৎপর্য, নামাযের তাৎপর্য, যাকাতের তাৎপর্য, রোযার তাৎপর্য, হজ্জের তাৎপর্য, কোরআন তেলাওয়াতের আদব, যিকির ও দোয়া এবং বিশেষ বিশেষ সময়ে ওজিফাদির নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কিত। আচরণ খন্ডের দশটি অধ্যায় ঃ (১) পানাহারের আদব (২) বিয়ে-শাদীর আদব (৩) উপার্জন সংক্রান্ত বিধি-বিধান (৪) হালাল-হারাম (৫) জনগণের সাথে লেনদেনের প্রকারভেদ ও আদব (৬) নির্জনবাস (৭) সফর বা ভ্রমণের আদব (৮) সংগীত শ্রবণ ও আচ্ছন্নতা (৯) সদুপদেশ দান ও অসৎ বিষয় থেকে বারণ (১০) জীবনের শিষ্টাচার ও নবুয়তী স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কিত।

তৃতীয় খন্ড ধ্বংসাত্মক বিষয়সম্বলিত, যথা- (১) আত্মার বিস্ময় (২) আধ্যাত্মিক সাধনা (৩) ভোজন বিলাসিতা ও লজ্জাস্থানের বিপদাপদ (৪) জিহ্বার অনিষ্টকারিতা (৫) ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের অপকারিতা (৬) পৃথিবীর অনিষ্ট (৭) সম্পদ ও কার্পণ্যের নিন্দা (৮) ভুয়া মর্যাদা বোধ ও

লোকদেখানোর নিন্দা (৯) অহংকার ও আত্মপ্রশস্তির নিন্দা (১০) ধন-সম্পদের লোভ-লালসার নিন্দা প্রভৃতি সংক্রান্ত দশটি অধ্যায় সংযোজিত। আর চতুর্থ মুক্তি বিষয়ক খন্ডটিও তেমনি- (১) তওবা (২) ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা (৩) আশা ও ভয় (৪) দারিদ্র্য প্রীতি ও দুনিয়া পরিহার (৫) আল্লাহর একত্ব ও তাঁর উপর নির্ভরশীলতা (৬) প্রেম, আগ্রহ, সম্পর্ক ও সম্মতি (৭) নিয়ত, নিষ্ঠা ও সততা (৮) অনুধ্যান ও আত্মসমালোচনা অর্থাৎ, রিপুর প্রতি সতর্ক পর্যবেক্ষণ (৯) মনন ও (১০) মৃত্যুর স্মরণ সংক্রান্ত ১০টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

এবাদত খন্ডে আমরা এবাদতের অন্তর্নিহিত আদব ও তার সুন্নতসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াদি, সেগুলোর সেসব গোপন তাৎপর্যসমূহ তুলে ধরব যেগুলোর প্রতি এবাদতকারী ব্যাকুল হয়ে উঠে। সুতরাং যারা এসব বিষয় অবগত নয়, তারা আখেরাতের আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত নয়। বস্তুতঃ এ বিষয় প্রায়শই ফেকাহ বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বর্জিত হয়েছে এবং কেউই এগুলো লিপিবদ্ধ করেননি।

আচরণ খন্ডে আমরা মানব প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত আচার-আচরণের তাৎপর্য তুলে ধরব। সাথে সাথে আমরা সেগুলোর পন্থাসমূহের সূক্ষ্মতা এবং ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কেও আলোচনা করব। কারণ, এর প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি দ্বীনদারেরই রয়েছে। অতঃপর ধ্বংস খণ্ডে সেসব বিষয় চিহ্নিত করব যেগুলো পরিহার করা অপরিহার্য। আত্মা এবং হৃদয়কে এগুলো থেকে পবিত্র মুক্ত করার কথা কোরআনেও উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা সেসব অভ্যাসের মধ্যে প্রত্যেকটির সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বর্ণনা করব এবং অতঃপর সেসব বিষয় উল্লেখ করব যার কারণে মানুষের মধ্যে সে অভ্যাসগুলোর জন্ম হয়। প্রসঙ্গতঃ আমরা এসব অভ্যাসের ফলে যেসব বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেগুলো তুলে ধরব। তারপর আমরা এসব অভ্যাসের লক্ষণাদি এবং কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর যথাযথ প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব, যার মাধ্যমে মানুষ তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

সবশেষে মুক্তি খণ্ডে সেসমস্ত কল্যাণ, আচরণ ও সৎস্বভাব সম্পর্কে আলোচনা করব, যার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যা নৈকট্যপ্রাপ্তদের স্বভাব এবং আল্লাহ্ তাআলার নেকট্য লাভ করতে আগ্রহী বান্দারা যার মাধ্যমে নৈকট্য লাভে সক্ষম হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আমরা এসব স্বভাবের

সংজ্ঞা, তাৎপর্য, তা অর্জনের উপায়, এর ফলাফল ও লক্ষণাদি এবং এর সেসব ফযীলত মাহাত্ম্য শরীয়ত ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি সহকারে আলোচনা করব। অবশ্য এসব বিষয়ে লোকেরা পুস্তকাদিও লেখেছে। তবে আমার এ পুস্তক তাদের রচনা থেকে পাঁচটি ব্যাপারে স্বতন্ত্র ঃ (১) যে বিষয়টি তারা সংক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য ভেবে ছেড়ে দিয়েছে তা আমি সবিস্তার ব্যাখ্যাসহ লেখেছি। (২) যে বিষয়গুলো তারা বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্তভাবে লেখেছে, আমি সেগুলো ধারাবাহিক ও বিন্যস্তভাবে বর্ণনা করেছি। (৩) যে বিষয়গুলো তারা সুদীর্ঘ বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করেছে, আমি সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করেছি। (৪) তারা যেসব বিষয় বারংবার উল্লেখ করেছেন সেগুলোর পুনরাবৃত্তি আমি বর্জন করেছি; শুধু তার মূল উদ্দেশ্যটি রেখেছি। (৫) আমি সেসব বিষয়গুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছি, যেগুলো অনুধাবন করা (সাধারণ) জ্ঞানের পক্ষে কঠিন, অথচ এসবে এতদসংক্রান্ত পুস্তকাদির সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি। কারণ, এ বিষয়ে সবাই প্রায় একই রকম লেখেছে। অথচ এমনও হতে পারে যে, এসব গোপন বিষয়ে একজন অবগত হবেন, কিন্তু তাঁর আরেক সতীর্থ অবগত হবেন না কিংবা এ সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারে কোন শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি, কিন্তু পুস্তকে তা উল্লেখ করতে ভুলেই গেছেন। অথবা ভুলেনওনি, কিন্তু আসল তাৎপর্য লেখার ব্যাপারে তাঁর কোন অন্তরায় থেকে গিয়েছিল। যাই হোক, আমাদের এ পুস্তকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে সেই সমুদয় তাৎপর্যের উপর ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। আর আমরা যে একে চারটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি, তারও দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ এই বিন্যাস, গবেষণা ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটিই ছিল অপরিহার্য। কারণ, যে জ্ঞানের মাধ্যমে আখেরাতের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়, তা দুই প্রকার। একটি হল 'এলমে মোয়ামালা' তথা বৈষয়িক জ্ঞান আর দ্বিতীয়টি 'এলমে মোকাশাফা। 'এলমে মোকাশাফা' বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে জ্ঞান, যার কাছে জানা বিষয়টির বিকাশ দাবী করা যেতে পারে। আর এলমে মোয়ামালাহ্ বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সে এলেম, যার মাধ্যমে বিকশিত এলেমের উপর আমল করা যায়। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হল এলমে মোয়ামালাহ্, এলমে মোকাশাফা' নয়– যা কোন কিতাব বা গ্রন্থে লেখার অনুমতি নেই। বস্তুতঃ মা'রেফতান্বেষী ও সিদ্দীকগণের উচ্চতর মর্তবা-মর্যাদাই হল 'এলমে মোকাশাফা' অর্জন করতে পারা। পক্ষান্তরে এলমে মোয়ামালা' হল তা লাভের উপায় বা অবলম্বন। কিন্তু নবী রসূলগণ মানুষের সাথে শুধুমাত্র 'এলমে মোয়ামালা' সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন এবং এর প্রতি পথ প্রদর্শন করেছেন– এলমে মোকাশাফার ব্যাপারে কোন

আলোচনা করেননি। তবে উপমা উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে শুধু এর প্রতি সামান্য ইঙ্গিত-ইশারা দিয়েছেন এ কারণে যে, তাঁরা জানতেন, সৃষ্টির কোন বাস্তব রূপ নেই।

অতঃপর এলমে মোয়ামালা দু'রকম। এক বাহ্যিক এলেম। অর্থাৎ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা কাজকর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান। দুই- অন্তরের ক্রিয়াকর্মের জ্ঞান। যে এলেম বা জ্ঞান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর প্রতিফলিত হয়, সেগুলো হয় হবে এবাদত-উপাসনা, না হয় হবে আচার-অভ্যাস। পক্ষান্তরে বাতেন বা গোপন- যা অন্তরের বা রিপুর অভ্যাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তাও ভাল কিংবা মন্দ এই দু'ভাগে বিভক্ত। কাজেই মোট দাঁড়ালো চার ভাগে। এলমে মোয়ামালার কোন বিষয়ই এই বিভাগসমূহের বহির্ভূত নয়। আরেকটি কারণ, আমি শিক্ষার্থীদের সত্যিকার আগ্রহ সে ফেকাহর মধ্যেই দেখেছি, যা এমন লোকদের কাছে রক্ষিত, আল্লাহর প্রতি যাদের কোন ভয়-ভীতি নেই এবং যা গর্ব-অহংকারের উপায় হতে পারে অথবা যার উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। আর সে ফেকাহ্ও চার প্রকার। যেহেতু প্রিয় বস্তু-সামগ্রীর প্রেক্ষিতে অন্যান্য বস্তু-সামগ্রীও প্রিয় বলে গণ্য হয়, সেহেতু আমিও এ ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করিনি। এ গ্রন্থটির আকৃতিও ফেকাহ গ্রন্থেরই অনুরূপ করেছি, যাতে করে মনের আকর্ষণ এদিকে বৃদ্ধি পায়। আর একই কারণে কোন কোন লোক, যারা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি বিত্তবানদের আকর্ষণ সৃষ্টি করতে আগ্রহী, তারা নিজেদের গ্রন্থকে নক্ষত্রের পঞ্জিকার আকারে ছক ও সংখ্যার ভিত্তিতে লেখেছেন এবং সেগুলোর নামকরণও করেছেন, 'স্বাস্থ্য-পঞ্জি' ধরনের। কারণ, বিত্তবানরা সাধারণতঃ এমনি ব্যাপারে বেশী আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সুতরাং এই রচনারীতিও তাদের মনোবৃত্তি সেসব পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট করবে। বলাই বাহুল্য, কারো মন সে এলেমের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে এমন কলা-কৌশল অবলম্বন করা, যাতে চিরস্থায়ী জীবনের কল্যাণ বিদ্যমান, সে কলা-কৌশলের তুলনায় অত্যন্ত জরুরী, যাতে শুধু দৈহিক চিকিৎসার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কারণ, এলমে আখেরাতের ফল হল অন্তরাত্মার চিকিৎসা করা, যাতে করে একটা জীবন অনন্ত স্থায়িত্বে পৌছাতে পারে। পক্ষান্তরে চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান সে পর্যন্ত কেমন করে পৌছাতে পারবে, যাতে শুধু দৈহিক রোগ-ব্যাধিরই প্রতিকার হয়। আর একথাও নিশ্চিত, সেটি সামান্য কিছু দিনের মধ্যেই যাওয়া-আসা করে। এবার আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তৌফীক ও পথ প্রদর্শনের আবেদন করছি। কারণ, তিনিই মহান দাতা। অতঃপর এলেম অধ্যায় গ্রন্থের শুরুতেই লেখছি।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

Contents

এহইয়াউ উলুমিদ্দীন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জ্ঞান, জানার্জন ও জ্ঞানদানের মাহাত্ম্য

কোরআন মজীদে জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এই ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ـ

ফেরেশতাকুল ও মধ্যপন্থী আলেমগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম পর্যায়ে নিজের সত্তা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেরেশতাকুল এবং তৃতীয় পর্যায়ে জ্ঞানীদের কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও মৌলিকতা বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ আরও বলেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

যারা বিশ্বাসী এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্তবা অনেক উঁচু করে দেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন– সাধারণ মুমিনদের মর্তবা অপেক্ষা জ্ঞানী মুমিনদের মর্তবা সাতশ'স্তর বেশী হবে এবং প্রত্যেক দু'স্তরের দূরত্ব হবে পাঁচশ' বছরের সমান।

আল্লাহ্ পাক আরও বলেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ "জিজ্ঞেস করুন, যারা জ্ঞানী এবং জ্ঞানহীন, তারা কি সমান হতে পারে?"

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۔

"বান্দাদের মধ্যে একমাত্র আলেমরাই আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে।"

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ ۔

বলে দিন, আল্লাহ্ এবং কিতাবের জ্ঞানে জ্ঞানীরা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষ্যদাতারূপে যথেষ্ট।

قَالَ الَّذِىْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ ۔

যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলল ঃ আমি তাকে এনে দিচ্ছি।

এতে ব্যক্ত করা হয়েছে সে লোকটি জ্ঞানের বলেই রাণী বিলকিসের সিংহাসন এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۔

"যারা জ্ঞানী ছিল, তারা বলল ঃ তোমাদের ধ্বংস হোক, আল্লাহ্ প্রদত্ত কল্যাণই বিশ্বাসী ও সৎকর্মীর জন্য উত্তম।"

এতে বলা হয়েছে, পরকালের মাহাত্ম্য শিক্ষার মাধ্যমে জানা যায়।

وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ ۔

"আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি। এগুলো কেবল তারাই বুঝে, যারা জ্ঞানী।"

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَاِلٰى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ ـ

"যদি তারা বিষয়টি রসূলের কাছে এবং গণ্যমান্যদের কাছে উপস্থাপন করত, তবে তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানান্বেষী, তারা জেনে নিতে পারত।"

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে তাঁর নিজের বিধান শিক্ষিতদের ইজতিহাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্র বিধান জানার ব্যপারে তাদের মর্তবাকে পয়গম্বরগণের মর্তবার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ـ

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি পোশাক, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে, আর নাযিল করেছি পশম এবং পরহেযগারীসুলভ পোশাক, এটা সর্বোত্তম।

এ আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে পোশাকের অর্থ শিক্ষা, পশমের অর্থ বিশ্বাস এবং পরহেযগারীসুলভ পোশাক বলে লজ্জা বুঝানো হয়েছে।

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ ـ

"আমি তাদের কাছে কিতাব পৌঁছে দিয়েছি, যা জ্ঞান সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছি।"

فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ ـ

"আমি সজ্ঞানে তাদের সকল অবস্থা বর্ণনা করব।"

بَلْ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىْ صُدُوْرِ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ـ

"বরং এগুলো কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের বক্ষে গচ্ছিত।"

خَلَقَ الْاِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ ـ

"তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন।" এ বিষয়টি অনুগ্রহ প্রকাশের স্থলে বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده -

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে ধর্মের প্রজ্ঞা দান করেন এবং তার অন্তরে সৎপথ ইলহাম করেন।

তিনি আরও বলেন ঃ العلماء ورثة الانبياء "জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ পয়গম্বরগণের উত্তরাধিকারী।"

বলাবাহুল্য, নবুওয়তের চেয়ে বড় কোন মর্তবা নেই। কাজেই এ মর্তবার উত্তরাধিকারী হওয়ার চেয়ে বড় আর কোন গৌরবও নেই। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে আকাশ ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু মাগফেরাত প্রার্থনা করে। সুতরাং এর চেয়ে বড় আর কি পদমর্যাদা হবে, যার কারণে আকাশ ও পৃথিবীর ফেরেশতাকুল মাগফেরাতের দোয়ায় মশগুল থাকবে? জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকে, আর ফেরেশতারা তার জন্যে মাগফেরাত প্রার্থনায় নিরত থাকেন। রসূলে করীম (সঃ) বলেন ঃ "প্রজ্ঞা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করে এবং গোলামের মর্যাদাও এত উঁচু করে যে, তাকে রাজা-বাদশাহদের আসনে বসিয়ে দেয়।" এ হাদীসে তিনি দুনিয়াতে জ্ঞানের ফলাফল বর্ণনা করেছেন। বলাবাহুল্য, আখেরাত দুনিয়ার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

خصلتان لايكونا فى منافق حسن سمت وفقه فى الدين -

"দুটি স্বভাব মোনাফেকের মধ্যে পাওয়া যায় না। –(১) সুন্দর পথ প্রদর্শন এবং (২) ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান।" কোন কোন সমসাময়িক ধর্ম জ্ঞানীর নেফাক (কপটতা) দেখে এ হাদীস সম্পর্কে সন্দেহ করা উচিত

নয়। কেননা, "ফেকাহ্" শব্দ বলে রসূলুল্লাহ (সঃ) সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞাই বুঝাননি, যা তোমরা মনে কর; বরং এ শব্দের অর্থ পরে বর্ণিত হবে। ফেকাহবিদের সর্বনিম্ন স্তর হল আখেরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে বিশ্বাস করা। এ বিশ্বাস ফেকাহ্বিদের মধ্যে সুষ্ঠু ও প্রবল হয়ে গেলে সে নেফাক ও নাম-যশের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সঃ) আরও বলেন ঃ "মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ঈমানদার সেই জ্ঞানী ব্যক্তি, যার কাছে মানুষ প্রয়োজন নিয়ে আগমন করলে সে তাদের উপকার করে এবং মানুষ তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করলে সে নিজেকে বিমুখ করে দেয়।" তিনি আরও বলেছেন ঃ "ঈমান নিরাভরণ। তার পোশাক হচ্ছে তাকওয়া (খোদাভীতি), তার মজ্জা হচ্ছে লজ্জা এবং তার ফল হচ্ছে জ্ঞান।" এক হাদীসে আছে ঃ মানুষের মধ্যে নবুওয়তের মর্তবার নিকটতম হচ্ছে জ্ঞানী ও জেহাদকারী সম্প্রদায়। জ্ঞানী সম্প্রদায় এ কারণে যে, তারা মানুষকে রসূলুল্লাহ (সঃ) কতৃর্ক আনীত কথাবার্তা বলে এবং জেহাদকারীগণ এ কারণে যে, তারা পয়গম্বরগণের আনীত শরীয়তের জন্যে অশ্বের সাহায্যে জেহাদ করে। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "একটি গোষ্ঠীর মরে যাওয়া একজন জ্ঞানী ব্যক্তির মরে যাওয়া অপেক্ষা সহজতর।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلنَّاسُ مَعْدِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَخِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا ـ

"মানুষ স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির মত খনি বিশেষ। অতএব যারা জাহেলিয়াতের যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, তারা ইসলাম যুগেও শ্রেষ্ঠ, যদি তারা দ্বীনের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়।" এক হাদীসে আছে ঃ "কেয়ামতের দিন জ্ঞানীদের লেখার কালি শহীদদের রক্তের সাথে ওজন করা হবে।" আরও আছে ঃ "আমার উম্মতের যেব্যক্তি চল্লিশটি হাদীছ মুখস্থ করবে, সে কিয়ামতের দিন ফেকাহবিদ ও জ্ঞানীরূপে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাৎ লাভ করবে।" অন্যত্র আছে ঃ যেব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দ্বীন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করবে, আল্লাহ্ তাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবেন এবং তাকে ধারণাতীত জায়গা থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করবেন।" আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, "হে ইবরাহীম! আমি মহাজ্ঞানী এবং প্রত্যেক জ্ঞানীকে পছন্দ করি।" আরও আছে ঃ "আমার উম্মতের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক রয়েছে,

যারা ঠিক হয়ে গেলে সকল মানুষ ঠিক হযে যায় এবং যারা বিগড়ে গেলে সকল মানুষ বিগড়ে যায়। তাদের এক শ্রেণী হচ্ছে শাসক এবং অপর শ্রেণী ফেকাহ্‌বিদ অর্থাৎ, দ্বীনী এলমে সমৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ।" অন্য হাদীসে আছে ঃ "আল্লাহ্‌র নৈকট্যশালী করে এমন জ্ঞান বেশী পরিমাণে না থাকার দিন যদি আমার উপর আসে, তবে সেদিনের সূর্যোদয় যেন আমার ভাগ্যে না জুটে।"

এবাদত ও শাহাদতের উপর জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠত্বদান প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِىْ عَلٰى اَدْنٰى رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِىْ ـ

"জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্ব সাহাবীদের উপর।"

লক্ষণীয়, এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এলেমকে কেমন করে নবুওয়তের স্তরে রেখেছেন এবং জ্ঞানহীন কর্মের মর্তবা কেমন করে হ্রাস করেছেন। অথচ এবাদতকারী সদাসর্বদা যে এবাদত করে, তার জ্ঞান সে অবশ্যই রাখে। এ জ্ঞান না হলে এবাদত হবে না।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلٰى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ ـ

"আলেম ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব এবাদতকারীর উপর তেমনি, যেমন চতুর্দশীর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব তারকারাজির উপর হয়ে থাকে।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

يَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ

"কেয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবে– পয়গম্বরগণ, অতঃপর জ্ঞানী লোকগণ, অতঃপর শহীদগণ।"

এ হাদীস দ্বারা জ্ঞানের এমন মাহাত্ম্য প্রমাণিত হয় যে, এটা নবুওয়তের পরে এবং শাহাদতের অগ্রে। অথচ শাহাদতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে

বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলার এবাদত কোন কিছুর মাধ্যমে ততটুকু সমৃদ্ধ হয় না, যতটুকু দ্বীনের জ্ঞানের মাধ্যমে হয়। একজন দ্বীনের জ্ঞানী ব্যক্তি শয়তানের জন্যে হাজার এবাদতকারী অপেক্ষা কঠোর হয়ে থাকে। প্রত্যেক বস্তুর একটি স্তম্ভ আছে। এ দ্বীনের স্তম্ভ হচ্ছে ফেকাহ্ (দ্বীনী জ্ঞান)।" আরও বলা হয়েছে ঃ "ঈমানদার আলেম ঈমানদার আবেদ অপেক্ষা সত্তর গুণ শ্রেষ্ঠ।" অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন জ্ঞানী ব্যক্তির সংখ্যা অনেক এবং বক্তার সংখ্যা কম। ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প এবং দাতার সংখ্যা অধিক। এমন যুগে জ্ঞান লাভ করা অপেক্ষা আমল করা উত্তম। অতি সত্বর এমন যুগ আসবে, যখন জ্ঞানীর সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং বক্তা হবে অধিক। দাতা কম হবে এবং ভিক্ষুক বেশী হবে। তখন জ্ঞান অর্জন হবে আমল অপেক্ষা উত্তম।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি ও এবাদতকারীর মধ্যে একশ' স্তরের ব্যবধান রয়েছে! প্রত্যেক দু'স্তরের মাঝখানে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে, যতটুকু একটি দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বছরে অতিক্রম করতে পারবে।" এক হাদীসে বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ "ইয়া রসূলাল্লাহ্, কোন্ আমলটি উত্তম?" তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ আমরা উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কিত জ্ঞান। আবার বলা হল ঃ আমরা আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করছি, আপনি এলেম সম্পর্কে বলছেন! তিনি বললেন ঃ এলেমের সমন্বয়ে অল্প আমল উপকারী হয় এবং মূর্খতার সমন্বয়ে অধিক আমলও নিষ্ফল হয়ে যায়।" এক হাদীসে আছে ঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদেরকে উঠাবেন। অতঃপর আলেমদেরকে উঠাবেন এবং তাদেরকে বলবেন ঃ "হে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ! আমি তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান রেখেছিলাম, তা তোমাদেরকে কিছু জেনেই রেখেছিলাম। আমি তোমাদের মধ্যে আমার জ্ঞান এজন্যে রাখিনি যে, তোমাদেরকে শাস্তি দেব। যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করলাম।" আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমরাও এমনি আনজাম কামনা করি।

জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণেরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। হযরত আলী (রাঃ) কোমায়লকে বললেন, "হে কোমায়ল! জ্ঞান ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। জ্ঞান তোমার হেফাযত করে, আর তুমি

ধন-সম্পদের হেফাযত কর। জ্ঞান শাসক আর ধন-সম্পদ শাসিত। ধন ব্যয় করলে হ্রাস পায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বেড়ে যায়।" তিনি আরও বলেন ঃ "জ্ঞানী ব্যক্তি রোযাদার, এবাদতকারী ও জেহাদকারী অপেক্ষা উত্তম। আলেম ব্যক্তির মৃত্যু হলে ইসলামে এমন শূন্যতা দেখা দেয়, যা তার উত্তরসুরি ছাড়া কেউ পূরণ করতে পারে না।" তাঁর কথিত একটি আরবী কবিতার অনুবাদ এরূপ ঃ

"সকল মানুষ আকার-আকৃতিতে একরূপ। সকলের পিতা আদম এবং সকলের মা হওয়া। তারা যদি মূল উপাদান নিয়ে গর্ব করতে চায়, তবে পানি ও মৃত্তিকা ব্যতীত তাদের মূল উপাদান আর কি? হাঁ, যার দেহে আলেমদের গর্বের আলখেল্লা আঁটা রয়েছে। কেননা, সে নিজে যেমন পথপ্রাপ্ত, তেমনি অপরেরও পথ-প্রদর্শক। সৌন্দর্যের বস্তু তার অর্জিত রয়েছে। এটাই মানুষের মর্যাদা। মূর্খরা সদা জ্ঞানীদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তথাপি তুমি এমন জ্ঞান অর্জন কর, যদ্দ্বারা চিরঞ্জীব হতে পার। সকল মানুষ মৃত; কিন্তু জ্ঞানী চিরজীবী।

আবুল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের চেয়ে বেশী ইযযতের কোন বিষয় নেই। বাদশাহ জনগণের শাসক হয়ে থাকে এবং জ্ঞানীরা বাদশাহদের শাসক হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-কে এলেম, ধন-সম্পদ ও রাজত্বের মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। তিনি এলেম পছন্দ করেছিলেন। ফলে তাঁকে এলেমের সাথে ধন এবং রাজত্বও দান করা হয়েছিল। হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কে? তিনি বললেন ঃ সংসারবিমুখ দরবেশ। প্রশ্ন হল ঃ নীচ কে? উত্তর হল ঃ "যারা নিজেদের দ্বীন বিক্রি করে খায়।" মোট কথা, জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে তিনি মানুষ বলেননি। কেননা, যে বৈশিষ্ট্য মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে, তা হচ্ছে জ্ঞান। মানুষ তখনই মানুষ বলে কথিত হবে যখন তার মধ্যে গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ দিব্যমান থাকবে। মানুষের মর্যাদা দৈহিক শক্তির কারণে নয়। কেননা, উট তার চেয়ে বেশী শক্তির অধিকারী। মানুষের মর্যাদা বিশাল বপু হওয়ার কারণেও নয়। কেননা, হাতীর বপু তার চেয়ে অনেক বিশাল। তেমনি বীরত্বের কারণেও নয়। কেননা, হিংস্র জন্তুর বীরত্ব মানুষের

চেয়ে বড়। বরং একমাত্র জ্ঞানের দিক দিয়েই মানুষ সম্ভ্রান্ত। জ্ঞানের জন্যই মানুষ সৃষ্টি। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ কেউ আমাকে বলুক, যেব্যক্তি এলেম পায়নি, সে কি পেয়েছে এবং যেব্যক্তি এলেম পেয়েছে, তার পাওয়ার আর কি বাকী আছে?

ফাতাহ্ মুসেলী বলেন ঃ রোগীকে রোজ রোজ খাদ্য, পানীয় ও ওষুধপত্র কিছু না দিলে সে কি মরে যাবে না? লোকেরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে মরে যাবে। তিনি বললেন ঃ আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ। আত্মাকে তিন দিন এলেম ও জ্ঞান থেকে উপোস রাখলে সে মরে যায়। তাঁর এ উক্তি যথার্থ। কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হচ্ছে আত্মার খোরাক; এগুলোর মাধ্যমেই তার জীবন; যেমন দেহের খোরাক খাদ্য। যার জ্ঞান নেই, তার অন্তর রুগ্ন। মৃত্যু তার জন্যে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার আত্মার রোগ ও মৃত্যুর খবর রাখে না। দুনিয়ার মহব্বত ও কাজ কারবারে লেগে থাকার কারণে তার চেতনা লোপ পায়। যেমন ভয় ও নেশার আতিশয্যে জখমের ব্যথা অনুভূত হয় না; যদিও বাস্তবে ব্যথা থাকে। কিন্তু মৃত্যু যখন দুনিয়ার বোঝা ও সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়, তখন সে আত্মার মৃত্যুর কথা জানতে পারে এবং পরিতাপ করে। অবশ্য তখন পরিতাপে কোন উপকার হয় না। ভীত ব্যক্তির ভয় অথবা মাতালের নেশা দূর হয়ে গেলে ভয় ও নেশার অবস্থায় তার যেসব জখম লাগে, সেগুলো সে হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকে। সত্য উদঘাটিত হওয়ার সেই দিনের ভয়াবহতা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, এখন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। মৃত্যু হলে জাগ্রত হবে।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ "জ্ঞানী লোকদের লেখার কালি এবং শহীদদের রক্ত ওজন করা হলে কালির ওজন বেশী হবে।" হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ "হে লোকসকল! জ্ঞান অর্জন কর জ্ঞানকে তুলে নেয়ার পূর্বে। জ্ঞান তুলে নেয়ার অর্থ জ্ঞানী লোকদের মৃত্যুবরণ করা। আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ– যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তারা জ্ঞানী লোকদের মাহাত্ম্য দেখে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জ্ঞানী অবস্থায় পুনরুত্থিত করলেই ভাল হত। কেউ জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হয়।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাতের কিছু অংশে জ্ঞানচর্চা করা আমার মতে সারারাত জাগ্রত থেকে নফল এবাদত করা অপেক্ষা উত্তম। এ বিষয়টিই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً ـ

"আয় পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে ইহকালে পুণ্য এবং পরকালে পুণ্য দান করুন।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ দুনিয়ার পুণ্য জ্ঞান ও আরাধনা। পরকালের পুণ্যের অর্থ জান্নাত।

জনৈক দার্শনিককে কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্ বস্তু সঞ্চয় করা দরকার? উত্তর হল ঃ এমন বস্তু সঞ্চয় করা উচিত, যা তোমার নৌকা ডুবে গেলে তোমার সাথে সাঁতার কাটতে থাকে। অর্থাৎ, জ্ঞানই হচ্ছে সঞ্চয়যোগ্য বস্তু। কারণ, দেহরূপী নৌকা মৃত্যুরূপী সলিলে সমাধিলাভ করলে পর এটাই সাথে থাকে।

অন্য একজন দার্শনিক বলেন ঃ "যেব্যক্তি প্রজ্ঞাকে নিজের লাগাম বানিয়ে নেয়, মানুষ তাকে ইমাম করে নেয়। যেব্যক্তি জ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করে, মানুষ তাকে ইযযত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।"

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ জ্ঞানের এক গৌরব এই যে, "একে কোন ব্যক্তির সাথে সামান্যতম ব্যাপারেও সম্পর্কযুক্ত করা হলে সে আনন্দিত হয়। উদাহরণতঃ যদি বলা হয়, অমুক ব্যক্তি এ ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে। পক্ষান্তরে সে এ বিষয়ের জ্ঞান রাখে না– একথা কাউকে বলা হলে সে দুঃখিত হয়।"

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ "হে লোকসকল! জ্ঞানব্রতী হও। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে একটি মহব্বতের চাদর আছে। যেব্যক্তি কোন বিষয়ের জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাআলা সে চাদর তাকে পরিয়ে দেন। এরপর সে ব্যক্তি কোন গোনাহ্ করলেও তাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের তওফীক দান করা হয়। পুনরায় গোনাহ্ করলেও আল্লাহ্ তাকে এই তওফীক দান করেন। তৃতীয় বার গোনাহ্ করার পরও এরূপ করা হয়। এভাবে বার বার তওফীক দানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার কাছ থেকে সে চাদরটি ছিনিয়ে

না নেয়া, যদিও তার গোনাহ্ বৃদ্ধি পেতে পেতে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছে।"

আহ্নাফ (রহঃ) বলেন, "মনে হয় জ্ঞানীগণ সমগ্র ইয্যতের মালিক হয়ে যাবে। যে ইয্যত জ্ঞানের দ্বারা সুদৃঢ় না হয়, তার পরিণতি হয় লাঞ্ছনা।"

সালেম ইবনে আবী জা'দ বলেন ঃ "আমি ক্রীতদাস ছিলাম। প্রভু আমাকে তিন'শ দেরহামের বিনিময়ে মুক্ত করে দিলে আমি কি কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহ করব সে সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম। অবশেষে জ্ঞানকে পেশা করে নিলাম। এরপর এক বছর অতীত না হতেই শহরের শাসক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম; কাছে আসতে দিলাম না।"

যুহরা ইবনে আবু বকর বলেন ঃ আমার পিতা আমাকে ইরাকে জ্ঞান ব্রতী হতে চিঠি লেখলেন। তিনি লেখলেন– যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও তবে জ্ঞান হবে তোমার ধন। আর যদি ধনাঢ্য হয়ে যাও, তবে জ্ঞান হবে অঙ্গসজ্জা।

হযরত লোকমান তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিলেন ঃ হে বৎস! জ্ঞানীদের কাছে বস। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞানের নূর দ্বারা অন্তরকে জীবিত করেন, যেমন বৃষ্টির পানি দ্বারা মাটিকে শস্যশ্যামল করেন। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্যে পানিতে মাছ এবং শূন্যে পাখীরা পর্যন্ত ক্রন্দন করে। বাহ্যতঃ তাঁকে দেখা না গেলেও তাঁর স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত থাকে।

জ্ঞান অন্বেষণের মাহাত্ম্য

এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ ঃ

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ -

"তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে?"

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"অতএব যারা স্মরণ রাখে, তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যদি তোমরা না জান।"

হাদীস নিম্নরূপ ঃ

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَّطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللّٰهُ بِهٖ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ ـ

"যেব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে চলে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালাবেন।"

* ফেরেশতারা জ্ঞান অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্যে পাখা বিছিয়ে দেয়।

* একশ' রাকআত নফল নামায পড়া অপেক্ষা জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা উত্তম।

* জ্ঞানের কোন অধ্যায় শিক্ষা করা মানুষের জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম।

* জ্ঞান অন্বেষণ কর, যদিও তা চীনে থাকে; অর্থাৎ অনেক দূরে থাকে।

* জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

* জ্ঞান একটি ভাণ্ডার, যার চাবি হচ্ছে প্রশ্ন করা । সুতরাং জ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশ্ন কর। কেননা, এতে চার ব্যক্তি সওয়াব পায়– (১) প্রশ্নকারী (২) জ্ঞানী ব্যক্তি (৩) শ্রোতা এবং (৪) যে তাদের প্রতি মহব্বত রাখে।

* মূর্খ ব্যক্তি যেন তার মূর্খতা নিয়ে চুপ করে বসে না থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরও তার জ্ঞান নিয়ে চুপ থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ, মূর্খতা দূর করার জন্যে প্রশ্ন করবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি তার জওয়াব দিবে।

* হযরত আবু যরের (রাঃ) হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জ্ঞান সংক্রান্ত মজলিসে হাযির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া, হাজার রোগীর খবর নিতে যাওয়া এবং হাজার জানাযায় যোগদান অপেক্ষা উত্তম। কেউ আরজ করল ঃ কোরআন তেলাওয়াত অপেক্ষাও কি উত্তম? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ জ্ঞান ব্যতীত কোরআন কি উপকার করে?

* ইসলামকে জীবিত করার উদ্দেশে জ্ঞান অন্বেষণকালে যেব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, জান্নাতে তার এবং পয়গম্বরগণের স্তর হবে এক।

নিম্নে এ প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি বর্ণিত হল ঃ

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি যখন জ্ঞান অর্জন করছিলাম, তখন হীন ছিলাম। এখন আমার কাছে লোকজন জ্ঞান লাভ করতে শুরু করলে সম্মানের অধিকারী হয়ে গেছি।

* ইবনে আবী মুলায়কা বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সমতুল্য কাউকে দেখিনি। তাঁর মুখাকৃতি সর্বোত্তম, কথাবার্তা প্রাঞ্জল এবং ফতোয়া সর্বাধিক জ্ঞানবহ।

* ইবনে মোবারক বলেন ঃ আমার কাছে সেই ব্যক্তি আশ্চর্যজনক, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে না। কারণ, তার মন তাকে কোন মাহাত্ম্যের প্রতি আহ্বান করে না।

* জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ দু'ব্যক্তির প্রতি আমার মনে যে দয়ার উদ্রেক হয়, তা অন্য কারও প্রতি হয় না– এক, সে ব্যক্তি, যে জ্ঞান অন্বেষণ করে; কিন্তু বুঝে না এবং দুই, সে ব্যক্তি, যে বুঝে; কিন্তু অন্বেষণ করে না।

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ একটি মাসআলা শিক্ষা করা আমার মতে সারা রাত জেগে নফল পড়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি এবং জ্ঞান অন্বেষণকারী কল্যাণে অংশীদার। অন্য সকলেই কল্যাণ থেকে বঞ্চিত। তিনি আরও বলেন ঃ জ্ঞানী হও অথবা জ্ঞান অন্বেষণকারী হও অথবা শ্রোতা হও, চতুর্থ কোন কিছু হয়ো না, তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

* হযরত আতা (রহঃ) বলেন ঃ জ্ঞানের একটি মজলিস ক্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের কাফ্‌ফারা হয়ে যায়।

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হাজার রাত জাগরণকারী রোযাদার আবেদের মরে যাওয়া এমন জ্ঞানী ব্যক্তির তুলনায় কম, যে আল্লাহ্ তা'আলার হালাল ও হারাম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ।

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অন্বেষণ করা নফলের চেয়ে উত্তম।

* ইবনে আবদুল হাকাম বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের কাছে পাঠাভ্যাসে রত ছিলাম। এমন সময় যোহরের সময় হল। আমি নামাযের জন্যে কিতাব বন্ধ করলে তিনি বললেন ঃ ওহে, যার জন্যে তুমি উঠেছ, সেটা এর চেয়ে উত্তম নয়, যাতে তুমি ছিলে। তবে নিয়ত দুরস্ত হওয়া শর্ত।

* হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মনে করে, জ্ঞান অন্বেষণ করা জেহাদ নয়, সে বুদ্ধি বিবেচনায় অপক্ব।

জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব

এ সম্পর্কিত আয়াত এই ঃ

وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ ـ

"এবং যাতে সতর্ক করে তাদের সম্প্রদায়কে, যখন তাদের কাছে ফিরে আসে, যাতে সম্প্রদায়ের লোকেরা সংযমী হয়।"

এ আয়াতে সতর্ক করার অর্থ জ্ঞানদান ও পথ প্রদর্শন।

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ـ

"যখন আল্লাহ কিতাবের অধিকারীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন একে মানুষের জন্যে অবশ্যই বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।"

এতে বলা হয়েছে, জ্ঞানের শিক্ষাদান ওয়াজেব।

وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ـ

"এবং তাদের একটি দল জেনে-শুনে সত্য গোপন করে।"

এতে বর্ণিত হয়েছে যে, জ্ঞান গোপন করা হারাম। যেমন- সাক্ষ্য গোপন করার জন্যে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ـ

যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপিষ্ঠ।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ

"তার চেয়ে সুন্দর কথা কার, যে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে!"

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ـ

"তোমার পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে।"

শিক্ষাদানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে জ্ঞানদান করে তার কাছ থেকে সে অঙ্গীকারও নিয়েছেন, যা পয়গম্বরগণের কাছ থেকে নিয়েছেন; অর্থাৎ, তারা অবশ্যই তা বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়ামন প্রেরণ করার সময় বললেন ঃ

لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ

"যদি আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা একটি লোককেও পথ প্রদর্শন করেন, তবে এটা হবে তোমার জন্যে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম।"

* যেব্যক্তি অন্যদেরকে শিক্ষাদানের উদ্দেশে জ্ঞানের একটি অধ্যায় শিক্ষা করবে, তাকে অবশ্যই পয়গম্বর ও সিদ্দীকের সওয়াব দান করা হবে।

* হযরত ঈসা (আঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তদনুযায়ী আমল করে এবং মানুষকে তা শিক্ষাদান করে, সে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে মহান বলে বিবেচিত হয়।

* কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা এবাদতকারী ও জেহাদকারীদেরকে বলবেন ঃ জান্নাতে যাও। আলেম তথা জ্ঞানী ব্যক্তি বলবেন ঃ ইলাহী! তারা আমাদের জ্ঞানের বদৌলতে এবাদত ও জেহাদ করেছে; অর্থাৎ সম্মান পাওয়ার যোগ্য আমরা। আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ তোমরা আমার কাছে আমার কোন কোন ফেরেশতার সমতুল্য। তোমরা সুপারিশ কর। তোমাদের সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। অতঃপর তারা সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ মর্তবা সে জ্ঞানের, যা শিক্ষাদানের মাধ্যমে অপরের কাছে পৌঁছায়। সে জ্ঞানের নয়, যা কেবল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যেই সীমিত থাকে এবং অন্যের কাছে পৌঁছায় না।

* রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا مِّنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ يُّؤْتِيَهُمْ إِيَّاهُ وَلٰكِنْ يَذْهَبُ بِذِهَابِ الْعُلَمَاءِ

فَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا رُؤَسَاءُ جُهَّالًا إِنْ سُئِلُوا أَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَضِلُّونَ يُضِلُّونَ -

"আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দান করার পর তা ছিনিয়ে নিয়ে যান না। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়া থেকে তুলে নেয়ার মাধ্যমে জ্ঞানও তুলে নেন। সেমতে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি দুনিয়া থেকে চলে গেলে তার সাথে জ্ঞানও চলে যায়। অবশেষে মূর্খ নেতৃবর্গ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এই মূর্খদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করলে তারা না জেনে না শুনে ফতোয়া দেয়। ফলে নিজেরাও বিপথগামী হয় এবং অপরকেও বিপথগামী করে।

مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ -

যেব্যক্তি কোন জ্ঞান অর্জন করে, অতঃপর তা গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।

* উৎকৃষ্ট দান ও উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে জ্ঞানের কথা, যা তুমি শুনে স্মরণ রাখবে, এরপর মুসলমান ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে এবং তাকে শিক্ষা দেবে। এটা এক বছর এবাদতের সমান।

* বলা হয়েছে ঃ

اَلدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ وَّمَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَمَا وَالَاهُ اَوْ مُعَلِّمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا -

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং যা কিছু তাতে রয়েছে, তাও অভিশপ্ত; কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং যা এর নিকটবর্তী হয় অথবা শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থী, এগুলো অভিশপ্ত নয়।

اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهٗ وَمَلَائِكَتَهٗ وَاَهْلَ سَمٰوَاتِهٖ وَاَرْضِهٖ حَتَّى النَّمْلَةَ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ فِي الْبَحْرِ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ -

নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীবৃন্দ, এমনকি পিপীলিকা তাদের গর্তে এবং মৎস্য সমুদ্রে সেই শিক্ষকের জন্যে রহমত কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়।

* এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দোয়ার চাইতে বড় কোন উপকার করতে পারে না।

* যদি ঈমানদার একটি উত্তম কথা শুনে তদনুযায়ী আমল করে, তবে তার জন্যে তা এক বছরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।

* একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাড়ী থেকে বের হয়ে দু'টি মজলিস দেখলেন। এক মজলিসে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া প্রার্থনা করা হচ্ছিল এবং মজলিসের লোকেরা দোয়ার প্রতিই উৎসুক ছিল। অপর মজলিসে শিক্ষাদান করা হচ্ছিল। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ প্রথম মজলিসের লোকেরা তো আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে দেবেন এবং ইচ্ছা না করলে দেবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় মজলিসের লোকেরা শিক্ষাদানে রত আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকেও শিক্ষাদাতারূপেই প্রেরণ করেছেন। এই বলে তিনি দ্বিতীয় মজলিসের দিকে গেলেন এবং তাদের মধ্যে বসে পড়লেন।

* রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

مَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ
كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا بُقْعَةٌ
قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَتْ
مِنْهَا بُقْعَةٌ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا
النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ
قَيْعَانٌ لَاتَمْسَكُ مَاءً وَّلَا تُنْبِتُ كَلَاً۔

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত কোন ভূখণ্ডে পতিত প্রচুর বৃষ্টির মত। সে ভূখণ্ডের কিছু অংশ এমন যে, সে পানি ধারণ করে এবং প্রচুর ঘাস উৎপন্ন করে। অপর অংশ এমন যে, সে পানি আটকে রাখে। আল্লাহ তা'আলা আটকে পড়া সে পানি দ্বারা মানুষকে উপকার পৌছান। তারা তা পান করে এবং

ক্ষেতে সেচ করে। পক্ষান্তরে সে ভূখন্ডের কিছু অংশ এমন যে, সে পানি আটকায় না এবং ঘাস, লতাপাতাও উৎপন্ন করে না।"

এ হাদীসে ভূখন্ডের প্রথম অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা জ্ঞানের দ্বারা নিজেরা উপকৃত হয়। দ্বিতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা অপরকে উপকার পৌছায় এবং তৃতীয় অংশটি তাদের দৃষ্টান্ত, যারা উভয় বিষয় থেকে বঞ্চিত।

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ عِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَصَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَّوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْ لَهُ بِالْخَيْرِ -

মানুষ মারা গেলে তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিনটি বিষয় অব্যাহত থাকে– (১) জ্ঞান- যা দ্বারা অপরের উপকার হয়, (২) সদকায়ে জারিয়া এবং (৩) সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, যে তার জন্যে নেক দোয়া করে।

اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ -

* সৎ কাজের প্রতি যে উৎসাহ দেয়, সে সৎকর্মীর অনুরূপ।

لَا حَسَدَ اِلَّا فِى اثْنَيْنِ رَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ وَرَجُلٌ اٰتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلٰى هَلَكَتِهِ فِى الْخَيْرِ -

* দু'ব্যক্তির প্রতিই ঈর্ষা করা উচিত– (১) যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন; অতঃপর সে তদনুযায়ী কাজ করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়। (২) যাকে আল্লাহ তা'আলা ঐশ্বর্য দিয়েছেন এবং তা দান-খয়রাতে ব্যয় করতে বাধ্য করেছেন।

* আমার নায়েবদের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আপনার নায়েব কারা? তিনি বললেন ঃ যারা আমার পথ বেছে নেয় এবং তা মানুষকে শিক্ষা দেয়।

শিক্ষাদানের ফযীলত সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি ঃ

* হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কোন হাদীস বর্ণনা করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, সে সেসব লোকের সমান সওয়াব পাবে, যারা সে কাজটি সম্পাদন করবে।

* হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে ভাল কথা শেখায়, তার জন্যে সকল বস্তু, এমনকি সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত এস্তেগফার করে।

* জনৈক আলেম বলেন ঃ জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ।

* বর্ণিত আছে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) আসকালানে এসে কিছু দিন অবস্থান করেন। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তিনি বললেন ঃ আমার জন্যে সওয়ারী ঠিক করে দাও, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। এ শহরে জ্ঞানের অপমৃত্যু ঘটবে। এ কথা বলার কারণ, তিনি শিক্ষাদানের মাহাত্ম্য এবং এর মাধ্যমে জ্ঞান অব্যাহত রাখতে প্রয়াসী ছিলেন।

* আতা (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিবের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি কাঁদছেন। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমাকে কেউ জ্ঞানের কথা জিজ্ঞেস করে না।

* জনৈক মনীষী বলেন ঃ জ্ঞানীরা কালের প্রদীপ। স্ব স্ব সময়ে প্রত্যেকেই উজ্জ্বল বাতি বিশেষ। সমসাময়িক লোকেরা তাঁদের কাছ থেকে আলো আহরণ করে।

* হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেম সম্প্রদায় না থাকলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যেত। অর্থাৎ, জ্ঞানীরা জ্ঞানদানের মাধ্যমে মানুষকে পশুত্বের স্তর থেকে বের করে মানবতার স্তরে পৌঁছে দেয়।

* ইকরিমা বলেন ঃ এ জ্ঞানের কিছু মূল্য আছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ তা কি? তিনি বললেন ঃ তা এই যে, তা এমন ব্যক্তিকে শিক্ষা দেবে, যে স্মরণ রাখে এবং বিনষ্ট না করে।

* ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায বলেন ঃ আলেমগণ উম্মতের প্রতি পিতামাতার চেয়ে অধিক দয়াশীল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কেমন করে? তিনি বললেন ঃ পিতামাতা মানুষকে দুনিয়ার আগুন থেকে রক্ষা করে, আর আলেমগণ রক্ষা করেন আখেরাতের আগুন থেকে।

* জনৈক মনীষী বলেন ঃ জ্ঞানের সূচনা চুপ থাকা, অতঃপর শ্রবণ করা, অতঃপর মুখস্থ করা, অতঃপর আমল করা, অতঃপর মানুষের মধ্যে প্রচার করা।

* অন্য একজন বলেন ঃ নিজের জ্ঞান এমন ব্যক্তিকে দাও যে সে সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এমন ব্যক্তির কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ কর, যে তুমি

যা জান না তা জানে। এরূপ করলে তুমি যা জান না, তা জানতে পারবে এবং যা জানবে তা মনে থাকবে।

* হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন ঃ আমি এ বিষয়টি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকেও বর্ণিত পেয়েছি যে, জ্ঞান অর্জন কর। কারণ, জ্ঞানার্জন করা খোদাভীতি, তার অন্বেষণ এবাদত, তার পাঠদান তসবীহ্ এবং তার আলোচনা জেহাদ। যেব্যক্তি জানে না, তাকে জ্ঞানদান করা খয়রাত। যোগ্য ব্যক্তির জন্যে তা ব্যয় করা নৈকট্য। জ্ঞান একাকীত্বে সহচর, সফরে সঙ্গী, একান্তে বাক্যালাপকারী, ধর্মের পথপ্রদর্শক, সচ্ছলতা ও নিঃস্বতা উভয় অবস্থায় পথপ্রদর্শক, বন্ধুদের সামনে প্রতিনিধিত্বকারী, অপরিচিতদের মধ্যে নৈকট্যকারী, শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার এবং জান্নাতের পথে আলোকবর্তিকা। এ জ্ঞানের বদৌলত আল্লাহ্ তা'আলা কিছু লোককে উচ্চ মর্তবা দান করেন। তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সর্দার, নেতা ও পথপ্রদর্শক করেন। তাদের দেখাদেখি অন্যরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। মানুষ তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলে এবং তাদের ক্রিয়াকর্মের প্রতি তাকিয়ে থাকে। ফেরেশতারা তাদের বন্ধুত্ব কামনা করে এবং পাখা দ্বারা তাদেরকে মুছে পরিষ্কার করে। প্রাণী ও নিষ্প্রাণ সবাই তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি, সমুদ্রের মৎস্য, পোকমাকড়, স্থলের হিংস্র সরীসৃপ ও চতুষ্পদ জীব-জন্তু এবং আকাশ ও তারকারাজি পর্যন্ত মাগফেরাতের দোয়া করে। কারণ, জ্ঞান আত্মার জন্য জীবনী শক্তি। এর কারণে মূর্খতা থাকে না। জ্ঞান একটি নূর। এটি যার মধ্যে থাকে তার সামনে থেকে অন্ধকার সরে যায়। জ্ঞানের দ্বারা দেহ শক্তি পায় এবং দুর্বলতা দূরীভূত হয়। এর সাহায্যে বান্দা সৎলোকদের মর্তবা ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা রোযা রাখার সমান এবং জ্ঞানদানে মশগুল থাকা রাত জেগে নফল এবাদত করার সমান। জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য, একত্বে বিশ্বাস ও এবাদত হয়। এর মাধ্যমেই পরহেযগারী, তাকওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং হালাল হারামের জ্ঞান অর্জিত হয়। জ্ঞান ইমাম এবং আমল তার অনুসারী। সৎলোকদের অন্তরেই এর জন্যে স্থান করা হয় এবং হতভাগ্যরা এ থেকে বঞ্চিত থাকে। আমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তওফীকপ্রার্থী।

যে জ্ঞান ফরযে আইন

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

* জ্ঞান অর্জন কর; যদিও তা চীন দেশে থাকে।

যে জ্ঞান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন, তা কি? এ ব্যাপারে মতভেদ আছে এবং এতে বিশটিরও বেশী মতের সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা সবগুলোর বিবরণ দিচ্ছি না। তবে মতভেদের সারকথা প্রত্যেক পক্ষই সে জ্ঞানকে অত্যাবশ্যক বলেছেন, যাতে সে নিজে নিয়োজিত ছিল। উদাহরণতঃ কালাম শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বলেন, কালাম শাস্ত্রই ফরযে আইন। কারণ, তওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্ববাদ এর মাধ্যমেই জানা যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান এ শাস্ত্রের দ্বারাই অর্জিত হয়। ফেকাহ্বিদগণ বলেন, ফেকাহ্শাস্ত্র শিক্ষা করা ফরযে আইন। কারণ, এর মাধ্যমে এবাদত, হালাল-হারাম এবং জায়েয না-জায়েয ও আদান-প্রদান সম্পর্কে জানা যায়। তফসীরবিদ ও হাদীসবিদগণ বলেন ঃ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের (সাঃ) সুন্নত শিক্ষা করা ফরযে আইন। কেননা, এ দু'টি থেকেই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তি। সূফীগণ বলেন ঃ ফরযে আইন হচ্ছে আমাদের জ্ঞান। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, বান্দার নিজের অবস্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার মর্যাদার অবস্থা জানা ফরযে আইন। কেউ বলেন ঃ এখলাস, নফসের অপবাদ এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা ও ফেরেশতাদের এলহামের পার্থক্য জানা ফরযে আইন। আবার কেউ বলেন, ফরযে আইন হচ্ছে 'এলমে বাতেন', যা এ জ্ঞানের যোগ্য বিশেষ লোকদের উপর ওয়াজেব। তাঁরা শব্দের ব্যাপকতা পরিবর্তন করে একে বিশেষ অর্থে নিয়েছেন।

আবু তালেব মক্কী (রহঃ) বলেন ঃ ফরযে আইন হচ্ছে সে জ্ঞান, যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله الخ

পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত ঃ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই----------।

কেননা, এ পাঁচটি বিষয়ই ওয়াজেব। তাই এগুলো জানাও ওয়াজেব।

এখন শিক্ষার্থীর পক্ষে যে বিষয়টি বিশ্বাস করা দরকার, তা আমরা উল্লেখ করছি। আমরা এ অধ্যায়ের ভূমিকায় বলে এসেছি যে, এলেম দুই প্রকার (১) এলমে মোয়ামালা ও (২) এলমে মোকাশাফা। হাদীসে যে এলেম প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয বলে ব্যক্ত হয়েছে, তা হচ্ছে এলমে মোয়ামালা তথা আদান-প্রদান সম্পর্কিত জ্ঞান। বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে তিন প্রকার বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়– (১) বিশ্বাস, (২) বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা ও (৩) না করা। এখন ধর, কোন ব্যক্তি সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময়ে বালেগ হল। এখন তার উপর প্রথমতঃ ওয়াজেব হবে শাহাদতের উভয় কলেমা অর্থসহ শিক্ষা করা। অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" কলেমাটি শেখা ও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ওয়াজেব হবে। এ সম্পর্কে আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণ লিপিবদ্ধ করে বিশ্বাস করা ওয়াজেব হবে না; বরং নিঃসন্দেহে ও দ্বিধাহীন চিত্তে কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করাই তার পক্ষে যথেষ্ট হবে। এতটুকু জ্ঞান মাঝে মাঝে অনুসরণ ও শ্রবণের মাধ্যমেও অর্জিত হয়ে যায়– আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন হয় না। আলোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ ওয়াজেব না হওয়ার কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরবের লোকদের কাছ থেকে যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই কেবল সত্য বলে বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেছেন।

মোট কথা, উপরোক্ত বিষয়টুকু জেনে নিলেই তখনকার ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। তখন কলেমাদ্বয় শিক্ষা করা ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই তার জন্যে ফরযে আইন ছিল। এছাড়া অন্য কোন কিছু তার জন্যে জরুরী ছিল না। কারণ, সে যদি এই কলেমাদ্বয় সত্য বলে বিশ্বাস করার পর মারা যায়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত বান্দারূপেই মরবে, নাফরমানরূপে নয়।

কলেমার পর অন্য বিষয়সমূহ সাময়িক কারণাদির ভিত্তিতে তার উপর ওয়াজেব হয়। এগুলো প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য নয়। কেউ কেউ এগুলো থেকে আলাদাও থাকতে পারে। এসব সাময়িক কারণ কর্ম ও বিশ্বাসের মধ্যে দেখা দেয়। প্রথমটির উদাহরণ এই– মনে কর, উপরোক্ত ব্যক্তি সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী সময় থেকে যোহর পর্যন্ত জীবিত

রইল। যোহরের সময় এলে তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে ওযু ও নামাযের মাসআলা শিক্ষা করা। অতএব এ ব্যক্তি বালেগ হওয়ার সময় সুস্থ থাকলে যদি সে সূর্য ঢলে পড়ার সময় পর্যন্ত কিছু না শেখে এবং এ সময়ের পর শিখতে শুরু করলে ঠিক সময়ে সব শেখে আমল করতে না পারে, তবে বলা যায় যে, ব্যহ্যতঃ সে জীবিত থাকবে বিধায় সময়ের পূর্বেই শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব। এ কথাও বলা যায়, জানা আমল করার জন্যে শর্ত। আমল ওয়াজেব হওয়ার পর সে আমল সম্পর্কে জানা ওয়াজেব হয়। সুতরাং প্রথম সময় থেকে শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়। অন্যান্য নামাযের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য।

এর পর যদি এ ব্যক্তি রমযান পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে রমযানের কারণে রোযা শিক্ষা করা তার উপর নতুন ওয়াজেব হবে। অর্থাৎ, জানতে হবে যে, সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার সময়। এ সময়ে রোযার নিয়ত করা এবং পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা জরুরী।

এখন যদি তার কাছে অর্থ-সম্পদ আসে অথবা বালেগ হওয়ার সময়ই অর্থ সম্পদ থাকে, তবে যাকাতের পরিমাণ জানা তার জন্যে অপরিহার্য হবে। কিন্তু তখনই অপরিহার্য হবে না; বরং বালেগ হওয়ার সময় থেকে এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর অপরিহার্য হবে। যদি তার কাছে উট ব্যতীত অন্য কিছু না থাকে তবে কেবল উটের যাকাত জানাই জরুরী হবে। অন্যান্য মালের ক্ষেত্রে এরূপ বুঝা উচিত।

যদি তার উপর হজ্জের মাস আসে, তবে হজ্জের মাসআলা তখনই জানা জরুরী নয়। কেননা, হজ্জ সমগ্র জীবৎকালের মধ্যে মাত্র একবার আদায় করতে হয়। তবে আলেমগণের উচিত তার সামর্থ্য থাকলে বলে দেয়া যে, জীবনে একবার হজ্জ করা সে ব্যক্তির উপর ফরয, যে পাথেয় ও সওয়ারীর মালিক। এতে সম্ভবতঃ সে সাবধানতা অবলম্বন জরুরী মনে করে দ্রুত হজ্জ আদায় করতে সচেষ্ট হবে। অতঃপর যখন সে হজ্জ করার ইচ্ছা করবে, তখন মাসআলা শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব হবে। তবে কেবল হজ্জের আরকান ও ওয়াজেব বিষয়সমূহ শিক্ষা করা জরুরী হবে– নফলসমূহ নয়। কারণ, যে কাজ করা নফল, তা শিক্ষা করাও নফল। মোট কথা, যেসব করণীয় কাজ ফরযে আইন, সেগুলো শিক্ষা করা ক্রমান্বয়ে এমনিভাবে ওয়াজেব হবে। বর্জনীয় কর্মের ক্ষেত্রেও যখন যেরূপ অবস্থা দেখা দেবে, সেভাবেই তা শিক্ষা করা ওয়াজেব। এ বিষয়টি

মানুষের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ। উদাহরণতঃ যেসব কথাবার্তা বলা হারাম, সেগুলো জানা বোবার জন্যে ওয়াজেব নয়; অথবা অবৈধ দৃষ্টির মাসআলা জানা অন্ধের জন্যে জরুরী নয় কিংবা যারা জঙ্গলে বাস করে, তাদের জন্যে কোন্ কোন্ গৃহে বসা হারাম, তা জানা আবশ্যক নয়। মোট কথা, যদি জানা যায়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এসব বিষয়ের প্রয়োজন হবে না, তবে সেগুলো শিক্ষা করা তার উপর ওয়াজেব নয়; বরং যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত, সেগুলো সম্পর্কে বলে দেয়া জরুরী।

উদাহরণতঃ যদি মুসলমান হওয়ার সময় রেশমী বস্ত্র পরিহিত থাকে অথবা অবৈধভাবে দখল করা যমীনে বসে থাকে কিংবা বেগানা নারীর প্রতি তাকিয়ে থাকে, তবে তাকে এসব বিষয় বর্জন করার কথা বলে দেয়া জরুরী। যেসব বিষয়ে সে লিপ্ত নয়; বরং অদূর ভবিষ্যতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন পানাহারের বস্তু, সেগুলো শিক্ষা দেয়া ওয়াজেব। উদাহরণতঃ যদি কোন শহরে মদ্যপান ও শূকরের মাংস খাওয়ার প্রচলন থাকে, তবে তাকে এগুলো বর্জন করার কথা বলা জরুরী। যেসব বিষয় শিক্ষা করা ওয়াজেব, সেগুলো শেখানোও ওয়াজেব। বিশ্বাস এবং অন্তরের কর্মসমূহ জানাও আশংকা অনুযায়ী ওয়াজেব। যেমন, তার অন্তরে কলেমাদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হলে তার এমন বিষয় শেখা উচিত, যদ্দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যায়। যদি সে সন্দেহ করে এবং মরে যায়; মৃত্যুর সময় সে বিশ্বাস করেনি যে, আল্লাহ্ তা'আলার কালামে পাক অনন্ত, আল্লাহর দীদার সম্ভবপর, তার মধ্যে পরিবর্তনের অবকাশ নেই এবং এছাড়া অন্যান্য বিশ্বাসও পোষণ করেনি, তবে এরূপ ব্যক্তি সকলের মতানুযায়ী ইসলামের উপরই মরেছে। কিন্তু যেসব কুমন্ত্রণা বিশ্বাসের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, সেগুলোর কতক স্বয়ং মানুষের মন থেকে উদগত হয় এবং কতক পরিস্থিতি-পরিবেশের প্রভাব মনে উৎপন্ন হয়। যদি সে এমন শহরে বসবাস করে, যেখানে বেদআতী কথাবার্তার প্রচলন রয়েছে, তবে তাকে বালেগ হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে সত্য বিষয় শিখিয়ে বেদআত থেকে রক্ষা করতে হবে, যাতে প্রথমেই মিথ্যা শিকড় গেড়ে না বসে। কেননা, মিথ্যা শ্রুতিগোচর হয়ে গেলে তা মন থেকে দূর করা ওয়াজেব হবে। অবশ্য কোন কোন সময় এটা দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণতঃ নও-মুসলিম ব্যক্তি ব্যবসায়ী হলে এবং তার শহরে সুদের কারবার প্রচলিত থাকলে সুদ থেকে আত্মরক্ষার মাসআলা শিক্ষা করা তার জন্যে ওয়াজেব হবে। অতএব ফরযে আইন শিক্ষা সম্পর্কে আমরা যা

লিপিবদ্ধ করেছি, তাই সত্য। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় আমলের অবস্থা জানা ফরযে আইন। সুতরাং যেব্যক্তি প্রয়োজনীয় আমল ও তার ওয়াজেব হওয়ার সময় জেনে নেবে, সে তার ফরযে আইন জ্ঞান অর্জন করে নেবে। সূফীগণ বলেছেন, ফরযে আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং ফেরেশতাদের ইলহাম জানা। তাদের এ উক্তিও সত্য, কিন্তু সে ব্যক্তির জন্যে, যে এতে লিপ্ত হয়। মানুষ যেহেতু প্রায়ই অনিষ্টের কারণাদি তথা রিয়া ও হিংসা থেকে মুক্ত থাকে না, তাই তিনটি ধ্বংসাত্মক বিষয়ের মধ্য থেকে যার প্রতি সে নিজেকে মুখাপেক্ষী দেখে, তা জানা তার জন্যে অপরিহার্য। এটা জানা অবশ্যই ওয়াজেব। কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয় মারাত্মক– (১) কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয়, (২) কুপ্রবৃত্তি, যা মেনে চলা হয় এবং (৩) আত্মম্ভরিতা। কোন মানুষ এগুলো থেকে মুক্ত নয়। পরে আমরা আড়ম্বর, আত্মপ্রীতি ইত্যাদি মনের যেসব অবস্থা উল্লেখ করব, সে এ তিনটি মারাত্মক বিষয়েরই অনুসারী, যা দূর করা ফরযে আইন। এই মারাত্মক বিষয়সমূহের সংজ্ঞা, কারণাদি, লক্ষণ ও প্রতিকার না জানা পর্যন্ত এগুলো দূর করা সম্ভব নয়। কেননা, অনিষ্ট সম্পর্কে না জানার কারণেই মানুষ অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকার হচ্ছে বিপরীত বিষয় দ্বারা তার মোকাবিলা করা। পরবর্তীতে বিনাশন পর্বে আমরা যা লিপিবদ্ধ করেছি, তার অধিকাংশই ফরযে আইন। সব মানুষ অনর্থক বিষয়াদিতে মশগুল হওয়ার দিক দিয়ে সেগুলো বর্জন করে রেখেছে।

নও-মুসলিম ব্যক্তিকে বেহেশত, দোযখ, পুনরুজ্জীবন ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় দ্রুত শিক্ষা দিতে হবে– যাতে সে এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করে। এ বিষয়টিও দুটি কলেমায়ে শাহাদতের পরিশিষ্ট। কারণ, রসূলে করীম (সাঃ)-এর রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাঁর আনীত বিষয়সমূহও বুঝা দরকার। তা এই যে, যেব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করে, তার জন্যে জান্নাত এবং যে তাঁদের নাফরমানী করে তার জন্য জাহান্নাম। সত্য মাযহাব এটাই এবং এ থেকে আরও জানা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির দিবারাত্রির চিন্তাধারার মধ্যে এবাদত ও আদান-প্রদানের কিছু নতুন নতুন ঘটনা ঘটতে থাকে। এ কারণেই তার সামনে যে অভিনব ঘটনা ঘটে, তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী এবং যে ঘটনা সত্বর ঘটবে বলে আশা করা যায়, অবিলম্বে তার জ্ঞান লাভ করাও জরুরী।

সুতরাং জানা গেল, طلب العلم فريضة على كل مسلم বলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সে আমলের এলেমই বুঝিয়েছেন, যার ওয়াজেব হওয়া সুস্পষ্ট, অন্য কোন এলেম বুঝাননি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল, আমল ওয়াজেব হওয়ার সময় ক্রমান্বয়ে এলেম ওয়াজেব হতে থাকবে। والله اعلم

যে জ্ঞান ফরযে কেফায়া

প্রকাশ থাকে যে, শিক্ষার প্রকারসমূহ উল্লেখ না করা পর্যন্ত কোন্‌টি ফরয এবং কোন্‌টি ফরয নয়– এর পার্থক্য বুঝা যাবে না। ফরযে কেফায়ার দিক দিয়ে জ্ঞান দু'রকম– শরীয়তগত ও শরীয়ত বহির্ভূত। পয়গম্বরগণের কাছ থেকে যে জ্ঞান অর্জিত হয় এবং বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও শ্রবণ দ্বারা অর্জিত হয় না, তাকে আমরা শরীয়তগত জ্ঞান বলে থাকি। যেমন, অংক শাস্ত্র বুদ্ধি দ্বারা, চিকিৎসা শাস্ত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং অভিধান শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা অর্জিত হয়। যে জ্ঞান শরীয়তগত নয়, তা তিন প্রকার– ভাল, মন্দ, অনুমোদিত। যে জ্ঞানের সাথে পার্থিব বিষয়াদির উপযোগিতা জড়িত, তা ভাল জ্ঞান; যেমন চিকিৎসা ও অংক শাস্ত্র! এ শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে কতক ফরযে কেফায়া এবং কতক শুধু ভাল– ফরয নয়। পার্থিব বিষয়াদিতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা ফরযে কেফায়া। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র। দেহের সুস্থতার জন্যে এটা জরুরী। লেনদেন, ওসিয়ত, উত্তরাধিকার বন্টন ইত্যাদিতে অংক শাস্ত্র জরুরী। শহরে কোন ব্যক্তি এ জ্ঞানের অধিকারী না থাকলে শহরবাসীর অসুবিধার অন্ত থাকবে না। কিন্তু অংক শাস্ত্রে একজন জ্ঞানী হলেও যথেষ্ট হয়ে যায় এবং অন্যরা এ ফরয থেকে অব্যাহতি পায়। আমরা চিকিৎসা ও অংক শাস্ত্রের জ্ঞান ফরয বলেছি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেননা, এদিক দিয়ে মৌলিক শিল্পগুলোও ফরযে কেফায়া। উদাহরণতঃ বস্ত্র বয়ন, কৃষিকাজ এবং রাজনীতি প্রভৃতিও ফরযে কেফায়া। বরং বদরক্ত চুষে বের করা এবং সেলাই কর্ম শিক্ষা করাও জরুরী। কোন শহরে বদরক্ত বের করার লোক না থাকলে শহরবাসীর জীবন বিপন্ন হবে। যে আল্লাহ রোগ প্রেরণ করেছেন, তিনি ওষুধও নাযিল করেছেন এবং ব্যবহার পদ্ধতিও নির্দেশ করেছেন। এভাবে তিনি রোগমুক্তির উপকরণ ঠিক করে দিয়েছেন। সুতরাং এসব উপকরণ কাজে না লাগিয়ে বিনা চিকিৎসায় মরে যাওয়া বৈধ নয়। যে জ্ঞান ফরয নয়, কেবল ভাল, যেমন অংক ও চিকিৎসার

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করার প্রয়োজন হয় না। শরীয়ত বহির্ভূত জ্ঞানের মধ্যে মন্দ শিক্ষা, যেমন জাদু ও তেলেসমাতের জ্ঞান, আর অনুমোদিত অর্থাৎ, বৈধ জ্ঞান যেমন, ক্ষতিকর নয় এমন কবিতা এবং ইতিহাসের জ্ঞান। এখানে শরীয়তগত জ্ঞান বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এ জ্ঞান সবই ভাল। কিন্তু বাস্তবে মন্দ হওয়া সত্ত্বেও তা শরীয়তগত জ্ঞান জানায় ধোঁকা হয় বিধায় এ জ্ঞান দু'রকম– ভাল ও মন্দ। ভাল জ্ঞানের কিছু অংশ মৌলিক, কিছু অংশ শাখা, কিছু অংশ ভূমিকা এবং কিছু অংশ পরিশিষ্ট। অর্থাৎ, এ জ্ঞানের চারটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথম মৌলিক । এ মৌলিক জ্ঞান চারটি–

(১) আল্লাহর কিতাব, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নত, (৩) উম্মতের ইজমা এবং (৪) সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্য। ইজমা যেহেতু সুন্নতকে জানার সুযোগ করে দেয়, তাই এটা মৌলিক জ্ঞান। কিন্তু এর মর্যাদা সুন্নতের পর। সাহাবায়ে কেরামের ঐতিহ্যও সুন্নত জ্ঞাপন করে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ওহী প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা এমন সব বিষয় দেখেছেন যা অন্যের দৃষ্টিতে অদৃশ্য। তাই আলেমগণ তাঁদের অনুসরণ করা এবং তাঁদের ঐতিহ্যগুলোকে প্রমাণ সাব্যস্ত করা যথার্থ মনে করেছেন।

শরীয়তগত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে শাখা, যা এই চারটি মৌলিক জ্ঞান থেকে বুঝা যায়, শব্দাবলী থেকে বুঝা যায় না; বরং অর্থ সম্ভার ও কারণাদির মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। উদাহরণতঃ রসূলে করীম (সাঃ) বলেনঃ لا يقضى القاضى وهو غضبان বিচারক ক্রুদ্ধ অবস্থায় কোন রায় দেবে না। এ থেকে এটাও জানা যায় যে, যখন বিচারকের উপর প্রস্রাবের চাপ থাকে, অথবা সে ক্ষুধার্ত থাকে অথবা রোগ যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে, তখনও রায় দেবে না।

এই শাখা জ্ঞান দু'ভাগে বিভক্ত– (১) পার্থিব কল্যাণ সংক্রান্ত জ্ঞান। কল্যাণের সাথে ফেকাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত। এর দায়িত্বে রয়েছেন ফেকাহ্বিদগণ। তাঁরা পার্থিব আলেম। (২) আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে মনের অবস্থা এবং তার ভাল ও মন্দ অভ্যাসের জ্ঞান। এসব অভ্যাসের মধ্যে কোন্‌টি আল্লাহ্র পছন্দনীয় আর কোন্‌টি অপছন্দনীয়, তাও জানতে হয়। এ গ্রন্থের শেষার্ধে এ জ্ঞানের বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।

শরীয়তগত জ্ঞানের তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ভূমিকা, যা শরীয়তগত জ্ঞানের হাতিয়ারস্বরূপ। যেমন, অভিধান ও ব্যাকরণ উভয়টিই কালামে পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের হাতিয়ার। অথচ অভিধান ও ব্যাকরণ শরীয়তগত জ্ঞান নয়। কিন্তু শরীয়ত জানার জন্যে এগুলো নিয়ে গবেষণা করা অপরিহার্য। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শরীয়ত আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক শরীয়তের অবস্থা তার ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়। তাই আরবী অভিধানের জ্ঞানার্জন কালামে পাক ও হাদীস শরীফের জ্ঞানার্জনের জন্য হাতিয়ার সাব্যস্ত হয়েছে। পুথিগত জ্ঞানও এ হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এটা জরুরী নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উম্মী ছিলেন; পুথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। যদি ধরে নেয়া যায়, শ্রুত কথাবার্তা স্মরণ রাখা সম্ভবপর, তবে লেখা শেখার প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু প্রায়শঃ মানুষ এরূপ হয় না বিধায় অক্ষর জ্ঞান জরুরী।

শরীয়তী জ্ঞানের চতুর্থ প্রকার হচ্ছে পরিশিষ্ট। এটা কোরআন মজীদে রয়েছে। কারণ, এর কতক অংশ শব্দাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, কেরাত ও অক্ষরের মাখরাজ তথা উচ্চারণস্থল প্রভৃতির জ্ঞানার্জন। আবার এর কয়েকটি অর্থের সাথে সম্পৃক্ত– যেমন, তফসীর। এ জ্ঞানও কোরআন হাদীসের জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কেবল অভিধানের জ্ঞান এর জন্যে যথেষ্ট নয়। আরও কতক অংশ কোরআনের বিধি-বিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন, নাসেখ, মনসুখ এবং আম ও খাস ইত্যাদির জ্ঞান। এ জ্ঞানকে 'উসূলে ফেকাহ্' তথা ফেকাহ্র মূলনীতি বলা হয়। হাদীসও এর অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস ও সাহাবীগণের বর্ণনায় রাবীদের নাম, বংশ পরিচয় ও অন্যান্য অবস্থা জানা, সাহাবীদের নাম ও গুণাবলী জানা, যাতে দুর্বল হাদীসকে শক্তিশালী হাদ্বীস থেকে পৃথক করা যায়। রাবীদের বয়সের অবস্থা জানা, যাতে মুরসাল হাদীস মুসনাদ থেকে আলাদা হয়ে যায়। এমনি ধরনের সকল বিষয় পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

শরীয়তগত জ্ঞানের উপরোক্ত প্রকার চতুষ্টয় কল্যাণকর এবং ফরযে কেফায়া। যদি প্রশ্ন হয়, উপরে ফেকাহ পার্থিব জ্ঞান এবং ফোকাহ্বিদগণকে পার্থিব আলেম বলা হল কেন? তবে জওয়াব এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিকে বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করে পিতার ঔরস থেকে মাতার গর্ভে এবং সেখান থেকে দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ করেছেন। এরপর দুনিয়া থেকে

কবরে, কবর থেকে হিসাব-নিকাশের জন্যে হাশরে এবং সেখান থেকে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এগুলোই হচ্ছে মানুষের সূচনা এবং শেষ মনযিল ও শেষ পরিণতি। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াকে মানুষের জন্যে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র করেছেন, যাতে মানুষ উপার্জনযোগ্য বিষয়সমূহ এখানে উপার্জন করে নেয়। মানুষ যদি সুষ্ঠুভাবে ও ইনসাফ সহকারে দুনিয়াকে গ্রহণ করে, তবে সকল ঝগড়াই চুকে যায় এবং ফেকাহ্বিদগণের কোন প্রয়োজনই অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মানুষ তা করে না। সে প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে দুনিয়াকে গ্রহণ করে। ফলে দুনিয়াতে ঝগড়া-বিবাদ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় মানুষকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যে রাজা-বাদশাহ তথা শাসনকর্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং আইন-কানুন রচনা করতে হয়েছে। ফেকাহ্বিদ শাসননীতি প্রণয়নে পারদর্শী এবং বিবাদ-বিসংবাদে মানুষের মধ্যে ইনসাফ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি শাসনকর্তাকে পথ প্রদর্শন করেন। হাঁ, দ্বীনের সাথেও ফেকাহ্র সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সরাসরি নয়– দুনিয়ার মধ্যস্থতায়। কারণ, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের শস্যক্ষেত্র এবং দ্বীন দুনিয়া ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে না। রাজ্য শাসন ও দ্বীন উভয়েই যমজ অর্থাৎ এক সাথে থাকে। দ্বীন আসল এবং রাজ্য তার রক্ষক। বৃক্ষ যেমন শিকড় ব্যতীত টিকে থাকতে পারে না, দ্বীনও তেমনি রক্ষক ব্যতীত কায়েম থাকে না। রাজ্য শাসন ও ব্যবস্থাপনা রাজা ব্যতীত পূর্ণ হয় না। ঝগড়া-বিবাদ ফয়সালা করার ব্যবস্থা ফেকাহ্র সাহায্যে হয়ে থাকে। সুতরাং রাজ্য শাসন যেমন প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়; বরং দ্বীনের পূর্ণতায় রাজ্য শাসন সহায়ক হয়ে থাকে, তেমনি রাজ্য শাসন পদ্ধতি অর্থাৎ ফেকাহ্র জ্ঞানলাভ করাও প্রথম স্তরের দ্বীনী এলেম নয়। উদাহরণতঃ পথিমধ্যে বেদুইনদের কবল থেকে রক্ষা করে– এমন ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে হজ্জ পূর্ণ হয় না। কিন্তু হজ্জ এক বস্তু, হজ্জের পথে চলা দ্বিতীয় বস্তু, হজ্জ পূর্ণ হওয়ার জন্যে পথের নিরাপত্তা তৃতীয় বস্তু এবং এর পদ্ধতি, কৌশল ও আইন-কানুন জানা চতুর্থ বস্তু। রাজ্য শাসন ও হেফাযতের পদ্ধতি শিক্ষা করা ফেকাহ্র সারকথা। নিম্নোক্ত হাদীসটি এর প্রমাণ ঃ

আমীর, মামুর ও মুতাকাল্লিফ– এ তিন শ্রেণী ব্যতীত যেন কেউ শাসনকার্য পরিচালনা না করে।

এ হাদীসে 'আমীর' বলে ইমাম তথা শাসককে বুঝানো হয়েছে। প্রথম যুগে শাসকই ফতোয়া দিতেন। 'মামুর' অর্থ ইমামের নায়েব এবং 'মুতাকাল্লিফ' অর্থ যে আমীরও নয় এবং মামুরও নয়। সে সেই ব্যক্তি, যে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এসব পদ গ্রহণ করে। সাহাবায়ে কেরামের রীতি ছিল, তাঁরা ফতোয়া দেয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলতেন এবং একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। কিন্তু কেউ কোরআন ও আখেরাতের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে বলে দিতেন। কতক রেওয়ায়েতে মুতাকাল্লিফ শব্দের স্থলে 'মুরায়ী' অর্থাৎ, রিয়াকার বর্ণিত আছে। কারণ, যেব্যক্তি ফতোয়া দানের পদ গ্রহণ করে, অথচ এ কাজের জন্যে একমাত্র সেই নির্দিষ্ট নয়, তার মতলব নাম যশ ও অর্থোপার্জন ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। বলা যেতে পারে, আপনার এ বক্তব্য হুদূদ ও কেসাসের বিধি-বিধানে এবং ক্ষতিপূরণ ও ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালায় জায়েয হতে পারে। কিন্তু এ গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত বিষয়বস্তু যেমন– নামায-রোযা ইত্যাদি এবাদত এবং হালাল হারাম কাজ-কারবারের বর্ণনা এ বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করে না। ফেকাহ্‌বিদগণ এসব বিষয়েও ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এর জওয়াব এই যে, ফেকাহ্‌বিদগণ আখেরাতের বিষয়সমূহের মধ্য থেকে যেসব আমল বর্ণনা করেন, সেগুলো বেশীর চেয়ে বেশী তিন প্রকার হতে পারে– (১) ইসলাম, (২) নামায ও যাকাত এবং (৩) হালাল ও হারাম। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও ফেকাহ্‌বিদের চূড়ান্ত দৃষ্টি দুনিয়ার সীমা পার হয়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয় না। এ তিন বিষয়ের অবস্থাই যখন এই, তখন অন্যান্য বিষয়ে তো দুনিয়ার মধ্যেই থাকবে। উদাহরণতঃ ইসলাম সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদ কিছু বললে একথাই বলবে যে, অমুকের ইসলাম সঠিক এবং অমুকের ইসলাম সঠিক নয়। মুসলমান হওয়ার শর্ত এগুলো কিন্তু এসব বর্ণনায় মুখ ছাড়া অন্য কোন দিকে তার দৃষ্টি থাকবে না। অন্তর তার রাজত্বের বাইরে। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাজা বাদশাহদেরকে অন্তরের রাজত্ব থেকে পদচ্যুত করে দিয়েছেন। সেমতে জনৈক সাহাবী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন যে মুখে ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছিল। হত্যাকারী রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এই বলে ওযর পেশ করলেন যে, লোকটি তরবারির ভয়ে কলেমা উচ্চারণ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে শাসিয়ে বললেন ঃ هلا شققت قلبه অর্থাৎ তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে, সে অন্তর দিয়ে বলছে কিনা? বরং ফেকাহবিদ

ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া তরবারির ছায়াতলে দেয়। অথচ সে জানে, তরবারি দ্বারা তার সন্দেহ দূর হয়নি এবং অন্তরের উপর থেকে মূর্খতার পর্দা সরে যায়নি। যদি কোন ব্যক্তির ঘাড়ের উপর তরবারি উত্তোলিত থাকে এবং ধন-সম্পদের দিকে হাত প্রসারিত থাকে, এমতাবস্থায় সে কলেমা উচ্চারণ করলে ফেকাহ্‌বিদের ফতোয়া অনুযায়ী তার প্রাণ ও ধন-সম্পদ বেঁচে যাবে। কলেমার দৌলতে তার জীবন ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে কেউ আপত্তি করতে পারবে না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالواها فقد عصموا منى دماءهم واموالهم ـ

"কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" না বলা পর্যন্ত মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ আমাকে দেয়া হয়েছে। যখন তারা এ কলেমা বলবে, তখন আমার কাছ থেকে তারা তাদের জান ও মাল বাঁচিয়ে নেবে।"

এ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কেবল জান ও মালের উপর এ মৌখিক কলেমার প্রভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আখেরাতে মৌখিক কথাবার্তা উপকারী নয়; বরং অন্তরের নূর, রহস্য ও চরিত্র উপকারী। এসব বিষয় ফেকাহ শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়। কোন ফেকাহ্‌বিদ এগুলো বর্ণনা করলে তা কালাম ও চিকিৎসা শাস্ত্র বর্ণনা করার মতই হবে। তার এ বর্ণনা ফেকাহ্ শাস্ত্র বহির্ভূত।

অনুরূপভাবে যদি কেউ বাহ্যিক সব শর্ত পূরণ করে নামায আদায় করে এবং প্রথম তকবীর ছাড়া সমস্ত নামাযে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গাফেল থাকে; বরং বাজারের কাজকারবারের কথা চিন্তা করতে থাকে, তবে ফেকাহ্‌বিদ অবশ্যই ফতোয়া দেবেন যে, তার নামায সঠিক হয়েছে। অথচ এ নামায আখেরাতে তেমন উপকারী হবে না। যেমন, মুখে কেবল কলেমা উচ্চারণ করে নেয়া ইসলামের ব্যাপারে বিচার দিবসে উপকারী হবে না। কিন্তু ফেকাহ্‌বিদ এই অর্থে ইসলাম সঠিক হওয়ার ফতোয়া দেবেন যে, সে যা করছে তাতে আল্লাহ্‌র আদেশসূচক বাক্য পালিত হয়ে গেছে এবং হত্যা ও শাস্তি তার উপর থেকে অপসারিত হয়ে গেছে! নামাযে খুশু খুযু, নম্রতা ও অন্তর হাযির করা, যা আখেরাতের কাজ, তা

নিয়ে ফেকাহ্‌বিদগণ সচরাচর আলোচনা করেন না। করলেও তা ফেকাহ্ শাস্ত্র থেকে আলাদাই থাকবে।

যাকাতের ব্যাপারেও ফেকাহ্‌বিদের দৃষ্টি এতটুকুতেই নিবদ্ধ থাকে, যতটুকু দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে শাসনকর্তার দাবী পূর্ণ হয়ে যায়। অর্থাৎ, এতটুকু হওয়া যে, যদি মালদার ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করে এবং শাসনকর্তা তাকে জবরদস্তি গ্রেফতার করে, তবে এ ফতোয়া যেন দেয়া যায় যে, তার যিম্মায় যাকাত নেই। বর্ণিত আছে, কাজী আবু ইউসুফ বছরের শেষ ভাগে নিজের ধন-সম্পদ স্ত্রীকে দান করে দিতেন এবং তার ধন-সম্পদ তাকে দিয়ে নিজের নামে দান করিয়ে নিতেন, যাতে যাকাত ওয়াজেব না হয়। এ বিষয়টি কেউ হযরত আবু হানীফা (রহঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এটা তার ফেকাহ্‌র ফল। ইমাম আবু হানীফার এ উক্তি যথার্থ। কেননা, এ কৌশল কেবল দুনিয়াবী ফেকাহ্‌রই হতে পারে। পরকালে এর ক্ষতি যেকোন গোনাহ থেকে বড়।

হালাল ও হারামের অবস্থা এই যে, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার স্থির নির্দেশ রয়েছে, কিন্তু হারাম থেকে আত্মরক্ষা করার চারটি স্তর রয়েছে– (১) সেই স্তর, যা সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্যে শর্ত। আত্মরক্ষার এ ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ সাক্ষ্য দেয়ার, বিচারক হওয়ার এবং শাসক হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। বাহ্যিক হারাম থেকে বেঁচে থাকাই কেবল এ ধরনের আত্মরক্ষা। (২) সৎকর্মপরায়ণ লোকদের আত্মরক্ষা; অর্থাৎ এমন সন্দেহজনক বিষয়াদি থেকে আত্মরক্ষা করা, যাতে হারাম ও হালাল হওয়ার উভয়বিধ সম্ভাবনাই বিদ্যমান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ دع ما يريبك الى ما لا يريبك "যা সন্দেহজনক নয়, তার বিনিময়ে যা সন্দেহজনক তা ত্যাগ কর।" তিনি আরও বলেন ঃ الاثم حواز القلوب অর্থাৎ, গোনাহ অন্তরে খটকা লাগায়। (৩) মুত্তাকী-পরহেযগারদের আত্মরক্ষা– তারা কিছু সংখ্যক হালালকেও এ কারণে পরিহার করে যে, এর দ্বারা হারাম পর্যন্ত পৌঁছার ভয় থাকে।

لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا باس به مخافة مما به باس -

"মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী হয় না, যে পর্যন্ত এমন বিষয় পরিহার না করে, যাতে কোন ক্ষতি নেই 'ক্ষতি হতে পারে' এমন বিষয়ে জড়িত হওয়ার ভয়ে।" এর উদাহরণ– যেমন, কোন ব্যক্তি গীবত হওয়ার ভয়ে অন্যের অবস্থা বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকে। অথবা উল্লাস স্ফূর্তি বেড়ে গিয়ে অবাধ্যতা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সুস্বাদু খাদ্য ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। (৪) সিদ্দীকগণের আত্মরক্ষা। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত সবকিছু থেকে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, যেন জীবনের এমন কোন মুহূর্ত অতিবাহিত না হয়, যাতে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য থেকে সামান্য সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদিও তাতে হারাম পর্যন্ত না পৌছার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে জানা থাকে।

সুতরাং প্রথম স্তর ব্যতীত সকল স্তরই ফেকাহ্‌বিদের দৃষ্টির বাইরে থাকে। তার দৃষ্টি কেবল সাক্ষীদের ও বিচারকদের হারাম থেকে আত্মরক্ষার দিকে থাকে এবং সেসব বিষয়ের দিকে থাকে, যেগুলো আদেল হওয়ার পরিপন্থী। এরূপ আত্মরক্ষার উপর কায়েম থাকা আখেরাতে গোনাহ্ হওয়ার পরিপন্থী নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওয়াবেসা (রাঃ)-কে বলেন ঃ "তুমি তোমার অন্তরের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও লোকেরা তোমাকে ফতোয়া দেয়।"শেষ বাক্যটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করেছেন। ফেকাহ্‌বিদ অন্তরের খটকার কথা বর্ণনা করে না এবং খটকা সহকারে আমলের অবস্থাও বলে না; বরং কেবল এমন বিষয় বর্ণনা করে, যদ্দ্বারা ব্যক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

যাবতীয় বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, ফেকাহ্‌বিদের পূর্ণ দৃষ্টি সে জগতের সাথে জড়িত, যার দ্বারা আখেরাতের পথ নিষ্কণ্টক হয়। সে অন্তরের হাল হকিকত ও আখেরাতের বিধানাবলী বললে তা একান্তই প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। যেমন, তার কথায় মাঝে মাঝে চিকিৎসা, অংক, জ্যোতির্বিদ্যা ও কালাম শাস্ত্রের আলোচনাও এসে যায়। এ কারণেই হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন, ফেকাহ্ শাস্ত্রের অন্বেষণ আখেরাতের পাথেয় নয়। এ উক্তি যথার্থ। কেননা, সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে, তদনুযায়ী আমল করা। এমতাবস্থায় সেই জ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের খুঁটিনাটি আইন কানুনের জ্ঞান কিরূপে হতে পারে? এসব বিষয় দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হবে, এ আশায় যে লোক এসব বিষয় শিক্ষা করে সে উন্মাদ। আল্লাহর আনুগত্যে অন্তর ও

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়ের দ্বারা আমল হয়ে থাকে। এ আমলের জ্ঞানই সর্বোত্তম। এখানে প্রশ্ন হয়, আপনি ফেকাহ্ ও চিকিৎসা শাস্ত্রকে বরাবর করে দিলেন কিরূপে? চিকিৎসা শাস্ত্র দুনিয়া তথা দেহের সুস্থতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর উপরও দ্বীনের সঠিকতা নির্ভরশীল। এরূপ জ্ঞানকে ফেকাহ্র বরাবর করা ইজমার পরিপন্থী। এর জওয়াব এই যে, চিকিৎসা শাস্ত্র ও ফেকাহ্ বরাবর হওয়া অপরিহার্য নয়; বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনটি কারণে ফেকাহ্ চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর শ্রেষ্ঠ। প্রথমত ফেকাহ্ শরীয়তী জ্ঞান অর্থাৎ, নবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে অর্জিত। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্র শরীয়তী জ্ঞান নয়। দ্বিতীয়তঃ যারা আখেরাতের পথিক, তাদের কেউ ফেকাহ্র প্রতি অমুখাপেক্ষী নয়। রুগ্ন ও সুস্থ উভয়েরই এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি কেবল রুগ্নরাই মুখাপেক্ষী। তাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়তঃ ফেকাহ্ শাস্ত্র আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের সঙ্গী। কারণ, এর সারকথা হচ্ছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের প্রতি লক্ষ্য করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে অন্তরের অভ্যাস। ভাল আমল ভাল অভ্যাস থেকে প্রকাশ পায় এবং মন্দ আমল মন্দ অভ্যাস থেকে উদগত হয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে অন্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। অপর দিকে সুস্থতা ও অসুস্থতার উৎপত্তি হয় মেযাজ ও পিত্তের দোষ-গুণ থেকে, যা দেহের বিশেষণসমূহের অন্যতম– অন্তরের নয়। সুতরাং ফেকাহকে চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে দেখলে ফেকাহর শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাবে এবং একে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্রের সাথে তুলনা করলে আখেরাত সম্পর্কিত শাস্ত্র মনে হবে।

আখেরাত বিষয়ক এলেম

উল্লেখ্য, আখেরাত বিষয়ক এলেম দুই প্রকার– এলমে মুকাশাফা ও এলমে মুয়ামালা। এলমে মুকাশাফার অপর নাম এলমে বাতেন। এটা সকল জ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সেমতে জনৈক সাধক বলেন ঃ যে ব্যক্তি এ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, তার সমাপ্তি অকল্যাণকর হবে বলে আমি আশংকা করি। এ শাস্ত্র সম্পর্কে সর্বনিম্ন জ্ঞান এই যে, একে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং যোগ্য লোকদের এ জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার কথা স্বীকার করবে। অন্য একজন বলেন ঃ যার মধ্যে বেদআত ও আত্মম্ভরিতা রয়েছে, সে অন্যান্য শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হয়ে গেলেও এই শাস্ত্রের

কোন বিষয় অর্জন করতে পারবে না। এ শাস্ত্র অস্বীকারকারীর সর্বনিম্ন শাস্তি এই যে, এ শাস্ত্র থেকে সে কিছুই লাভ করতে পারে না। এটা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল বান্দাদের শাস্ত্র। এটা একটা নূর। অন্তর যখন তার মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন এই নূর অন্তরে প্রকাশ পায়। এ নূরের প্রভাবে মানুষের সামনে রহস্যের বহু দ্বারোদঘাটিত হয়ে যায়। পূর্বে যেসব বিষয়ের কেবল নাম শুনত এবং কিছু অস্পষ্ট অর্থ ধারণা করে নিত, এ নূরের বরকতে এখন সেসবগুলোর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। এমনকি, তখন আল্লাহ পাকের সত্তার প্রকৃত মারেফত অর্জিত হয় এবং তাঁর চিরন্তন গুণাবলীর, তাঁর কর্মের, দুনিয়া ও আখেরাতের সৃষ্টি রহস্যের এবং আখেরাতকে দুনিয়ার উপর নির্ভরশীল করার বাস্তব মারেফত অর্জিত হয়ে যায়। নবুওয়ত, নবীর অর্থ, ওহী, ফেরেশতা ও শয়তানের অর্থ, মানুষের সাথে শয়তানের শত্রুতার অবস্থা, নবীগণ কর্তৃক ফেরেশতাগণকে জানার স্বরূপ, তাঁদের কাছে ওহী পৌঁছার অবস্থা, আকাশ ও পৃথিবীর অবস্থা, অন্তরের মারেফত, তার মধ্যে ফেরেশতা ও শয়তানের বাহিনীর মোকাবিলার অবস্থা, ফেরেশতাগণের ইলহাম ও শয়তানদের কুমন্ত্রণার মধ্যে পার্থক্যের পরিচয়, আখেরাত, জান্নাত, দোযখ. কবরের আযাব, পুলসেরাত, মীযান ও হিসাবের পরিচয়, নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের তত্ত্ব–

اِقْرَاْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۔

"তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর। আজ তুমি তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে যথেষ্ট।"

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۔

"আখেরাতের গৃহই প্রকৃত জীবন যদি তারা জানত।"

আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাৎ, তাঁকে দেখার অর্থ, তাঁর নৈকট্যশীল হওয়া ও প্রতিবেশী হওয়ার উদ্দেশ্য, উর্ধ্ব জগতের সঙ্গ এবং ফেরেশতাগণের নৈকট্য দ্বারা ভাগ্যবান হওয়ার মর্ম, জান্নাতীদের স্তরের মধ্যে এত পার্থক্য হওয়া যে, তারা একে অপরকে আকাশের উজ্জ্বল তারকার মত ঝলমল করতে দেখবে– ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় এ নূরের কারণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এ নূরের পূর্বে উপরোক্ত বিষয়সমূহের মর্মে মানুষ মতভেদ করে। মূল বিষয়বস্তু সত্য বলে বিশ্বাস করে ঠিক, কিন্তু আপন স্বার্থের ব্যাপারে কিসের মধ্যে কি বলতে থাকে! কতক লোকের বিশ্বাস- এগুলো সব দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা তার সৎ বান্দাদের জন্যে যা সৃষ্টি করেছেন তা কোন চোখ দেখেনি, কান শুনেনি এবং কারও অন্তর কল্পনাও করেনি। মানুষের জন্যে জান্নাতে গুণাবলী ও নাম ছাড়া কিছু নেই। কারও বিশ্বাস- এগুলোর মধ্যে কিছু বিষয় দৃষ্টান্ত এবং কিছু বিষয় এমন, যার স্বরূপ শব্দ থেকে জানা যায়। কারও মতে, আল্লাহ্ তা'আলার মারেফতের পরিণতি ও পূর্ণতা, তাঁকে জানার ব্যাপারে অক্ষমতা স্বীকার করা। কিছু লোক আল্লাহ্ তা'আলার মারেফত সম্পর্কে বড় বড় দাবী করে। কেউ কেউ বলে, আল্লাহ্ তা'আলার মারেফতের চূড়ান্ত স্তর সর্বসাধারণের বিশ্বাসের সীমা; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিদ্যমান, জ্ঞাত, ক্ষমতাশালী, শ্রোতা, দ্রষ্টা, বাক্যালাপকারী। এলমে মুকাশাফা বর্ণনা করার পেছনে আমাদের উদ্দেশ্য এসব বিষয়ের উপর থেকে পর্দা সরে যাওয়া, সত্য বিষয় চোখে দেখে নেয়ার মত পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এরপর কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকা। অন্তরের উপর পাপাচারের মরিচা থরে থরে পড়ে না থাকলে এটা মানুষের সাধ্যাতীত নয়।

আখেরাতের এলেম দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সেসব পাপাচার থেকে অন্তরের স্বচ্ছ হওয়ার অবস্থা জানা, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর গুণ ও কর্মের স্বরূপ জানতে বাধা সৃষ্টি করে। অন্তর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করার একমাত্র উপায় হচ্ছে কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকা এবং সর্বাবস্থায় পয়গম্বরগণের অনুসরণ করা। এ উপায় অবলম্বন করলে অন্তর পরিষ্কার হতে থাকবে, তাতে সত্যের অংশ প্রতিফলিত এবং সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হতে থাকবে। এ স্বচ্ছতার পথ রিয়াযত তথা সাধনা ও জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। সাধনার বিবরণ স্বস্থানে বর্ণিত হবে।

এসব জ্ঞান কোন কিতাবে লিখিত হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে এ জ্ঞান সামান্য দান করেন, সে তা অন্যের কাছে সাধারণভাবে বর্ণনা করে না; কেবল যোগ্য সহচরের কাছেই বর্ণনা করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত হাদীসে এ গোপন জ্ঞানের কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ কতক জ্ঞান লুক্কায়িত ধনভাণ্ডারের ন্যায়। সাধকবৃন্দ ছাড়া কেউ এগুলো জানে না। তাঁরা এগুলো বললে কেবল সেসব লোকই এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে,

যারা আল্লাহর ব্যাপারে বিভ্রান্ত। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যে আলেমকে এ জ্ঞানের কিছু অংশ দান করেন, তাঁকে হেয় মনে করো না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হেয় করেননি এবং এ জ্ঞান দান করেছেন।

এলমে মুয়ামালা হচ্ছে অন্তরের ভালমন্দ অবস্থা জানা। ভাল অবস্থা যেমন– সবর, শোকর, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, সংসার বর্জন, খোদাভীতি, অল্পে তুষ্টি, দানশীলতা, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ স্বীকার করা, মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, সচ্চরিত্রতা, সৎভাবে জীবন যাপন করা, সততা, এগুলোর স্বরূপ জানা, এগুলো অর্জনের উপায় জানা, এগুলোর ফলাফল ও আলামত চেনা, এগুলোর মধ্যে কোনটি দুর্বল হয়ে গেলে তাকে শক্তিশালী করার উপায় জানা এবং কোনটি বিলুপ্ত হয়ে গেলে তা সৃষ্টি করার পদ্ধতি আয়ত্ত করা আখেরাত বিষয়ক এলেমের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে অন্তরের মন্দ অবস্থা, যেমন দারিদ্র্যের ভয়, তকদীরের প্রতি অসন্তোষ, হিংসা-দ্বেষ পোষণ, বড়ত্ব অন্বেষণ, প্রশংসা কামনা, পার্থিব ভোগ-বিলাসের জন্যে দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, রিয়া, ক্রোধ আস্ফালন, শত্রুতা, লোভ, কৃপণতা, লালসা, বিত্তবানদের সম্মান করা, ফকীরদেরকে হেয় করার প্রয়াস, কোন বিষয়ে একে অপরের উপর বড়াই করা, সত্য বিষয়ে অহমিকা করা, অনর্থক চিন্তা-ভাবনা করা, বেশী কথা বলা পছন্দ করা, অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সেজেগুজে থাকা, ধর্মের কাজে শৈথিল্য করা, নিজেকে বড় মনে করা, নফসের অনিষ্ট থেকে গাফেল হয়ে অন্যের দোষ অন্বেষণ করা, নিশ্চিন্ত হওয়া, আল্লাহর ভয় থেকে মুক্ত থাকা, অপমান বোধ করলে কঠোরভাবে তার প্রতিশোধ নেয়া, সত্য বিষয়ের প্রতিশোধে দুর্বল হওয়া, আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভয় হওয়া, এবাদতের উপর ভরসা করা, চক্রান্ত, আত্মসাৎ ও প্রতারণা করা কঠোর প্রাণ হওয়া, রূঢ়ভাষী হওয়া, দুনিয়া নিয়ে খুশী থাকা, পার্থিব সাফল্য না পেয়ে কাতর হওয়া, জুলুম করা, লজ্জা শরম ও দয়া কম হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সবই মন্দ। অন্তরের এসব অভ্যাস সকল অনিষ্ট ও কুকর্মের মূল। এর বিপরীত তথা ভাল অভ্যাসসমূহ আনুগত্য ও পুণ্যের মূল। এগুলোর সংজ্ঞা, স্বরূপ, কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার জানার নাম আখেরাত শাস্ত্র। এ শাস্ত্রের আলেমগণের ফতোয়া অনুযায়ী এটি ফরযে আইন। যেব্যক্তি এ থেকে বিমুখ থাকবে, সে আখেরাতে সত্যিকার মহাসম্রাটের ক্রোধে

নিপতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। যেমন, বাহ্যিক আমলের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী দুনিয়ার শাসনকর্তার তরবারি দ্বারা এবং ফেকাহ্‌বিদগণের ফতোয়া অনুযায়ী ধ্বংস হয়ে যায়। সারকথা, ফেকাহ্‌বিদগণ দুনিয়ার কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে ফরযে আইন বিষয়সমূহ দেখে থাকেন। আর আমরা যে জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করেছি, তা মানুষকে আখেরাতের কল্যাণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে। কোন ফেকাহবিদকে তাওয়াক্কুল অথবা এখলাস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে অথবা রিয়া থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে সে জওয়াবদানে বিরত থাকবে। অথচ এটা তার নিজের উপরও ফরযে আইন। এটা না জানলে তার পরকাল বিনষ্ট হবে। কিন্তু তাকে যদি লেয়ান, যেহার, ঘোড়দৌড় ও তীরন্দাজির মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তবে সে এগুলোর সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখার বিরাট দফতর বর্ণনা করে দেবে, যেগুলোর প্রয়োজন শত শত বছর পর্যন্তও কারও হবে না। প্রয়োজন হলেও সেগুলোর বর্ণনাকারীর অভাব হবে না। ফেকাহ্‌বিদ দিবারাত্র এগুলোর স্মরণ ও পাঠদান করার মধ্যে অতিবাহিত করে। কিন্তু যে বিশেষ বিষয়টি তার জন্য জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ, তার প্রতি গাফেল থাকে। এ ব্যাপারে কেউ আপত্তি করলে সে বলে ঃ এটা দ্বীনী এলেম এবং ফরযে কেফায়া। তাই আমি এতে নিয়োজিত আছি। মানুষ এ ধোঁকায় পড়ে ফেকাহর জ্ঞনার্জন করে এবং অপরকে ধোঁকা দেয়। জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই জানে, যদি ফরযে কেফায়ার হক আদায় করাই তার উদ্দেশ্য হত, তবে ফরযে কেফায়ার পূর্বে ফরযে আইন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করত। বস্তুতঃ ফরযে কেফায়া আরও অনেক রয়েছে। সেগুলো ফেকাহ্‌র পূর্বে অর্জন করত। কোন কোন শহরে কাফের যিম্মী ছাড়া মুসলমান চিকিৎসক নেই। ফেকাহর যেসকল বিধি-বিধান চিকিৎসা শাস্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোতে কাফেরদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও ফেকাহ্‌বিদ চিকিৎসা শাস্ত্র না শেখে এবং ফেকাহ্ শাস্ত্র বিশেষতঃ বিরোধপূর্ণ ও বিতর্কিত মাসআলাসমূহ শিক্ষা করার কাজে বাড়াবাড়ি করে। অথচ এ ধরনের ফতোয়াদান ও মোকদ্দমায় জওয়াব লেখার লোক শহরে ভূরি ভূরি বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় যখন কিছু লোক এ ফরযে কেফায়া পালনে তৎপর রয়েছে, তখন ফেকাহ্‌বিদরা এটা শিক্ষা করার অনুমতি কিরূপে দেবে এবং যে চিকিৎসা শাস্ত্র কেউ জানে না, তা বর্জন করার আদেশ কিরূপে দেবে? এর কারণ এছাড়া কিছুই নয় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের

জ্ঞানার্জনে ওয়াক্‌ফ ও ওসিয়তের মুতাওয়াল্লী হওয়া যায় না, এতীমদের ধনসম্পদের রক্ষক হওয়া যায় না, বিচারবিভাগ ও শাসনবিভাগে চাকুরী লাভ করে সমকক্ষদের চেয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় না এবং শত্রুদের উপর প্রবলও হওয়া যায় না।

পরিতাপের বিষয়, মন্দ আলেমদের ধোঁকায় দ্বীন মিটে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে এমন বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করুন, যার কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং শয়তান খুশী হয়। বাহ্যদর্শী আলেমগণের মধ্যে যারা পরহেযগার ছিলেন, তাঁরা বাতেনী আলেম ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতেন। উদাহরণতঃ ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শায়বান নামক এক আবেদ রাখালের সামনে এমনভাবে হাঁটু গেড়ে বসতেন ঃ যেমন মক্তবে বালকরা ওস্তাদের সামনে বসে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন ঃ অমুক অমুক ব্যাপারে আমি কি করব? লোকেরা ইমাম শাফেয়ীকে বলত ঃ আপনার মত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি এই জংলী লোকটির নিকট কি শিখতে পারেন? তিনি বলতেন ঃ তোমরা যা শেখনি, তার তওফীক এ ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)ও ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (রহঃ) মারূফ কারখীর কাছে যাতায়াত করতেন। অথচ তিনি যাহেরী এলেমে এঁদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাঁরা উভয়ই তাঁকে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কেও জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা যদি কোন বিষয়ের সম্মুখীন হই এবং কোরআন ও হাদীসে তার বিধান খুঁজে না পাই, তবে কি করব? তিনি বললেন ঃ সাধু পুরুষদের কাছে জিজ্ঞেস করো এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করো। এ কারণেই বলা হয়েছে, বাহ্যিক আলেমগণ পৃথিবী ও দেশের শোভা এবং বাতেনী আলেমগণ আকাশ ও ফেরেশতাজগতের সৌন্দর্য। জুনাইদ (রহঃ) বলেন ঃ একদিন আমাকে আমার মুর্শিদ সিররী (রহঃ) বললেন ঃ তুমি আমার কাছ থেকে উঠে কার কাছে গিয়ে বস? আমি বললাম ঃ মুহাসেবী (রহঃ)-এর কাছে। তিনি বললেন ঃ ভাল কথা। তাঁর জ্ঞান ও আদব গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি যে কালাম শাস্ত্র ও মুসলিম দার্শনিকদের খণ্ডন করেন তা শেখো না। এরপর আমি তাঁর কাছ থেকে উঠার সময় একথা বলতে শুনলাম ঃ আল্লাহ্ তোমাকে এলেম ও হাদীসওয়ালা সূফী করুন– সূফী হাদীসওয়ালা না করুন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে, যেব্যক্তি হাদীস ও এলেম শিখে সূফী হয়, সে সফলতা লাভ করে। আর যেব্যক্তি সূফী হয়ে হাদীস শিক্ষা করে, সে

নিজেকে বিপন্ন করে।

আমরা জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে কালাম শাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিনি এবং এগুলো ভাল কি মন্দ তাও বর্ণনা করিনি। এর কারণ, কালাম শাস্ত্রের যে সকল উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেগুলোর সারমর্ম কোরআন ও হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। যেসকল বিষয় কোরআন ও হাদীস বহির্ভূত, সেগুলো হয় বেদআতের অন্তর্ভুক্ত মন্দ বিবাদ বিসম্বাদ, না হয় বিভিন্ন ফেরকার বিরোধ সম্পর্কিত দীর্ঘ বক্তৃতা বিবৃতি। সুতরাং এগুলো সব বাতিল ও অর্থহীন বিষয়। সুস্থ হৃদয় এগুলো দূষণীয় মনে করে এবং সত্যপন্থী কান এগুলো শ্রবণ করতে সম্মত নয়। আর কিছু বিষয় রয়েছে যা দ্বীনের সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগে তার কোন অস্তিত্বই ছিল না। তখন এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বেদআত বলে গণ্য হত। কিন্তু এখন নীতি বদলে গেছে। কারণ, এ ধরনের বেদআত অনেক হয়ে গেছে, যা কোরআন ও হাদীসের দাবীর প্রতি বিমুখ করে। এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটেছে যারা বেদআতের সন্দেহকে মসৃণ করেছে এবং এ সম্পর্কে বক্তৃতা রচনা করেছে। ফলে এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করা প্রথমে নিষিদ্ধ থাকলেও প্রয়োজনের খাতিরে এখন জায়েয; বরং ফরযে কেফায়া হয়ে গেছে।

দর্শনশাস্ত্র কোন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং এর চারটি অংশ রয়েছে– (১) জ্যামিতি ও অংক। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, এ উভয়টিই জায়েয। যার সম্পর্কে আশংকা হয় যে, এগুলো পাঠ করলে খারাপ শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে এগুলো পাঠ করতে নিষেধ করা যাবে না। যার সম্পর্কে আশংকা, তাকে নিষেধ করা দরকার। কারণ, এসব বিষয়ে অধিক পারদর্শী হলে মানুষ বেদআতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অতএব যাদের ঈমান দুর্বল, তাদেরকে উভয় বিষয় পাঠ করা থেকে বাঁচানো উচিত। যেমন, ছোট শিশুকে নদীর কিনারে দাঁড়াতে দেয়া হয় না অথবা নও-মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করা থেকে দূরে রাখা হয়. যাতে তার উপর সংসর্গের প্রভাব না পড়ে। দ্বিতীয় অংশ ফালসাফা (দর্শন)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে প্রমাণের অবস্থা ও শর্ত এবং সংজ্ঞার কারণ ও শর্ত বর্ণিত হয়। উভয়টিই কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। (৩) এলমে ইলাহিয়াত– অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনা। এটাও কালাম শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। দার্শনিকরা এক্ষেত্রে কোন নতুন ধরনের জ্ঞান আবিষ্কার

করেননি; বরং তাদের মাযহাব আলাদা। তন্মধ্যে কতক কুফর এবং কতক বেদআত। মুতাযেলী হয়ে যাওয়া যেমন আলাদা শাস্ত্র নয়; বরং কালাম শাস্ত্রীদেরই কতক লোক যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করে বাতিল মাযহাব সৃষ্টি করে নিয়েছে, দার্শনিকদের অবস্থাও তেমনি। (৪) পদার্থবিদ্যা– এর কতক অংশ শরীয়ত বিরোধী। এটা মূলতঃ জ্ঞানই নয় যে, জ্ঞানের প্রকারসমূহের মধ্যে বর্ণনা করা যাবে; বরং এটা মূর্খতা। আর কতক অংশে পদার্থের গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এবং রূপান্তরণের বিষয় আলোচিত হয়। এর অবস্থা চিকিৎসা শাস্ত্রের মত। পার্থক্য এই যে, চিকিৎসকের দৃষ্টি রোগ ও সুস্থতার দিক দিয়ে বিশেষভাবে মানব দেহের উপর নিবদ্ধ থাকে এবং পদার্থবিদদের দৃষ্টি পদার্থের মধ্যে পরিবর্তন ও গতিশীলতার দিকে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র পদার্থবিদ্যার তুলনায় উত্তম। কারণ, এর প্রয়োজন আছে এবং পদার্থবিদ্যার তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

সারকথা, কালাম শাস্ত্র ফরযে কেফায়া জ্ঞানসমূহের অন্যতম। এর ফলে সর্বসাধারণের অন্তর বেদআতীদের চিন্তাধারা থেকে মুক্তি পায়। বেদআত পয়দা হওয়ার কারণে এ শাস্ত্র ওয়াজেব হয়েছে। যেমন হজ্জের পথে বেদুঈনদের জুলুম ও রাহাজানির কারণে রক্ষীর আশ্রয় নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। যদি বেদুঈনরা তাদের অত্যাচার বন্ধ করে দেয়, তবে হজ্জের শর্তসমূহের মধ্যে সাহায্য গ্রহণ করার শর্ত বাদ পড়ে যাবে। অনুরূপ বেদআতীরা যদি তাদের বাজে বকা বন্ধ করে দেয়, তবে সাহাবায়ে কেরামের সময়ে যতটুকু ছিল, এর বেশী কালাম শাস্ত্রের প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকবে না। অতএব কালাম শাস্ত্রীদের জানা উচিত, ধর্মে তাদের মর্তবা হজ্জের পথে রক্ষীদের মর্তবারই মত। যদি রক্ষী রক্ষা কাজ ছাড়া অন্য কিছু না করে, তবে সে হাজী হবে না। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করলেই কেবল হাজী হবে। এমনিভাবে যদি কালামশাস্ত্রী কেবল বিতর্ক ও বেদআত দমনেই মশগুল থাকে এবং আখেরাতের পথ অতিক্রম না করে, আত্মার উন্নতি ও সংশোধনে নিয়োজিত না হয়, তবে সে কখনও আলেমে দ্বীনগণের মধ্যে গণ্য হবে না। তার কাছে আকীদা অন্তর ও মুখের বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হাঁ, সর্বসাধারণ থেকে তার তফাৎ এতটুকু হবে যে, সে বেদআতীদের সাথে লড়াই করতে পারে এবং সাধারণ লোকের হেফাযত করে। কিন্তু আল্লাহ, তাঁর সিফাত ও কর্ম এবং এলমে মুকাশাফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের পরিচয় কালাম শাস্ত্রের দ্বারা

অর্জিত হয় না। বরং এ শাস্ত্র যে এগুলোর অন্তরায় তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই। একমাত্র মুজাহাদা তথা সাধনার দ্বারাই এসব বিষয় অর্জন করা যায়। মুজাহাদাকে আল্লাহ্ তা'আলা হেদায়েতের মুখবন্ধ সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"যারা আমার পথে সাধনা করে, অবশ্যই আমি তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।"

এখন আমি কালামশাস্ত্রীর সংজ্ঞাও বর্ণনা করলাম যে, সে সর্বসাধারণের বিশ্বাসকে বেদআতীদের যুক্তিজট থেকে মুক্ত রাখে, যেমন রক্ষী হাজীদেরকে বেদুঈনদের লুণ্ঠন থেকে রক্ষা করে। আমি ফেকাহবিদের সংজ্ঞা এই বর্ণনা করেছি যে, সে সেসব আইন জানে, যদ্দ্বারা বাদশাহ্ একে অপরের উপর সীমালংঘন দমন করতে পারে। ধর্ম শাস্ত্রের তুলনায় এই উভয় কাজ নিম্নস্তরের। অথচ গুণী আলেম বলে যাঁরা প্রসিদ্ধ, তাঁরা হলেন ফেকাহবিদ ও কালামশাস্ত্রী। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠ। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, আপনি ধর্ম শাস্ত্রের সাথে তুলনা করে এই আলেমগণকে নিম্নস্তরের বলেন কেন? তবে এর জওয়াব এই যে, যেব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ দেখে সত্যের পরিচয় লাভ করে, সে পথভ্রষ্টতার অরণ্যে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে। প্রথমে সত্য জানা দরকার। এর পর মানুষ চেনা উচিত, যদি সে সত্য পথের পথিক হয়। আর যদি তুমি অনুসরণ করেই তুষ্ট থাক এবং মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রসিদ্ধ স্তরের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ, তবে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা ও উচ্চ মর্তবা থেকে গাফেল হয়ো না। যাদের কথা তুমি বল, তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্বীনের ব্যাপারে কেউ তাঁদের মত চলতে পারে না, এমনকি তাঁদের কাছেও ঘেঁষতে পারে না। অথচ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব কালাম ও ফেকাহ শাস্ত্রের কারণে ছিল না; বরং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র ও তার পথ অবলম্বনের কারণে ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের উপর ছিল, তা বেশী রোযা রাখা, বেশী নামায পড়া এবং বহু হাদীস রেওয়ায়েতের কারণে ছিল না, ফতোয়া দান ও কালাম শাস্ত্রের দিক দিয়েও ছিল না; বরং সে বিষয়ের দিক দিয়ে ছিল, যা তাঁর বক্ষে প্রবিষ্ট ছিল। তোমার সে রহস্যের অনুসন্ধানে আগ্রহী

হওয়া উচিত। এটাই উৎকৃষ্ট ও গুপ্ত ভান্ডার বিশেষ। যাকে সাধারণ লোকজন বড় মনে করে এবং সম্মান করে, তাকে পরিত্যাগ কর। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) হাজারো সাহাবী দুনিয়াতে রেখে গেছেন। তাঁরা আল্লাহর দেয়া জ্ঞানে জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদের প্রশংসা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে করেছেন। তাঁদের কেউ কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। দশ জনের কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছাড়া কেউ নিজেকে ফতোয়া দানের কাজে নিয়োজিত করেননি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রধান সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তাঁর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ "অমুক শাসনকর্তার কাছে যাও। সে এ কাজ নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছে। এ প্রশ্নটি তার কাছে রাখ।" এতে ইঙ্গিত ছিল, মোকদ্দমা ও বিধিবিধান সম্পর্কে ফতোয়া দেয়া প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন ঃ এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ তিরোহিত হয়ে গেছে। লোকেরা বলল ঃ আমাদের মধ্যে বড় বড় সাহাবী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আপনি একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার উদ্দেশ্য ফতোয়া ও বিধানের এলেম নয়– আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কিত এলেম উদ্দেশ্য। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কি কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি বুঝিয়েছিলেন? যদি না বুঝিয়ে থাকেন, তবে তুমি সে এলেমের মারেফত হাসিল করতে আগ্রহ কর না কেন, যার দশ ভাগের নয় ভাগ হযরত ওমরের ওফাতের কারণে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল? অথচ হযরত ওমর (রাঃ) কালাম ও বিতর্কের দরজা বন্ধ করেন। কেউ তাঁর সামনে কোরআনের দু'আয়াতের পরস্পর বিরোধিতার প্রশ্ন উত্থাপন করলে তিনি তাকে দোররা মারতেন এবং তার সাথে মেলামেশা করতে মানুষকে নিষেধ করে দিতেন।

আলেমদের মধ্যে ফেকাহবিদ কালামশাস্ত্রীরা সমধিক প্রসিদ্ধ– একথার জওয়াব এই যে, যে বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয় এবং যার দ্বারা মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করা যায়, তা অন্য জিনিস। সেমতে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল খেলাফতের দিক দিয়ে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সেই রহস্যের কারণে যা তাঁর অন্তরে রক্ষিত ছিল। অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধি ছিল রাজনীতির কারণে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ছিল সে এলেমের দিক দিয়ে, যার দশ ভাগের নয় ভাগ তাঁর মৃত্যুর ফলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর লক্ষ্য

ছিল আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং জনগণের প্রতি ন্যায়বিচার ও স্নেহ মমতা। এদিক দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য ছিল অনন্য । এ বিষয়টি তাঁর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল। তাঁর অন্যান্য বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম তো অন্য লোকদের দ্বারাও সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর ছিল, যারা জাঁকজমক, সুখ্যাতি ও নামযশ প্রত্যাশী। মোট কথা, প্রসিদ্ধি ক্ষতিকর বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত আর শ্রেষ্ঠত্ব গোপন বিষয়ের আওতাভুক্ত, যা কেউ অবগত হতে পারে না। অতএব ফেকাহ ও কালামবিদ যথাক্রমে শাসক ও বিচারকের ন্যায়। তারা কয়েক ধরনের। তাদের কেউ আপন এলেম ও ফতোয়া দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা করে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর তরীকাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়; নামযশ ও সুখ্যাতি তাদের কাম্য হয় না। আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ তাআলার কাছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তারা এলেম অনুযায়ী আমল করে এবং ফতোয়া ও দলীল দ্বারা আল্লাহ তাআলার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। কেননা, প্রত্যেক এলেমই আমল, কিন্তু প্রত্যেক আমল এলেম নয়। চিকিৎসকও তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে সক্ষম। সে তার এলেম দ্বারা আল্লাহ্র জন্যে কাজ করে বিধায় সওয়াবের অধিকারী হবে। এমনিভাবে যদি শাসনকর্তা জনগণের কাজকারবার আল্লাহর জন্যে করে, তবে সে আল্লাহ্র কাছে পছন্দনীয় ও সওয়াবের যোগ্য হবে– ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়ার দিক দিয়ে নয়; বরং এমন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে, যার লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা।

তিন প্রকার বিষয় দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জিত হতে পারে– (১) শুধু এলেম এবং তা হচ্ছে এলমে মুকাশাফা। (২) শুধু আমল; যেমন শাসনকর্তার ন্যায়বিচার করা এবং মানুষকে শৃংখলায় রাখা। (৩) এলেম ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত শাস্ত্রই হচ্ছে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র। এই শাস্ত্রজ্ঞ আলেম ও আমেল উভয়টি হয়ে থাকে। এখন তুমি নিজেই পছন্দ কর কেয়ামতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে, না আমেলদের, না উভয় দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে? নিছক সুখ্যাতির অনুসরণ করার তুলনায় এ কাজটি তোমার জন্যে অধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। জনৈক কবি বলেন ঃ যা দেখ এবং শুন, তা ত্যাগ কর। সূর্য সামনে থাকতে শনি গ্রহের কি প্রয়োজন?

এখানে আমরা পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের কিছু অবস্থা লিপিবদ্ধ করছি। এতে জানা যাবে, যারা নিজেদেরকে তাঁদের মাযহাবের অনুসারী বলে দাবী করে, তারা তাঁদের প্রতি জুলুম করে এবং কিয়ামতে তারাই হবে এই ফেকাহ্‌বিদগণের বড় দুশমন। কেননা, স্ব স্ব এলেম দ্বারা আল্লাহ্‌ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের অন্য কোন লক্ষ্য ছিল না। তাঁদের অবস্থার মধ্যে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়েছে। সেমতে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞদের লক্ষণ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাঁরা কেবল ফেকাহ্‌শাস্ত্রেই মশগুল ছিলেন না; বরং আধ্যাত্ম্য জ্ঞানেরও চর্চা করতেন। এটা ঠিক, এ জ্ঞান সম্পর্কে তাঁরা কোন কিতাব লেখেননি এবং কাউকে এর সবকও দেননি। সাহাবায়ে কেরাম যে কারণে ফেকাহশাস্ত্র সম্পর্কে কোন কিতাব লেখেননি এবং দরস দেননি, সে একই কারণে ফেকাহ্‌বিদগণও তা করেননি। অথচ ফতোয়া শাস্ত্রে সব সাহাবীই এক একজন ফেকাহ্‌বিদ ছিলেন।

এখন আমরা ইসলামী ফেকাহর কিছু অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে জানা যাবে, আমরা যা কিছু লিখেছি তা পূর্ববর্তী ফেকাহ্‌বিদগণের প্রতি ভর্ৎসনা নয়; বরং তাদের প্রতি ভর্ৎসনা, যারা তাঁদের অনুসরণ দাবী করে এবং নিজেদেরকে তাঁদের মতাবলম্বী বলে প্রকাশ করে, অথচ আমলে তাঁদের বিপরীত।

যাঁরা ফকীহগণের উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং যাঁদের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী, তাঁরা হলেন পাঁচ জন- ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম সুফিয়ান সওরী (রহঃ)। তাঁদের প্রত্যেকেই এবাদত, সংসারত্যাগ, আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রে পারদর্শিতা, মানব কল্যাণ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং ফেকাহ্‌ দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা- এই পঞ্চ গুণে বিভূষিত ছিলেন। এই পঞ্চ গুণের মধ্য থেকে বর্তমান যুগের ফেকাহবিদগণ মাত্র একটি গুণে তাঁদের অনুসরণ করছেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন মাসআলার শাখাগত বিষয়াদিতে দক্ষতা অর্জন ও তা নিয়ে নিমগ্ন থেকেছেন। অবশিষ্ট চারটি গুণ কেবল আখেরাতেরই যোগ্য। আর এই একটি গুণ দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের জন্যে হতে পারে। কিন্তু এর মাধ্যমে তারা দুনিয়ার কল্যাণ লাভের জন্যে ঝুঁকে পড়েছে এবং এই একটিমাত্র গুণের কারণে তারা পূর্ববর্তী ইমামগণের সাথে সামঞ্জস্য দাবী করে। জিজ্ঞাসা করি, কর্মকার কি

ফেরেশতাগণের অনুরূপ হতে পারে?

এখন আমরা উপরোক্ত ইমামগণের অবস্থা বর্ণনা করছি। এতে জানা যাবে, চারটি গুণই তাঁদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। পঞ্চম গুণ অর্থাৎ, ফেকাহশাস্ত্রে দক্ষতা– এটা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যে এবাদতকারী ছিলেন, একথা এই রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায়– তিনি রাত্রিকে তিন ভাগে ভাগ করতেন, একভাগ এলেমের জন্যে, দ্বিতীয় ভাগ নামাযের জন্যে এবং তৃতীয় ভাগ নিদ্রার জন্যে। রবী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রমযান মাসে ষাট বার কোরআন খতম করতেন এবং তা নামাযেই খতম করতেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য বুয়ায়তী রমযানে প্রতিদিন এক খতম করতেন। হাসান কারাবেসী বলেন ঃ আমি ইমাম শাফেয়ীর সাথে অনেকবার রাত্রি যাপন করেছি। তিনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ নামায পড়তেন। আমি দেখেছি, তিনি নামাযে পঞ্চাশ আয়াতের বেশী পড়তেন না। বেশী পড়লে একশ' আয়াত পড়তেন। রহমতের আয়াত পাঠ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিজের জন্যে, সকল মুসলমানের জন্যে এবং ঈমানদারদের জন্যে সে রহমতের দোয়া করতেন। পক্ষান্তরে আযাবের আয়াত পাঠ করার সময় নিজেকে এবং মুসলমানদেরকে সে আযাব থেকে মুক্ত রাখার আবেদন করতেন। এভাবে আশা ও ভয় উভয়ই তাঁর মধ্যে একত্রিত থাকত। এ রেওয়ায়েত থেকে বুঝতে হবে, পঞ্চাশ আয়াতের বেশী না পড়া কোরআনী রহস্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যেরই জ্বলন্ত প্রমাণ। স্বয়ং তিনি বলেন ঃ আমি ষোল বছর যাবত পেট ভরে আহার করি না। কেননা, উদরপূর্তি দেহ ভারী করে, অন্তর কঠোর এবং বুদ্ধিমত্তা হরণ করে। অধিক নিদ্রা আনয়নের কারণে এতে মানুষের এবাদত হ্রাস পায়। এ উক্তিতে তিনি উদরপূর্তির অনিষ্ট বর্ণনা করে বাস্তব প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। এবাদতে তিনি কতদূর সচেষ্ট ছিলেন, তা তাঁর উদরপূর্তি বর্জন করা থেকেই বুঝা যায়। বলাবাহুল্য, কম আহার এবাদতের মূল। তিনি আরও বলেন ঃ আমি কখনও আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম তো দূরের কথা, সত্য কসমও খাইনি। এ উক্তির প্রেক্ষিতে চিন্তা কর, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহর প্রতাপ সম্পর্কে তাঁর কতটুকু জ্ঞান ছিল। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি চুপ করে রইলেন। লোকটি বলল ঃ আপনার প্রতি আল্লাহর

রহমত হোক, আপনি জওয়াব দিচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ চুপ থাকার মধ্যে আমার কল্যাণ, নাকি জওয়াব দেয়ার মধ্যে— একথা না জানা পর্যন্ত আমি জওয়াব দেব না। এখন চিন্তা কর, তিনি জিহ্বার হেফাযত কতটুকু করতেন! অথচ ফেকাহ্‌বিদগণের সকল অঙ্গের চেয়ে জিহ্বাই অধিক নিয়ন্ত্রণহীন। এ থেকে আরও বুঝা যায়, তাঁর কথা বলা ও চুপ থাকা সওয়াব অর্জনের উদ্দেশে হত। আহমদ ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ওয়াবীর বর্ণনা করেন ঃ একবার ইমাম শাফেয়ী লণ্ঠনের বাজার থেকে বের হলে আমরা তাঁর পেছনে চললাম। দেখি, এক ব্যক্তি জনৈক আলেমের সাথে বচসা করছে এবং তাকে মন্দ বলছে। ইমাম শাফেয়ী আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ অশ্লীল কথা শোনা থেকে কানকে রক্ষা কর, যেমন জিহ্বাকে বাজে বকাবকি থেকে রক্ষা করে থাক। কেননা, শ্রোতা বক্তার অশ্লীল বাক্য বিনিময়ে শরীক হয়ে থাকে। নির্বোধ ব্যক্তি তার মগজে যে সর্বাধিক খারাপ বিষয় জমিয়ে রাখে, তা তোমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিতে চায়। যদি তার কথা তাকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়, অর্থাৎ, শোনা না হয়, তবে এসব যে শুনবে না সে ভাগ্যবান হবে। পক্ষান্তরে যে বলে, সে হতভাগ্য হয়। তিনি বলেন ঃ জনৈক দার্শনিক অন্যের কাছে পত্র লেখল, তোমাকে আল্লাহ্ তাআলা এলেম দান করেছেন। এই এলেম পাপাচারের অন্ধকার দ্বারা মলিন করো না। নতুবা যেদিন আলেমরা তাদের এলেমের নূরে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে।

ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখতা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় ঃ

তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি দাবী করে যে, তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত ও স্রষ্টার মহব্বত এক সাথে রয়েছে, সে মিথ্যাবাদী। হুমায়দী বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ী একবার জনৈক শাসনকর্তার সাথে ইয়ামনে গমন করেন এবং সেখান থেকে দশ হাজার দেরহাম নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। তাঁর জন্যে মক্কার বাইরে এক গ্রামে তাঁবু স্থাপন করা হয়। জনগণ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে থাকে। তিনি সম্পূর্ণ অর্থ বণ্টন না করা পর্যন্ত সেখানে অনড় হয়ে রইলেন। একদিন তিনি হাম্মাম (গোসলখানা) থেকে বের হয়ে হাম্মামের মালিককে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দিলেন। একবার তাঁর হাত থেকে বেত পড়ে গেলে জনৈক ব্যক্তি তা তুলে দিল। তিনি এর

বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিলেন। তাঁর দানশীলতা প্রসিদ্ধ। বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। যুহদ তথা সংসারবিমুখতার মূল হচ্ছে দানশীলতা। কারণ, যেব্যক্তি ধন-সম্পদের মহব্বত রাখে, সে তা আটকে রাখে এবং আলাদা করে না। ধন-সম্পদ সে-ই আলাদা করবে, যার দৃষ্টিতে সংসার নিকৃষ্ট হবে। যুহদের অর্থ তাই। ইমাম শাফেয়ীর সংসারবিমুখতা, অধিক খোদাভীতি এবং আখেরাতের কাজে নিজেকে মশগুল রাখার ব্যাপারে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতও সাক্ষ্য দান করে ঃ

একবার সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না তাঁর সামনে অন্তরের কোমলতা সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন। লোকেরা সুফিয়ানকে বলল ঃ তিনি মারা গেছেন। সুফিয়ান বললেন ঃ মারা গেলে সমসাময়িক সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়েই মারা গেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ বলখী বলেন ঃ একবার আমি ও ওমর ইবনে বানানা একত্রে বসে এবাদতকারী ও সংসারবিমুখদের কথা আলোচনা করেছিলাম। ওমর বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী অপেক্ষা অধিক পরহেযগার ও মিষ্টভাষী কাউকে দেখিনি। একবার আমি ইমাম শাফেয়ী ও হারেস ইবনে লবীদ সাফা পাহাড়ের দিকে গেলাম। হারেস ছিলেন সালেহ মুরারীর শিষ্য। তিনি সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত শুরু করলেন। যখন هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ পাঠ করলেন, তখন আমি ইমাম শাফেয়ীকে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখলাম। তাঁর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে গেল এবং এবং তিনি কিছুক্ষণ ছটফট করে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলতে লাগলেন ঃ এলাহী, আমি আপনার কাছে মিথ্যুকদের জ্ঞান ও গাফেলদের বিমুখতা থেকে আশ্রয় চাই। এলাহী, আপনার জন্যেই সাধকদের অন্তর বিনম্র এবং ভক্তদের মাথা নত হয়। এলাহী, আপনার বদান্যতা থেকে আমাকে দান করুন এবং আমাকে কৃপার পর্দায় আবৃত্ত করুন। আপন সত্তার কৃপায় আমার ত্রুটি মার্জনা করুন। আবদুল্লাহ বলেন ঃ এর পর আমরা সকলেই সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। আমি যখন বাগদাদ পৌঁছলাম, তখন ইমাম শাফেয়ী ইরাকে ছিলেন। একদিন আমি নদীর কিনারে বসে অযু করছিলাম। একব্যক্তি আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন বৎস, উত্তমরূপে অযু কর। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার সাথে উত্তম ব্যবহার করবেন। আমি পেছন ফিরে দেখলাম,

জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তির পেছনে অনেক লোকজন রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি অযু করে তাদের পেছনে চললাম। বুযুর্গ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ তোমার কোন কাজ আছে কি? আমি বললাম ঃ, হাঁ, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে যে এলেম দান করেছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, যে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে নিষ্কৃতি পায়। যে দ্বীনের ভয় রাখে, সে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা পায়। যে দুনিয়াতে সংসারবিমুখ থাকে সে যখন কেয়ামতে আল্লাহ্ প্রদত্ত সওয়াব দেখবে, তখন তার চোখ ঠাণ্ডা হবে। আরও কিছু বলব? আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে তার ঈমান পূর্ণ করে নিতে পারে। প্রথম, অপরকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং প্রথমে নিজে তা মেনে চলবে। দ্বিতীয়, মন্দ কাজ থেকে অন্যকে নিষেধ করবে এবং প্রথমে নিজে বিরত থাকবে। তৃতীয়, আল্লাহ্ তাআলার নির্ধারিত সীমার খেয়াল রাখবে এবং তা অতিক্রম করবে না। আরও কিছু বলব? আমি বললাম ঃ ভাল। তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসারবিমুখ হয়ে থাকবে এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহী হবে। সবকিছুতে আল্লাহ্ তা'আলাকে সত্য জানবে, এতে তুমি মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ পর্যন্ত বলে তিনি চলে গেলেন। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ইনিই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)। এ রেওয়ায়েতে তাঁর বেহুঁশ হয়ে যাওয়া এবং উপদেশ দানের কথা চিন্তা কর। এতে তাঁর সংসারবিমুখতা ও প্রবল খোদাভীতি সম্পর্কে জানা যায়। এই ভীতি ও সংসারবিমুখতা আল্লাহ্র মারেফাত ব্যতীত অর্জিত হয় না। আল্লাহ্ বলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

বান্দাদের মধ্যে আল্লাহকে তারাই ভয় করে, যারা আলেম তথা জ্ঞানী।

ইমাম শাফেয়ী এই ভয় ও সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা ফেকাহ্ শাস্ত্রের যেহার, লেয়ান, সলম, ইজারা ইত্যাদি থেকে অর্জন করেননি; বরং কোরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। কেননা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দর্শনে কোরআন হাদীস পরিপূর্ণ। তাঁর দার্শনিক কথাবার্তা থেকে জানা যাবে, তিনি অন্তরের রহস্য ও আখেরাত সম্পর্কে কতদূর ওয়াকিফহাল ছিলেন। একবার রিয়া কি, এই মর্মে জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বিনা দ্বিধায় বললেন ঃ রিয়া এক প্রকার

ফেতনা, যা বৈষয়িক কামনা-বাসনা অন্তরে উপস্থাপিত করেছে। মন মন্দ কাজে উৎসাহী বিধায় আলেমগণ এর প্রতি আগ্রহী হয়েছে। ফলে তাদের আমল বরবাদ হয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি আমল করতে গিয়ে আত্মম্ভরিতার আশংকা কর, তখন ভেবে দেখো কার সন্তুষ্টির জন্যে তুমি আমল করছ। তুমি কোন্ সওয়াবের প্রতি আগ্রহ কর এবং কোন্ আযাবকে ভয় কর। তুমি কোন্ নিরাপত্তার জন্যে কৃতজ্ঞ এবং কোন্ বিপদকে স্মরণ কর। এসব বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলেই তোমার আমল তোমার দৃষ্টিতে তুচ্ছ গণ্য হবে এবং তুমি আত্মম্ভরিতা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এ উক্তিতে রিয়ার স্বরূপ ও আত্মম্ভরিতার প্রতিকার লক্ষণীয়। এগুলো অন্তরের জন্য অনিষ্টকর বিষয়সমূহের অন্যতম।

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের নফসকে হেফাযতে না রাখে, তার এলেম উপকারী হয় না। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্র আনুগত্য করে, সে এলেমের রহস্য বুঝে। প্রত্যেক ব্যক্তির শত্রু মিত্র অবশ্যই থাকে। অতএব তুমি তাদের সাথেই থাক, যারা আল্লাহ্র আনুগত্যশীল।

বর্ণিত আছে, আবদুল কাহের ইবনে আবদুল আজীজ একজন সৎ ও পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পরহেযগারী সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। ইমাম শাফেয়ীও তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি ইমাম শাফেয়ীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সবর, ইমতেহান (পরীক্ষা) ও তমকীন্ (প্রতিষ্ঠা) এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বললেন ঃ তমকীন পয়গম্বরগণের মর্তবা। এটা পরীক্ষার পরে অর্জিত হয়। সুতরাং পরীক্ষা হলে সবর হয় এবং সবরের পর তমকীন ও প্রতিষ্ঠা হয়। লক্ষ্য কর, আল্লাহ তাআলা প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পরীক্ষা নিয়েছেন এবং পরে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। তদ্রূপ হযরত মূসা ও হযরত আইউব (আঃ)-এর প্রথমে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে, এরপর তাঁদেরকে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছে। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বেলায় তেমনি প্রথমে পরীক্ষা এবং পরে প্রতিষ্ঠা ও রাজত্ব দান করা হয়েছে। অতএব তমকীন তথা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ

এমনিভাবে আমি ইউসুফকে মিসরে প্রতিষ্ঠা দান করেছি।

হযরত আইউব (আঃ)-এর ভীষণ পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

وَاٰتَيْنَا اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ ـ

"আমি তাঁকে তাঁর পত্নী ও তৎসহ আরও লোকদের দান করেছি। এটা আমার পক্ষ থেকে মেহেরবানী এবং এবাদতকারীদের জন্যে উপদেশ।"

ইমাম শাফেয়ীর এ জওয়াবে প্রতীয়মান হয়, কোরআনের রহস্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান ছিল এবং আল্লাহ্র পথের পথিকদের 'মকামাত' সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিফহাল ছিলেন। এসব বিষয় আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ীকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষ কখন আলেম হয়? তিনি বললেন ঃ মানুষ যখন তার জানা জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে অন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে এবং যে বিষয় অর্জিত হয়নি, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, তখন সে আলেম হয়। সেমতে জালিনূসকে কেউ জিজ্ঞেস করেছিল ঃ আপনি যে এক রোগের জন্যে অনেকগুলো যৌথ উপাদান সম্বলিত ওষুধ লেখেন এর কারণ কি? জালিনূস বললেন ঃ উদ্দেশ্য একই ওষুধ। এর তীব্র প্রভাব হ্রাস করার জন্য অন্য ওষুধ সাথে দেয়া হয়। কেননা, একক ওষুধ মারাত্মক হয়ে থাকে। এ ধরনের আরও অনেক উক্তি দ্বারা মারেফত জ্ঞানে ইমাম শাফেয়ীর উচ্চ মর্তবা বুঝা যায়।

ইমাম শাফেয়ী ফেকাহ্ শাস্ত্র ও ফেকাহ্ শাস্ত্রের বাহাস দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করতেন। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতগুলো এর প্রমাণ।

তিনি বলেন ঃ আমি চাই মানুষ এই শাস্ত্র দ্বারা উপকৃত হোক এবং এর কোন কৃতিত্ব আমার দিকে সম্বন্ধযুক্ত না হোক। এতে জানা গেল, এলেমের অনিষ্ট ও সুখ্যাতি অর্জনের কুফল সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়ত করতেন এবং খ্যাতির আকর্ষণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতেন।

তিনি বলেন ঃ আমি কখনও কারও সাথে তার ভ্রান্তি কামনা করে মুনাযারা তথা বিতর্ক করিনি। কারও সাথে আলোচনা করার সময় আমি কামনা করেছি যে, সে তওফীক, সততা ও সাহায্যপ্রাপ্ত হোক এবং তার

প্রতি আল্লাহ তাআলার সমর্থন ও হেফাযত থাকুক। কারও সাথে কথা বলার সময় আমি এ বিষয়ের পরওয়া করিনি যে, সত্য আমার মুখ দিয়ে অথবা তার মুখ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করুক। সত্য বিষয় কারও সামনে পেশ করার পর যদি সে কবুল করে, তবে আমি তার ভক্ত হয়ে যাই। পক্ষান্তরে সত্য বিষয় নিয়ে কোন ব্যক্তি জোর-জবরদস্তিতে আমার প্রমাণ খণ্ডন করলে সে আমার দৃষ্টিতে হেয় হয়ে যায়। আমি তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ পরিহার করি। এসব আলামত দ্বারাই জানা যায়, ফেকাহ্ শাস্ত্র ও ফেকাহ্ শাস্ত্রে বিতর্ক করার পেছনে ইমাম শাফেয়ীর লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন।

এখন দেখ, বর্তমান যুগের লোকেরা পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে কিভাবে তার অনুসরণ করেছে! এই এক বিষয়েও তারা বিরোধ করে। এজন্যেই আবু সওর (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম শাফেয়ীর মত কোন ব্যক্তি না আমি দেখেছি, না অন্য কেউ দেখেছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন ঃ চল্লিশ বছর ধরে আমি এমন কোন নামায পড়িনি,, যাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্যে দোয়া করিনি। এ রেওয়ায়েতে দোয়াকারীর ইনসাফ এবং যার জন্যে দায়া করা হয় তার মর্তবা লক্ষ্য কর এবং এর সাথে বর্তমান যুগের আলেমদের অবস্থা মিলিয়ে দেখ, তাদের মনে পরস্পরের প্রতি কতটুকু হিংসা-দ্বেষ রয়েছে। তারা পূর্ববর্তী মনীষীগণের অনুসরণ করে বলে যে দাবী করে, তা ঠিক নয়। ইমাম আহমদকে বেশী দোয়া করতে দেখে তাঁর পুত্র একদিন বললেন ঃ ইমাম শাফেয়ী কে ছিলেন, যার জন্যে আপনি এত বেশী দোয়া করেন? তিনি বললেন ঃ বৎস! ইমাম শাফেয়ী পৃথিবীর জন্যে সূর্যের মত এবং মানুষের জন্যে সুস্বাস্থ্যের মত ছিলেন। এখন বল, এসব বিষয়ে কেউ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে কি?

ইমাম আহমদ আরও বলতেন ঃ যে কেউ দোয়াত স্পর্শ করে, সে ইমাম শাফেয়ীর কাছে ঋণী। ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (তুলা বিক্রেতা) বলেন ঃ আমি চল্লিশ বছর ধরে যত নামায পড়েছি, তাতে ইমাম শাফেয়ীর জন্যে দোয়া করেছি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে এলেম দান করেছেন এবং তিনি তার মাধ্যমে সৎপথ প্রদর্শন করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর গুণাগুণ হিসাবের বাইরে বিধায় আমরা এতটুকু উল্লেখ করেই শেষ করছি। নসর ইবনে ইবরাহীম মাকদেসী (রহঃ) ইমাম শাফেয়ীর

গুণাবলী সম্পর্কে যে গ্রন্থ রচনা করেছেন, বর্ণিত অধিকাংশ বিষয় সেখান থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত ইমাম মালেক (রহঃ)-ও বর্ণিত পাঁচটি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁকে কেউ প্রশ্ন করল ঃ হে মালেক! এলেম অন্বেষণ করার ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ ভাল। বরং যেব্যক্তি (এলেমের জন্যে) সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে না, তুমিও তার সঙ্গ ত্যাগ করো না। তিনি দ্বীনের প্রতি অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করতেন। এমনকি যখন হাদীস বর্ণনা করার ইচ্ছা করতেন, তখন প্রথমে ওযু করতেন, বিছানায় বসে দাড়িতে চিরুনি করতেন, সুগন্ধি ব্যবহার করতেন, অতঃপর গাম্ভীর্যের সাথে হাদীস বর্ণনা করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীসের সম্মান করতে চাই। তিনি বলেন ঃ এলেম একটি নূর। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। অধিক রেওয়ায়েত দ্বারা তা অর্জিত হয় না। এলেমের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন একথাই প্রমাণ করে, তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র মহিমার মারেফত অত্যন্ত প্রবল ছিল।

এলেম দ্বারা ইমাম মালেকের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন। এটা তাঁর এ উক্তি থেকে জানা যায়, দ্বীনের ব্যাপারে বিতর্ক করা অর্থহীন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর এ উক্তিও এর প্রমাণ। তিনি বলেন, আমি যখন ইমাম মালেকের কাছে উপস্থিত হই তখন তাঁকে ৪৮টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি ৩২টি প্রশ্নের জওয়াবে বললেন ঃ আমি জানি না। যেব্যক্তির এলেম দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকে, সে কখনও এমনভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করতে সম্মত হয় না। এ জন্যেই ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ আলেমদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে বলতে হয়, ইমাম মালেক তাঁদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল তারকা। ইমাম মালেকের চেয়ে বেশী আমার প্রতি কারও অনুগ্রহ হয়নি। বর্ণিত আছে, আবু জাফর মনসুর ইমাম মালেককে জবরদস্তি তালাকের হাদীস বর্ণনা করতে নিষেধ করেছিলেন। এরপর এক ব্যক্তিকে এই প্রকার তালাকের মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছিলেন। লোকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি সকলের সামনে বলে দিলেন ঃ যেব্যক্তিকে জবরদস্তিমূলকভাবে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়, তার তালাক হয় না। এতে আবু জাফর তাঁকে বেত্রাঘাত করেন, কিন্তু তিনি হাদীসের বর্ণনা বর্জন করেননি।

ইমাম মালেক বলেন ঃ যেব্যক্তি কথায় পাকা– মিথ্যা বলে না, তার বুদ্ধি তার জন্যে কল্যাণকর হয়ে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে তার বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা দেয় না। সংসারের প্রতি ইমাম মালেকের নির্লিপ্ততা নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায়–

আমিরুল মুমিনীন মাহদী ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু এ সম্পর্কে আমি আপনাকে একটি হাদীস শুনাতে চাই। আমি রবিয়া ইবনে আবী আবদুর রহমানকে বলতে শুনেছি– মানুষের পরিবার-পরিজনই তার গৃহ।

খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ আপনার কোন গৃহ আছে কি? তিনি বললেন– না। খলীফা তাঁকে একটি বাড়ী ক্রয় করার জন্যে তিন হাজার দীনার দিলেন। তিনি তা রেখে দিলেন, ব্যয় করলেন না। অতঃপর খলীফা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় ইমাম মালেককে বললেন ঃ আপনিও আমাদের সাথে চলুন। আমি আপনার হাদীস গ্রন্থ মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করতে চাই, যেমন হযরত ওসমান (রাঃ) কোরআনের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। ইমাম মালেক জওয়াবে বললেন, মুয়াত্তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ বিভিন্ন শহরে পৌছে গেছেন এবং হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফলে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের কাছে হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ اختلاف امتى رحمة। আমার উম্মতের মতবিরোধ রহমতস্বরূপ। এখন রইল আপনার সাথে যাওয়ার বিষয়টি। এটাও হতে পারে না। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون যদি মদীনাবাসীরা বুঝে, তবে মদীনা তাদের জন্যে উত্তম। তিনি আরও বলেন–

المدينة تنفى خبثها كما ينفى الكير خبث الحديد -

"মদীনা তার ময়লা এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কর্মকারের

রেত লোহার ময়লা দূর করে দেয়।" আপনার দীনার যেমন দিয়েছিলেন তেমনি রাখা আছে। ইচ্ছা হলে নিয়ে যান, ইচ্ছা হলে রেখে যান। অর্থাৎ, আপনি আমাকে মদীনা ত্যাগ করাতে চান এই বলে যে, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমি দীনারকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনার উপর অগ্রাধিকার দেই না। এটা ছিল ইমাম মালেকের সংসারবিমুখতা।

যখন তাঁর এলেম ও শিষ্যদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে সব দিক থেকে অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে আসতে থাকে, তখন তিনি সমুদয় অর্থ সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দিতেন। এই দানশীলতা থেকে দুনিয়ার প্রতি তাঁর অনাসক্তি সম্পর্কে জানা যায়। মানুষের কাছে অর্থ সম্পদ না থাকা সংসারবিমুখতা নয়; বরং অর্থ সম্পদের প্রতি অন্তরের বেপরওয়া ভাবকেই বলা হয় সংসারবিমুখতা। হযরত সোলায়মান (আঃ) বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

ইমাম মালেক দুনিয়াকে হেয় মনে করতেন– একথা ইমাম শাফেয়ী বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়। তিনি বলেন ঃ আমি ইমাম মালেকের দরজায় খোরাসানী ঘোড়া ও মিসরীয় খচ্চরের এমন উৎকৃষ্ট একটি পাল দেখলাম, যা আমি কোনদিন দেখিনি। আমি তাঁর খেদমতে আরজ করলাম, কি চমৎকার পাল! তিনি বললেন ঃ আবু আবদুল্লাহ! এ পাল আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উপঢৌকন। আমি বললাম ঃ আপনি নিজে সওয়ার হওয়ার জন্যে একটি রেখে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ করি, যে মাটিতে তাঁর পয়গম্বর (সাঃ) শায়িত আছেন, সে মাটি আমার ঘোড়া পদদলিত করবে? এ রেওয়ায়েতে ইমাম মালেকের দানশীলতা লক্ষণীয়। তিনি সকল ঘোড়া ও খচ্চর একযোগে দান করেছিলেন। এরপর মদীনা তাইয়্যেবার পবিত্র মাটির সম্মানের কথাও চিন্তা কর।

ইমাম মালেক বর্ণিত নিম্নোক্ত কাহিনী দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাঁর এলেমের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করা।

তিনি বলেন ঃ আমি খলীফা হারুনুর রশীদের কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ আপনি আমার কাছে আসা যাওয়া করুন। যাতে আমার ছেলেরা আপনার কাছে মুয়াত্তার হাদীসসমূহ শুনতে পারে। আমি বললাম ঃ আল্লাহ আপনাকে উন্নতি দান করুন। এই এলেম আপনাদের নিকট

থেকে বের হয়েছে। আপনারা এর সম্মান করলে সে সম্মানিত হবে। আর যদি আপনারা এর অবমাননা করেন তবে এ এলেম লাঞ্ছিত হয়ে যাবে। মানুষ এলেমের কাছে যায়। এলেম মানুষের কাছে যায় না। খলীফা বললেন ঃ আপনি ঠিকই বলছেন। অতঃপর খলীফা ছেলেদেরকে মসজিদে গিয়ে সকলের সাথে মুয়াত্তা শ্রবণ করার আদেশ দিলেন।

হযরত ইমাম আবু হানীফা কুফী (রহঃ)-ও আবেদ, যাহেদ, আরেফ বিল্লাহ, আল্লাহভীরু এবং এলেমের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি প্রত্যাশী ছিলেন। ইবনে মোবারক বর্ণিত রেওয়ায়েতে তাঁর সাধারণ এবাদতের অবস্থা জানা যায়। তিনি শালীনতাসম্পন্ন ছিলেন এবং অত্যধিক নামায পড়তেন। আসাদ ইবনে আবী সোলায়মান বর্ণনা করেন– তিনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি প্রথমে অর্ধ রাত্রি এবাদত করতেন। এক দিন পথ চলার সময় এক ব্যক্তি তাঁর দিকে ইশারা করল এবং অন্য একজন বলল ঃ ইনি সমস্ত রাত্রি এবাদত করেন। এই মন্তব্য শুনার পর থেকে ইমাম সাহেব সমস্ত রাত্রি এবাদত শুরু করে দেন এবং বলেন ঃ আমি আল্লাহর কাছে লজ্জাবোধ করি এ জন্যে যে, আমি তাঁর যতটুকু এবাদত করি না, মানুষ ততটুকু বলাবলি করে।

নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ইমাম সাহেবের সংসারবিমুখতা প্রমাণিত হয়। রবী ইবনে আসেম বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে হুবায়রার নির্দেশক্রমে আমি ইমাম সাহেবকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি ইমাম সাহেবকে বায়তুল মালের প্রশাসক নিযুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি ইমাম সাহেবকে বিশটি বেত্রাঘাতের আদেশ দেন এবং তা পালিত হয়। লক্ষণীয়, তিনি বেত্রাঘাত সহ্য করলেন বটে, কিন্তু প্রশাসক হতে স্বীকৃত হলেন না। হাকাম ইবনে হেশাম সকফী বলেন ঃ সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তি ইমাম সাহেব সম্পর্কে আমার কাছে বর্ণনা করল, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিশ্বস্ত ছিলেন। বাদশাহ্ সরকারী ধনভাণ্ডারের চাবি তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাইলেন এবং তা গ্রহণ না করলে তাঁকে বেত্রদণ্ড দেয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিলেন এবং আল্লাহর আযাব ভোগ করার দুঃসাহস করলেন না।

ইবনে মোবারকের সামনে আবু হানীফার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা সে ব্যক্তির কথা কি বলছ, যাঁর সামনে দুনিয়া পেশ

করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

মুহাম্মদ ইবনে শুজা ইমাম সাহেবের জনৈক শিষ্যের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, একবার ইমাম সাহেবকে কেউ বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন আবু জাফর মনসুর আপনাকে দশ হাজার দেরহাম দিতে আদেশ করেছেন। ইমাম সাহেব সম্মত হলেন। যেদিন এই দেরহাম আসার কথা ছিল, সেদিন ইমাম সাহেব ফজরের নামায পড়ে মুখ ঢেকে নিলেন এবং কারও সাথে কোন কথা বললেন না। খলীফার দূত হাসান ইবনে কাহ্তাবা যখন সে অর্থ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল, তখনও তিনি কিছুই বললেন না। উপস্থিত এক ব্যক্তি দূতকে জানাল, তিনি আমাদের সাথেও কম কথাই বলেন; অর্থাৎ কথা না বলাই তাঁর অভ্যাস। আপনি এই অর্থ এই থলের মধ্যে ভরে গৃহের কোণে রেখে দিন (তাই করা হল)। অতঃপর দীর্ঘ দিন পরে ইমাম সাহেব যখন তাঁর বিষয়-সম্পত্তির ওসিয়ত করেন, তখন পুত্রকে বললেন ঃ আমার মৃত্যু হলে দাফনের পর এ থলেটি হাসান ইবনে কাহ্তাবার কাছে নিয়ে যাবে এবং বলবে ঃ এটা আপনার আমানত, যা আপনি আবু হানীফার কাছে সোপর্দ করেছিলেন। ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র ওসিয়ত অনুযায়ী থলেটি পৌঁছে দিলে হাসান ইবনে কাহ্তাবা বললেন ঃ আপনার পিতার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। তিনি ধর্ম-কর্মের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট ছিলেন।

বর্ণিত আছে, ইমাম সাহেবকে বিচারকের পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করা হলে তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ের যোগ্যতা আমার মধ্যে নেই। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ কেন? তিনি বললেন ঃ যদি আমি সত্যবাদী হই, তবে তো বাস্তবিকই এ পদের যোগ্য নই। পক্ষান্তরে যদি মিথ্যাবাদী হই তবে মিথ্যাবাদী কখনও বিচারকের পদ গ্রহণ করার জন্যে উপযুক্ত হতে পারে না।

ইমাম সাহেব যে আখেরাত শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, ধর্মীয় বিষয়াদিতে ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং আরেফ বিল্লাহ ছিলেন, তা এ থেকে জানা যায় যে, তিনি আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করতেন এবং সংসারে নির্লিপ্ত ছিলেন। সেমতে ইবনে জুরাইজ (রহঃ) বলেন ঃ আমি অবগত হয়েছি, তোমাদের এই নো'মান ইবনে সাবেত কুফী আল্লাহ্ তা'আলাকে অত্যন্ত ভয় করেন। শুরাইক নখয়ী বলেন ঃ ইমাম আযম খুব চুপচাপ থাকতেন, চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতেন এবং মানুষের সাথে কম কথা

বলতেন। এসব বিষয় উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি এলমে বাতেন ও ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে মশগুল থাকতেন। কারণ, যে চুপচাপ থাকা ও সংসারবিমুখতা প্রাপ্ত হয়, সে জ্ঞানে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এ হচ্ছে ইমামত্রয়ের অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও সুফিয়ান সওরীর অবস্থা এই যে, তাঁদের অনুসারী পূর্বোক্ত ইমামত্রয়ের অনুসারীদের তুলনায় কম, কিন্তু তাঁরা পরহেযগারী ও সংসারবিমুখতায় অধিক প্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁদের উভয়ের কর্ম ও উক্তিতে পরিপূর্ণ। তাই এ ব্যাপারে বিশদ বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই।

এখন তুমি ইমামত্রয়ের সীরাত সম্পর্কে চিন্তা কর, এসব অবস্থা, কর্ম ও উক্তি কিসের ফল। তাঁরা যে সংসারবিমুখ ছিলেন এবং খাঁটিভাবে খোদাপ্রেমিক ছিলেন, এটা কি ফেকাহ্র শাখাগত মাসআলা তথা সলম, ইজারা, যেহার, ঈলা ও লেয়ান জানার ফল হতে পারে, না অন্য শাস্ত্র দ্বারা অর্জিত, যা ফেকাহ্ অপেক্ষা উত্তম ও শ্রেষ্ঠ? আরও চিন্তা কর, যারা নিজেদেরকে তাঁদের অনুসারী বলে দাবী করে, তারা সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে জ্ঞান উত্তম গণ্য হয় কিন্তু বাস্তবে উত্তম নয়
কোন কোন জ্ঞান মন্দ কেন

প্রশ্ন হতে পারে, যে বস্তু যেমন আছে ঠিক তেমনি জানাকে বলা হয় এলেম। এটা আল্লাহ তাআলার অন্যতম সিফাত বা গুণ। এমতাবস্থায় এলেম মন্দ ও নিন্দনীয় কেমন করে হতে পারে? জওয়াব এই যে, এলেম স্বয়ং মন্দ হয় না; বরং তিনটি কারণের মধ্য থেকে কোন একটি কারণ মানুষের মধ্যে উপস্থিতির কারণে এলেমকে মন্দ বলা হয়। তিনটি কারণ এই : (১) এমন এলেম, যা আলেমের জন্যে অথবা অন্যের জন্যে ক্ষতিকর পরিণতি বয়ে আনে। যেমন, জাদুবিদ্যা ও তেলেসমাতি বিদ্যাকে মন্দ বলা হয়। অথচ জাদুবিদ্যা সত্য। কোরআন এর সাক্ষী। মানুষ জাদুকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কাজে ব্যবহার করে। বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর কেউ জাদু করেছিল।

ফলে তিনি অসুস্থ হয় পড়েছিলেন। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) এসে সংবাদ দেন এবং একটি কূপের ভেতরে পাথরের নীচ থেকে সে জাদু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

জাদু এক প্রকার জ্ঞান, যা পদার্থের বৈশিষ্ট্য ও তারকা উদয়ের মধ্যে গণনামত বিষয়সমূহ জানার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রথমে পদার্থ দ্বারা সে ব্যক্তির একটি পুত্তলিকা তৈরী করা হয়, যার উপর জাদু করতে হবে। এরপর তারকা উদয়ের একটি বিশেষ সময়ের জন্যে অপেক্ষো করা হয়। যখন সেই সময় আসে তখন পুত্তলিকার উপর কতিপয় কুফরী কলেমা ও শরীয়ত বিরোধী অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে এগুলোর মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। এসব তদবীরের ফলে আল্লাহ্‌র নিয়মানুযায়ী জাদুকৃত ব্যক্তির মধ্যে অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জ্ঞান হিসাবে এসব বিষয় জানা মন্দ নয়। কিন্তু মানুষের ক্ষতি করা ছাড়া এবং অনিষ্টের ওসিলা হওয়া ছাড়া অন্য কিছুর যোগ্যতা এসবের মধ্যে নেই বিধায় এ বিদ্যাকে নিন্দনীয় বলা হয়। যদি কোন অত্যাচারী ব্যক্তি কোন ওলীকে হত্যা করতে মনস্থ করে এবং ওলী তার ভয়ে কোন সুরক্ষিত স্থানে আত্মগোপন করেন, তবে জানা সত্ত্বেও ওলীর ঠিকানা অত্যাচারীকে বলা উচিত নয়। এস্থলে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অথচ জিজ্ঞাসার জওয়াবে তার ঠিকানা বলা সত্য অবস্থা প্রকাশ করা ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু পরিণতি ক্ষতিকর বিধায় এটা মন্দ।

(২) যে এলেম প্রায়শঃ আলেমের জন্যে ক্ষতিকর হয়ে থাকে– যেমন জ্যোতির্বিদ্যা। এটা সত্তার দিক দিয়ে মন্দ নয়। কেননা, এটা হিসাব সংক্রান্ত বিষয়। কোরআন পাকে বলা হয়েছে ; وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ـ অর্থাৎ, সূর্য ও চন্দ্রের গতি হিসাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আরও বলা হয়েছে–

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ

অর্থাৎ, আমি চন্দ্রকে কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশেষে সে খেজুরের পুরাতন শাখার ন্যায় সরু হয়ে যায়।

অথবা জ্যোতির্বিদ্যার সারমর্ম হচ্ছে কারণ দ্বারা ঘটনা বর্ণনা করা। এটা চিকিৎসকের নাড়ি দেখে ভাবী রোগের কথা বলে দেয়ার মতই। মোট কথা, জ্যোতির্বিদ্যা জানার মানে সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার

নির্ধারিত নিয়মকে জানা। কিন্তু শরীয়ত একে মন্দ বলে আখ্যা দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন তকদীরের আলোচনা হয় তখন নীরব হয়ে যাও। যখন জ্যোতির্বিদ্যার কথা বলা হয় তখন নীরব থাক এবং যখন আমার সাহাবীগণের প্রসঙ্গ উঠে তখন নীরব থাক। তিনি আরও বলেন ঃ আমি আমার উম্মতের জন্যে তিনটি বিষয়ে ভয় করি– (ক) শাসকদের জুলুম করা, (খ) জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী হওয়া এবং (গ) তকদীর অস্বীকার করা।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ জ্যোতির্বিদ্যা এ পরিমাণে অর্জন কর যাতে স্থলে ও পানিতে পথ প্রাপ্ত হতে পার। এতটুকু অর্জন করেই ক্ষান্ত হও।

তিন কারণে জ্যোতির্বিদ্যা অর্জন করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রথমতঃ অধিকাংশ মানুষের জন্যে এটা ক্ষতিকর। অর্থাৎ, যখন মনে একথা উদয় হয় যে, তারকার গতিবিধির দরুনই এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন মনে এ বিশ্বাসও বদ্ধমূল হতে থাকে যে, তারকারাজিই প্রভাব বিস্তারকারী এবং সেগুলোই উপাস্য। সেগুলো উর্ধ্বাকাশে বিরাজমান থাকে বিধায় মনে সেগুলোর সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং আন্তরিক মনোযোগ সেগুলোর দিকে নিবদ্ধ থাকে। কল্যাণের আশা এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষাপ্রাপ্তি তারকারাজির সাথেই সম্পৃক্ত বলে ধারণা হতে থাকে। এতে করে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ মন থেকে মুছে যায়। কেননা, দুর্বল বিশ্বাসীদের দৃষ্টি উপায় পর্যন্তই সীমিত থাকে। পাকা আলেম ব্যক্তি অবশ্যই জানেন, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি সকলেই আল্লাহ্ তাআলার আদেশ পালন করে মাত্র। দুর্বল বিশ্বাসী ব্যক্তি সূর্যের কিরণ সূর্যোদয়ের কারণে দেখে। উদাহরণতঃ যদি পিপীলিকাকে বুদ্ধিমান ধরে নেয়া হয় এবং সে কাগজের উপর থেকে লক্ষ্য করে যে, কলমের কালি দ্বারা কাগজ কাল হয়ে যাচ্ছে, তবে সে এটাই বিশ্বাস করবে যে, লেখা কলমেরই কাজ। তার দৃষ্টি কলম থেকে আঙ্গুলের দিকে, আঙ্গুল থেকে হাতের দিকে, হাত থেকে ইচ্ছার দিকে, ইচ্ছা থেকে ইচ্ছাকারী লেখকের দিকে এবং লেখক থেকে তার শক্তি ও হাত সৃষ্টিকারীর দিকে উন্নতি করবে না। মোট কথা, মানুষের দৃষ্টি প্রায়ই নিকটের ও নিম্নের কারণসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ থেকে সকল কারণের মূল কারণের দিকে উন্নতি করা থেকে বিরত থাকে। তাই জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

নিষেধ করার দ্বিতীয় কারণ, জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়াবলী নিছক অনুমানভিত্তিক। তাই এর মাধ্যমে কোন কিছু বলা মূর্খতার উপর ভিত্তি করে বলারই নামান্তর। এমতাবস্থায় এটা মূর্খতা হিসাবে মন্দ– বিদ্যা হিসাবে নয়। কেননা, এটা ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর মোজেযা, যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জ্যোতির্বিদের কোন কথা ঘটনাচক্রেই সত্য হয়ে থাকে। কেননা, জ্যোতির্বিদ মাঝে মাঝে কোন কারণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে থাকে। সেই কারণের পর অনেকগুলো শর্তের অনুপস্থিতির দরুন ঘটনা সংঘটিত হয় না। এ সব শর্ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই। সুতরাং যদি ঘটনাচক্রে আল্লাহ্ তাআলা অবশিষ্ট শর্তগুলোও উপস্থিত করে দেন, তখন জ্যোতির্বিদের কথা সত্য হয়ে যায়। অন্যথায় তার কথা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এটা এমন যেন কেউ দেখল, পাহাড়ের উপর থেকে মেঘমালা উঠে উঠে একত্রিত হচ্ছে এবং চলাফেরা করছে। এতে সে অনুমান করে বলে দিল, আজ বৃষ্টি হবে। অথচ প্রায়ই এমন মেঘমালার পরেও রৌদ্র উঠে পড়ে এবং মেঘ কেটে যায়। কখনও বৃষ্টি হলেও কেবল মেঘমালাই বৃষ্টিপাতের জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত অন্যান্য কারণগুলোর সমাবেশ না ঘটে।

অনুরূপভাবে মাঝির অনুমান করা যে, নৌকা সহীহ্ সালামত থাকবে। মাঝি বাতাসের গতিবিধি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকে এবং এর উপর ভরসা করেই একথা বলে। অথচ বাতাসের দিক পরিবর্তনের আরও গোপন কারণ রয়েছে। সেগুলো মাঝি জানে না। ফলে কখনও তার অনুমান সত্য এবং কখনও ভ্রান্ত হয়ে থাকে। এ জন্যেই দৃঢ় চিত্ত ব্যক্তিকেও জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তৃতীয় কারণ, এই বিদ্যার দ্বারা কোন উপকারই হয় না। কেননা, এতে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে মাথা ঘামানো হয়। মানুষের মূল্যবান জীবন অনুপকারী কাজে বিনষ্ট করা যে খুবই ক্ষতিকর, তা বলাই বাহুল্য। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক ব্যক্তির চার পাশে অনেক লোককে জমায়েত দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ লোকটি কে? লোকেরা বলল ঃ সে একজন বড় পণ্ডিত। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ কি বিষয়ে পণ্ডিত? উত্তর হল, কাব্যে ও আরবদের বংশ জ্ঞানে। তিনি বললেন ঃ এ বিদ্যা উপকারী নয়; বরং এটা এমন মূর্খতা যা ক্ষতিকরও বটে। তিনি আরও বললেন ঃ

انما العلم اية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة -

অর্থাৎ, বিদ্যা তিনটি কোরআনের অকাট্য আয়াত, প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং কোরআন ও সুন্নতে বর্ণিত ত্যাজ্য সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বিষয়ক জ্ঞান।

এতে প্রমাণিত হয়, জ্যোতির্বিদ্যার মত শাস্ত্রে মাথা ঘামানো বিপদাশংকায় পতিত হওয়া এবং মূর্খতায় লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। কারণ, তকদীরে যা আছে তা হবেই। তা থেকে আত্মরক্ষা অসম্ভব। চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ নয়। এর প্রয়োজন আছে। সাধারণতঃ এর প্রমাণ দেখা যায়।

বিদ্যা যে কিছু লোকের জন্যে নিশ্চিত ক্ষতিকর, তা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, পাখীর গোশত দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্যে ক্ষতিকর। বরং কোন কোন লোকের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকাই উপকারী হয়ে থাকে। বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি চিকিৎসকের কাছে তার স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের অভিযোগ করলে চিকিৎসক স্ত্রীর নাড়ি পরীক্ষা করে বলল ঃ এখন সন্তান লাভের জন্যে চিকিৎসা করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা নাড়ি দেখে মনে হচ্ছে, সে চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা যাবে। একথা শুনে স্ত্রী অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেল এবং তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। সে তার ধন-সম্পদ বন্টন ও ওসিয়ত করে পানাহার পরিহার করল এবং মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অবশেষে নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যু হল না। তার স্বামী চিকিৎসককে এ কথা জানালে চিকিৎসক বলল ঃ আমি জানতাম, সে মরবে না। এখন তার সাথে সহবাস কর। তার গর্ভে তোমার সন্তান হবে। স্বামী জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে বললেন? চিকিৎসক বললেন, অধিক মোটা হওয়ার কারণে মহিলার গর্ভাশয়ের মুখে চর্বির পরত পড়ে যাচ্ছিল। এটাই ছিল গর্ভ ধারণের অন্তরায়। আমি মনে করলাম, মৃত্যু ভয় ছাড়া সে ক্ষীণাঙ্গিনী হবে না। তাই তার মনে মৃত্যুর ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। এখন তার গর্ভধারণের অন্তরায় দূর হয়ে গেছে। এ গল্প থেকে জানা যায়, কতক বিদ্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার মধ্যে বিপদাশংকা থাকে। এ থেকেই এ হাদীসের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায়- نعوذ بالله من علم لا ينفع —অনুপকারী বিদ্যা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতএব শরীয়ত যেসব জ্ঞানের নিন্দা করেছে, সেগুলো সম্পর্কে

জিজ্ঞেস করো না এবং সাহাবায়ে কেরাম ও সুন্নতের অনুসরণ করো। এ অনুসরণেই নিরাপত্তা নিহিত এবং ঘাঁটাঘাঁটিতে বিপদ লুক্কায়িত। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان من العلم جهلا وان من القول عيا

–নিশ্চয় কোন কোন এলেম মূর্খতা এবং কোন কোন কথা হয়রানির কারণ।

বলাবাহুল্য, এলেম মূর্খতা হয় না; কিন্তু ক্ষতিসাধনে তার প্রভাব মূর্খতার অনুরূপ হয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ সামান্য তওফীক অনেক এলেম অপেক্ষা উত্তম। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ বৃক্ষ অনেক, কিন্তু সবগুলো উপকারী নয়।

শব্দ পরিবর্তিত এলেম

প্রকাশ থাকে যে, মন্দ এলেম শরীয়তগত এলেমের সাথে মিশে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, মানুষ উৎকৃষ্ট নামসমূহ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে ভিন্ন অর্থে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী মনীষীগণ এসব নাম যে উদ্দেশে ব্যবহার করতেন, মানুষ সেসব নাম বিকৃত করে অন্য উদ্দেশে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এরূপ শব্দ পাঁচটি– ফেকাহ্, এলেম, তওহীদ, তায্কীর ও হেকমত। এগুলো উৎকৃষ্ট শব্দ। এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গ দ্বীনের স্তম্ভ হতেন। কিন্তু এখন এগুলো মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এজন্যই এখন এগুলো দ্বারা বিশেষিত ব্যক্তিবর্গের নিন্দা করা হলে তা আশ্চর্য ঠেকে। কেননা, প্রথমে এগুলো দ্বারা উত্তম ব্যক্তিবর্গ বিশেষিত হতেন।

প্রথম শব্দ ফেকাহ্কে আজকাল বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে– পরিবর্তন করা হয়নি। অর্থাৎ, ফেকাহ্ হচ্ছে আশ্চর্য ধরনের শাখাগত বিষয় ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানা, এ সম্পর্কে আলোচনা করা এবং এ সম্পর্কিত উক্তিসমূহ মুখস্থ করা। যেব্যক্তি এ সম্পর্কে খুব চিন্তা-ভাবনা করে এবং অধিক মশগুল থাকে, তাকে বড় ফেকাহ্‌বিদ বলা হয়। অথচ পূর্ববর্তী যুগে ফেকাহ্ শব্দের এ অর্থ ছিল না; বরং তখন অর্থ ছিল আখেরাতের পথ এবং নফসের সূক্ষ্ম বিপদাপদ ও অনিষ্টকর আমলসমূহ জানা, ঘৃণিত দুনিয়া সম্পর্কে উত্তমরূপে অবহিত হওয়া, আখেরাতের আনন্দ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া এবং অন্তরে ভয়-ভীতি আচ্ছন্ন থাকা। এর প্রমাণ

আল্লাহ্ তাআলার এই উক্তি–

لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْا اِلَيْهِمْ -

"যাতে দ্বীন সম্পর্কে বোধশক্তি অর্জন করে এবং নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদেরকে সতর্ক করে।"

অতএব, যে ফেকাহ্ দ্বারা মানুষকে সতর্ক করা হয়, সেটিই আমাদের বর্ণিত ফেকাহ্। তালাক, গোলাম মুক্ত করার মাসআলা এবং লেয়ান, সলম ও ইজারার শাখাগত বিষয়াদি নয়। কারণ, এগুলো দ্বারা মোটেই সতর্ক করা হয় না। বরং কেউ সদা সর্বদা এসব বিষয়ে মশগুল থাকলে তার অন্তর কঠোর হয়ে যায় এবং মন থেকে ভয় দূর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا -

"তারা তাদের অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করে না।" অর্থাৎ তারা ঈমানের কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম করে না। ফতোয়া হৃদয়ঙ্গম না করা উদ্দেশ্য নয়। মনে হয় ফেকাহ্ ও ফাহম সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। পূর্বে ও বর্তমানে এগুলো সে অর্থে ব্যবহৃত হত, যা আমরা লিখেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ -

"নিশ্চয় তাদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয় বেশী। এটা এজন্যে যে, তারা বুঝে না।"

এ আয়াতে কাফেররা যে আল্লাহকে কম ভয় করে এবং মানুষকে বেশী ভয় করে সে বিষয়কেই ফেকাহ্র অভাব বলে অভিহিত করা হয়েছে। এখন চিন্তা কর, এটা শাখাগত ফতোয়া মনে না রাখার ফল, না আমরা যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলো না থাকার ফল? রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর কাছে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলেছিলেন ঃ তোমরা বিজ্ঞ, দার্শনিক ও ফকীহ্। অথচ তারা শাখাগত ফতোয়া অবগত ছিল না।

মা'দ ইবনে ইবরাহীম যুহরী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ মদীনা মুনাওয়ারার বাসিন্দাদের মধ্যে অধিক ফকীহ্ কে? তিনি বললেন ঃ যে

আল্লাহ্ তাআলাকে অধিক ভয় করে। তিনি যেন ফেকাহ্র ফলাফল বলে দিয়েছেন। খোদাভীতি বাতেনী এলেমের ফল– ফতোয়া ও মামলা-মোকদ্দমার ফল নয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ণ ফকীহ্ কে, আমি কি তোমাদেরকে তা বলব না? লোকেরা আরজ করল ঃ জি হাঁ বলুন। তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ফকীহ্ সে ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না, তাঁর আযাব থেকে নির্ভীক করে না এবং অন্য কিছুর আশায় কোরআন বর্জন করে না।

একবার আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন ঃ

لان اقعد مع قوم تذكرون الله تعالى من غدوة الى طلوع الشمس احب الى من ان اعتق اربع رقاب -

যারা ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে, তাদের সাথে বসা আমার কাছে চারটি গোলাম আযাদ করার চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

অতঃপর হযরত আনাস (রাঃ) ইয়াযীদ রাকাশী ও যিয়াদ নিমেরীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "পূর্বে যিকিরের মজলিস তোমাদের এসব মজলিসের মত ছিল না। তোমাদের একজন কিসসা বলে, ওয়াজ করে, মানুষের সামনে খোতবা পাঠ করে এবং একের পর এক হাদীস বর্ণনা করে। আর আমরা বসে ঈমানের আলোচনা করতাম, কোরআন বুঝতাম, দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করতাম এবং আমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত বর্ণনা করতাম।" এ রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) কোরআন বুঝা ও নেয়ামত বর্ণনাকে 'তাফাক্কুহ্' তথা দ্বীনের জ্ঞান বলেছেন।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– মানুষ পূর্ণ ফকীহ্ হয় না যে পর্যন্ত আল্লাহর ব্যাপারে অপরকে নিজের প্রতি নাখোশ না করে এবং কোরআনের বহু অর্থে বিশ্বাস না করে। এ রেওয়ায়েতটি আবু দারদার উপর মওকুফও বর্ণিত আছে। তাতে আরও আছে, এরপর সে নিজের নফসের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং তার প্রতি সর্বাধিক নাখোশ থাকবে।

ফারকাদ সনজী (রহঃ) কোন বিশেষ বিষয় হাসান বসরীকে জিজ্ঞেস

করলেন। জওয়াব শুনে ফারকাদ বললেন, ফেকাহবিদরা আপনার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। হাসান বসরী বললেন ঃ হে ফারকাদ! তুমি কি ফেকাহবিদ স্বচক্ষে কোথাও দেখেছ? ফকীহ সে ব্যক্তি, যে সংসারের প্রতি বিমুখ, পরকালের প্রতি উৎসাহী, দ্বীনের ব্যাপারে বুদ্ধিমান, বিরতিহীনভাবে পরওয়ারদেগারের এবাদতকারী, পরহেযগার, মুসলমানদের বিমুখতা থেকে আত্মরক্ষাকারী, তাদের ধন-সম্পদের প্রতি বিমুখ এবং মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এখানে হযরত হাসান বসরী এতগুলো বিষয় উল্লেখ করলেন, কিন্তু একথা বললেন না যে, ফকীহ ফেকাহ শাস্ত্রের শাখাগত ফতোয়ারও হাফেয হবে। আমরা একথা বলি না যে, ফেকাহ শব্দটি বাহ্যিক বিধানাবলীর ফতোয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে না। বরং আমরা বলি, ব্যাপক অর্থে ফতোয়ার ক্ষেত্রেও শব্দটি ব্যবহৃত হত। তবে অধিকাংশ মনীষী ফেকাহ শব্দটি আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের অর্থেই ব্যবহার করতেন। এখন শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় মানুষ ধোঁকায় পড়েছে। তারা কেবল ফতোয়ার বিধানাবলীতেই মশগুল হয়ে পড়েছে এবং আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা এ পছন্দের উপর মনের দিক থেকে একটি ভরসা পেয়েছে। কেননা, আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র সূক্ষ্ম বিধায় তা পালন করা কঠিন। তার মাধ্যমে সরকারী পদ, জাঁকজমক ও অর্থকড়ি লাভ করা দুরূহ। তাই শয়তান এই বাহ্যিক ফেকাহ অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করার খুব সুযোগ পেয়েছে। যে ফেকাহ্ শরীয়তের একটি উৎকৃষ্ট শাস্ত্র ছিল, শয়তান তা বিশেষ ফতোয়া শাস্ত্রের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

দ্বিতীয়, এলেম শব্দটি পূর্বে আল্লাহর মারেফত, তাঁর আয়াতসমূহের অবগতি এবং সৃষ্টির মধ্যে তাঁর ক্রিয়াকর্ম চেনার অর্থে ব্যবহৃত হত। হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেছিলেন ঃ مات تسعة اعشار العلم এলেমের দশ ভাগের নয় ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি এলেমকে মারেফত বলেছেন এবং নিজেই তফসীর করেছেন যে, এখানে আল্লাহ্র এলেম উদ্দেশ্য।

মানুষ এ শব্দটিও বিশেষ অর্থে ধরে নিয়েছে। তারা প্রচার করে দিয়েছে, যেব্যক্তি প্রতিপক্ষের সাথে ফেকাহ্র মাসআলা মাসায়েল নিয়ে খুব বিতর্ক করে এবং এতে ব্যাপৃত থাকে, প্রকৃতপক্ষে সে-ই আলেম।

শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তার মাথায়ই শোভা পায়। পক্ষান্তরে যে বিতর্কে পারদর্শী নয়, অথবা তাতে পিছিয়ে থাকে, মানুষ তাকে দুর্বল মনে করে এবং আলেমদের মধ্যে গণ্য করে না। বস্তুতঃ এলেমের এ অর্থ পূর্বে ছিল না। এটা তাদেরই কারসাজি। এলেম ও আলেমের ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সেসব আলেমের বিশেষণ, যাঁরা আল্লাহ্ তাআলা, তাঁর বিধিবিধান, ক্রিয়াকর্ম ও গুণাবলী সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে এখন আলেম তাদেরকে বলা হয়, যারা শরীয়তের এলেম তো রাখেই না, কেবল বিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহে ঝগড়া-কলহ করার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে। এতেই তারা অদ্বিতীয় আলেমগণের মধ্যে পরিগণিত হয়, যদিও তফসীর, হাদীস ইত্যাদি কিছুই জানে না। এ বিষয়ই অনেক শিক্ষার্থীর জন্যে মারাত্মক অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তৃতীয় শব্দ তওহীদের অর্থ এবং কালাম শাস্ত্র ও বিতর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া, প্রতিপক্ষের বিরোধপূর্ণ কথাবার্তা আয়ত্ত করা, সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তৈরী করা, অধিক আপত্তি বের করা এবং প্রতিপক্ষকে অভিযুক্ত করা। ফলে এ ধরনের অনেক নতুন দল নিজেদের উপাধি সাব্যস্ত করছে 'আহলে আদল ও তওহীদ' এবং কালামশাস্ত্রীদের নাম রেখেছে তওহীদের আলেম। অথচ এ শাস্ত্রের যেসব বিষয়বস্তু উদ্ভব হয়েছে, সেগুলোর কোনটিই প্রথম যুগে ছিল না; বরং তখন যারা বিতর্ক ও কলহের সূত্রপাত করত, তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হত। সে যুগের লোকেরা কোরআন পাকে বর্ণিত হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রমাণই হৃদয়ঙ্গম করত এবং তখন কোরআনের শিক্ষাই ছিল পূর্ণ শিক্ষা। তাদের মতে পরকালীন বিষয়কে তওহীদ বলা হত। এটা কালামশাস্ত্রীরা বুঝে না, বুঝলেও আমলে আনেন না। পরকাল বিষয়ের ব্যাখ্যা এই যে, উপায় ও কারণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে ভাল মন্দ সকল কর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করতে হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করা যাবে না। এটা তওহীদের একটি প্রধান মূলনীতি। এরই ফল হচ্ছে তওয়াক্কুল, যা যথাস্থানে বর্ণিত হবে। এ তওহীদেরই এক ফল ছিল, হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তাঁর সহচরগণ বললেন ঃ আমরা আপনার জন্যে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি বললেন ঃ চিকিৎসকই আমাকে অসুস্থ করেছেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আবু বকর (রাঃ) অসুস্থ হলে তাঁর সহচরগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

চিকিৎসক আপনার রোগ সম্পর্কে কি বলেছে? তিনি বললেন ঃ চিকিৎসক বলেছেন- اِنِّىْ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ আমি যা চাই, তাই করি।

তওহীদ এমন একটি উৎকৃষ্ট রত্ন, যার দু'টি আবরণ রয়েছে এবং আর দুটির একটি অপরটি অপেক্ষা রত্ন থেকে দূরবর্তী। লোকেরা তওহীদ শব্দটিকে বিশেষ আবরণের অর্থে এবং সেই বিশেষ শাস্ত্রের অর্থে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যদ্বারা আবরণের হেফাযত হয়। তারা আসল রত্ন বাদ দিয়েছে। তওহীদের প্রথম আবরণ হচ্ছে মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা। এ তওহীদ খৃস্টানদের প্রবর্তিত ত্রিত্ববাদের বিপরীত। কিন্তু এ তওহীদ কখনও মোনাফেকের মুখ থেকেও উচ্চারিত হয়; যার অন্তর বাইরের বিপরীত। তওহীদের দ্বিতীয় আবরণ হচ্ছে মুখে যে কলেমা উচ্চারণ করে, অন্তরে তার বিষয়বস্তুর বিপরীত বিশ্বাস না থাকা; বরং অন্তরে তা সত্য বলে প্রত্যয় থাকা। এটা সর্বসাধারণের তওহীদ। কালামশাস্ত্রীরা এ তওতীদকেই বেদআত থেকে রক্ষা করে। আর আসল রত্ন তওহীদ হচ্ছে উপায় ও কারণাদির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সবকিছুকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশ্বাস করা এবং বিশেষভাবে তাঁরই এবাদত করা, অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত না করা। যারা নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে, তারা এ তওহীদের বাইরে অবস্থান করে। কেননা, যেব্যক্তি নিজের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে তার খেয়াল খুশীকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে নেয়। আল্লাহ বলেন ঃ اَفَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

"তুমি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যে তার খেয়াল খুশীকে উপাস্য করে নিয়েছে?"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের খেয়াল খুশী হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বাধিক ঘৃণ্য উপাস্য, যার উপাসনা পৃথিবীতে করা হয়। আসলেও চিন্তা করলে বুঝা যায়, মূর্তিপূজারীরা প্রকৃতপক্ষে মূর্তির পূজা করে না; বরং মনের খেয়াল খুশীর পূজা করে। কারণ, তাদের মন বাপদাদার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট। তারা সেই আকর্ষণের অনুসরণ করে।

মানুষের প্রতি রাগ করাও এ তওহীদের পরিপন্থী। কেননা, যেব্যক্তি ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় বলে বিশ্বাস করবে, সে অন্যের প্রতি কিরূপে রাগ করতে পারে? মোট কথা, পূর্বে এ স্তরকে তওহীদ বলা হত। এটা সিদ্দীকগণের স্তর। মানুষ একে কিভাবে পাল্টে

দিয়েছে এবং ব্যক্তিক আবরণটি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছে! তারা এ আবরণকেই প্রশংসা ও গর্বের বস্তু সাব্যস্ত করেছে। অথচ এটা প্রশংসার মূল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। মানুষের অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে কেবলামুখী হয়ে বলে–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا -

"আমি একাগ্রতা সহকারে আমার মুখ সেই সত্তার দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।"

এখন যদি তার অন্তর বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার দিকে না থাকে, তবে এর অর্থ এই হবে যে, সে প্রত্যহ দিনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলার সাথে মিথ্যা বলে। কেননা, মুখের অর্থ যদি বাহ্যিক মুখ হয় তবে সেটা তো সব দিক থেকে ফিরিয়ে কাবার দিকে রাখা হয়েছে। কা'বা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার দিক নয় যে, কেউ কা'বার দিকে মুখ করলে আল্লাহ তা'আলার দিকে মুখ করা হবে। আর যদি মুখের অর্থ হয় অন্তরের ধ্যান, যা এবাদতের উদ্দেশ্য, তবে যেখানে অন্তর পার্থিব প্রয়োজন ও স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত, অর্থসম্পদ ও জাঁকজমক সঞ্চয়ের কৌশল আবিষ্কারে মগ্ন এবং সম্পূর্ণরূপে সেদিকেই নিবিষ্ট, সেখানে একথা কেমন করে সত্য হবে যে, আমি আমার মুখ সেই আল্লাহর দিকে করলাম, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? এ বাক্যটি আসল তওহীদের স্বরূপ স্থাপন করে। বাস্তবে সে-ই তওহীদপন্থী, যে সত্যিকার এক ছাড়া অন্য কাউকে দেখে না এবং অন্তর অন্য দিকে ফেরায় না। এ তওহীদ হচ্ছে এ আদেশ পালন করা ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ -

"বল, আল্লাহ। এরপর তাদেরকে তাদের বৃথা কথনে খেলাধুলা করতে দাও।"

এখানে মুখে বলা অর্থ নয়। কেননা, মুখ অন্তরের অবস্থা বর্ণনা করে, যা কখনও সত্য কখনও মিথ্যা হয়। আল্লাহ তা'আলাকে দেখার স্থান হচ্ছে অন্তর, যা তওহীদের উৎস।

চতুর্থ শব্দ যিকির ও তাযকীর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এরশাদ

করেন ঃ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

যিকিরের মজলিসের প্রশংসায় অনেক হাদীস বর্ণিত আছে। উদাহরণতঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন–

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة قال مجالس الذكر ـ

যখন তোমরা জান্নাতের বাগান অতিক্রম কর, তখন বিচরণ কর, (অর্থাৎ, সংগ্রহ করে বেড়াও)। জিজ্ঞেস করা হল ঃ জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন ঃ যিকিরের মজলিস।

ان الله وملائكة سياحين فى الهواء سوى ملائكة الخلق اذا راوا مجالس الذكر ينادى بعضهم بعضا الا هلموا الى بغيتكم فياتونهم ويحفون بهم ويستمعون الا فاذكروا الله وكروا بانفسكم ـ

"মখলুকের ফেরেশতা ছাড়াও আল্লাহ তাআলার কতক ভ্রমণকারী ফেরেশতা আছে, তারা শূন্যে বিচরণ করে। তারা যখন যিকিরের মজলিস দেখে তখন একে অপরকে ডেকে বলে ঃ চল, তোমাদের অভীষ্ট বিষয় এখানে রয়েছে। অতঃপর তারা যিকিরওয়ালাদের কাছে এসে তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং যিকির শুনে। সাবধান, আল্লাহর যিকির কর এবং নফ্সকে উপদেশ দাও।"

লোকেরা এ যিকির পরিবর্তন করে এমন সব বিষয়ের নাম যিকির রেখে দিয়েছে যা আজকালকার ওয়ায়েযরা সব সময় বর্ণনা করে। অর্থাৎ, কিসসা, কবিতা ইত্যাদির বর্ণনা। অথচ কিসসা বেদআত। পূর্ববর্তী মনীষীগণ কিসসা কথকের কাছে বসতে নিষেধ করেছেন। ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে কিসসা ছিল না– হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে ছিল। ফলে ফেতনা দেখা দেয় এবং কিসসা কথকরা বহিষ্কৃত হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন তিনি মসজিদ থেকে বের হয়ে বললেন ঃ কিসসা কথকই

আমাকে মসজিদ থেকে বের করেছে। সে না আসলে আমি বের হতাম না। যমরা বলেন ঃ আমি সুফিয়ান সওরীকে বললাম ঃ আমরা কিসসা কথকের কাছে যাব? তিনি বললেন ঃ বেদআতের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও। ইবনে আওন বলেন ঃ আমি ইবনে সিরীনের কাছে গিয়ে আরজ করলাম ঃ আজ তেমন ভাল কাজ হয়নি। আমীর কিসসা কথকদের কিসসা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমীর উত্তম তওফীক প্রাপ্ত হয়েছেন।

আ'মাশ (রহঃ) বসরার জামে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন, এক ব্যক্তি ওয়ায করছে এবং বলছে ঃ আ'মাশ আমার কাছে রেওয়ায়েত করেছেন। একথা শুনে আ'মাশ বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং বগলের লোম উপড়াতে লাগলেন। ওয়ায়েয বলল ঃ মিয়া, তোমার লজ্জা করে না। আ'মাশ বললেন ঃ আমি তো সুন্নত কাজ করছি। এতে শরমের কি আছে? বরং তুমি মিথ্য বলছ যে, আ'মাশ তোমার কাছে রেওয়ায়েত করেছে। শুন, আমিই আ'মাশ। আমি তোমার কাছে কিছুই রেওয়ায়েত করিনি। আহমদ বলেন ঃ কিসসা কথক ও ভিক্ষুক সর্বাধিক মিথ্যুক। হযরত আলী (রাঃ) বসরার জামে মসজিদ থেকে কিসসা কথককে বের করে দেন এবং হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা শুনলেন- তাঁকে বের করেননি। কারণ, তিনি আখেরাত ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, নফসের দোষ ও বিপজ্জনক আমল সম্পর্কে হুশিয়ার করতেন, শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তিনি আল্লাহ্র নেয়ামত ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বান্দার অক্ষমতার কথা বলতেন এবং দুনিয়ার নিকৃষ্টতা, দোষ, ক্ষণস্থায়িত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরকালের পথে বিপদাপদের অবস্থা বর্ণনা করতেন। এটাই শরীয়তসম্মত উৎকৃষ্ট যিকির। এর প্রতিই আবু যর (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

"যিকিরের মজলিসে উপস্থিতি হাজার রাকআত (নফল নামায) পড়ার চেয়ে উত্তম। এলেমের মজলিসে যাওয়া হাজার রোগীর কুশল জিজ্ঞাসা করার চেয়ে এবং হাজার জানাযার পশ্চাতে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হুযুর, কোরআন তেলাওয়াতের চেয়েও কি? তিনি বললেন ঃ কোরআন তেলাওয়াতের উপকারিতা এটি এলেম বলেই।"

আতা (রঃ) বলেন ঃ যিকিরের একটি মজলিস ক্রীড়া-কৌতুকের সত্তরটি মজলিসের জন্যে কাফ্ফারা হয়ে যায়।

এখন মিষ্ট ও মসলাযুক্ত কথার উদগাতারা তাদের বাজে কথাবার্তার নাম দিয়েছে তাযকীর। অথচ তারা উৎকৃষ্ট যিকিরের পথ ভুলে কোরআন বহির্ভূত ও অতিরঞ্জিত কিসসা কাহিনীতে ব্যাপৃত। একান্ত সত্য হলেও কতক কিস্সা শোনা উপকারী এবং কতক শোনা অপকারী হয়ে থাকে। যেব্যক্তি এটা অবলম্বন করে, তার মধ্যে সত্য-মিথ্যা এবং উপকারী অপকারী বিষয়বস্তুর সংমিশ্রণ হয়ে যায়। এ কারণেই এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ কারণেই ইমাম আহমদ বলেন ঃ সত্য অবস্থা বর্ণনাকারীর বড় প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং যদি সে কিসসা কোন নবীর হয়, ধর্ম সম্পর্কিত হয় এবং কথকও সত্যবাদী হয়, তবে এরূপ কিস্সা শুনতে কোন দোষ আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু বর্ণনাকারীর মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যেসব কিসসায় এমন ত্রুটি ও অসতর্কতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার তাৎপর্য সর্বসাধারণের বোধগম্য নয়, সেগুলো বর্ণনা করবে না এবং এমন বিরল ত্রুটি-বিচ্যুতিও বর্ণনা করবে না, যার পেছনে ত্রুটিকারী অনেক সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, যার ফলে সে ত্রুটি ক্ষমাযোগ্য হয়ে গেছে। কিসসা কথক এ দু'টি বিষয় থেকে বেঁচে থাকলে তার কিসসা কথনে দোষ নেই। এসব শর্তসহ উৎকৃষ্ট কিসসা তাই হবে, যা কোরআন মজীদ ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কোন কোন লোক আনুগত্য ও এবাদতে উৎসাহ যোগায় এমন গল্প রচনা করে নেয়া দুরস্ত মনে করে। তারা বলে ঃ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করা। কিন্তু এটা শয়তানী কুমন্ত্রণা। কেননা, সত্য ঘটনার অভাব নেই যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। যেসব বিষয় আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) বর্ণনা করেছেন, সেগুলো সত্ত্বেও ওয়াযে নতুন বিষয় আবিষ্কার করার প্রয়োজন নেই। ছন্দ মিলিয়ে কথা বলার চেষ্টা মকরূহ ও বানোয়াট গণ্য হয়েছে। সেমতে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের ছেলে ওমর প্রয়োজনবশতঃ তাঁর কাছে আসেন। তিনি ওমরকে ছন্দপূর্ণ কাব্যে নিজের প্রয়োজনের কথা বর্ণনা করতে শুনে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তোমাকে মন্দ মনে করি। তওবা না করা পর্যন্ত আমি তোমার প্রয়োজনের কথা শুনব না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহার মুখে তিনটি ছন্দপূর্ণ বাক্য শুনে বললেন ঃ হে ইবনে রাওয়াহা! নিজেকে ছন্দের বাঁধন

থেকে দূরে রাখ। এ থেকে জানা যায়, যে ছন্দ দু'বাক্যের অধিক হয়, তা নিষিদ্ধ ছিল। জনৈক ব্যক্তি ভ্রূণহত্যায় হত্যার বিনিময় সম্পর্কে বলেছিল ঃ

كيف ندى من لا شرب ولا اكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل -

"যে খায়নি, পান করেনি, চিৎকার করেনি, তার রক্তপণ আমরা কিরূপে দেব? এরূপ বিষয় তো মাফ হয়ে যায়।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে বললেন ঃ বেদুঈন ব্যক্তির ছন্দের অনুরূপ ছন্দ রচনা কর।

ওয়াযের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কবিতা বলা খারাপ। আল্লাহ বলেন ঃ

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ -

"পথভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে। দেখ না, তারা প্রতি উপত্যকায় মাথা কুটে ফেরে?

وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ

আমি পয়গম্বরকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়।

যেসব কবিতা বলা ওয়ায়েযদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশের মধ্যে এশকের জ্বালা, মাশুকের সৌন্দর্য, মিলনের আনন্দ ও বিরহের যন্ত্রণা বর্ণিত হয়। অথচ ওয়াযের মজলিস সর্বসাধারণ দ্বারাই পূর্ণ থাকে, যাদের অভ্যন্তর কামভাবে পরিপূর্ণ এবং অন্তর সুন্দর বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট। এমতাবস্থায় এসব কবিতা তাদের মনের সুপ্ত বিষয়কে উস্কানি দেয়। ফলে কামাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠে এবং তারা চিৎকার ও হাহুতাশ করে। মোট কথা, অধিকাংশ অথবা সব কবিতার পরিণতিই এক ধরনের অনিষ্টকর বিষয় হয়ে থাকে। তবে যেসব কবিতায় উপদেশ ও প্রজ্ঞা রয়েছে, কেবল সেগুলোই দলীল হিসাবে উল্লেখ করা এবং অন্য কোন প্রকার কবিতা ব্যবহার না করা উচিত।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ان من الشعر لحكمة নিশ্চয় কোন কোন কবিতা প্রজ্ঞাপূর্ণ।

যদি মজলিসে বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিবর্গ সমবেত থাকে এবং জানা থাকে যে, তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে নিমজ্জিত, তবে তাদের জন্যে সে কবিতা ক্ষতিকর নয়, যা বাহ্যতঃ মানুষের উদ্দেশে রচনা করা হয়েছে। কেননা, শ্রোতা যা শুনে তা সে ছাঁচেই গড়ে নেয়, যা তার অন্তরে প্রবল থাকে। 'সেমা' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এ কারণেই হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) ছয় থেকে দশ জন লোকের মধ্যে ওয়ায করতেন। এর বেশী হলে কিছুই বলতেন না। তাঁর মজলিসে কখনও পূর্ণ বিশ জন লোক হয়নি। একবার ইবনে সালেমের ঘরের দরজায় কিছু লোক সমবেত হলে এক ব্যক্তি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ)-কে বলল ঃ আপনি বয়ান করুন। এখানে আপনার বন্ধুবর্গ উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বললেন ঃ এরা আমার বন্ধু নয়। এরা মজলিসের লোক। আমার বন্ধু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কতক সূফী দু'প্রকার কালাম গড়েছেন– একে তো তারা খোদায়ী এশ্‌ক ও মিলনের ব্যাপারে লম্বা চওড়া দাবী, যার পর বাহ্যিক আমলের কোন প্রয়োজন থাকেনি। এমনকি কেউ কেউ আল্লাহর সাথে এক হয়ে যাওয়ার দাবীও করতে থাকে এবং বলে ঃ পর্দা সরে গেছে, দীদার হচ্ছে এবং সামনাসামনি সম্বোধন অর্জিত হচ্ছে। তারা আরও বলে ঃ আমাদের প্রতি এই আদেশ হয়েছে এবং আমরা এই বলেছি। এ ব্যাপারে তারা হুসাইন ইবনে মনসূর হাল্লাজের অনুরূপ হওয়ার দাবী করে, যাকে এমনি ধরনের কয়েকটি কথা বলার কারণে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। তারা 'আনাল হক' উক্তি এবং হযরত বায়েযীদ বোস্তামীর উক্তিকে সনদ হিসাবে পেশ করে। অর্থাৎ, বায়েযীদ বোস্তামী থেকেও 'সোবহানী, সোবহানী বলার কথা বর্ণিত আছে।

এ ধরনের বাক্যের দ্বারা সর্বসাধারণের অনেক ক্ষতি হয়েছে। এমন কি, কোন কোন কৃষক তার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এমনি ধরনের দাবী করতে শুরু করে। কেননা, এ বাক্য অন্তরের কাছে খুব ভাল মনে হয়। এতে বাহ্যিক আমল করতে হয় না। মকাম ও হাল অর্জনের জন্যে

আত্মশুদ্ধিও করতে হয় না। কাজেই নির্বোধেরা এরূপ দাবী করবে না কেন এবং পাগলামি ও বাজে কথা বকবে না কেন? কেউ তাদের এ সব বিষয় মানতে অস্বীকার করলে তারা বলে ঃ এ অস্বীকারের কারণ হচ্ছে এলেম ও বিতর্ক। এলেম একটি পর্দা এবং বিতর্ক নফসের আমল। আমরা যা অর্জন করেছি তা নূরের কাশফের মাধ্যমে কেবল বাতেন দ্বারা জানা যায়। মোট কথা, এমনি ধরনের বিষয় পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সর্বসাধারণের ক্ষতি এত বেড়ে গেছে যে, যদি তাদের মধ্যে কেউ এ ধরনের কিছু কথা বলে, তবে তাকে মেরে ফেলা দশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখার তুলনায় ভাল হয়।

হযরত বায়েযীদ বোস্তামী থেকে বর্ণিত উক্তি সম্পর্কে কথা এই যে, প্রথমতঃ এর বিশুদ্ধতা স্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়তঃ যদি কেউ এরূপ কথা তাঁর মুখে শুনে থাকে, তবে সম্ভবতঃ আল্লাহ্র উক্তিকেই বর্ণনার আকারে তিনি মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করছিলেন। যেমন বলতেন ঃ

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ -

"নিশ্চয় আমিই আল্লাহ। আমি ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অতএব আমার এবাদত কর।" (সূরা তোয়াহা)

এ থেকে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, যিনি এ আয়াত পাঠ করছেন তিনি নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন।

দ্বিতীয় প্রকার কালাম যা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। এটি বাহ্যতঃ ভাল কিন্তু অর্থ ভয়াবহ। এতে কোন প্রকার উপকার হয় না। এসব কালাম স্বয়ং বক্তারই হৃদয়ঙ্গম হয় না; বরং পাগলামি ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার কারণে বলে দেয়। এ পাগলামির কারণ, যে কথা তার কানে পড়ে, তার অর্থ কমই স্মরণ রাখে। অধিকাংশ এরূপই।

অথবা বক্তা নিজে বুঝে কিন্তু অপরকে সে কালাম বুঝাতে পারে না। কিংবা মনের ভাব প্রকাশ করার মত বাক্য গঠন করতে সক্ষম হয় না। কারণ, বিদ্যাবুদ্ধি কম। এ ধরনের কালাম দ্বারা অন্তর পেরেশান এবং বুদ্ধি চিন্তাকে হয়রান করা ছাড়া কোন উপকার হয় না। হাঁ, এমন অর্থ বুঝে নেয়া যেতে পারে, যা উদ্দেশ্য নয়। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি এসব কালামের অর্থ নিজের বাসনা অনুযায়ী বুঝবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

যেব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যার অর্থ তারা বুঝে না, সে হাদীস সেই সম্প্রদায়ের জন্যে একটি আপদ হবে। তিনি আরও বলেন ঃ এমন কথা বল, যা তারা বুঝে। যা বুঝে না তা বলো না। তোমরা কি চাও, আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হোক? এ উক্তিটি এমন কালাম সম্পর্কে, যার বক্তা নিজে তা বুঝে বটে কিন্তু শ্রোতারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এরূপ কালাম বলা জায়েয হবে না। এ থেকে জানা যায়, যে কালাম স্বয়ং বক্তাই বুঝে না, তা বলা কেমন করে দুরস্ত হবে?

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যারা যোগ্য নয়, তাদেরকে জ্ঞানের কথা শুনিয়ো না। শুনালে জ্ঞানের কথার প্রতি তোমার বাড়াবাড়ি হবে। পক্ষান্তরে যারা যোগ্য, তাদের থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রেখো না। রাখলে তাদের প্রতি অন্যায় করা হবে। কোমলপ্রাণ চিকিৎসকের মত হয়ে যাও। সে যেখানে রোগ দেখে সেখানেই ওষুধ লাগিয়ে দেয়। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি অযোগ্যদের মধ্যে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করে, সে মূর্খ। আর যে যোগ্য থেকে জ্ঞানের কথা আটকে রাখে সে জালেম। জ্ঞানের কথা একটি প্রাপ্য হক। কিছু লোক এর অধিকারী। সুতরাং প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিয়ে দেয়া উচিত।

কেউ কেউ শরীয়তের বাহ্যিক শব্দ থেকে যে অর্থ বুঝা যায় তা গ্রহণ করে না এবং তা থেকে এমন বাতেনী বিষয় উদ্ভাবন করে, যার কোন উপকারিতা নেই। যেমন, বাতেনী ফের্কার লোকেরা কোরআন মজীদের ভিন্ন অর্থ বের করে। এটাও হারাম এবং এর ক্ষতি অনেক বেশী। কেননা, শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন দলীল ও প্রয়োজন ছাড়াই যখন শব্দের বাহ্যিক অর্থ বাদ দেয়া হবে, তখন শব্দের উপর কোন আস্থা থাকবে না। ফলে আল্লাহ ও রসূলের কালামের উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাবে। কারণ সকলের বাতেন এক রকম হয় না। তাতে পরস্পর বিরোধিতার আশংকা থাকে। ফলে শব্দকে বিভিন্ন অর্থে ঢেলে নেয়া যেতে পারে। বাতেনী ফের্কা এভাবে গোটা শরীয়তকে বরবাদ করেছে। এ ফের্কার লোকেরা কোরআনের যে ব্যাখ্যা করে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই ঃ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ اذ هب الى فرعون انه طغى (হে মূসা!) ফেরআউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে। বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এতে অন্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ফেরআউনের অর্থও

অন্তর। অন্তরই প্রত্যেক মানুষের অবাধ্য। وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' –বাতেনী ফের্কা বলে ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত যেসব বস্তুর উপর ভরসা করা হয়, সেগুলো নিক্ষেপ করা উচিত। হাদীসে আছে تسحروا فان فى السحور بركة "তোমরা সেহরী খাও। সেহরীর মধ্যে বরকত আছে।" বাতেনী ফের্কা বলে ঃ এর অর্থ সেহরীর সময় এস্তেগফার করা। তারা এমনিভাবে ব্যাখ্যা করে। তারা আদ্যোপান্ত কোরআনকে বাহ্যিক অর্থ এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্য আলেমগণ কর্তৃক বর্ণিত তফসীর থেকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে কিছু সংখ্যক যে বাতিল তা নিশ্চিত। যেমন ফেরআউনের অর্থ অন্তর নেয়া। কেননা, ফেরআউন একজন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যক্তি ছিল। সে কাফের ছিল এবং হযরত মূসা (আঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন– একথা আমাদের জানা। এমনিভাবে সেহ্র শব্দ দ্বারা এস্তেগফার অর্থ নেয়াও বাতিল। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন আহার করতেন এবং বলতেন ঃ

هلموا الى الغذاء المبارك অর্থাৎ, তোমরা বরকতের খাদ্যের দিকে এসো। মোট কথা, এসব ব্যাখ্যা হারাম ও পথভ্রষ্টতা। এগুলোর মধ্যে কোনটিই সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত নেই। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)– যিনি মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান ও উপদেশদানে পাগলপারা ছিলেন, তাঁর পক্ষ থেকেও এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত নেই। হাদীসে আছে–

من فسر القران برآيه فليتبوا مقعده من النار .

যেব্যক্তি নিজের মতানুযায়ী কোরআনের তফসীর করে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।

এ হাদীসে উপরোক্তরূপ বাক্যই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমে একটি উদ্দেশ্য ও মত ঠিক করে নিয়ে সেই মত প্রমাণ করার জন্যে কোরআনকে সাক্ষী করা এবং কোরআনের শব্দ থেকে আপন মতলব উদ্ধার করা। অথচ এর পেছনে কোন আভিধানিক সমর্থন নেই।

এ হাদীস থেকে একথা বুঝা ঠিক হবে না যে, চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে কোরআনের তফসীর করা যাবে না। কেননা, অনেক আয়াত সম্পর্কে সাহাবী ও তফসীরকারগণের পক্ষ থেকে পাঁচ ছয় ও সাত ধরনের

উক্তি বর্ণিত আছে। এটা জানা কথা, সবগুলো উক্তিই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শ্রুত নয়। কেননা, এসব উক্তি মাঝে মাঝে পরস্পর বিরোধীও হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো দীর্ঘ গবেষণাপ্রসূতই হয়ে থাকবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ اللهم فقهه فى الدين হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন।

যারা উপরোক্তরূপ অপব্যাখ্যা বৈধ মনে করে এবং বলে, এর উদ্দেশ্য মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা, তারা সে ব্যক্তিরই অনুরূপ, যে শরীয়তে উল্লেখ নেই এমন একটি বাস্তব সত্য বিষয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে একটি হাদীস গড়ে নেয় অথবা যে কোন বিষয় সে সত্য মনে করে, সে সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে একটি হাদীস তৈরী করে নেয়। এটা জুলুম ও গোমরাহী এবং নিম্নবর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত–

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار ـ

'যে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা বলে, তার ঠিকানা জাহান্নাম।' বরং শব্দের অপব্যাখ্যা করা আরও খারাপ। কেননা, এর কারণে শব্দের উপর থেকেই আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং কোরআন বুঝার পথ রুদ্ধ হয়। এখন তুমি জেনে থাকবে যে, শয়তান মানুষের ইচ্ছাকে কিরূপ সৎ জ্ঞান থেকে সরিয়ে মন্দ জ্ঞানের দিকে নিয়ে গেছে। এগুলো মন্দ আলেমদের দ্বারা মর্মার্থ পরিবর্তনের বদৌলত প্রসার লাভ করেছে। যদি তুমি কেবল প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে তাদের অনুসরণ কর এবং প্রথম যুগে যেসকল ব্যাখ্যা সুবিদিত ছিল, সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য না কর, তবে তোমার অবস্থাও শোচনীয় হবে।

পঞ্চম শব্দ হেকমত। আজকাল হাকীম শব্দটি চিকিৎসক, কবি ও জ্যোতির্বিদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। বরং যেব্যক্তি ফুটপাতে বসে নানা রূপ ভেল্কী দেখায়,, তাকেও হাকীম বলা হয়। অথচ হেকমতের প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ـ

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেকমত (প্রজ্ঞা) দান করেন। যে হেকমত প্রাপ্ত হয় সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন ঃ মানুষ যদি হেকমতের একটি বাক্য শেখে, তবে এটা তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছুর চেয়ে উত্তম। এখন চিন্তা কর, পূর্বে হেকমত কি ছিল আর এখন কার্যতঃ কোন্ অর্থে চলে গেছে। অন্যান্য শব্দ এর উপরই অনুমান করে নাও এবং মন্দ আলেমদের দ্বারা প্রতারিত হয়ো না। কেননা, দ্বীনের উপর তাদের অনিষ্ট শয়তানদের তুলনায় অনেক বেশী। শয়তান তাদের মাধ্যমেই মানুষের মন থেকে দ্বীনকে বহিষ্কার করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়; ঘৃণ্যতম মানুষ কে? তিনি জওয়াব দিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন ঃ ইলাহী! ক্ষমা কর। অতঃপর বার বার জিজ্ঞাসার জওয়াবে তিনি বললেন ঃ ঘৃণ্যতম মানুষ হচ্ছে মন্দ আলেম। সুতরাং ভাল ও মন্দ এলেম জানা হয়ে গেছে এবং আরও জানা হয়েছে যে, কি কারণে ভাল এলেম মন্দ এলেমের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। এখন তুমি ইচ্ছা করলে নিজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসরণ করবে। আর যদি প্রতারণার কূপে নিক্ষিপ্ত হতে চাও, তবে পরবর্তীদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে। যেসব জ্ঞান পূর্ববর্তীদের পছন্দনীয় ছিল সেগুলো সব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে এলেমের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তার অধিকাংশই বেদআত বা নতুন আবিষ্কার। রসূলে করীম (সাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ

بدآ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدآ فطوبى للغرباء فقيل ومن الغرباء ـ قال الذين يصلحون ما افسده الناس من سنتى والذين يحيون ما اماتوه من سنتى ـ

"ইসলামের সূচনা হয়েছে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবং শেষ পর্যন্ত সে নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই ফিরে যাবে যেমন সূচনা হয়েছিল। অতএব সুসংবাদ একাকীদের জন্যে। প্রশ্ন করা হল ঃ একাকী কারা? তিনি বললেন ঃ যারা আমার সেই সুন্নতের সংস্কার করে, যা মানুষের হাতে নষ্ট হয়ে যায় এবং যারা সেই সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করে, যাকে মানুষ মেরে ফেলে।"

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা আজ যে বিষয় আঁকড়ে রয়েছ, তারা সে বিষয় আঁকড়ে থাকবে। অন্য হাদীসে আছে– তারা অনেক লোকের মধ্যে কম সংখ্যক সৎলোক। তাদের বন্ধুর তুলনায় শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী। কেউ এ জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করলে মানুষ তার শত্রু হয়ে যায়। এ জন্যেই হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যখন তুমি কোন আলেমের অনেক বন্ধু দেখ, তখন বুঝে নাও সে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিলিয়ে দিয়েছে। কারণ, সে কেবল সত্য কথা বললে অধিকাংশ মানুষ তার শত্রু হত।

কল্যাণকর জ্ঞানের মধ্যে প্রশংসনীয় জ্ঞান

প্রকাশ থাকে যে, এদিক দিয়ে জ্ঞান তিন প্রকার– এক, যে জ্ঞানের অল্পও মন্দ, অধিকও মন্দ। দুই. যে জ্ঞানের অল্পও ভাল, অধিকও ভাল এবং তিন, যে জ্ঞান যতটুকুতে কাজ চলে, ততটুকু হলে তো ভাল, কিন্তু চাহিদার অতিরিক্ত হলে প্রশংসনীয় নয়। এ প্রকার তিনটি দেহের অবস্থার মতই। দেহের কোন কোন অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন সুস্থতা ও সৌন্দর্য। কতক অবস্থা কম হোক কিংবা বেশী, মন্দ বিবেচিত হয়; যেমন কুশ্রী হওয়া ও কুচরিত্র হওয়া। কতক অবস্থা এমন যে, তা মাঝামাঝি পরিমাণে হলে ভাল বলে গণ্য হয়; যেমন অর্থ ব্যয়। এ ব্যাপারে অপব্যয় প্রশংসনীয় নয়, যদিও তা ব্যয়। প্রথম প্রকার জ্ঞান যার অল্প ও অধিক সবটাই মন্দ তা হল এমন জ্ঞান যাতে ইহকাল ও পরকালের কোন উপকারিতা নেই, অথবা যার ক্ষতি উপকারিতার তুলনায় বেশী। যেমন জাদু, তেলেসমাত ও জ্যোতির্বিদ্যা। এগুলোর কোনটির মধ্যেই ফায়দা নেই। মানুষের উৎকৃষ্ট সম্পদ জীবন এতে ব্যয় করা অনর্থক বরবাদ করার নামান্তর। আবার কোন জ্ঞানের দ্বারা পার্থিব কোন প্রয়োজন কখনো মিটে গেলেও এর উপকারিতার তুলনায় অপকারিতা বেশী হয়ে থাকে; বরং অপকারের তুলনায় এ উপকার তুচ্ছ মনে হয়। আর যে জ্ঞান আদ্যোপান্ত ভাল, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফত, তাঁর গুণাবলী ও কর্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অভ্যাস ও নীতি জানা এবং দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার রহস্য অবগত হওয়া। এ জ্ঞানই মূল উদ্দেশ্য এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের উপায়। এ জ্ঞানার্জনের যত বেশী চেষ্টাই করা হোক তা প্রয়োজনের

তুলনায় কমই হবে। কেননা, এটা অতল দরিয়া। সকল পর্যটক তার তীরেই ঘুরাফেরা করে। এর অভ্যন্তরে নবী, ওলী ও দৃঢ় চিত্ত আলেম ব্যতীত কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার ব্যাপারে এলেম শিক্ষা করা ও আখেরাত শাস্ত্রজ্ঞগণের জীবনী অধ্যয়ন করা কল্যাণকর হয়ে থাকে, এটা শুরুতে দরকার। পরিণামে এ শিক্ষায় যে বিষয় দ্বারা সাহায্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে সাধনা, অধ্যবসায়, অন্তরের পরিশুদ্ধি, দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকরণ এবং দুনিয়াতে নবী ওলীদের মিল সৃষ্টিকরণ। যে কেউ এ জ্ঞান লাভের জন্যে এভাবে চেষ্টা করবে, সে তার ভাগ্যে যতটুকু আছে তা পেয়ে যাবে। চেষ্টা পরিমাণে পাবে না। হাঁ, এতে সাধনার প্রয়োজন অবশ্য আছে। সাধনা ব্যতীত কোন কিছু অর্জিত হয় না। এ ছাড়া হেদায়েতের কোন চাবি নেই।

তৃতীয় শিক্ষা (যা এক বিশেষ পরিমাণ পর্যন্ত ভাল)– সে শিক্ষা, যা আমরা ফরযে কেফায়ার বর্ণনায় লিখে এসেছি। মানুষের উচিত দু'টি বিষয় থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করা। হয় সে নিজের চিন্তা করবে এবং নিজের চিন্তা শেষ হলে অপরের চিন্তা করবে। কিন্তু নিজের সংশোধন করার পূর্বে অপরের সংশোধনে মশগুল হওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এখন যদি তুমি নিজের চিন্তা কর, তবে সর্বপ্রথম সে জ্ঞান আহরণে মশগুল হও, যা পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী তোমার উপর ফরযে আইন। আর বাহ্যিক আমল যেমন নামায, রোযা, পবিত্রতা ইত্যাদিতে মশগুল হও। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ যে জ্ঞান মানুষ বাদ দিয়ে রেখেছে, সেটি হচ্ছে অন্তরের গুণাগুণ সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে জানতে হবে, কোন্ গুণটি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ। কেননা, কোন মানুষ এমন নেই যার মধ্যে লোভ, লালসা, হিংসা, রিয়া ও আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি মন্দ গুণাবলী নেই। এগুলো সবই মারাত্মক গুণ। এগুলোকে এমনিই রেখে কেবল বাহ্যিক আমলে মশগুল থাকা এমন, যেমন কেউ খোস-পাঁচড়া, ফোড়া ইত্যাদি রোগে কেবল ত্বকের উপর প্রলেপ দেয় এবং শিঙ্গা লাগিয়ে ভিতরের বদরক্ত বের করার ব্যাপারে অলসতা করে। যারা নামেই আলেম এবং কাঠমোল্লা, তারা কেবল বাহ্যিক আমল সম্পর্কেই বর্ণনা করে। আর আখেরাতের আলেমগণ বাতেনের সংস্কার ও অনিষ্টের উপকরণ দূর করা ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অধিকাংশ মানুষ কেবল বাহ্যিক আমল করে এবং অন্তর পরিষ্কার করে না। এর কারণ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল

সহজ এবং অন্তরের আমল কঠিন। এটা এমন, যেমন কেউ তিক্ত ও বিস্বাদ ওষুধ পান করা কঠিন মনে করে কেবল ত্বকের উপর ওষুধের প্রলেপ লাগায়। সে এতেই লিপ্ত থাকে এবং ভিতরে বদ উপকরণ বৃদ্ধি পেয়ে রোগ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। সুতরাং তুমি যদি আখেরাত কামনা কর এবং চির ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি প্রত্যাশা কর, তবে বাতেনের রোগ ও তার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ কর। তৃতীয় খন্ডে আমরা এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছি। সেটা জানার পর তুমি সে উৎকৃষ্ট মকামে অবশ্যই পৌঁছাতে পারবে যা আমরা চতুর্থ খন্ডে বর্ণনা করেছি। কেননা, অন্তর মন্দ বিষয় থেকে মুক্ত হলে তাতে ভাল বিষয়ের জন্য স্থান সংকুলান হয়। ফরযে আইন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি ফরযে কেফায়াতে ব্যাপৃত হয়ো না। বিশেষতঃ যখন অন্যেরা তা জানে ও পালন করে। কেননা, যেব্যক্তি অন্যের সম্ভাব্য সংশোধনের আশায় নিজের জীবন বিপন্ন করে, সে নির্বোধ। উদাহরণতঃ কারও কাপড়ের মধ্যে সাপ বিচ্ছু ঢুকে পড়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত, কিন্তু সে অপরের শরীর থেকে মাছি তাড়ানোর জন্যে পাখা খুঁজে ফিরে। এ ব্যক্তির চেয়ে বোকা আর কে হবে? যদি তুমি তোমার জাহের ও বাতেনের গোনাহ পরিত্যাগ করতে সক্ষম হও এবং এটা তোমার সার্বক্ষণিক অভ্যাসে পরিণত হয়, যা মোটেই অসম্ভব নয়, তবে তখন অবশ্য ফরযে কেফায়ায় মশগুল হতে পার। এতে ধারাবাহিকতা ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। অর্থাৎ, প্রথমে কালামে মজীদ, এর পর হাদীস শরীফ, অতঃপর তফসীর এবং কোরআন শিক্ষা অর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে হাদীসের শিক্ষা ও তার শাখা-প্রশাখায় মশগুল হওয়া উচিত। অর্থাৎ, ফেকাহ শাস্ত্রের বিশ্বাসযোগ্য মাযহাবসমূহ জানতে হবে— মতভেদ নয়। এর পর ফেকাহর নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য শিক্ষা জীবনে যতদূর সম্ভব অর্জন করা কর্তব্য। কিন্তু সমগ্র জীবন কোন এক বিশেষ শাস্ত্রে পূর্ণতা লাভের উদ্দেশে ডুবিয়ে রাখা অনুচিত। কেননা, জ্ঞান সীমাহীন এবং বয়স সীমিত।

এসব শাস্ত্র অন্য উদ্দেশ্যের জন্যে হাতিয়ার ও উপায়, স্বয়ং কাম্য নয়। কাজেই এগুলোতে এমনভাবে নিমগ্ন হওয়া ঠিক নয় যে, আসল উদ্দেশ্যই বিস্মৃত হয়ে যায়। কাজেই অভিধান শাস্ত্র ততটুকুই শিক্ষা করা উচিত, যদ্দ্বারা আরবী ভাষা বুঝা ও বলা যায়। এমনিভাবে ব্যাকরণ ততটুকু শিক্ষা করা দরকার, যতটুকুর সম্পর্ক কোরআন ও হাদীসের সাথে

রয়েছে। শিক্ষার তিনটি স্তর রয়েছে– (১) যতটুকুতে কাজ চলে, (২) মাঝারি স্তর এবং (৩) পূর্ণতার স্তর। এখন হাদীস, তফসীর, ফেকাহ ও কালাম শাস্ত্রের এ তিনটি স্তর বলে দেয়া হচ্ছে, যাতে অন্যান্য শাস্ত্রও অনুমান করে নেয়া যায়। তফসীর শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে কোরআনের দ্বিগুণ পুরু একটি কিতাব যেমন, আলী ওয়াহেদী নিশাপুরীর তফসীর ওজীয। মাঝারি স্তর হচ্ছে কোরআনের তিন গুণ পুরু একটি কিতাব। যেমন, নিশাপুরীর অন্য তফসীর ওসীত। পূর্ণতার স্তর আরও বেশী, যার কোন প্রয়োজন নেই। হাদীসের প্রথম স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের বিষয়বস্তু কোন পন্ডিত ব্যক্তির কাছে বুঝে নেয়া। বর্ণনাকারীদের নাম মুখস্থ করা জরুরী নয়। এ কাজ পূর্ববর্তী লোকেরা সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের কিতাবসমূহ বিশ্বাসযোগ্য মনে করাই তোমার জন্যে যথেষ্ট। মাঝারি স্তর হচ্ছে বোখারী ও মুসলিমের সাথে সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ পাঠ করা। পূর্ণতার স্তর হচ্ছে দুর্বল, শক্তিশালী, সহীহ, মুয়াল্লাল ইত্যাদি যত প্রকার হাদীস বর্ণিত আছে সবগুলো পাঠ করা এবং সনদের অনেক তরীকা, বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত, নাম ও গুণাবলী জানা। ফেকাহ শাস্ত্রে প্রথম স্তর হচ্ছে মুযানীর মুখতাসারের ন্যায় কিতাব পড়ে নেয়া। মাঝারি স্তর হচ্ছে আমার কিতাব ওসীতের সাথে আরও বড় বড় কিতাব পাঠ করা। কালাম শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে বর্ণিত আহলে সুন্নতের আকীদাসমূহ জেনে নেয়া। এর মাঝারি স্তর হচ্ছে আমার 'কিতাবুল ইকতিসাদ ফিল এতেকাদের' মত একশ' পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা। বেদআতীদের সাথে বিতর্ক করার জন্যেই কালামশাস্ত্রের প্রয়োজন। এটা কেবল সর্বসাধারণের স্বার্থেই উপকারী। বেদআতী ব্যক্তি সামান্য বিতর্ক জানলেও তার সাথে কালাম শাস্ত্র কমই উপকারী হয়। কারণ, বিতর্কে নিরুত্তর হয়ে গেলেও সে বেদআত ত্যাগ করবে না। সে নিজেকে অপক্ক মনে করে ধরে নেবে, এর জওয়াব অবশ্যই আছে, তবে আমি দিতে পারিনি।

মন্দ আলেমদের দোষ এই যে, তারা সত্যের নামে বিদ্বেষে বাড়াবাড়ি করে এবং প্রতিপক্ষকে ঘৃণার চোখে দেখে। এর ফল এই দাঁড়ায়, প্রতিপক্ষও মোকাবিলা করতে উদ্যত হয় এবং বাতিলের পক্ষপাতিত্ব অধিক করে। যে বিষয়ে তাকে অভিযুক্ত করা হয় তা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। যদি আলেমগণ শুভেচ্ছা ও হিতাকাঙ্ক্ষার পথ ধরে একান্তে

প্রতিপক্ষকে উপদেশ দিত এবং বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিহার করত, তবে সম্ভবতঃ সফলতা অর্জিত হত।

পরবর্তী যমানায় যেসব বিরোধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এ সম্পর্কে যে ধরনের রচনা, গ্রন্থ ও বিতর্ক আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমন পূর্ববর্তী যমানায় ছিল না। এগুলো থেকে মারাত্মক বিষের ন্যায় বেঁচে থাকা উচিত। কারণ, এটা দুরারোগ্য ব্যাধি। এ ব্যাধিই ফেকাহবিদদেরকে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত করেছে। আমার বক্তব্য তেমনি কোন ফেকাহবিদ শুনলে বলবে ঃ যে যা না পারে, সে তার দুশমন হয়ে যায়। এতে তোমার বুঝা উচিত নয় যে, আমি এ শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞ; বরং আমি এ শাস্ত্রে জীবনের একটি বড় অংশ নিয়োজিত করেছি। রচনা, তথ্যানুসন্ধান, বিতর্ক ও বর্ণনায় প্রথম শ্রেণীর লোকদেরকেও পেছনে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু এর পর আল্লাহ তা'আলা আমাকে সরল পথ এলহাম করে এ শাস্ত্রের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তখন আমি এ শাস্ত্র বর্জন করে আত্মচিন্তায় মশগুল হয়েছি। কাজেই আমার উপদেশ তোমার কবুল করা উচিত। কেননা, অভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা ঠিক হয়ে থাকে। যদি কেউ বলে, ফতোয়া শরীয়তের স্তম্ভ এবং শরীয়তের কারণসমূহ বিরোধ না জেনে জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাই কালাম শাস্ত্র শিক্ষা করা জরুরী। এ যুক্তি শুনে তোমার পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, মাযহাবের কারণসমূহ স্বয়ং মযহাবে উল্লিখিত হয়েছে। এর অতিরিক্ত সবই অহেতুক ঝগড়া। প্রথম যুগের লোকগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম এগুলো জানতেন না। অথচ অন্যদের তুলনায় তাঁরা ফতোয়া শাস্ত্র অনেক বেশীই জানতেন।

অতএব তোমার উচিত জ্বিন শয়তানদের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং মানব শয়তানদের ধোঁকা থেকেও বেঁচে থাকা। মানব শয়তানরা বিভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত করার কাজে জ্বিন শয়তানদেরকে বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছে।

সারকথা, তুমি পৃথিবীতে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার সাথে একাকী ধরে নাও এবং জান যে, মৃত্যু, আল্লাহর সামনে উপস্থিতি, হিসাব নিকাশ, বেহেশত-দোযখ সম্মুখে রয়েছে। এর পর চিন্তা কর, এই সামনের বস্তুগুলোর মধ্যে কোনটি তোমার জন্যে উপকারী। যেটি উপকারী সেটি অবলম্বন কর এবং অবশিষ্ট সবগুলো বর্জন কর।

জনৈক সূফী কোন একজন পরলোকগত আলেমকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি যেসব শাস্ত্র দ্বারা বিতর্ক করতেন, সেগুলোর অবস্থা কি? আলেম ব্যক্তি তার প্রসারিত হাতের তালুতে ফুঁ মেরে বললেন ঃ সব ধুলোর ন্যায় উড়ে গেছে। কেবল দু'রাকআত নামায আমার কাজে এসেছে, যা রাতের বেলায় আমি আদায় করতাম। হাদীসে বলা হয়েছে–

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه اوتوا الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون -

"হেদায়াত লাভ করার পর কোন সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তখন হয়েছে, যখন তারা কলহ ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ তারা কেবল কলহের জন্যেই আপনার এ নাম বর্ণনা করে। তারা তো কলহপ্রিয় সম্প্রদায়।"

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ (যাদের অন্তর বক্র) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসে আছে– এরা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক এবং وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ –এদের থেকে বেঁচে থাকুন, যাতে ওরা আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে– আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেই বুঝিয়েছেন।

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক হবে, যাদের উপর আমলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং ঝগড়া ও বিতর্কের দরজা খুলে যাবে। এক হাদীসে আছে– তোমরা এমন যমানায় আছ, যাতে আমলের দরজা খোলা আছে। অচিরেই এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি হবে, যাদের অন্তরে বিবাদ ঢেলে দেয়া হবে। মশহুর এক হাদীসে আছে– ابغض الخلق الى الله تعالى الالد الخصم আল্লাহ তা'আলার কাছে মানুষের মধ্যে অধিক নিন্দনীয় হচ্ছে ঝগড়াটে ব্যক্তি। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ যে সম্প্রদায় বাকপটুতা প্রাপ্ত হয়, তারা আমল থেকে বঞ্চিত হয়। আলী ইবনে বসীর হিম্মামী তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা খলীল ইবনে আহমদের মৃত্যুর পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে বললেন ঃ আপনার চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান আমি কাউকে পাইনি। এখন আপনার অবস্থা কি? খলীল

বললেন ঃ আমি যে কাজে ব্যাপৃত ছিলাম তার অবস্থা তো তুমি জেনেছ? এ কলেমাগুলো ছাড়া কোন কিছু আমার জন্যে উপকারী হয়নি–

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তর্কশাস্ত্রে মানুষের মনোযোগী হওয়ার কারণ

প্রকাশ থাকে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে খোলাফায়ে রাশেদীন খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তাঁরা ছিলেন একাধারে আলেমবিল্লাহ (আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী), তাঁর বিধি-বিধান সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়ে ফতোয়া দানের ব্যাপারে পারদর্শী। এ কারণেই ফেকাহবিদদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন তাঁদের কমই হত। কেবল যেসব ব্যাপারে পরামর্শ ছাড়া উপায় ছিল না, সেগুলোতেই ফেকাহবিদদের প্রয়োজন দেখা দিত। এজন্যই আলেমগণ একনিষ্ঠভাবে আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রেই নিয়োজিত ছিলেন এবং তাঁদের অন্য কোন বৃত্তি ছিল না। তাঁরা আইনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং এ নিয়ে বিতর্ক এড়িয়ে চলতেন এবং এ দায়িত্ব একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। তাঁরা সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তা'আলার দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁদের জীবনালেখ্য থেকে এ কথাই জানা যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে এক শ্রেণীর আলেম যোগ্যতা এবং বিধি-বিধান ও ফতোয়া সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান ছাড়াই শাসন কর্তৃত্বের বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তাদেরকে বাধ্য হয়ে ফেকাহবিদদের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় এবং সর্বাবস্থায় তাদেরকে সঙ্গে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তাবেয়ী আলেমগণের মধ্যে যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা প্রথম যুগের রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত, খাঁটি দ্বীনের অনুসারী এবং পূর্বসূরিদের পদাংক অনুসরণকারী ছিলেন। ফলে শাসকবর্গ তাঁদেরকে ডাকলে তাঁরা পালিয়ে ফিরতেন এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতেন। তাই বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের বিভিন্ন পদ দান করার জন্যে শাসকবর্গ আলেমগণকে পীড়াপীড়ি করত। খলীফা, ইমাম ও প্রশাসন সবাই আলেমগণের তোয়াজ করতেন, কিন্তু আলেমগণ তাদের হাতে ধরা দিতেন না। সমসাময়িক লোকেরা যখন আলেমগণের এই সম্মান প্রত্যক্ষ করল, তখন তারা এলেম হাসিল

করার প্রতি মনোনিবেশ করল, যাতে শাসকবর্গের কাছে সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করা যায়। তারা ফতোয়া শাস্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং নিজেদেরকে শাসকবর্গের সামনে উপস্থাপন করল। তাদের সাথে পরিচিত হয়ে বিভিন্ন পদ ও পুরস্কার লাভ করল।

কিছু সংখ্যক তো এর পরেও বঞ্চিত রইল এবং কিছু সংখ্যকের উদ্দেশ্য সফল হল। যারা সফল হল, তারাও চাওয়ার লাঞ্ছনা এবং অনাহূত অবস্থায় দন্ডায়মান হওয়ার অবমাননা থেকে বাঁচতে পারল না। মোট কথা, যে ফেকাহবিদগণ পূর্বে প্রার্থিত ছিল, তারা এখন প্রার্থী হয়ে গেল। পূর্বে যারা শাসকবর্গের হাতে ধরা দিত না এবং সম্মানিত ছিল, এখন তাদের কাছে এসে তারা লাঞ্ছিত হল। কিন্তু এর পরেও যেসব আলেম তওফীকপ্রাপ্ত হলেন, তাঁরা সর্বদাই এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত রইলেন। সে যুগে মানুষের অধিকাংশ মনোযোগ ফতোয়া ও বিচার বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। কেননা, পদ ও শাসনক্ষমতা লাভে এরই প্রয়োজন ছিল বেশী। তাদের পরে আকায়েদের রীতিনীতি সম্পর্কে মানুষের আলোচনা শুনে কিছু সংখ্যক শাসকের মনে কারণসমূহের প্রমাণাদি শুনার আগ্রহ সৃষ্টি হল। জনসাধারণ যখন জানতে পারল, এই শাসকগণ কালাম শাস্ত্রের মোনাযারা ও বিতর্কের প্রতি আগ্রহী, তখন তারা এরই চর্চা শুরু করে দিল। এতে অনেক গ্রন্থ রচিত হল এবং বিতর্কের পদ্ধতি, প্রতিপক্ষের বক্তব্যে আপত্তি উত্থাপনের পন্থা আবিষ্কৃত হল। তারা মনে করল, আল্লাহর দ্বীনের পক্ষ থেকে মন্দ বিষয়সমূহ প্রতিহত করা, সুন্নতের পক্ষ থেকে লড়াই করা এবং বেদআতের মূলোৎপাটন করাই আমাদের লক্ষ্য। যেমন– তাদের পূর্বসূরি ফেকাহবিদগণ বলতেন, তাদের উদ্দেশ্য ফতোয়া উত্তমরূপে জানা এবং মুসলমানদের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধানের দায়িত্ব নেয়া।

এর কিছুকাল পরে এমন শাসকশ্রেণী আগমন করল, যারা কালাম শাস্ত্রের গবেষণা পছন্দের দৃষ্টিতে দেখল না। কারণ, এতে বিতর্কের দ্বার খুলে যাওয়ায় পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ সৃষ্টি হয়। এমনকি, খুনাখুনি এবং জনপদ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু তারা ফেকাহ সম্পর্কিত মোনাযারা, বিশেষতঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রহঃ)-এর মাযহাবের উত্তম বিধান জানার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। সেমতে জনসাধারণ কালাম শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্র বাদ দিয়ে এই ইমামদ্বয়ের মধ্যে

বিরোধীয় মাসআলাসমূহের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ইমাম মালেক, আহমদ ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ)-এর মধ্যেকার মতভেদসমূহের প্রতি তারা তেমন কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেনি। তারা নিজেদের খামখেয়ালীতে একথা বুঝে নেয় যে, তাদের উদ্দেশ্য শরীয়তের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বের করা, দ্বীনের কারণসমূহ সপ্রমাণ করা এবং ফতোয়ার মূলনীতির ভিত্তি স্থাপন করা। এ সম্পর্কে তারা অনেক গ্রন্থ রচনা করে, যাতে নানারকম বিতর্ক লিপিবদ্ধ করা হয়। জনসাধারণ এখন পর্যন্ত এ নীতিই অনুসরণ করে আসছে। জানি না, আমাদের পরবর্তী যমানায় আল্লাহ তা'আলা কি অবধারিত করে রেখেছেন। মোট কথা, মতভেদ ও মোনাযারার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এটাই ছিল কারণ। যদি শাসকশ্রেণী এগুলো ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়, তবে আলেমরাও তাদের অনুগামী হবে এবং এ বাহানা পেশ করা থেকে বিরত হবে না যে, যে শাস্ত্রে তারা মশগুল রয়েছে সেটা ধর্মীয় শাস্ত্র এবং আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য ছাড়া তাদের অন্য কিছু কাম্য নয়।

মোনাযারা

জানা উচিত, একশ্রেণীর আলেম কোন কোন সময় মানুষকে এই বলে বিভ্রান্ত করে যে, তাদের মোনাযারা বা বিতর্ক করার উদ্দেশ্য এমন বিষয়ে আলোচনা, যাতে সত্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। কেননা সত্য কাম্য। চিন্তায় একে অন্যের সাহায্য করা এবং অনেক লোকের ঐকমত্য হওয়া নিঃসন্দেহে উপকারী। সাহাবায়ে কেরামও এ উদ্দেশেই পরস্পর পরামর্শ করতেন। উদাহরণতঃ তাঁরা দাদা বিদ্যমান থাকলে পৌত্রদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, মদ্যপানের শাস্তি, ফরায়েযের মাসআলা ইত্যাদি বিষয়ে পরস্পর পরামর্শ করতেন। ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, মুহাম্মদ, মালেক, আবু ইউসুফ (রহঃ) প্রমুখ ইমাম থেকে বর্ণিত মতভেদও এ বিষয়ে সহায়ক। আমি তোমাকে এ বিভ্রান্তির অন্তর্নিহিত রহস্য বলে দিচ্ছি, সত্য বিষয়ে একে অপরের কাছে সাহায্য চাওয়া অবশ্যই ধর্মসিদ্ধ। কিন্তু এর জন্যে কয়েকটি শর্ত ও আলামত রয়েছে।

প্রথম, মোনাযারা যেহেতু ফরযে কেফায়া। কাজেই যেব্যক্তি ফরযে আইন সমাপ্ত করেনি, তার পক্ষে এতে ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়। যার উপর ফরযে আইন রয়েছে, সে যদি ফরযে কেফায়ায় ব্যাপৃত হয় এবং

বলে, তার উদ্দেশ্য সত্যান্বেষণ, তবে সে মিথ্যাবাদী। সে সে ব্যক্তিরই মত, যে নিজে নামায পড়ে না এবং বস্ত্র বয়নে ব্যাপৃত থেকে বলে ঃ আমার উদ্দেশ্য যারা উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়ে এবং পোশাক পায় না, তাদের সতর আবৃত করা। কেননা, এরূপ হওয়া সম্ভবপর এবং বাস্তবে কখনও এরূপ হয়েও থাকে। যেমন, ফেকাহবিদগণ বলেন, তাদের বিরোধপূর্ণ বিষয়সমূহ বাস্তবে সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর, যদিও কম সংঘটিত হয়। আজ যারা মোনাযারায় ব্যাপৃত থাকে তারা সর্বসম্মতিক্রমে ফরযে আইন বিষয়সমূহ বর্জন করে বসেছে। যদি কারও উপর তাৎক্ষণিকভাবে কোন আমানত আদায় করা ওয়াজেব হয়ে থাকে এবং সে তাতে অবহেলা করার বাহানারূপে নামায পড়তে থাকে, যা বাহ্যতঃ সর্বোত্তম সওয়াবের কাজ, তবে বলাবাহুল্য, এ নামায দ্বারা সে আল্লাহ তাআ'লার নাফরমানই হবে। এ থেকে জানা গেল, আনুগত্যের কোন কাজ করাই মানুষের আনুগত্যশীল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না তাতে সময়, শর্ত ও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য রাখা হয়।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা অপেক্ষা অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ না দেখা। যদি অন্য কোন ফরযে কেফায়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, এরপরও মোনাযারায় ব্যাপৃত হয়, তবে সে নাফরমান হবে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি একদল মানুষকে পিপাসায় কাতর হতে দেখে, কেউ যাদের খবর নেয় না। কিন্তু সে তাদেরকে পানি পান করাতে সক্ষম। এমতাবস্থায় সে পানি পান না করিয়ে যদি শিংগা লাগানোর কৌশল শিক্ষা করতে ব্যাপৃত হয় এবং বলে, এটা শিক্ষা করা ফরযে কেফায়া; শহরে এরূপ কুশলী ব্যক্তি না থাকলে শহরবাসীরা রোগে কষ্ট পাবে। যদি তাকে কেউ বলে, শহরে শিংগা লাগানোর লোক পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে, তবে সে বলে, এতে এ কাজটি যে ফরযে কেফায়া, তা তো বিলুপ্ত হয় না। মোট কথা, যেব্যক্তি এরূপ করে এবং নেহায়েত জরুরী কাজটি করে না, অর্থাৎ পিপাসার্ত মুসলমানদেরকে পানি পান করায় না, তার অবস্থা এ ব্যক্তির মতই, যে মোনাযারাকে ফরযে কেফায়া মনে করে তাতে ব্যাপৃত থাকে এবং অন্য যেসব ফরযে কেফায়া কেউ পালন করে না, তাতে তৎপর হয় না। উদাহরণতঃ ফতোয়ার কথাই বলা যাক, এর জন্যে অনেক লোক রয়েছে। প্রত্যেক শহরে কিছু না কিছু

ফরযে কেফায়া পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। যেমন অধিকাংশ শহরে মুসলমান চিকিৎসক নেই, যার সাক্ষ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে শরীয়তের আইনে গ্রাহ্য হয়। অথচ ফেকাহ্‌বিদদের মধ্যে কারও চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি উৎসাহ নেই।

অনুরূপভাবে সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা একটি ফরযে কেফায়া। যারা মোনাযারা করে, তাদের অধিকাংশই মোনাযারার মজলিসে রেশমী পোশাক অথবা রেশমী ফরাশ বিছানো দেখে। অথচ সে এমন বিষয়ে মোনাযারা করে, যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই। যদিও থাকে, তবে তার বর্ণনাকারী থাকে অনেক। এরপরও তারা বলে, তারা ফরযে কেফায়ায় মশগুল হয়ে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য কামনা করে। হযরত আনাস্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ সঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কখন বর্জিত হবে? তিনি বললেন ঃ "যখন তোমাদের চেয়ে উত্তম লোকদের মধ্যে শৈথিল্য দেখা দেবে, বড়দের মধ্যে নির্লজ্জতা ও ছোটদের মধ্যে রাজত্ব চলে আসবে এবং নীচদের মধ্যে ফেকাহ্ তথা ধর্মীয় জ্ঞান।"

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, যে মোনাযারা করবে তার মুজতাহিদ হতে হবে। অর্থাৎ নিজের অভিমত অনুসারে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আযম (রঃ) প্রমুখের মযহাবের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে ফতোয়া দেবে না। এমনকি, সে যদি সত্য বিষয়টি ইমাম আযমের মযহাব থেকে জানতে পারে, তবে ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য বর্জন করবে এবং সত্য যা জানবে তদনুযায়ী ফতোয়া দেবে। সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণ তাই করতেন। যেব্যক্তি ইজতিহাদের স্তরে উন্নীত হয়, তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হলে সে তার ইমামের উক্তি বর্ণনা করে দেয়। তার ইমামের মযহাবে কিছু দুর্বলতা জানতে পারলে সে তা বর্জন করে না। এরূপ ব্যক্তির মোনাযারায় ফায়দা নেই।

চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, মোনাযারা এমন বিষয়ে করবে, যা হয়ে গেছে অথবা সত্বরই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এমনি ধরনের ঘটনাবলীতে পরামর্শ করেছেন, যা নতুন সংঘটিত হত অথবা প্রায়ই সংঘটিত হত। যেমন, ফরায়েযের বিষয়সমূহ। কিন্তু আজকাল যারা মোনাযারা করে, তাদেরকে এরূপ করতে দেখা যায় না। যেসব ব্যাপারে মানুষ প্রায়ই লিপ্ত হয়, সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে তারা প্রয়াস চালায় না;

বরং এমন ব্যাপার তালাশ করে, যাতে কোন না কোন দিক দিয়ে বিবাদের অবকাশ থাকে। যেসকল ঘটনা সচরাচর ঘটে থাকে, সেগুলো প্রায়ই ছেড়ে দেয়া হয় এবং বলা হয়, এ বিষয়টি হাদীসের সাথে সম্পর্কযুক্ত অথবা এটা নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার। আশ্চর্যের বিষয়, উদ্দেশ্য তো সত্যানুসন্ধান, অথচ হাদীসের দোহাই দিয়ে বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয় অথবা ছোটখাট বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়! সত্য বিষয়ে তো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে অভীষ্টে পৌঁছে যাওয়াই কাম্য হয়ে থাকে। দীর্ঘ আলোচনা কাম্য নয়।

পঞ্চম শর্ত, মজলিসে এবং আমীর ও শাসকদের সামনে মোনাযারা করা অপেক্ষা নির্জনতায় ও একান্তে মোনাযারা করা উত্তম মনে হতে হবে। কেননা, নির্জনতায় সাহস, চিন্তা-ভাবনা একত্রিত ও পরিষ্কার থাকে এবং সত্য বিষয় দ্রুত অনুধাবন করা যায়। পক্ষান্তরে লোকজনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং প্রত্যেকেই নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে উৎসাহী হয়ে যায়– সত্যপন্থী হোক কিংবা মিথ্যাপন্থী। সকলেই জানে, এখন মোনাযারাকারীরা মজলিস ও জনগণের সমাবেশেই বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে অধিক আগ্রহী। একজন অন্যজনের সাথে বহু দিন থাকে, কিন্তু একান্তে কোন বক্তৃতা দেয় না; কিংবা একজন কিছু জিজ্ঞেস করলে অন্যজন জওয়াব দেয় না। যদি কোন আমীর ব্যক্তি উপস্থিত থাকে অথবা জনসমাগম হয়, তবে বক্তৃতার কোন দিক বাকী রাখে না, যাতে প্রমাণিত হয়, সে একজন জবরদস্ত বক্তা।

ষষ্ঠ শর্ত, সত্য বিষয়ের অন্বেষণে এমন অবস্থা হতে হবে, যেমন কেউ হারানো বস্তু অন্বেষণ করে। হারানো বস্তুটি তার হাত দিয়ে পাওয়া যাক বা অন্যের হাত দিয়ে– তাতে কোন পার্থক্য থাকে না। বিতর্কে নিজেকে প্রতিপক্ষের সাহায্যকারী মনে করতে হবে; বিপরীত ও শত্রুপক্ষ নয়। সে ভ্রান্তি প্রকাশ করে দিলে অথবা সত্য বিষয় বলে দিলে তার কাছে কৃতজ্ঞ হবে। উদাহরণতঃ হারানো বস্তুর অন্বেষণে যদি কেউ এক পথে চলতে থাকে এবং অন্য এক ব্যক্তি তাকে অন্য সড়কে যেতে বলে, তবে সে সেই ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ধন্যবাদ জানায়। তাকে মন্দ বলে না; বরং তার প্রতি খুশী হয়। সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শের অবস্থা তাই ছিল। সেমতে এক মহিলা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষণের মধ্যে বাধা দিয়ে তাঁকে সত্য বিষয় অবগত করালে তিনি বললেন ঃ মহিলা ঠিক বলছে এবং পুরুষ

(অর্থাৎ, আমি) ভুল করেছি। অন্য এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি তার জওয়াব দিলেন। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমিনীন, মাসআলাটি এরূপ নয়; বরং এরূপ। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ তোমার কথাই ঠিক। আমি ভুল করেছি। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরও জ্ঞানী রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে সে কথা বলে দিলেন যা থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। তখন আবু মূসা বললেন ঃ যতদিন এ আলেম তোমাদের মধ্যে রয়েছেন, ততদিন আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। ঘটনাটি এই ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করল এবং মারা গেল। তার কি অবস্থা হবে? তিনি বললেন ঃ 'সে জান্নাতে থাকবে।' তখন আবু মূসা (রাঃ) কূফার শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রশ্নকারীকে বললেন ঃ আমীরকে পুনরায় জিজ্ঞেস কর। সম্ভবতঃ তিনি তোমার প্রশ্ন বুঝেননি। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন। আমীর আবারও একই জওয়াব দিলেন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেন ঃ আমি বলি, যদি সে মারা যায় এবং সত্যে পৌছে থাকে, তবে জান্নাতী হবে। হযরত আবু মূসা বললেন ঃ আপনার কথাই ঠিক। বাস্তবে সত্যান্বেষী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ ন্যায়সঙ্গত কথাই বলা উচিত। আজকাল এ ধরনের কথা কোন সামান্য ফেকাহবিদের কাছে কেউ বর্ণনা করলেও সে মানবে না; বরং বলবে– এ মাসআলায় সত্যে পৌছার কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এটা সবাই জানে। মোট কথা আজকালকার মোনাযারাকারীদেরকে লক্ষ্য কর, যদি প্রতিপক্ষের মুখ দিয়ে সত্য প্রকাশ পায়, তবে তাদের মুখমণ্ডল কেমন কাল হয়ে যায়। এরপর গোপনে গোপনে যতদূর সম্ভব, এ সত্য অস্বীকার করার চেষ্টা করে। যেব্যক্তি তাদেরকে অভিযুক্ত করে, তারা সারা জীবন তার নিন্দা চর্চা করতে থাকে। তার পরও মোনাযারায় নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ বলতে তাদের লজ্জা করে না।

সপ্তম শর্ত, মোনাযারায় শরীক ব্যক্তি যদি এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণের দিকে যায় এবং এক আপত্তির বদলে অন্য আপত্তি পেশ করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া উচিত নয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মোনাযারা এরূপই হত। বিতর্কের নবাবিষ্কৃত সূক্ষ্ম বিষয়াদি তাদের মোনাযারায় অনুপস্থিত ছিল। কেননা, সত্য বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সর্বদাই

মিথ্যার বিপরীত হয়ে থাকে। আর সত্য বিষয় কবুল করা ওয়াজেব। অথচ মোনাযারার মজলিসে দেখা যায়, সারাক্ষণ একে অপরের কথা খণ্ডনে এবং বিবাদ বিসম্বাদে লিপ্ত থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি তার ধারণায় কোন মূল বিধানের একটি কারণ বর্ণনা করলে অন্য ব্যক্তি জওয়াব দেয় ঃ মূল বিষয়ে এ বিধান হওয়ার কারণ এটিই, এর প্রমাণ কি? উত্তরে সে বলে ঃ আমার তো তাই মনে হয়। তুমি যদি অন্য কোন সুস্পষ্ট কারণ জান, তবে বর্ণনা কর। আমিও ভেবে দেখব। এরপর আপত্তিকারী পীড়াপীড়ি করে বলে ঃ কারণ অন্যটি; আমি তা জানি কিন্তু বলব না। কেননা, বলা আমার জন্যে জরুরী নয়। এরপর পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও সে তা বর্ণনা করে না এবং মোনাযারার মজলিসে হট্টগোল হতে থাকে। আপত্তিকারী ব্যক্তি বুঝে না যে, 'আমি জানি কিন্তু বলব না'– তার একথা 'শরীয়ত বিরোধী' মিথ্যার নামান্তর। কেননা, যদি বাস্তবে কারণটি তার অজানা থাকে এবং কেবল প্রতিপক্ষকে অপারগ করে দেয়ার জন্যে জানার দাবী করে, তবে সে ফাসেক, মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্র নাফরমান এবং তাঁর ক্রোধের পাত্র। পক্ষান্তরে যদি সে আপন দাবীতে সত্যবাদী হয়, তবুও সে ফাসেক। কারণ, সে একটি জানা শরীয়তগত বিষয় গোপন করে। অথচ তার মুসলমান ভাই তা জেনে চিন্তাভাবনা করার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস করছে। এটা সর্ববাদিসম্মত কথা যে, মানুষ ধর্মের যা কিছু জানে, কারও জিজ্ঞাসার পর তা বলা ও প্রকাশ করা ওয়াজেব। এখন সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ ও পূর্ববর্তী আলেমগণের বক্তব্য দেখে বিচার করা দরকার, তাদের মধ্যে এ ধরনের বিষয় শুনা গেছে কি? তাদের কেউ কখনও এক প্রমাণ থেকে অন্য প্রমাণে যেতে নিষেধ করেছেন কি? তারা কি কিয়াস ছেড়ে সাহাবীর উক্তি অবলম্বন করতে এবং হাদীস ছেড়ে আয়াত অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন? তাঁদের সকল মোনাযারা এমন হত যে, তাঁরা অন্তরে যা চিন্তা করেছেন, মুখে হুবহু তা বর্ণনা করেছেন, অতঃপর তা নিয়ে সকলে মিলে চিন্তাভাবনা করেছেন।

অষ্টম শর্ত, মোনাযারা এমন ব্যক্তির সাথে করতে হবে, যার কাছ থেকে উপকার আশা করা যায় এবং যে জ্ঞানের বিষয়ে ব্যাপৃত। আজকাল প্রায়শঃ দেখা যায়, যারা মোনাযারা করে তারা বড় বড় আলেমের সাথে মোনাযারা করতে ভয় পায়। আশংকা এই করা হয় যে, সত্য বিষয় তার মুখ দিয়ে বের হয়ে পড়লে মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা ফাঁস হয়ে

পড়বে। ফলে যারা অজ্ঞানী তাদের সাথে মোনাযারা করার উৎসাহ বেশী দেখা যায়, যাতে তাদের সামনে বাতিলকেই সপ্রমাণ করা যায়।

মোনাযারার এই আটটি শর্ত ছাড়া আরও অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শর্ত রয়েছে, কিন্তু এই আটটি শর্ত দ্বারাই তুমি মোনাযারাকারীর প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যে মোনাযারা করে না অন্য কোন কারণে। সারকথা, শয়তান মানুষের অন্তরকে ঘিরে রেখেছে। বাস্তবে শয়তান হল মানুষের সর্ববৃহৎ দুশমন ও ধ্বংসকামী। যেব্যক্তি এই শয়তানের সাথে মোনাযারা করে না এবং অন্য লোকের সাথে এমন বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মোনাযারায় প্রবৃত্ত হয়, যাতে ইজতিহাদকারী সত্য বিষয়ে পৌঁছে অথবা সত্য বিষয়ে পৌঁছার সওয়াবে অংশীদার হয়, সে শয়তানের ক্রীড়নক এবং খাঁটি লোকদের জন্যে একটি শিক্ষা।

মোনাযারা থেকে উদ্ভূত বিপদ

প্রকাশ থাকে যে, নিজে প্রবল হওয়া, অপরকে নিশ্চুপ করা, নিজের গুণগরিমা প্রকাশ করা, মানুষের মধ্যে শুদ্ধভাষিতা, বাগ্মিতা ও গর্ব প্রদর্শন করা এবং মানুষের মন নিজের দিকে আকৃষ্ট করা ইত্যাদি হীন উদ্দেশে যে মোনাযারা করা হয়, তা আল্লাহ তাআলার কাছে নিন্দনীয় ও শয়তানের কাছে প্রশংসনীয় বদঅভ্যাসসমূহের উৎস হয়ে থাকে। অহংকার, হিংসা, আত্মম্ভরিতা, লোভ-লালসা, জাঁকজমকপ্রিয়তা ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ অনিষ্টের সম্পর্ক মোনাযারার সাথে এমন, যেমন যেনা, গালি-গালাজ, হত্যা, চুরি ইত্যাদি বাহ্যিক অনিষ্টের সম্পর্ক মদ্যপানের সাথে। কোন ব্যক্তিকে মদ্যপান এবং এসব কুকর্ম করার ক্ষমতা দেয়া হলে যেমন সে মদ্যপানকে সামান্য মনে করে তা করে বসবে, এরপর মাতাল অবস্থায় অবশিষ্ট কুকর্মগুলো করে ফেলবে, তেমনি যার মনে অপরকে নিশ্চুপ করার আগ্রহ, মোনাযারায় জয়ী হওয়ার বাসনা এবং জাঁকজমক ও অহংকারপ্রীতি প্রবল থাকে, তার মনে সকল প্রকার লুকিয়ে থাকে এবং যাবতীয় বদভ্যাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। হাদীস ও কোরআনের আলোকে আমরা এসব বদভ্যাসের নিন্দা তৃতীয় খন্ডে বর্ণনা করব। এখানে কেবল এমন কতিপয় বদভ্যাস বর্ণিত হচ্ছে, যেগুলো মোনাযারা থেকে উদ্ভূত হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হিংসা। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

الحسد يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ـ

"হিংসা সৎকর্মসমূহকে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।"

যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে হিংসা থেকে মুক্ত হয় না। কারণ, সে কখনও জয়ী হয় এবং কখনও পরাভূত হয়। কখনও তার যুক্তির প্রশংসা করা হয় আবার কখনও প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রশংসিত হয়। যে পর্যন্ত পৃথিবীতে এক ব্যক্তিও এমন থাকবে, যে জ্ঞান গরিমা ও মোনাযারায় স্বনামখ্যাত অথবা মোনাযারাকারীর ধারণায় তার যুক্তিই অধিক শক্তিশালী, সে পর্যন্ত অবশ্যই সে হিংসা পোষণ করবে, প্রতিপক্ষের কাছ থেকে ফিরে কেবল মোনাযারাকারীর দিকে আকৃষ্ট হোক এমনটা পছন্দ করবে। সত্য বলতে কি, হিংসা একটি জ্বলন্ত আগুন। যে এতে লিপ্ত হয়, সে দুনিয়াতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে কালাতিপাত করে। আখেরাতের আযাব আরও বেশী ভয়ংকর। তাই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ জ্ঞান যেখানেই পাও, অর্জন কর। ফেকাহবিদদের যেসকল উক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে, সেগুলো গ্রহণ করো না। তারা পালের ছাগলের ন্যায় লড়াই করে।

দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে অহংকার করা। এ সম্পর্কে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ "যেব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করেন। আর যে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উঁচু করেন।"

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

العظمة ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى واحدا فيهما قصمته ـ

"মাহাত্ম্য আমার পরিধেয় এবং বড়ত্ব আমার চাদর। যেব্যক্তি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোন একটিতে আমার সমকক্ষতার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেই।"

মোনাযারাকারীরা তাদের সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের লোকদের সাথে অহংকার, বড়ত্ব অন্বেষণ এবং আপন যোগ্যতার চেয়ে বড় আসন লাভের বাসনা থেকে মুক্ত থাকে না। এমনকি, সভাপতির আসনের

নিকটে অথবা দূরের জায়গায় বসার জন্যে পর্যন্ত লড়াই করে এবং পথ সংকীর্ণ হলে আগে যাওয়ার জন্যে খুনাখুনিতে লিপ্ত হয়। মাঝে মাঝে তাদের কতক অনভিজ্ঞ ও প্রতারক ব্যক্তি বলে থাকে, এলেমের ইযযত রক্ষা করাই তাদের লক্ষ্য। ঈমানদার ব্যক্তি নিজেকে লাঞ্ছিত করতে পারে না। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এই বাহানায় তারা বিনয়কে লাঞ্ছনা বলে মনে করে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা ও পয়গম্বরগণ বিনয়ের প্রশংসা করেছেন। যে অহংকার আল্লাহ্ তাআলার কাছে নিন্দনীয়, তারা তাকে ধর্মের সম্মানরূপে আখ্যায়িত করে এবং শব্দ পরিবর্তন করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এটা এলেম ও হেকমত শব্দকে পরিবর্তন করে অন্য অর্থ করারই মত।

আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। খুব কম মোনাযারাকারীই এ দোষ থেকে মুক্ত থাকে। অথচ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ "ঈমানদার ব্যক্তি পরশ্রীকাতর হতে পারে না।" এর নিন্দায় অনেক কিছু বর্ণিত আছে। মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন কাউকে দেখে যে, সে প্রতিপক্ষের কথায় মাথা নাড়ে এবং তার কথা ভালরূপে শুনে না, তখন সে উদ্বিগ্ন হয় এবং তার প্রতি পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে।

আর একটি কুঅভ্যাস হচ্ছে গীবত তথা পরনিন্দা। আল্লাহ্ তাআলা একে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। মোনাযারাকারী ব্যক্তি এরূপ মাংস ভক্ষণেই অভ্যস্ত হয়ে থাকে। সে সর্বদা প্রতিপক্ষের কথাবার্তা উদ্ধৃত করে তার নিন্দা করে। সে চরম সাবধানী হলে এটা করে যে, প্রতিপক্ষের কথা সত্য সত্য বর্ণনা করে– মিথ্য বলে না, কিন্তু এতেও এমন কথা বর্ণনা করে না, যদ্দ্বারা তার দোষ, হেরে যাওয়া এবং মানহানি ঘটতে পারে। বলাবাহুল্য, এ ধরনের আলোচনা গীবতেরই অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মিথ্যা বলে, তবে সেটা তো পুরোই অপবাদ, যা গীবত থেকেও জঘন্য।

অপর একটি বদভ্যাস হচ্ছে আত্মপ্রশংসা। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى -

তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে মোত্তাকী সেটা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। জনৈক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ মন্দ সত্য কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ আত্মপ্রশংসা করা। যেব্যক্তি মোনাযারা করে, সে শক্তি-সামর্থ্য

ও সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্বে অগ্রণী হওয়ার ব্যাপারে নিজের প্রশংসা নিজেই করে থাকে। বরং মোনাযারার মাঝখানে বলে উঠে– এ ধরনের বিষয় আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। এগুলো আমার নখদর্পণে। আমি হাদীস ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী। সে এমনি ধরনের আরও অনেক কথাবার্তা কখনও আস্ফালনের ছলে এবং কখনও নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার উদ্দেশে বলে থাকে। বলাবাহুল্য, আস্ফালন এবং দর্প প্রদর্শন করা শরীয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ।

ছিদ্রান্বেষণও মোনাযারা থেকে উদ্ভূত একটি কুঅভ্যাস। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَا تَجَسَّسُوا। তোমরা ছিদ্রান্বেষণ করো না। মোনাযারাকারী ব্যক্তি প্রতিপক্ষের ত্রুটিবিচ্যুতি ও দোষ অন্বেষণ করে ফিরে। এমনকি, তার শহরে কোন মোনাযারাকারীর আগমনের সংবাদ পেলে সে এমন ব্যক্তির খোঁজ করে, যে তার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে দিতে পারে। সে তাকে জিজ্ঞেস করে করে দোষ জেনে নেয় এবং প্রয়োজনে সেগুলো প্রকাশ করে প্রতিপক্ষকে লজ্জা দেয়। এমনকি, তার শৈশবকালীন অবস্থা এবং দৈহিক দোষ যেমন টেকো হওয়া ইত্যাদিও জেনে নেয়। এর পর মোনাযারার সময় তাকে সামান্যও প্রবল হতে দেখলে প্রথমে সম্ভ্রমের খাতিরে ইশারা ইঙ্গিতে সেসব দোষ বর্ণনা করে। অন্যরাও এ বিষয়টি পছন্দ করে এবং স্বয়ং মোনাযারাকারী এক একটি সূক্ষ্ম অস্ত্ররূপে গণ্য করে। পক্ষান্তরে দুর্মুখ হলে প্রকাশ্যে ও স্পষ্ট ভাষায় সেসব দোষ উল্লেখ করতে দ্বিধা করে না।

অপরের দুঃখে আনন্দিত হওয়া এবং আনন্দে দুঃখ করাও একটি বদ অভ্যাস, যা মোনাযারাকারীর মধ্যে পাওয়া যায়। অথচ যে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে, মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে না, সে ঈমানদারদের চরিত্র থেকে বহু মনযিল দূরে অবস্থান করে। অতএব যেব্যক্তি গুণগরিমা প্রকাশ করে গর্ব করে, তার কাছে অবশ্যই তা ভাল লাগবে, যা তার সমকক্ষ ও গুণগরিমায় অংশীদারদের কাছে খারাপ লাগে। তাদের মধ্যে এমন শত্রুতা হবে, যেমন সতীনদের মধ্যে হয়ে থাকে। এক সতীন দূর থেকে অপর সতীনকে দেখে যেমন ক্ষেপে উঠে এবং মলিন হয়ে যায়, তেমনি মোনাযারাকারী ব্যক্তি যখন অপরকে দেখে, তখন তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা এসে যায়; যেন

সামনে ভূত এসে গেছে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর সম্মুখীন হয়ে গেছে। তাদের মধ্যে সে মহব্বত ও মুখ কোথায়, যা খাঁটি আলেমগণের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় হয়ে থাকে? যেরূপ ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি ও সুখে দুঃখে শরীক থাকার কথা আলেমগণ থেকে বর্ণিত আছে, তা তাদের মধ্যে কোথায়? এমনকি, শাফেয়ী (রঃ) বলেন ঃ গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একটি নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। এখন আমরা জানি না, যাদের মধ্যে এলেম ও শিক্ষা একটি চূড়ান্ত শত্রুতার কারণ হয়ে গেছে, তারা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মযহাব অনুসরণের দাবী করে কিরূপে? এটা কিরূপে সম্ভব, গর্ব, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মহব্বত ও সম্প্রীতি কায়েম থাকবে? এটা কখনও হতে পারে না। এ মোনাযারা যে মন্দ, তা জানার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, মোনাযারা তোমার কাছ থেকে মুমিনদের অভ্যাস ছাড়িয়ে নিয়ে মোনাফিকদের অভ্যাসের সাথে তোমাকে জড়িয়ে দেয়।

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে নেফাক তথা কপটতা। এর অনিষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ নয়। যারা মোনাযারা করে, তাদের কপটতাও করতে হয়। উদাহরণতঃ প্রতিপক্ষ অথবা তার বন্ধু ও অনুসারীদের সাথে সাক্ষাত হলে অপারগ হয়ে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা হয়, তাদের প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করা হয় এবং তাদের মর্তবায় বিশ্বাস প্রকট করা হয়। অথচ বক্তা নিজে ও সম্বোধিত ব্যক্তি এবং অন্য যারা শুনে, সকলেই জানে, এ সব বানোয়াট, প্রতারণা, মিথ্যা ও দুষ্কর্ম বৈ কিছু নয়। বাহ্যতঃ মুখে বন্ধু হলেও আন্তরিকভাবে একে অপরের শত্রু। আল্লাহ তাআলা এহেন বদভ্যাস থেকে আপন আশ্রয়ে রাখুন।

নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ যখন মানুষ এলেম শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয় এবং মুখে বন্ধু হয়ে থাকে, কিন্তু অন্তরে পরস্পরের শত্রু হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেন, তাদেরকে বধির করে দেন এবং তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলোপ করেন। অভিজ্ঞতার আলোকেও অবশ্যই এমনটি হতে দেখা গেছে।

আরেকটি বদভ্যাস হচ্ছে সত্য কথার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ ও সে সম্পর্কে লড়াই করার স্পৃহা। মোনাযারাকারীদের কাছে সর্বাধিক মন্দ

বিষয় হচ্ছে প্রতিপক্ষের মুখ থেকে সত্য প্রকাশ পাওয়া। এরূপ হলে মোনাযারাকারী তা অস্বীকার করা ও না মানার জন্যে সাধ্যানুযায়ী উঠে পড়ে লেগে যায় এবং যতদূর সম্ভব তা প্রতিহত করার জন্যে ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। ফলে সত্য বিষয়ে লড়াই করা তার মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়। যখনই কোন কথা কানে পড়ে, তখনই তাতে আপত্তি তোলার কথা ভাবতে থাকে। ক্রমশঃ এ বিষয়টি কোরআন পাকের দলীলসমূহে এবং শরীয়তের ভাষায়ও তার মনে প্রবল হয়ে যায়। সে এক দলীলের মোকাবিলা অন্য দলীল দ্বারা করে। অথচ বাতিলের মোকাবিলায়ও লড়াই ঝগড়া করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا فى اعلى الجنة.

যেব্যক্তি বাতিলপন্থী হয়ে ঝগড়া বর্জন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতের এক কোণে গৃহ নির্মাণ করেন। আর যেব্যক্তি সত্যপন্থী হয়ে কলহ বর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি গৃহ নির্মাণ করেন।

আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং তাঁর নিজের উপর মিথ্যা বলা এবং সত্য বিষয় মিথ্য প্রতিপন্ন করাকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। সেমতে তিনি বলেন ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ.

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর উপর মিথ্যা গড়ে এবং সত্য বিষয়কে তার কাছে আসার পর মিথ্যা বলে জাহির করে।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ.

সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণ দেয় এবং সত্য আসার পর তাকে মিথ্যা বলে?

আর একটি বদভ্যাস হচ্ছে রিয়া তথা লোক দেখানো ভাব। এটা অধিক দুরারোগ্য ব্যাধি। এর দ্বারা সর্ববৃহৎ কবীরা গোনাহ প্রকাশ পায়। এ সম্পর্কে রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

বর্ণিত দশটি আভ্যন্তরীণ দোষই সকল অনিষ্টের মূল। সম্ভ্রমশীল নয়- এমন লোকদের মধ্যেযেসব অনিষ্ট হয়ে যায়,সেগুলো এর অতিরিক্ত। উদাহরণতঃ এমনভাবে বিতর্ক করা যে, হাতাহাতি, ঠেলাঠেলি, কিলঘুষি, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, পিতামাতাকে ও ওস্তাদদেরকে মন্দ বলা এবং গালিগালাজ করার উপক্রম হয়ে যায়। এ ধরনের লোক মনুষ্যত্বের গণ্ডির বাইরে। যারা বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রমশীল, তাদের মধ্যে এ দশটি অনিষ্ট অবশ্যই থাকে। হাঁ, মাঝে মধ্যে কোন মোনাযারাকারী এগুলোর মধ্যে কতক বদভ্যাস থেকে বেঁচেও থাকে, যদি তার প্রতিপক্ষ তার চেয়ে নিম্নস্তরের হয় অথবা অনেক বেশী উঁচু স্তরের হয়, অথবা তার শহর থেকে দূরে বসবাস করে। আর যার প্রতিপক্ষ সমকক্ষ, নিকটে বসবাসকারী ও সমস্তরের হয়, সে এই দশটি বদভ্যাস থেকে মুক্ত হয় না। এ দশটি বদভ্যাস থেকে আরও দশটি কুকাণ্ড প্রকাশ পায়, যার প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ দীর্ঘ মনে করে আমরা এখানে উল্লেখ করছি না। উদাহরণতঃ নাক সিঁট্কানো, রুষ্টতা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, জাঁকজমক, আস্ফালন, ধনী ও সরকারী কর্মচারীদের সম্মান এবং তাদের কাছে আসা-যাওয়া, তাদের হারাম ধন সম্পদ গ্রহণ, নিষিদ্ধ পোশাকে সজ্জিত হওয়া, গর্ব অহংকারভরে অপরকে হেয় মনে করা, বেশী কথা বলা, মন থেকে ভয় ও আশা তিরোহিত হওয়া, এমন গাফেল হওয়া যে, নামাযে দাঁড়িয়ে কত রাকআত পড়েছে এবং কি পড়েছে তা মনে না থাকা, কার কাছে মোনাজাত করছে, তাও বোধশক্তিতে না থাকা। মোনাযারাকারী ব্যক্তি সারাজীবন মোনাযারা সম্পর্কিত এলেমের মধ্যে ডুবে থাকে এবং উত্তম বাক্য বলা, ছন্দপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা, বিরল কথাবার্তা স্মরণ করা ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকে। অথচ এগুলো আখেরাতে কোন উপকারে আসবে না। মোনাযারাকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। তাদের মধ্যে যেব্যক্তি অধিক ধার্মিক ও জ্ঞানী, তার মধ্যেও এসব বদভ্যাসের উপকরণ সঞ্চিত থাকে। সে মোজাহাদার মাধ্যমে একে গোপন রাখে। এই খারাপ অভ্যাসগুলো সে ব্যক্তির মধ্যেও বিদ্যমান থকে, যে ওয়াজ নসীহতে মশগুল থাকে, যদি ওয়াজ দ্বারা তার উদ্দেশ্য জনপ্রিয়তা অর্জন এবং ধন-দৌলত ও সম্মান অর্জন করা হয়।

যদি কোন ব্যক্তি বিচারকের পদ লাভ, ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী হওয়া এবং সমকক্ষদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার উদ্দেশে এলেম, মযহাব ও ফতোয়ায় নিয়োজিত থাকে, তবে তার মধ্যে এসব অভ্যাস অপরিহার্যরূপে পাওয়া যাবে। মোট কথা, যেব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব ছাড়া অন্য কিছুর উদ্দেশে আলেম হবে, তার মধ্যেই এ সমস্ত বদভ্যাস পাওয়া যাবে। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কিয়ামতে মানুষের মধ্যে কঠোরতর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ্ তাআলা তার এলেম দ্বারা কোন উপকার পৌঁছাননি। এক্ষেত্রে তার এলেম উপকার না করে বরং ক্ষতি করেছে। যে এলেম অন্বেষণ করে তার অবস্থা সে ব্যক্তির মত, যে দুনিয়াতে রাজত্ব অন্বেষণ করে। যদি ঘটনাক্রমে রাজত্ব না পায় তবে আশা করা যায় না যে, সে অন্য লোকদের মত বেঁচে থাকবে; বরং তাকে অবশ্যই বড় বড় লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হবে। যদি বল, মোনাযারার অনুমতি দেয়ার মধ্যে উপকারিতা রয়েছে, এতে এলেম অন্বেষণের প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হয়, যা না থাকলে এলেম মিটে যাবে। তবে আমি বলব, তোমার এ কথা এক দিক দিয়ে ঠিক, কিন্তু উপকারী নয়। কারণ ছেলেদেরকে খেলার বল, ডাংগুলি ও খেলাধুলার প্রতিশ্রুতি না দিলে তারা মক্তবের প্রতি আগ্রহী হয় না। এতে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী হওয়া উত্তম হয়ে যায় না। এমনিভাবে জাঁকজমকপ্রীতি না হলে এলেম মিটে যাবে– এ বাক্য এ কথা বুঝায় না যে, যেব্যক্তি জাঁকজমক অন্বেষণ করবে, সে মুক্তি পাবে। বরং সে তো তাদেরই একজন যাদের সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله ليؤيد هذا الدين باقوام لا خلاق لهم -

"আল্লাহ্ তাআলা এমন লোকের মাধ্যমেও এ দ্বীনকে শক্তিশালী করেন, যাদের দ্বীনে কোন অংশ নেই।"

অন্যত্র বলেন ঃ

ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر -

"আল্লাহ তা'আলা পাপাচারী ব্যক্তির মাধ্যমে এ দ্বীনকে শক্তি দান করেন।"

এ থেকে জানা গেল, যারা জাঁকজম প্রিয়, তারা নিজেরা তো ধ্বংস

হয় বটে, কিন্তু কখনো কোন সময় তাদের দ্বারা অন্যদের মঙ্গল হয়, যদি তারা অন্যদেরকে সংসার বর্জনের আহ্বান জানায়। এটা এরূপ নেতাদের মধ্যে হয়, যাদের অবস্থা বাহ্যতঃ পূর্ববর্তী মনীষীগণের বাহ্যিক অবস্থার অনুরূপ হয়; কিন্তু অন্তরে জাঁকজমকপ্রিয়তা লুক্কায়িত থাকে। তাদের দৃষ্টান্ত মোমবাতির মত। সে নিজে জ্বলে পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কিন্তু অন্যেরা তার কাছ থেকে আলো লাভ করে। অর্থাৎ, এই নেতাদের ধ্বংসের মাধ্যমে অন্যদের মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু যদি কোন নেতা সংসার অন্বেষণে উৎসাহ দেয়, তবে তাকে জ্বলন্ত অগ্নি মনে করতে হবে, সে নিজে প্রজ্বলিত এবং অপরকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়।

মোট কথা, আলেমগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত- (১) যারা নিজেরাও ধ্বংস হবে এবং অপরকেও ধ্বংস করবে। তারা এমন আলেম, যারা প্রকাশ্যে দুনিয়া অন্বেষণ করে এবং দুনিয়ার প্রতি মনোনিবেশ করে। (২) যারা নিজেরাও ভাগ্যবান এবং অপরকেও ভাগ্যবান করে। তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে যাহের ও বাতেন উভয় ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি আহ্বান করে। (৩) যারা নিজেরা ধ্বংস হবে; কিন্তু অপরকে ভাগ্যবান করে। তারা এমন আলেম, যারা মানুষকে আখেরাতের দিকে আহ্বান করে এবং বাহ্যতঃ নিজেরাও সংসার নির্লিপ্ত; কিন্তু তাদের অন্তরে মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাঁকজমকের বাসনা লুক্কায়িত থাকে। এখন তুমি নিজের ব্যাপারে চিন্তা কর, কোন্ শ্রেণীতে রয়েছ এবং কিসের উপকরণ সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছ- দুনিয়ার না আখেরাতের? এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি আল্লাহ্র জন্যে খাঁটি নয়, আল্লাহ্ তাকে কবুল করবেন। ইনশাআল্লাহ্ আমরা রিয়া অধ্যায়ে বরং গোটা তৃতীয় খণ্ডে এমন আলোচনা করব, যাতে তুমি নিঃসন্দেহ হয়ে যাবে।
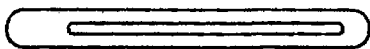
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আদব

শিক্ষার্থীর আদব অনেক হলেও সেগুলো মোটামুটি দশ ভাগে বিভক্ত। প্রথম আদব, শিক্ষার্থী নিজেকে হীন চরিত্র ও মন্দ অভ্যাস থেকে পবিত্র রাখবে। কেননা, শিক্ষা হচ্ছে অন্তরের এবাদত, আভ্যন্তরীণ সংশোধন এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায়। বাহ্যিক এবাদত নামায যেমন বাহ্যিক নাপাকী থেকে বাহ্যিক পবিত্রতা ছাড়া দুরস্ত হয় না, তেমনি আভ্যন্তরীণ এবাদত অর্থাৎ, এলেম দ্বারা অন্তরের এবাদতও মন্দ চরিত্র এবং নাপাক অভ্যাস থেকে পাক হওয়া ছাড়া দুরস্ত হয় না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ بنى الدين على النظافة অর্থাৎ, ধর্ম-কর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ ـ

অর্থাৎ, মুশরিকরা নাপাক। এতে বুদ্ধিমানদের অবহিত করা হয়েছে যে, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই নির্ভরশীল নয়, যা চোখে পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ মুশরিকরা গোসলও করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়ও পরিধান করে, অথচ তাদের অভ্যন্তরভাগ নাপাক থাকে। নাপাকী এমন বিষয়কে বলে, যা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। আভ্যন্তরীণ নাপাকী থেকে বেঁচে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ নাপাকী পরিণামের দিক দিয়ে মারাত্মক। এ জন্যেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ لايدخل الملائكة بيتا فيه كلب ـ

"যে গৃহে কুকুর রয়েছে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।"

অন্তর মানুষের একটি গৃহ, যাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত, প্রভাব ও অবস্থান হয়ে থাকে। ক্রোধ, কামনা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি হচ্ছে ক্ষ্যাপা কুকুর সদৃশ। অতএব অন্তরে যদি এসব কুকুর থাকে, তবে তাতে ফেরেশতাদের যাতায়াত কিরূপে হবে।। শিক্ষার নূরও আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের মাধ্যমে অন্তরে পৌছান। সেমতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ـ

অর্থাৎ কোন মানুষের যোগ্যতা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা যবনিকার অন্তরাল থেকে পাঠিয়ে দেন তিনি কোন পয়গামবাহক; সে তাঁর আদেশে যা ইচ্ছা পৌঁছে দেয়।

অনুরূপভাবে জ্ঞান সংক্রান্ত রহমতের দায়িত্বেও ফেরেশতাগণ নিয়োজিত। তারা নিন্দনীয় অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পাক পবিত্র। সুতরাং তারা পাক জায়গাই দেখে এবং তাদের কাছে রক্ষিত আল্লাহ্ তাআলার রহমতের ভাণ্ডার পবিত্র অন্তরেই ভরে দেয়। আমরা একথা বলি না যে, উল্লিখিত হাদীসে গৃহের অর্থ অন্তর এবং কুকুরের অর্থ ক্রোধ ও নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ বোঝানো হয়েছে। এরূপ বললে বাতেনিয়া সম্প্রদায় আপত্তি করবে, তোমরা আমাদেরকে যা করতে নিষেধ কর, এখন নিজেরাই তা করছ। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ হাদীসে এ বিষয়টির প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। বাহ্যিক শব্দ পরিবর্তন করে আভ্যন্তরীণ অর্থ গ্রহণ এক কথা এবং বাহ্যিক অর্থ বহাল রেখে আভ্যন্তরীণ অর্থের প্রতি হুশিয়ারী অবলম্বন ভিন্ন কথা। দ্বিতীয়টি জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি। আলেম ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের এটাই নিয়ম। কেননা, জ্ঞানার্জনের অর্থ হল, যে বিষয় অন্যদেরকে বলা হয় তা কেবল তাদের মধ্যেই সীমিত না রাখা; বরং নিজেও তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করা। যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্যের উপর বিপদ দেখে, তবে সে একে নিজের জন্যে শিক্ষা মনে করে এবং সেও বিপদের লক্ষ্য হতে পারে বলে বুঝে নেয়। কারণ, দুনিয়াতে পরিবর্তন হতেই থাকে। সুতরাং অন্যের অবস্থা দেখে নিজের দিকে খেয়াল করা এবং দুনিয়া সম্পর্কে চিন্তা করা একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা।

অনুরূপভাবে মানব নির্মিত গৃহ থেকে তুমিও অন্তরের দিকে খেয়াল কর, যা আল্লাহ্ তাআলার একটি গৃহ বিশেষ। কুকুর তার মন্দ অভ্যাস অর্থাৎ, হিংস্রতা ও অপবিত্রতার কারণে নিন্দনীয়– আকার আকৃতির কারণে নয়। তুমি কুকুর থেকে তার হিংস্রতার ধ্যান কর এবং জেনে নাও, যে অন্তর ক্রোধ, লোভ-লালসা, দুনিয়ার জন্যে কলহ-বিবাদ এবং ধন-সম্পদের জন্যে মানুষকে অপমান করা ইত্যাদি কুঅভ্যাসে পরিপূর্ণ, সে অন্তর আভ্যন্তরীণ কুকুর এবং বাহ্যিক অন্তর। জ্ঞানের নূর অভ্যন্তরভাগ দেখে, বাইরের অঙ্গ নয়।

সুতরাং যদি কেউ বলে, অনেক লোক কুচরিত্রের অধিকারী হয়েও জ্ঞান অর্জন করেছে, তবে এর জওয়াব, এটা কখনও হতে পারে না। যেব্যক্তি কুচরিত্রের অধিকারী, সে আখেরাতে উপকারী ও চিরন্তন সৌভাগ্যের কারণ সত্যিকার জ্ঞান কখনও অর্জন করতে পারবে না। সে এ জ্ঞান থেকে

অনেক মন্যিল দূরে থাকবে। কারণ, এ জ্ঞানের সূচনাতেই শিক্ষার্থী জানবে, গোনাহ্ মারাত্মক সর্বনাশা বিষ। তুমি কখনও কাউকে জেনেশুনে মারাত্মক বিষ সেবন করতে দেখেছ কি? তুমি যে জ্ঞানের কথা শুনেছ, সেটা মানুষের একটি প্রথাগত বিষয়। তারা এটা মুখে উচ্চারণ করে এবং কখনও অন্তরে বার বার বলে। সত্যিকার জ্ঞানের উপর এর কোন দখল নেই। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক বর্ণনা দ্বারা জ্ঞান হয় না; বরং জ্ঞান অন্তরে গুপ্ত একটি নূর। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জ্ঞান হচ্ছে কেবল আল্লাহর ভয়। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ـ

অর্থাৎ, একমাত্র জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। এখানে আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞানের বিশেষ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এদিক দিয়েই জনৈক অনুসন্ধানবিদ এ বাক্যের অর্থ করেছেন–

تعلمنا العلم لغير الله فابى العلم ان يكون الا الله ـ

অর্থাৎ, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উদ্দেশে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। কিন্তু জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এর মর্মার্থ, জ্ঞান আমাদের অর্জিত হয়নি এবং এর স্বরূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত হয়নি। কেবল বাহ্যিক শব্দ ও বাক্য অর্জিত হয়েছে। যদি বল, আমরা অনেক অনুসন্ধানী আলেম ও ফেকাহ্বিদকে দেখি, তাঁরা শাখা ও মূলনীতিতে সেরা বিশেষজ্ঞরূপে গণ্য হয়; অথচ তাদের চরিত্র খারাপ। তবে এর জওয়াব হচ্ছে, তুমি যখন জ্ঞানের স্তর ও আখেরাতের জ্ঞান সম্পর্কে অবগত হবে, তখন বুঝতে পারবে, যে জ্ঞানে তারা মশগুল রয়েছেন, সেটা জ্ঞান হিসাবে খুব কমই উপকারী। জ্ঞান কেবল আল্লাহর উদ্দেশে অর্জন করলেই এবং আল্লাহর নৈকট্য উদ্দেশ্য হলেই এর উপকার পাওয়া যায়। এদিকে আমরা ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করেছি এবং সত্বরই এ অধ্যায়ে আরও সবিস্তার বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় আদব, শিক্ষার্থী সাংসারিক কাজকর্মের সাথে সম্পর্ক হ্রাস করবে এবং আত্মীয়-স্বজন ও মাতৃভূমি থেকে দূরে থাকবে। কেননা সকল সম্পর্কই বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ও বাধাদানকারী। আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দু'টি মন সৃষ্টি করেননি। ফলে চিন্তা বিভক্ত থাকলে জ্ঞানের প্রকৃত

স্বরূপ উদঘাটনে ত্রুটি দেখা দেবে। এজন্যেই কেউ বলেছেন ঃ শিক্ষা তোমাকে তার সামান্য অংশও দেবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাতে সমস্ত মন প্রাণ নিবিষ্ট করবে। তুমি এরূপ করলে জ্ঞান তোমাকে যে সামান্য অংশ দেবে, তাও উপকারী কিনা জানা নেই। যে চিন্তা অনেক কাজে বিভক্ত থাকে, তা নালার পানির মত ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছু অংশ মাটি শুষে ফেলে এবং কিছু শুকিয়ে বাতাসের সাথে উড়ে যায়। ফলে ক্ষেতে পৌঁছার মত পানি থাকে না।

তৃতীয় আদব, শিক্ষার্থী জ্ঞানের কারণে অহংকার করবে না এবং শিক্ষকের উপর শাসন চালাবে না; বরং নিজের ব্যাপার সর্বাবস্থায় পুরোপুরি শিক্ষকের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেবে। তার উপদেশ তেমনি মান্য করবে, যেমন মূর্খ রোগী দয়ালু ও বিচক্ষণ ডাক্তারের কথা মান্য করে। শিক্ষাগুরুর সাথে বিনয়াবনত ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁর সেবা দ্বারা সওয়াব ও গৌরব কাম্য হওয়া দরকার। শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) জানাযার নামায পড়লে তাঁর খচ্চর তাঁর নিকটে আনা হয়, যেন তিনি তাতে সওয়ার হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আগমন করলেন এবং খচ্চরের সাথে সংলগ্ন লোহার আংটি চেপে ধরলেন। যায়েদ ইবনে সাবেত বললেন ঃ হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাচাত ভাই! আপনি লোহার আংটি ছেড়ে দিন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আলেম ও মহান ব্যক্তিদের সাথে এমনি ব্যবহার করার নির্দেশ আমি পেয়েছি। যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁর হস্ত চুম্বন করে বললেন ঃ আমরাও আমাদের পয়গম্বরের পরিবার-পরিজনের সাথে এমনি ব্যবহার করার আদেশ পেয়েছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ খোশামোদ করা ঈমানদারের চরিত্র নয়; কিন্তু জ্ঞান অন্বেষণে খোশামোদ করা যায়। সুতরাং শিক্ষার্থীর অহংকার করা উচিত নয়। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত আলেমের কাছেই পড়ব– অন্যের কাছে নয়– এটাও শিক্ষার্থীর এক প্রকার অহংকার। এটা নির্বুদ্ধিতা বৈ নয়। কেননা, জ্ঞান মুক্তি ও সৌভাগ্যের কারণ। যেব্যক্তি কোন ইতর হিংস্র জন্তু থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়, সে এ বিষয়ে পার্থক্য করবে না যে, তাকে আত্মরক্ষার কৌশল কোন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি না অজ্ঞাত ব্যক্তি বলে দেবে। বলাবাহুল্য, যারা আল্লাহ তা'আলাকে জানে না, তাদের জন্যে অগ্নিরূপী সর্বগ্রাসী শত্রুর ক্ষতি প্রত্যেক হিংস্র প্রাণীর ক্ষতির তুলনায় ভয়ংকর হবে। জ্ঞান ঈমানদারের

হারানো সম্পদ; যেখানে তা পাবে, সেখান থেকেই সৌভাগ্য মনে করে গ্রহণ করবে। কেউ এ জ্ঞান তার কাছে পৌঁছালে, সে যেই হোক তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে।

মোট কথা, বিনয়াবনত হওয়া ও কান লাগানো ছাড়া জ্ঞান অর্জিত হয় না।। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ -

অর্থাৎ, "এতে সে ব্যক্তির চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে, যার অন্তর আছে অথবা যে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করে।"

অন্তর থাকার উদ্দেশ্য জ্ঞানের যোগ্যতা ও অনুধাবন করার প্রতিভা থাকা। অনুধাবনে সক্ষম হওয়াই যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত না মনোনিবেশ সহকারে শুনবে। যাতে কানে যা কিছু ফেলা হয়, তা ভালরূপে শুনে বিনয়, শোকর, আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা সহকারে কবুল করে নেয়। ওস্তাদের সামনে শাগরেদদের এমন থাকা উচিত, যেমন নরম মাটি, যার উপর অনেক বৃষ্টি পড়ে এবং মাটি সব পানি পান শুষে। ওস্তাদ কোন নিয়ম বললে শাগরেদ তার অনুসরণ করবে, নিজের মতামত খাটাবে না। কেননা, ওস্তাদ ভুল করলেও তা শাগরেদের নির্ভুলতা অপেক্ষা তার জন্যে অধিক উপকারী। অভিজ্ঞতা দ্বারা এমন সূক্ষ্ম বিষয় জানা যায়, যা শুনলে অবাক লাগে। কিন্তু তার উপকারিতা অনেক। উদাহরণতঃ অনেক গরম মেজাজের রোগীর চিকিৎসা চিকিৎসকরা গরম ওষুধ দ্বারাই করেন, যাতে রোগীর মধ্যে চিকিৎসার গুরুভার সহ্য করার মত উত্তাপ সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু যারা চিকিৎসা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ নয়, তারা একথা শুনে আশ্চর্যবোধ করে। আল্লাহ তা'আলা হযরত খিযির ও মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। হযরত খিযির বললেন ঃ

اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَالَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا -

অর্থাৎ "আপনি আমার সাথে থেকে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আপনি এমন বিষয় দেখে ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করেও যার তত্ত্ব আপনার আয়ত্বাধীন নয়?"

এরপর হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে শর্ত দিলেন, চুপ থাকতে হবে এবং আমি নিজে না জানানো পর্যন্ত প্রশ্ন করা চলবে না।

فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۔

"অতএব আপনি যদি আমার সাথে থাকেন, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে আপনাকে বলি।" কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) সবর করতে পারলেন না, বার বার তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলেন। অবশেষে এটাই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে গেল। সারকথা, যে শাগরেদ তার ওস্তাদের মোকাবিলায় নিজের মত ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখে, সে তার উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত হয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা এক আয়াতে বলেছেন ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ "তোমাদের জ্ঞান না থাকলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

এ থেকে জিজ্ঞেস করার অনুমতি জানা যায়। এর উদ্দেশ্য, বাস্তবে জিজ্ঞেস করা বৈধ। কিন্তু যেসব বিষয় জিজ্ঞেস করার অনুমতি ওস্তাদ দেন সেগুলোই জিজ্ঞেস করতে হবে। কেননা, যে কথা অনুধাবন করার ক্ষমতা তোমার নেই, তা জিজ্ঞেস করা খারাপ। এ কারণেই হযরত খিযির মূসা (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করতে বারণ করেছিলেন।

মোট কথা, সময়ের পূর্বে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। তোমার কি প্রয়োজন এবং তা কখন বলা উচিত, সে সম্পর্কে ওস্তাদ অবহিত রয়েছেন। যে পর্যন্ত বলার সময় না আসে, জিজ্ঞেস করার সময়ও আসে না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আলেমের হক, তাকে অনেক প্রশ্ন করো না, জওয়াবের ব্যাপারে দোষারোপ করো না, যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন পীড়াপীড়ি করো না এবং সে ভুল করলে তাকে ক্ষমার্হ মনে কর। যে পর্যন্ত আলেম আল্লাহর আদেশের হেফাযত করে, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা নিজের জন্য অপরিহার্য মনে কর। তার সামনে উপবেশন করো না।

চতুর্থ আদব, শিক্ষার্থী প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের মতভেদ শোনা থেকে বেঁচে থাকবে- সে দুনিয়ার জ্ঞান অন্বেষণ করুক অথবা আখেরাতের জ্ঞান। কেননা, মতভেদ শুনলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জ্ঞান-বুদ্ধি বিহ্বল, চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত ও মতামত শিথিল হয়ে পড়ে এবং উপলব্ধি ও

সূচনার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়ে যায়। প্রথমে সে ওস্তাদের পছন্দনীয় কোন পন্থা বিশ্বাস করবে, এরপর অন্যান্য মাযহাব ও তাদের সন্দেহ শুনবে। যদি তার ওস্তাদ এক মত অবলম্বন করার ব্যাপারে পাকাপোক্ত না হয় এবং এক মাযহাব থেকে অন্য মাযহাব পাল্টানো ও তাঁদের উক্তি বর্ণনা করাই তাঁর অভ্যাস হয়, তবে এরূপ ওস্তাদ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, এরূপ ওস্তাদ হেদায়াত করে কম এবং পথভ্রষ্ট করে বেশী। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? যে নিজেই হারিয়ে গেছে, সে অন্যকে পথ দেখাবে কেমন করে?

প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে সন্দেহের পেছনে পড়তে বারণ করা, কোন নও মুসলিমকে কাফেরদের সাথে মেলামেশা করতে বারণ করারই মত। আর যে শিক্ষা সমাপ্ত করেছে, তাকে মতভেদসমূহে উৎসাহিত করা এমন, যেমন শক্ত ঈমানদারকে কাফেরদের সাথে দেখা সাক্ষাতে উৎসাহিত করা হয়। কেননা, প্রত্যেক কাজের জন্যে উপযুক্ত লোক দরকার। এ জন্যেই ভীরু কাপুরুষকে কাফেরদের উপর হামলা করতে বলা হয় না; বরং বীরপুরুষকে এ কাজের জন্য ডাকা হয়। এ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্পর্কে গাফেল হয়ে কোন কোন দুর্বল লোক ধারণা করে যে, শক্ত লোকদের তরফ থেকে বর্ণিত শৈথিল্যে তাদের অনুসরণ করা জায়েয। তাঁরা বুঝেনি যে, শক্ত লোকদের কাজ কারবার দুর্বল লোকদের কাজ কারবার থেকে আলাদা। এ সম্পর্কে জনৈক শায়খ বলেন ঃ যেব্যক্তি আমাকে প্রথম অবস্থায় দেখেছে, সে যিন্দীক তথা খোদাদ্রোহী হয়ে গেছে। কারণ, শেষ অবস্থায় আমল বাতেনের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ ফরয ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অন্যান্য আন্দোলন থেকে স্তব্ধ হয়ে যায়। দর্শকরা মনে করে, এটা শৈথিল্য ও অকর্মণ্যতা। অথচ বাস্তবে তা নয়; বরং এটা অন্তরের পর্যবেক্ষণের আওতায় সার্বক্ষণিক যিকিরে ব্যাপৃত থাকা, যা সর্বোত্তম আমল। দুর্বল ব্যক্তি অঙ্গের বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটাকে পদস্খলন মনে করে এবং নিজেও তদ্রূপ করে। তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কোন ব্যক্তি এক গ্লাস পানিতে সামান্য নাপাক বস্তু ফেলে দেয় এবং বলে, সমুদ্রের জন্যে যা বৈধ তা গ্লাসের জন্যে আরও উত্তমরূপে বৈধ হওয়া উচিত। লোকটি জানে না যে, সমুদ্র তার শক্তির মাধ্যমে নাপাকীকে পানিতে পরিণত করে ফেলে এবং সমুদ্র প্রবল হওয়ার কারণে নাপাকীও সমুদ্রের মত হয়ে যায়। কিন্তু সামান্য নাপাকীই গ্লাসে প্রবল থাকে। সেটা গ্লাসকে নিজের মত নাপাক

করে দেয়। এমনি ধরনের যুক্তির ভিত্তিতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্যে এমন বিষয় জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে, যা অন্যের জন্যে জায়েয নয়। উদাহরণতঃ তাঁর জন্যে চার জনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে। কেননা, তাঁকে যে শক্তি দান করা হয়েছিল, তার সাহায্যে তিনি স্ত্রীদের মধ্যে 'আদল' তথা সমতা বিধান করতে পারতেন– তাঁদের সংখ্যা যতই হোক না কেন। অন্য ব্যক্তি অল্প কয়েকজনের মধ্যেও ন্যায়বিচার করতে পারে না। বরং তাদের মধ্যকার ক্ষতি স্বয়ং তাকেও গ্রাস করবে; অর্থাৎ স্ত্রীদের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে সে আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে বসবে। যেব্যক্তি ফেরেশতাকে কর্মকারের অনুরূপ মনে করে, সে সফলকাম হবে কি?

পঞ্চম আদব, শিক্ষার্থী কোন উৎকৃষ্ট শাস্ত্রই না দেখে পরিত্যাগ করবে না। এতটুকু দেখবে যাতে তার উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এর পর যদি জীবনে কুলায়, তবে সে সম্পর্কে পূর্ণতা অর্জনের চেষ্টা করবে। নতুবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রে আত্মনিয়োগ করে তাতে পূর্ণতা অর্জন করবে এবং অবশিষ্ট শাস্ত্রগুলো অল্প বিস্তর অর্জন করবে। কেননা, শাস্ত্র একে অপরের সহায়ক ও পরস্পর জড়িত। কোন শাস্ত্র শিক্ষা না করা শত্রুতাবশতই হতে পারে। কেননা, মানুষ যা করতে পারে না তার প্রতি বিরূপ হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ .

অর্থাৎ, যখন তাঁর হেদায়েতে তারা পথে আসে না, তখন বলবে– এটা একটা সনাতন মিথ্যা।

জনৈক কবি বলেন, রোগের কারণে যার মুখের স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়, সে মিঠা পানিকেও তিক্ত মনে করে। মোটকথা, উৎকৃষ্ট শাস্ত্র স্তর অনুযায়ী বান্দাকে আল্লাহর পথের, পথিক করে দেয় অথবা পথ চলায় কিছু না কিছু সাহায্য করে।

ষষ্ঠ আদব, শিক্ষণীয় শাস্ত্রসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি সহসা অবলম্বন করবে না; বরং ক্রমের দিকে লক্ষ্য রাখবে। যেটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, সেটি থেকে শুরু করবে। কারণ, জীবন প্রায়শঃ সকল শাস্ত্র আয়ত্ত করার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই সাবধানতা হচ্ছে, প্রত্যেক বস্তু থেকে উৎকৃষ্টটি অর্জন করবে এবং তা থেকে অল্প নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। অল্প জ্ঞান দ্বারা যে শক্তি অর্জিত হয়, তা সর্বোত্তম শিক্ষা তথা আখেরাত

বিষয়ক শিক্ষার উভয় প্রকার মোআমালা ও মোকাশাফায় ব্যয় করবে। এলমে মোআমালার অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে এলমে মোকাশাফা এবং এর পরিণতি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার মারেফাত। এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের উদ্দেশ্য সে বিশ্বাস নয়, যা জনসাধারণ বাপ-দাদার কাছ থেকে শুনে এসেছে অথবা মুখস্থ করে নিয়েছে। কালাম শাস্ত্রের পদ্ধতিও উদ্দেশ্য নয়, যাতে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কথা টিকিয়ে রাখা হয়। কালাম শাস্ত্রীদের উদ্দেশ্য এতটুকুই। বরং এলমে মোকাশাফা বলে আমাদের উদ্দেশ্য হল এক প্রকার প্রত্যয়, যা সেই নূরের ফল, যা আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরে স্থাপন করে দেন, যখন বান্দা সাধনা করে তার অন্তরকে অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে। অবশেষে বান্দা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ঈমানের মর্তবা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যার সাক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) এভাবে দিয়েছেন– যদি আবু বকরের ঈমান সারা বিশ্বের ঈমানের সাথে ওজন করা হয়, তবে আবু বকরের ঈমানই ভারী হবে। আশ্চর্যের বিষয়, কিছু লোক শরীয়তের প্রবর্তক রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছ থেকে এ ধরনের উক্তি শ্রবণ করার পর এর অনুরূপ যা কিছু শুনে, তাকে ঘৃণা করে এবং বলে যে, এগুলো সূফীদের অনর্থক ও দুর্বোধ্য কথাবার্তা।

সারকথা, তোমার সেই রহস্য জানার লোভ করা উচিত যা ফেকাহ্‌বিদ এবং কালামশাস্ত্রীদের সাহস ও আয়ত্তের বাইরে। এর অন্বেষণে লোভী না হয়ে তুমি এর পথ পাবে না।

মোট কথা, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবকিছুর মূল লক্ষ্য যে শাস্ত্র, তা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার মারেফাত। এটা অতল সাগর। এতে সর্বাগ্রে রয়েছেন পয়গম্বরগণ, এর পর তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ। বর্ণিত আছে, পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মধ্যে দু'জন দার্শনিকের চিত্র এক উপাসনালয়ে পরিদৃষ্ট হয়। তাদের একজনের হাতে রাখা একটি চিরকুটে লেখা ছিল ঃ যদি তুমি সকল বিষয় সংশোধন করে নাও, তবে মনে করো না যে, একটি বিষয়ও সংশোধন করতে পেরেছ, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ কর এবং তাঁকেই সকল কারণের মূল কারণ ও স্রষ্টা না জান। অপর হাতে রাখা চিরকুটে লিখিত ছিল ঃ আল্লাহ তা'আলার মারেফাতের পূর্বে আমি পানি পান করতাম এবং পিপাসার্ত থাকতাম। অবশেষে যখন তাঁর মারেফাত অর্জিত হল তখন পানি পান করা ছাড়াই পিপাসা নিবৃত্ত হয়ে গেল।

সপ্তম আদব, এমন কোন শাস্ত্রে পা রাখবে না, যে পর্যন্ত না তার আগে যেসব শাস্ত্র জানা দরকার সেগুলোর উপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয়। কেননা, শাস্ত্রসমূহ এক জরুরী ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত এবং এক শাস্ত্র অন্য শাস্ত্রের পথ। যে এই ক্রম ও স্তরের প্রতি লক্ষ্য রাখে, সেই তওফীক প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ -

অর্থাৎ, "আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা তা যথার্থই পাঠ করে।" অর্থাৎ, এলেম ও আমলের দিক দিয়ে এক শাস্ত্রে পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত অন্য শাস্ত্রের দিকে অগ্রসর হয় না। যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করবে তাতে তার উপরের শাস্ত্রে উন্নতি করার নিয়ত রাখবে। যদি কোন শাস্ত্রে মতভেদ হয় অথবা তাতে কয়েকজনই ভুল করে অথবা এলেম অনুসারে আমল না করে, তবে সে শাস্ত্র অর্থহীন বলে আখ্যায়িত করো না। যেমন কেউ কেউ চিকিৎসকের ভুল দেখে চিকিৎসা শাস্ত্রকে অকেজো মনে করে, জ্যোতিষীর কথাবার্তা ঘটনাচক্রে সত্য হতে দেখে কিছু লোক এর নির্ভুলতায় বিশ্বাসী হয় এবং কিছু লোক অন্য জ্যোতিষীর ভুল জেনে একে অকেজো বলে। অথচ তারা সকলেই ভ্রান্ত। বস্তুতঃ বিষয়টির বাস্তবতা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে যাচাই করে নেয়া উচিত। কেউই কোন শাস্ত্রে এতটুকু ব্যুৎপত্তির অধিকারী হয় না যে, তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে যাবে। এজন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষকে দেখে সত্য চেনার চেষ্টা করো না; বরং সত্যকে জেনে নাও। এরপর সত্যপন্থীদেরকে আপনা আপনি জেনে যাবে।

অষ্টম আদব, শাস্ত্রসমূহ যে কারণে একটি অপরটি থেকে শ্রেষ্ঠ, তা জানতে হবে। শ্রেষ্ঠত্ব দু'বিষয়ের কারণে হয়– ফলাফলের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে এবং শক্তিশালী প্রমাণের কারণে। উদাহরণতঃ ধর্মশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্র দেখলে দেখা যায়, প্রথমটির ফলাফল অনন্ত জীবনের সুখ এবং দ্বিতীয়টির ফলাফল ধ্বংসশীল জীবনের সুখ। সুতরাং এদিক দিয়ে ধর্ম শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেননা, তার ফলাফল শ্রেষ্ঠ। অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অংকশাস্ত্রের প্রমাণসমূহ পাকাপোক্ত ও শক্তিশালী। সুতরাং এটা জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ। যদি অংকশাস্ত্রকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সাথে মিলিয়ে দেখি, তবে চিকিৎসাশাস্ত্র

অংকশাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ, যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিকাংশই আন্দাজ অনুমান মাত্র।

এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল, আল্লাহ্, ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলের পরিচয় বিষয়ক শাস্ত্রই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। আর যেসব শাস্ত্র এ শাস্ত্র পর্যন্ত পৌছার উপায় ও মাধ্যম, সেগুলোও শ্রেষ্ঠ। কাজেই এ শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রের প্রতি আগ্রহ ও লোভ করা তোমার উচিত নয়।

নবম আদব, শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হবে নিজের অভ্যন্তরকে সদগুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করা এবং পরিণামে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ এবং ফেরেশতা ও উর্ধ্ব জগতের নৈকট্যশীলদের প্রতিবেশিত্ব অর্জন করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব, ধন-সম্পদ, জাঁকজমক, নির্বোধদের সাথে বিতর্ক এবং সমকক্ষদের উপর গর্ব করা না হওয়া উচিত। জ্ঞানের দ্বারা যার নিয়ত থাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, তার পক্ষে অবশ্যই এমন জ্ঞান অন্বেষণ করা দরকার, যা এই উদ্দেশের নিকটবর্তী। অর্থাৎ তার আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্র গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিতাব ও সুন্নতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফতোয়াশাস্ত্র, অভিধানশাস্ত্র, ব্যাকরণশাস্ত্র ইত্যাদিকে ঘৃণার চোখে দেখতে পারবে না। এগুলো ফরযে কেফায়া শ্রেণীভুক্ত জ্ঞান। আমরা আখেরাত বিষয়ক শাস্ত্রের প্রশংসায় যে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছি, এতে মনে করো না যে, উপরোক্ত শাস্ত্রসমূহ মন্দ। যারা এসব শাস্ত্রে আলেম, তারা তাদের মতই, যারা মাটির হেফাযত করে এবং আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে। অর্থাৎ, তাদের কেউ যুদ্ধ করে, কেউ সাহায্য করে, কেউ তাদের পানি পান করায় এবং কেউ তাদের সওয়ারীর হেফাযত করে। আল্লাহ্র বাণীসমূহকে তুলে ধরা নিয়ত হলে তাদের কেউই সওয়াব থেকে বঞ্চিত নয়। আলেমগণের অবস্থাও তদ্রূপ। আল্লহ্ তাআলা বলেন–

يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ـ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা আলেম, আল্লাহ তাদের মর্তবা উচ্চ করেন।

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে তাদের অনেক মর্তবা।

মোট কথা, আলেমগণের শ্রেষ্ঠত্ব আপেক্ষিক। কারও তুলনায় বেশী এবং কারও তুলনায় কম। তাঁরা স্বয়ং হেয় নয়। সুতরাং এরূপ ধারণা করা উচিত নয় যে, যে এলেম উচ্চ মর্তবার নিম্নে, তা মূল্যহীন। বরং জানা উচিত যে, সর্বোচ্চ মর্তবা পয়গম্বরগণের, এর পর মজবুত আলেমগণের, এরপর সৎকর্মশীল বান্দাগণের– তাদের স্তর অনুযায়ী। সারকথা, যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে তার সওয়াব সে পাবে। যেব্যক্তি এলেম দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে চাইবে, তার এলেম যাই হোক না কেন, তার জন্যে উপকারী হবে এবং তার মর্তবা অবশ্যই উচ্চ করবে।

দশম আদব, কোন্ শিক্ষা আসল উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী এবং কোন্টি দূরবর্তী, তা জানতে হবে; যাতে নিকটবর্তীকে দূরবর্তীর উপর অগ্রাধিকার দেয়া এবং জরুরী জ্ঞান অবলম্বন করা যায়। জরুরী জ্ঞান অর্থ সে শিক্ষা যা তোমাকে চিন্তাশীল করবে। বলাবাহুল্য, দুনিয়া ও আখেরাতে একমাত্র তোমার অবস্থাই তোমাকে চিন্তাশীল করে। দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আখেরাতের সুখ-শান্তি একত্রে অর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। কোরআন পাকে একথা বর্ণিত হয়েছে এবং অন্তর্দৃষ্টিও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাই জ্ঞানই অনন্তকাল স্থায়ী হয়, সেটাই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। এমতাবস্থায় দুনিয়া হবে একটি মনযিল; দেহ হবে বাহন আর আমল হবে উদ্দেশের দিকে চলা। উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার দীদার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কেননা, সকল সুখ ও আনন্দ এতেই নিহিত। তবে পৃথিবীর কম লোকই এর মূল্য অনুধাবন করে।

জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ ও দীদারের সাথে তুলনা করে দেখলে তা তিন প্রকার। দীদারের যা উদ্দেশ্য তা পয়গম্বরগণ অন্বেষণ করতেন এবং তাঁরাই এটা বুঝতেন। সে দীদার উদ্দেশ্য নয়, যা জনসাধারণ ও কালামশাস্ত্রীদের মস্তিষ্কে আসে। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তুমি এলেমের এই প্রকারত্রয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

দৃষ্টান্ত এই– কোন গোলামকে বলা হল, যদি তুমি হজ্জ কর এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম পূর্ণরূপে পালন কর, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে এবং রাজত্বও লাভ করবে। আর যদি তুমি হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হও এবং পথে কোন বাধার সম্মুখীন হও, তবে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু রাজত্ব পাবে না। এখন এই গোলাম তিন প্রকার কাজের সম্মুখীন হবে– প্রথমতঃ সফরের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করা অর্থাৎ, উট ক্রয়, মশক তৈরী ও খাদ্য

শস্য সংগ্রহ, দ্বিতীয়তঃ দেশ ত্যাগ করে কা'বা গৃহের দিকে রওয়ানা হওয়া এবং তৃতীয়তঃ হজ্জের ক্রিয়াকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং এক একটি রোকন ক্রমানুসারে আদায় করা। এই তিনটি অবস্থা এবং এহরাম ও বিদায়ী তওয়াফ শেষ হওয়ার পর গোলাম আযাদী ও রাজত্বের অধিকারী হবে। প্রত্যেক অবস্থায় এই গোলামের অনেক স্তর রয়েছে। এখন যেব্যক্তি এখনও পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার কাজে লিপ্ত, অথবা চলা শুরু করেছে, সে সৌভাগ্যের এতটুকু কাছাকাছি হবে না, যতটুকু সেব্যক্তি হবে যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দিয়েছে। কেননা, সে দুই অবস্থা অতিক্রম করে খুব কাছে পৌঁছে গেছে। অনুরূপভাবে জ্ঞানও তিন প্রকার। এক প্রকার সফরের সাজসরঞ্জাম ক্রয় করার মত। এটা হচ্ছে চিকিৎসা ও ফেকাহ শিক্ষা এবং দুনিয়াতে দেহের উপযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞানসমূহ। দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা প্রান্তরে চলা ও উপত্যকা অতিক্রম করার মত। এটা হচ্ছে বদভ্যাসের ময়লা থেকে বাতেনকে পাক-পবিত্র করা এবং এমন উচ্চ মর্তবায় পৌঁছা, যেখানে তওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারে না। এসব বিষয় পথ চলার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর জ্ঞান অর্জন করা পথের মনযিলসমূহ জানার মত। অতিক্রম না করে কেবল মনযিল ও পথ জেনে নেয়া যেমন যথেষ্ট নয়, তেমনি চরিত্র শুদ্ধ না করে কেবল চরিত্র শুদ্ধির উপায় জেনে নেয়াও যথেষ্ট নয়। জ্ঞান ছাড়া চরিত্র শুদ্ধি হতে পারে না। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হজ্জ ও হজ্জের রোকনসমূহের মত। এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ফেরেশতার জ্ঞান এবং এলমে মোকাশাফায় বর্ণিত বিষয়াদির জ্ঞান। এ প্রকার শিক্ষার পর মুক্তি ও সৌভাগ্য অর্জিত হয়। কিন্তু নিরাপত্তা এ পথের প্রত্যেক পথিকেরই অর্জিত হয় যদি তার উদ্দেশ্য সৎ হয়। যারা আল্লাহ তা'আলার আরেফ, তাদের ছাড়া অন্য কেউ সৌভাগ্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারে না। তারাই নৈকট্যশালী হয় এবং তাদের উপরই রহমত, সুখ ও জান্নাতের নেয়ামত বর্ষিত হয়। যারা পূর্ণতার স্তর থেকে দূরে থেকে যায়, তাদের নাজাত ও নিরাপত্তা অর্জিত হয়। সেমতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ -

অর্থাৎ, অতঃপর যদি সে নৈকট্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে তার জন্যে রয়েছে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও জান্নাতের নেয়ামত। আর যদি সে হয় ডান দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত, তবে তাদের তরফ থেকে আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।

আর যারা উদ্দেশের প্রতি মনোযোগী হয় না এবং সেদিকে চলে না, অথবা চললেও আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়তে চলে না; বরং জাগতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে চলে, তারা বাম দিকের লোকদের অন্তর্ভুক্ত; অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হবে। তাদের জন্যে বলা হয়েছে ঃ

نُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ -

অর্থাৎ, তারা উত্তপ্ত পানি দ্বারা আপ্যায়িত হবে এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।

মোট কথা, এলমে মোকাশাফার পরে সৌভাগ্য তথা সিদ্ধি লাভ হয়। আর এলমে মোকাশাফা এলমে মোআমালার পরে আসে। অর্থাৎ আখেরাতের পথে চলা এবং গুণাবলীর উপত্যকাসমূহ অতিক্রম করার পর এলমে মোকাশাফা অর্জিত হয়। আমরা চিকিৎসা ও ফেকাহশাস্ত্রকে হজ্জের জন্যে পাথেয় ও সওয়ারী প্রস্তুত করার সাথে তুলনা করেছি। এর কারণ, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের জন্যে তাঁর দিকে অন্তর চলে, দেহ নয়। আমাদের মতে অন্তর সেই মাংসপিন্ড নয় যা চোখে উপলব্ধ হয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার এক রহস্য। এটা ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয় না। কখনও একে রূহ এবং কখনও নফসে মুতমায়িন্নাহ বলা হয়। শরীয়ত একে কলব তথা অন্তর বলে ব্যক্ত করে। কেননা, অন্তর হচ্ছে এ রহস্যের প্রথম সওয়ারী এবং অন্তরের মাধ্যমে সমগ্র দেহ তার সওয়ারী ও হাতিয়ারে পরিণত হয়। এলমে মোকাশাফা দ্বারা এ রহস্যের অবস্থা চমৎকাররূপে জানা যায়। এ রহস্য প্রকাশযোগ্য নয়; বরং এ সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি নেই। বেশীর বেশী এতটুকু বলার অনুমতি আছে যে, এটি একটি উৎকৃষ্ট বিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়াদির তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং খোদায়ী নির্দেশ। সেমতে আল্লাহ্ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ -

"তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার নির্দেশের অংশ।"

উদ্দেশ্য এই যে, রূহ তার পালনকর্তার দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহ্ তাআলাই এর উৎস এবং তাঁর দিকেই সে প্রত্যাবর্তন করে। দেহ এ রূহের সওয়ারী, যাতে সওয়ার হয়ে সে চলে। আল্লাহর পথে দেহ অন্তরের জন্যে এমন, যেমন হজ্জের পথে দেহের জন্যে উট অথবা পানির মশক। অতএব যে আমলের উদ্দেশ্য দেহের কল্যাণ সাধন, সেটা সওয়ারীর কল্যাণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্দেশ্যও দেহের কল্যাণ সাধন। কেননা, দৈহিক স্বাস্থ্যের দেখাশোনার জন্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়। ধরে নাও, মানুষ যদি একা থাকত, তবে তার চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজন হত– ফেকাহ্র প্রয়োজন হত না। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, সে একাকী অবস্থায় জীবিত থাকতে পারে না। আহারের জন্যে হালচাষ, বপন এবং অন্ন ও বাসস্থান অর্জন প্রভৃতি একাকী সমাধা করা সম্ভব হতে পারে না। এর জন্যে অন্যের সাথে মেলামেশা করা ও সাহায্য চাওয়া জরুরী। মানুষ যখন পরস্পরে মেলামেশা করেছে এবং কামনা বাসনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তখন পরস্পরে কলহ-বিবাদ ও মারামারি করে বরবাদ হতে শুরু করেছে। এ কলহ বিবাদই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে, যেমন দেহের পিত্তাদি বিগড়ে গেলে মানুষের মৃত্যু ঘটে থাকে। চিকিৎসাশাস্ত্রের মাধ্যমে পিত্তাদির দূষিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং শাসন ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে বাহ্যিক ফ্যাসাদ দূর করে কামনা বাসনায় সমতা আনয়ন করা। পিত্তাদিতে সমতা কায়েম রাখার নিয়ম কানুন জানাকে ফেকাহশাস্ত্র বলা হয়। উভয়টি দেহের হেফাযতের জন্যে অন্তরের বাহন হয়। সুতরাং যেব্যক্তি কেবল ফেকাহ্ ও চিকিৎসাশাস্ত্রেই নিয়োজিত থাকে এবং নফসের উপর মোজাহাদা বা সাধনা না করে, সে যেন উট ক্রয় করে তার প্রতিপালনেই কেবল ব্যস্ত থাকে; কিন্তু হজ্জের পথে পা বাড়ায় না। যারা আত্মার সংশোধন তথা এলমে মোকাশাফার পথে চলমান, তাদের সাথে এই ফেকাহ্শাস্ত্রীদের তুলনা এমন, যেমন যারা হজ্জের রোকনসমূহ পালনে লিপ্ত, তাদের সাথে সে ব্যক্তির তুলনা, যে উট কিনে সেটিকে কেবল ঘাস খাওয়াচ্ছে– হজ্জের পথে রওয়ানা হচ্ছে না।

সুতরাং এ বিষয়টি প্রথমেই চিন্তা কর এবং সে ব্যক্তির উপদেশ মান্য কর, যে তোমার কাছে এর কোন মজুরি চায় না এবং যে সততঃ এতে মগ্ন রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম ছাড়া তোমার জন্যে এ বিষয়টি অর্জিত

হবে না। জনসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকদের কাছ থেকে আলাদা হওয়ার জন্যে তোমাকে পূর্ণ সাহসিকতা প্রদর্শন করতে হবে এবং কেবল নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর জন্যে এতটুকু আদবই যথেষ্ট মনে হয়।

শিক্ষকের আদব

জানা উচিত, জ্ঞানের ব্যাপারে মানুষের অবস্থা চার প্রকার, যেমন অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে মানুষের চার অবস্থা হয়ে থাকে। প্রথম, মানুষ অর্থ সৃষ্টি করে। তখন তাকে উপার্জনকারী বলা হয়। দ্বিতীয়, আপন উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করে, তখন সে ধনী হয়ে যায় এবং অন্যের মুখাপেক্ষী থাকে না। তৃতীয়, উপার্জিত অর্থ নিজের জন্যে ব্যয় করে, ফলে সে উপকৃত হয়। চতুর্থ, উপার্জিত অর্থ অন্যকে দেয়, তখন তাকে দাতা ও গুণী বলে গণ্য করা হয়। এই শেষ অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানেরও তদ্রূপ চারটি অবস্থা রয়েছে– এক, অর্জনের অবস্থা, দুই, অর্জিত জ্ঞানে এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করা যে, অন্যের কাছে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না থাকে, তিন, অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তদ্দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া এবং চার, সে জ্ঞান দ্বারা অন্যের উপকার করা। শেষোক্ত অবস্থা সকল অবস্থা থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যেব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে, আমল করে এবং মানুষকে জ্ঞানদান করে– আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বে তাকেই মহান বলা হয়। সে সূর্যের মত, অপরকে আলো দান করে এবং নিজেও আলোকময়। সে মেশকের মত, অপরকে সুগন্ধিতে আমোদিত করে এবং নিজেও সুগন্ধিযুক্ত। আর যেব্যক্তি অপরকে শিক্ষা দান করে, কিন্তু নিজে আমল করে না, সে শাণের মত, লোহাকে ধারালো করে কিন্তু নিজে কাটে না, অথবা সূচের মত, যে অন্যের জন্যে পোশাক তৈরী করে, কিন্তু নিজে উলঙ্গ থাকে। মানুষ যখন শিক্ষাদানে মশগুল হয়, তখন সে একটি বিরাট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাই এর আদব ও নিয়মাবলী স্মরণ রাখা উচিত। প্রথম শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদদেরকে সন্তানের মত স্নেহ করবে। যেমন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

انما انا لكم مثل الوالد لولد .

সন্তানের জন্যে যেমন পিতা, আমিও তোমাদের জন্যে তেমনি। অর্থাৎ, শিক্ষক শাগরেদদেরকে আখেরাতের আগুন থেকে বাঁচানোর নিয়ত করবেন। এটা পিতামাতার তাদের সন্তানদেরকে দুনিয়ার আগুন থেকে বাঁচানোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যেই শিক্ষকের হক পিতামাতার চেয়ে বেশী। কেননা, পিতামাতা সন্তানের ধ্বংসশীল জীবনের কারণ, আর শিক্ষক অক্ষয় জীবনের কারণ। শিক্ষক না থাকলে পিতামাতার কাছ থেকে অর্জিত বিষয় সন্তানকে স্থায়ী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিত, কিন্তু শিক্ষক বলতে আমরা এমন ব্যক্তিকে বুঝব, যে আখেরাত শাস্ত্র শিক্ষা দেয়। অথবা দুনিয়ার শাস্ত্র আখেরাতের নিয়তে শিক্ষা দেয়- দুনিয়ার নিয়তে নয়। কেননা, দুনিয়ার নিয়তে শিক্ষা দান করা মানে নিজে ধ্বংস হওয়া এবং অপরকে ধ্বংস করা। এমন শিক্ষকতা থেকে আল্লাহ হেফাযত করুন। এক পিতার পুত্ররা যেমন পারস্পরিক মহব্বত ও সম্প্রীতির সাথে থাকে এবং লক্ষ্য অর্জনে একে অপরকে সাহায্য করে, তেমনি এক ওস্তাদের শাগরেদদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা থাকা উচিত। আখেরাত উদ্দেশ্য হলে শাগরেদরা এমনি হয়। কিন্তু দুনিয়া লক্ষ্য হলে তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা হয়ে থাকে। যারা দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভের শিক্ষা গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির বাইরে- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই এবং তারা এ উক্তির বিষয়বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঃ

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۔

যারা বন্ধু, তারা সেদিন পরস্পরের শত্রু হবে; কিন্তু খোদাভীরুরা শত্রু হবে না।

দ্বিতীয় শিষ্টাচার হচ্ছে, শিক্ষাদানের ব্যাপারে শরীয়তের কর্ণধার রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর অনুসরণ করবে। অর্থাৎ শিক্ষার জন্যে কোন পারিশ্রমিক চাইবে না, কোন বিনিময়ের নিয়ত করবে না এবং কৃতজ্ঞতাও প্রত্যাশা করবে না। বরং কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে শিক্ষা দেবে। শাগরেদের প্রতি অনুগ্রহ হচ্ছে- এরূপ মনে করবে না; বরং শাগরেদদের অনুগ্রহভাজন হওয়া এবং এরূপ মনে করা জরুরী যে, তুমি তাদেরই কারণে গৌরবের অধিকারী হয়েছ। তারা তাদের

আত্মশুদ্ধির কাজ তোমাকে সমর্পণ করেছে এবং তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ দিয়েছে; যেমন কোন ব্যক্তি তার ক্ষেত তোমাকে ধার দেয়, যাতে তুমি নিজের জন্যে তাতে ফসল উৎপন্ন কর। বলাবাহুল্য, এখানে ক্ষেতওয়ালার উপকারের তুলনায় তোমার উপকার বেশী হবে। সুতরাং শিক্ষাদানে শাগরেদের তুলনায় ওস্তাদের সওয়াব যখন বেশী হয়, তখন শাগরেদের উপর অনুগ্রহ করার কোন মানে নেই। শাগরেদ না হলে ওস্তাদ এ সওয়াব কোথায় পেত? তাই সওয়াব ও প্রতিদান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে চাওয়া উচিত নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا ۔

"বলে দিন, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না।" কেননা, ধনদৌলত ও দুনিয়ার সামগ্রী দেহের খাদেম এবং মনের সওয়ারী। তারা সকলেই এলেমের খেদমত করে। অতএব যেব্যক্তি এলেমের বিনিময়ে ধন-দৌলত চাইবে, তার দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কারও জুতায় নাপাকী লেগে গেছে, সে তা পরিষ্কার করার জন্যে মুখে ঘষা দিয়ে নেয়। বলাবাহুল্য, এতে যে খেদমতের যোগ্য, তাকে খাদেম করা হয় এবং যে খাদেম তাকে খেদমত পাওয়ার যোগ্য করা হয়। এটা চরম বিপ্লব। এ ধরনের লোক কেয়ামতে অপরাধীদের সাথে মাথা নীচু করে আল্লাহ তা'আলার সামনে দন্ডায়মান হবে। মোট কথা, গৌরব ও সম্মান ওস্তাদের প্রাপ্য। এখন দেখ, যারা বলে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য তাদের লক্ষ্য, ফেকাহ ও কালামশাস্ত্র শিক্ষাদানে তাদের দশা কি হবে? তারা ধন-সম্পদ ও প্রতিপত্তি ব্যয় করে এবং জায়গীর লাভের জন্যে রাজা-বাদশাহদের নানা রকম লাঞ্ছনা ভোগ করে। তারা এটা বর্জন করলে কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে না এবং কেউ তাদের কাছে আসবে না। তদুপরি ওস্তাদ শাগরেদের কাছে আশা করে, সে তার প্রত্যেক বিপদে কাজে লাগবে, শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে সাহায্য করবে, অমঙ্গলকামীদের সাথে শত্রুতা রাখবে এবং তার জাগতিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি গাধার ন্যায় বহন করবে। যদি শাগরেদ এসব বিষয়ে সামান্যও ত্রুটি করে, তবে ওস্তাদজী তার আন্তরিক দুশমন হয়ে যায়। এ ধরনের আলেম নেহায়েত নীচ ও হীন।

তৃতীয় শিষ্টাচার, ওস্তাদ শাগরেদকে উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কোন

ত্রুটি করবে না। উদাহরণতঃ শাগরেদ যদি যোগ্যতা অর্জনের পূর্বে কোন মর্তবা লাভের পেছনে পড়ে অথবা জাহেরী এলেম অর্জন করার পূর্বে বাতেনী এলেমে ব্যাপৃত হতে চায়, তবে তাকে নিষেধ করবে। এরপর তাকে বলবে, জ্ঞান অন্বেষণ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে করবে– প্রভাব প্রতিপত্তি অন্বেষণ ও গর্ব করার জন্যে নয়। এটা যে মন্দ, একথা যথাসম্ভব প্রথমেই তার মনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। কেননা, পাপাচারী আলেমের মঙ্গল কম এবং অনিষ্ট বেশী হয়ে থাকে। সুতরাং যদি ওস্তাদ শাগরেদের অন্তর থেকে জেনে নেয়, সে দুনিয়া লাভের জন্যেই এলেম অর্জন করছে এবং ফেকাহশাস্ত্রে বিতর্ক করার এবং আহকামে মুনাযারার শিক্ষা লাভ করছে, তবে তাকে বিরত রাখবে এবং বলে দেবে, এগুলো আখেরাতের শিক্ষা নয় এবং এমন শিক্ষাও নয়, যার সম্পর্কে জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে এলেম শিখছি, কিন্তু এলেম আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হতে অস্বীকার করেছে। এ ধরনের এলেম হচ্ছে এলমে তফসীর, এলমে হাদীস ও এলমে আখেরাত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী মনীষীগণ মশগুল থাকতেন। যদি শাগরেদ দুনিয়ার উদ্দেশে এসব এলেম শেখে, তবে তাকে নিষেধ করবে না। কেননা, শাগরেদ ওয়ায়েয হওয়ার লোভে এবং মানুষকে তার দলভুক্ত করার আশায় এসব এলেম শিখতে তৎপর হয় এবং প্রায়ই শিক্ষাজীবনে এর পরিণতি সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। ফলে সে তার নিয়ত ঠিক করে নেয়। কারণ এর মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি এবং দুনিয়াকে তুচ্ছ ও আখেরাতকে বড় করে দেখার শিক্ষাও রয়েছে। এতে আশা করা যায়, পরিণামে শাগরেদ সঠিক পথে এসে যাবে।

ওস্তাদ যেসব বিষয়ের উপদেশ অন্যকে দেবে, সেগুলো নিজেও মেনে চলবে। শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হওয়া এবং জাঁকজমক সৃষ্টির বাসনা এমন, যেমন পাখী শিকারের জালের চারপাশে দানা ফেলে দেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি কামভাব সৃষ্টি করেছেন, যাতে এর মাধ্যমে মানুষের বংশ বিস্তার অব্যাহত থাকে। জাঁকজমকপ্রীতি সৃষ্টি করার কারণও তাই যে, এর মাধ্যমে শিক্ষাদীক্ষা কায়েম থাকবে। এটা উল্লিখিত শিক্ষাসমূহের মধ্যে হতে পারে। কিন্তু নিছক বিরোধপূর্ণ বিষয়াদি শিক্ষা করা এবং কালাম শাস্ত্রের কলহ বিবাদ আয়ত্ত করা এমন যে, মানুষ এগুলোতেই মশগুল থাকলে এবং অন্য শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে অন্তরের কঠোরতা,

আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গোমরাহীতে পড়ে থাকা ও জাঁকজমক প্রীতিই বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া কোন উপকার হবে না। তবে আল্লাহ তা'আলা আপন রহমতে যাকে বাঁচিয়ে নেন অথবা যে এগুলোর সাথে অন্য ধর্মীয় শিক্ষাও মিলিয়ে নেয়, তার অবশ্য উপকার হতে পারে। একবার সুফিয়ান সওরীকে কেউ দুঃখিত দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমরা দুনিয়াদারদের জন্যে বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে গেছি। তারা এলেম শিক্ষা করার জন্যে আমাদের পেছনে পড়ে। এরপর যখন শিখে ফেলে, তখন বিচারক, গভর্নর অথবা দারোগা নিযুক্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ শিষ্টাচার, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উত্তম ও সঠিক পন্থা হল, শাগরেদকে কুচরিত্র থেকে যতদূর সম্ভব ইঙ্গিতে ও সস্নেহে নিষেধ করবে। কঠোর ভাষায় এবং ধমকের সুরে শাসাবে না। কেননা, স্পষ্ট ভাষা ভয়ভীতির পর্দা সরিয়ে দেয় এবং বিরুদ্ধাচরণে সাহস যোগায়। সেমতে ওস্তাদকুল শিরোমণি রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

"মানুষকে ছাগলের লেজ চূর্ণ করতে নিষেধ করা হলে তারা তা অবশ্যই চূর্ণ করবে আর বলবে, আমাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।"

হযরত আদম ও হাওয়ার কাহিনী এ বিষয়ের চমৎকার সাক্ষী। কাহিনী জেনে নেয়ার জন্যে আমরা তোমাকে এটা স্মরণ করিয়ে দেইনি, বরং তুমি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সতর্ক হয়ে যাও। স্পষ্ট ভাষায় না বলার আরেক কারণ, যারা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী, তারা ইঙ্গিতে বললেও অর্থ বুঝে নেয় এবং বুঝে নেয়ার খুশী তাদেরকে আমল করতে উৎসাহিত করে– যাতে অন্যেরা জানে, বিষয়টি তার বুদ্ধিমত্তায় ধরা পড়েছে।

পঞ্চম শিষ্টাচার, ওস্তাদ যে শাস্ত্র শিক্ষা দেয় তার উপরের শাস্ত্রসমূহের প্রতি শাগরেদের মন বীতশ্রদ্ধ করে না তোলা। উদাহরণতঃ যারা অভিধান শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস শাগরেদের সামনে ফেকাহকে মন্দ বলা এবং যারা ফেকাহ শিক্ষা দেয়, তাদের অভ্যাস হাদীস ও তফসীর শাস্ত্রের নিন্দা করা। তারা বলে ঃ হাদীস ও তফসীর নিছক ইতিহাসগত এবং শ্রবণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এতে বিবেকের কোন দখল নেই। কালামশাস্ত্রীরা ফেকাহকে ঘৃণা করে এবং বলে ঃ ফেকাহশাস্ত্র একটি শাখাগত ব্যাপার।

এতে মহিলাদের মাসিকের কথা বর্ণিত হয়। এটা কালাম শাস্ত্রের মর্যাদা কিরূপে পেতে পারে, যাতে আল্লাহর সেফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়? ওস্তাদদের এ অভ্যাস খুবই মন্দ, যা থেকে বেঁচে থাকা উচিত। যে ওস্তাদ এক শাস্ত্র শিক্ষাদানের দায়িত্ব নেয়, তার উচিত শাগরেদের মনে তার উপরের শাস্ত্র শিক্ষা করার পথও খুলে দেয়া।

ষষ্ঠ শিষ্টাচার, ওস্তাদ যেন এমন কোন কঠিন বিষয় বর্ণনা না করেন, যা হৃদয়ঙ্গম করতে শাগরেদের জ্ঞানবুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়ে, যাতে শাগরেদ ওস্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়ে অথবা তার বুদ্ধিবিভ্রাট না ঘটে। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসরণ করা উচিত। তিনি বলেন ঃ আমরা পয়গম্বরগণ যেন মানুষকে তাদের স্তরে রেখে তাদের বুদ্ধি জ্ঞান অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বলি– সেরূপ আদেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। সুতরাং শাগরেদ ভালরূপে বুঝবে– নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওস্তাদ শাগরেদের সামনে কোন বিষয়ের স্বরূপ প্রকাশ করবে না। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যখন কেউ কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কথা বলে, যা তাদের বোধগম্য নয়, তখন তাদের কিছু লোকের জন্য এটা ফেতনা হয়ে যায়। একবার হযরত আলী (রাঃ) তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এর মধ্যে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান রয়েছে, যদি এগুলোর সমঝদার থাকে। অর্থাৎ, আমি এসব জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করি না। কারণ, সমঝদার নেই। তিনি সত্যই বলেছেন ঃ নেক বান্দাদের অন্তর রহস্যের আধার। এ থেকে জানা গেল, আলেম যা জানে, তা যে কোন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। এটা তখন, যখন শিক্ষার্থী বুঝে, কিন্তু উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আর যখন বুঝেই না, তখন তার কাছে না বলা অধিক সঙ্গত। ঈসা (আঃ) বলেন ঃ শূকরের গলায় মণি-মাণিক্য পরায়ো না। জ্ঞান-বিজ্ঞান মণি-মাণিক্যের চেয়ে উত্তম এবং যেব্যক্তি জ্ঞানকে খারাপ মনে করে, সে শূকরের চেয়ে অধম, এজন্যেই জনৈক বুযুর্গ বলেছেন ঃ প্রত্যেককে তার বুদ্ধির মাপকাঠি অনুযয়ী মাপ এবং তদনুযায়ী তার সাথে কথা বল, যাতে তুমি তার কাছ থেকে বেঁচে থাক এবং এবং সে তোমার দ্বারা উপকৃত হয়। নতুবা সে মনোবলের সংকীর্ণতার কারণে মানবে না। জনৈক ব্যক্তি এক আলেমকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি জওয়াব দিলেন না। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীস শুনেননি, যেব্যক্তি উপকারী এলেম গোপন

করে, কেয়ামতে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে। আলেম বললেন ঃ লাগামের কথা রাখ এবং চলে যাও। যদি কোন সমঝদার আসে এবং এলেম গোপন করি, তখন সে আমাকে লাগাম পরিয়ে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمْ

তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ নির্বোধদের হাতে সমর্পণ করো না।

এতে হুশিয়ার করা হয়েছে, এলেম যেব্যক্তিকে খারাপ করে দেয় এবং বিভ্রান্তিতে ফেলে, তাকে এলেম থেকে বিরত রাখা উত্তম। অযোগ্য ব্যক্তিকে কোন বস্তু দেয়া যোগ্যকে না দেয়ার তুলনায় কম জুলুম নয়; বরং উভয় কাজ সমান জুলুম।

সপ্তম শিষ্টাচার, যখন শাগরেদের অবস্থা জানা যায় যে, তার বুদ্ধি-শুদ্ধি কম, তখন ওস্তাদ তাকে তার উপযুক্ত স্থূল বিষয় বলে দেবেন এবং এতে সূক্ষ্ম কথাও আছে, একথাও তাকে বলবেন না। কেননা, এরূপ বললে সেই স্থূল বিষয়ে শাগরেদের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যাবে। তার মন বিক্ষিপ্ত হবে এবং বলবে, তাকে শিক্ষাদানে কুণ্ঠাবোধ করা হচ্ছে। নিজের ধারণায় প্রত্যেক ব্যক্তি মনে করে, সে প্রতিটি সূক্ষ্ম জ্ঞানের উপযুক্ত। প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার প্রতি এজন্যে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ তাকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন। অথচ বাস্তবে সেই বেশী নির্বোধ, যে তার বুদ্ধি পূর্ণ হওয়ার ধারণায় বেশী আনন্দিত হয়। এ থেকে জানা যায়, সাধারণ লোকদের মধ্যে যদি কেউ শরীয়ত অনুসারী হয় এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের কাছ থেকে বর্ণিত বিশ্বাসসমূহ নতুন ব্যাখ্যা ছাড়াই তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে তার বিশ্বাসকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়; বরং তাকে তার কাজে মশগুল থাকতে দেয়া উচিত। কেননা, তার সামনে বাহ্যিক ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হলে সে সাধারণের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে দাখিল হওয়া তার জন্যে সহজ হবে না। ফলে তার মধ্যে ও গোনাহের মধ্যে যে আড়াল ছিল, তা দূর হয়ে যাবে। এর পর সে পুরোপুরি অবাধ্য শয়তান হয়ে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে। সুতরাং সাধারণের সামনে সূক্ষ্ম জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণনা করা উচিত নয়; বরং তাদেরকে কেবল এবাদত এবং যেসব কাজ তারা করে, তাতে ঈমানদারী শিক্ষা দেয়া সমীচীন। কোরআনের বিষয়বস্তু অনুযায়ী জান্নাতের

আগ্রহ এবং দোযখের ভয় দ্বারা তাদের অন্তর পূর্ণ করে দেয়া উচিত। তাদের সামনে কোন সন্দেহের অবতারণা করা যাবে না। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ তাদের মনে আটকে থাকে এবং তা বের হওয়া কঠিন হয়। ফলে তারা বরবাদ হয়ে যায়। সারকথা, সাধারণ লোকদের জন্যে বিতর্কের দ্বার উন্মোচিত করা উচিত নয়।

অষ্টম শিষ্টাচার, ওস্তাদ স্বীয় এলেম অনুযায়ী আমল করবেন। তার কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল থাকতে পারবে না। কারণ, এলেম অন্তরের চক্ষু দ্বারা জানা যায়, আর আমল বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা। বাহ্যিক চক্ষু দ্বারা দেখে এমন লোক অনেক। এমতাবস্থায় আমল এলেমের বিপরীত হলে হেদায়েত হবে না। যেব্যক্তি নিজে এক কাজ করে এবং অপরকে তা ক্ষতিকারক বলে করতে নিষেধ করে, মানুষ তার সাথে উপহাস করে এবং সেই কাজ করতে অধিক আগ্রহী হয়। তারা বলে, এ কাজটি ভাল ও আনন্দদায়ক না হলে ওস্তাদজী করেন কেন? ওস্তাদ ও শাগরেদ বাঁশ ও তার ছায়ার মত। যদি বাঁশ নিজে সোজা না হয়, তবে ছায়া সোজা হবে কিরূপে? আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ -

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে ভুলে যাও?

এতদসত্ত্বেও আলেমের উপর গোনাহের শাস্তি জালেমের তুলনায় বেশী হয়। কেননা, আলেম গোনাহে লিপ্ত হলে এক বিশ্ব গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। মানুষ তার অনুসরণ করে। যেব্যক্তি কোন কুরীতি আবিষ্কার করে, তার উপর নিজের এবং যারা এ কুরীতির অনুসরণ করে তাদের গোনাহ্ বর্তে থাকে। এ জন্যেই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ দু'ব্যক্তি আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে– এক, সেই আলেম, যে তার ইজ্জত হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত হয়েছে। দুই, সেই মূর্খ, যে দরবেশ হওয়ার ভান করছে। কেননা, মূর্খ দরবেশ হয়ে মানুষকে ধোঁকা দেয় এবং আলেম গোনাহ্ করে বিভ্রান্তি ছাড়ায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের আলামত

ভাল আলেম সম্পর্কে বর্ণিত শাস্তিবাণী থেকে জানা যায়, কেয়ামতে অন্যান্য লোকদের তুলনায় অধিকতর কঠোর শাস্তি মন্দ আলেমদের উপরই হবে। তাই যেসকল আলামত ভাল আলেম ও মন্দ আলেমের মধ্যে পার্থক্য করে, সেগুলো জানা জরুরী। আমাদের মতে দুনিয়ার আলেম মানে মন্দ আলেম, যাদের উদ্দেশ্য এলেম দ্বারা দুনিয়া উপভোগ করা এবং দুনিয়াবাসীদের কাছে সম্মান, জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সকল মানুষের তুলনায় কঠোর আযাব সেই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ্ তাআলা এলেম দ্বারা কোন উপকার দেননি। তিনি আরও বলেন ঃ এলেম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত মানুষ আলেম হয় না। অন্য এক হাদীসে আছে-

العلم علمان علم على اللسان فذالك حجة الله تعالى على ابن ادم وعلم فى القلب وذالك العلم النافع .

এলেম দু'প্রকার- এক মৌখিক এলেম। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জব্দ করবেন। দুই, অন্তরস্থিত এলেম। এটাই উপকারী এলেম। আরও বলেন ঃ শেষ যমানায় এবাদতকারী মূর্খ হবে এবং আলেম পাপাচারী হবে। আরও বলেন ঃ আলেমদের সাথে গর্ব করা, বোকাদের সাথে তর্ক করা এবং মানুষের দৃষ্টি নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে এলেম শিক্ষা করো না। যে এরূপ উদ্দেশে এলেম শিখবে, সে দোযখে যাবে। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজের এলেম গোপন করবে, আল্লাহ্ তাকে আগুনের লাগাম পরাবেন। আরও বলেন ঃ অবশ্যই আমি দাজ্জালকে ততটুকু ভয় করি না, যতটুকু দাজ্জাল নয় এমন ব্যক্তিকে ভয় করি। প্রশ্ন করা হল ঃ সে ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি পথভ্রষ্টকারী শাসকদেরকে ভয় করি। আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেমে বেশী এবং

হেদায়েতে কম, সে আল্লাহ্ তাআলার থেকে বেশী দূরে। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ কতদিন তুমি শেষ রাত্রের পথিকদের জন্যে পথ পরিষ্কার করবে এবং নিজে বিস্ময়াবিষ্টদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকবে? এমনি ধরনের আরও অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায়, এলেমের বড় বিপদ। কেননা, আলেম ব্যক্তি হয় চিরতরে ধ্বংস হওয়ার পথে, না হয় চিরন্তন সৌভাগ্যের পথে থাকে। এলেমে ডুব দিয়ে যদি সৌভাগ্য না হয়, তবে নিরাপত্তা থেকেও বঞ্চিত থাকবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের জন্যে আমি মোনাফেক আলেমকে অধিক ভয় করি। প্রশ্ন করা হল ঃ মোনাফেক আবার আলেম হবে কিরূপে? তিনি বললেন ঃ যে মুখে মুখে আলেম কিন্তু অন্তর ও আমলের দিক দিয়ে জাহেল, সেই মোনাফেক আলেম। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তুমি তাদের মধ্যে হয়ো না, যারা আলেম ও দার্শনিকদের মত এলেম রাখে; কিন্তু আমলে মূর্খদের সমান। এক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি এলেম শিক্ষা করতে চাই, কিন্তু ভয় হয়, কোথাও তা বিনষ্ট না করে দেই। তিনি বললেন ঃ তোমার এলেম ত্যাগ করে বসাই এলেম বিনষ্ট করার জন্যে যথেষ্ট। ইবরাহীম ইবনে ওকবাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ মানুষের মধ্যে সর্বাধিক অনুতাপ কার হয়? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সেই সর্বাধিক অনুতপ্ত হয়, যে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করে। মৃত্যুর সময় সেই আলেম সর্বাধিক অনুতপ্ত হবে, যে আমলে ত্রুটি করেছে। খলীল ইবনে আহমদ বলেন ঃ মানুষ চার প্রকার– এক, যে বাস্তবে জানে এবং এটাও জানে যে, সে জানে, এরূপ ব্যক্তি আলেম। তার অনুসরণ কর। দুই, যে জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সে জানে। সে নিদ্রিত। তাকে জাগাও। তিন, যে জানে না কিন্তু এটা জানে যে, সে জানে না। এরূপ ব্যক্তি হেদায়েতের যোগ্য। তাকে হেদায়েত কর। চার, যে জানে না এবং এটাও জানে না যে, সে জানে না, সে মূর্খ। তাকে বর্জন কর। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ এলেম আমলকে ডাকে। আমল সাড়া না দিলে এলেম বিদায় হয়ে যায়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ মানুষ যতক্ষণ এলেম অন্বেষণে থাকে, ততক্ষণ সে আলেম। আর যখন মনে করে, তার জানা হয়ে গেছে, তখন সে জাহেল। ফুযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ তিন ব্যক্তির প্রতি আমার দয়া হয়– এক, যে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানিত ছিল, এরপর লাঞ্ছিত হয়ে গেছে। দুই, যে ধনী ছিল, এখন নিঃস্ব হয়ে গেছে। তিন, যে আলেমকে

নিয়ে দুনিয়া খেলা করে। হযরত হাসান (রঃ) বলেন ঃ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু। আর অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করা। এরপর তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার অর্থ এই ঃ আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে হেদায়েত ছেড়ে পথভ্রষ্টতা গ্রহণ করে। যে দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে তার জন্যে আরও আশ্চর্য লাগে। তাদের চেয়ে অধিক আশ্চর্য লাগে তার জন্যে, যে অপরের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের দ্বীন বিক্রয় করে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

ان العالم ليعذب عذابا يطوف به اهل النار استعظاما لشدة عذابه ـ

আলেমকে এমন কঠোর আযাব দেয়া হবে, যার কঠোরতার কারণে দোযখীরা তার চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এতে বিপথগামী আলেমের আযাবের কথা বলা হয়েছে। উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি–

يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق اقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطوف به اهل النار فيقولون مالك فيقول كنت امر بالخير ولا اتيه وانهى عن الشروات به ـ

কেয়ামতের দিন আলেমকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়িভুঁড়ি নিয়ে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা যাঁতাকল নিয়ে ঘুরে। দোযখীরা তার আশেপাশে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে– তোমার এ পরিণতি কেন? সে বলবে ঃ আমি অপরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম, নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম।

গোনাহের কারণে আলেমের আযাব দ্বিগুণ হওয়ার কারণ, সে জেনে শুনে নাফরমানী করে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, "মোনাফেক দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে।" কারণ, তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা ইহুদীদেরকে খৃস্টানদের চেয়ে অধিক ঘৃণিত বলেছেন; অথচ ইহুদীরা আল্লাহ তাআলাকে ثالث ثلثة (তিন জনের তৃতীয় জন) বলেনি, কিন্তু তারা জানার পরে অস্বীকার করেছে। সেমতে আল্লাহ স্বয়ং বলেন ঃ يَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ তারা তাকে চেনে যেমন তাদের সন্তানদেরকে চেনে। অন্যত্র বলেন ঃ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ তাদের পরিচিতজন যখন তাদের কাছে আসল, তারা তাকে অস্বীকার করে বসল। অতএব আল্লাহর অভিসম্পাত অস্বীকারকারীদের উপর।

বালআম ইবনে বাউরার কাহিনীতে বলা হয়েছে—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ـ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗۤ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ـ

"তাদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনান, যাকে আমি আমার নিদর্শনাবলী দান করেছিলাম। অতঃপর সে সেগুলো থেকে বের হয়ে গেল। অতঃপর শয়তান তার পেছনে লাগল এবং সে পথভ্রান্তদের দলভুক্ত হয়ে গেল, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে তাকে এগুলো দ্বারা উপরে তুলে নিতে পারতাম, কিন্তু সে পৃথিবীতে স্থায়ী হল এবং আপন খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করল। অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের ন্যায়। তুমি তার উপর বোঝা চাপালে হাঁপায় এবং ছেড়ে দিলেও হাঁপায়।

পাপাচারী আলেমের অবস্থাও তদ্রূপ। বালআমও আল্লাহর কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু সে কামনাকে আঁকড়ে রইল। তাই তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সে জ্ঞান প্রাপ্ত হোক না হোক সর্বাবস্থায় হাঁপায়। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ মন্দ আলেমরা এমন, যেমন নালার

মুখে কোন পাথর রেখে দেয়া হয়। সে নিজেও পানি পান করে না এবং তা ফসলের ক্ষেতে প্রবাহিত হতেও দেয় না। এসব হাদীস ও স্মরণীয় বাণী থেকে জানা যায়, দুনিয়াদার আলেম জাহেলের তুলনায়ও শোচনীয় অবস্থা এবং কঠোর আযাবে থাকবে। যারা সফলকাম ও নৈকট্যশীল আলেম, তাঁরা ভাল আলেম অর্থাৎ, আখেরাতের আলেম। তাঁদের অনেক আলামত রয়েছে। তন্মধ্যে একটি, তাঁরা তাঁদের এলেম দ্বারা দুনিয়া অন্বেষণ করেন না। কেননা, আলেমের সর্বনিম্নস্তর, সে দুনিয়ার হেয়তা, নীচতা, মলিনতা, স্থায়িত্বহীনতা এবং আখেরাতের মাহাত্ম্য, স্থায়িত্ব, তার নেয়ামতের পরিচ্ছন্নতা এবং রাজত্বের বিশালতা জেনে নেবে। সে আরও জানবে, দুনিয়া ও আখেরাত একে অপরের বিপরীত– দু'সতীনের মত– একজনকে খুশী করলে অন্যজন নাখোশ হয়ে যায়; নিক্তির দু'পাল্লার মত– একটি যতই নীচে ঝুঁকে, অপরটি ততই উপরে উঠে। অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের মত– যতই একটির নিকটে যাবে ততই অপরটি থেকে দূরে সরে পড়বে। অথবা দুপেয়ালার মত– একটি ভর্তি ও অপরটি খালি; ভর্তিটি থেকে যে পরিমাণে খালিটি ভরবে, সেই পরিমাণে ভর্তিটি খালি হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি দুনিয়াকে এরূপ জানে না, তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। কারণ এটা দেখা ও অভিজ্ঞতা দ্বারাই জানা যায়। যার জ্ঞান বুদ্ধিই ত্রুটিযুক্ত, সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি আখেরাতের মাহাত্ম্য ও স্থায়িত্ব বুঝে না, সে কাফের, ঈমান বর্জিত। যার ঈমানই নেই সে আলেম হবে কিরূপে? আর যেব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের বৈপরীত্য জানে না, সে পয়গম্বরগণের শরীয়ত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং কোরআন পাক আদ্যোপান্ত অস্বীকার করে। এহেন ব্যক্তি আলেমরূপে গণ্য হবে কিরূপে? যেব্যক্তি এসব বিষয় জেনে আখেরাতকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার দেয় না, সে শয়তানের বন্দী। তার কামনা বাসনা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য তার উপর প্রবল হয়ে গেছে। এরূপ ব্যক্তিও আলেমদের দলভুক্ত হতে পারে না। হযরত দাউদ (আঃ)-এর রেওয়ায়েতেসমূহে আল্লাহ তাআলার উক্তি এভাবে বর্ণিত আছে– আলেম ব্যক্তি যখন তার কামনা অবলম্বন করে, তখন আমি তাকে সামান্যতম শাস্তি এই দেই যে, তাকে আমার মোনাজাতের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে দেই। হে দাউদ! আমার অবস্থা এমন আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করো না, যাকে দুনিয়া পাগলপারা করে দিয়েছে। তা হলে সে

তোমাকে আমার মহব্বতের পথে বাধা দেবে। এ ধরনের লোক আমার বান্দাদের জন্যে ডাকাতস্বরূপ। হে দাউদ! তুমি কাউকে আমাকে অন্বেষণ করতে দেখলে তার খাদেম হয়ে যাও। হে দাউদ! যেব্যক্তি কোন পলাতক বান্দাকে আমার দিকে সরিয়ে আনে, আমি তাকে সতর্ককারী ও দায়িত্ববানরূপে লিপিবদ্ধ করি, তাকে কখনও শাস্তি দেই না। এ জন্যেই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমদের শাস্তি হচ্ছে অন্তরের মৃত্যু। অন্তরের মৃত্যু হচ্ছে আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া কামনা করা। ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাযী বলেন ঃ এলেম ও জ্ঞান দ্বারা যখন দুনিয়া কামনা করা হয়, তখন তার জ্যোতি বিনষ্ট হয়ে যায়। মসঊদ ইবনে মুসাইয়েব বলেন ঃ আলেম যখন কথা ফাঁস করে, তখন সে চোর। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন তুমি আলেমকে দুনিয়া প্রত্যাশী দেখ, তখন তাকে দ্বীনের ব্যাপারে দোষী মনে কর। কেননা, যে সে বিষয়ের প্রত্যাশী, সে তাতেই মগ্ন থাকে। মালেক ইবনে দীনার বলেন ঃ আমি এক পূর্ববর্তী কিতাবে আল্লাহ্ তাআলার এই বাণী পাঠ করেছি– আলেম যখন দুনিয়াকে মহব্বত করে, তখন আমি নিম্নতম শাস্তিস্বরূপ মোনাজাতের মিষ্টতা তার মন থেকে দূর করে দেই। জনৈক ব্যক্তি তার ভ্রাতাকে লেখল ঃ তোমাকে এলেম দান করা হয়েছে। এখন এলেমের নূর গোনাহের অন্ধকার দ্বারা নির্বাপিত করো না। নতুবা যেদিন আলেমগণ তাদের এলেমের আলোকে চলবে, সেদিন তুমি অন্ধকারে থেকে যাবে। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায রাযী দুনিয়াদার আলেমদেরকে বলতেন ঃ আলেমগণ! তোমাদের প্রাসাদ কায়সারের মত এবং গৃহ কেসরার মত। তোমাদের পোশাক খুব পরিপাটি, মোজা জালুতের মত, সওয়ারী কারূনের মত, পাত্র ফেরআউনের মত, গোনাহ মূর্খের মত এবং মাযহাব শয়তানের মত। অতএব মুহাম্মদী শরীয়ত কোথায়? জনৈক ব্যক্তি একজন সাধককে জিজ্ঞেস করল ঃ যেব্যক্তি গোনাহ করলে শাস্তি পায়, আপনার মতে সে কি আল্লাহ্ তাআলাকে চেনে না? সাধক বললেন ঃ যার কাছে দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় অগ্রাধিকার রাখে, সে আল্লাহ্ তাআলাকে চেনে না– এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

আখেরাতের আলেমদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে ধন-সম্পদ বর্জন করা যথেষ্ট– এরূপ মনে করো না। কেননা, আড়ম্বরপ্রীতির ক্ষতি ধন-সম্পদের চেয়ে বেশী। এ জন্যেই বিশর (রহঃ) বলেন–حدثنا

শব্দটি যা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, দুনিয়ার দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। তিনি দশ বস্তারও কিছু বেশী কিতাব দাফন করে দেন এবং বলেন ঃ আমার হাদীস বর্ণনা করার স্পৃহা আছে। এ স্পৃহা দূর হয়ে গেলে পরে হাদীস বর্ণনা করব। তাঁরই অথবা অন্য কোন বুযুর্গের উক্তি, যখন তোমার হাদীস বলার ইচ্ছা হয় তখন চুপ করে থাক। আর যখন ইচ্ছা না হয়, তখন হাদীস বর্ণনা কর। কারণ, শিক্ষাদান ও পথপ্রদর্শকের পদমর্যাদায় যে জাঁকজমকপ্রীতি আছে, তা সকল জাগতিক আনন্দের চেয়ে বেশী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে তার ইচ্ছা অনুসরণ করবে, সে দুনিয়াদারদের মধ্যে গণ্য হবে। এ কারণেই সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ হাদীসের ফেতনা ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির ফেতনার চেয়ে অধিক। এ ফেতনা অধিক ভয় করার যোগ্য বিধায় আল্লাহ্ তাআলা রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলেছেন–

وَلَوْ لَا اَنْ ثَبَّتْنَكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا ـ

"আমি যদি আপনাকে দৃঢ় না রাখতাম, তবে তাদের প্রতি আপনার মন সামান্য ঝুঁকে পড়ত।"

সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষ মৃত। আমেল ব্যতীত আলেমগণও সকলেই মাতাল। এখলাস ছাড়া সকল আমেলও ভ্রান্ত। যাদের এখলাস আছে তারাও ভীত, তাদের পরিণাম কি হবে? আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন হাদীস তলব করে অথবা বিবাহ করে অথবা জীবিকার জন্যে সফর করে, তখন সে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। হাদীস তলবের মধ্যে তাদের উদ্দেশ্য থাকে উচ্চ সনদ লাভ অথবা এমন হাদীস তলব করা, যার প্রয়োজন আখেরাতে নেই। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির গতি আখেরাতের দিকে এবং সে দুনিয়ার পথে ধাবমান হয়, সে আলেম হবে কিরূপে? সালেহ ইবনে হাস্‌সান নফরী বলেন ঃ আমি অনেক বড় বড় ওস্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁরা সকলেই হাদীসের পাপাচারী আলেম থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى

يصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة -

"যে শিক্ষা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয়, কেউ যদি সেই শিক্ষা দুনিয়ার অর্থসম্পদ পাওয়ার উদ্দেশে অন্বেষণ করে, তবে সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না।"

আল্লাহ তা'আলা মন্দ আলেমের এই পরিচয় বর্ণনা করেছেন যে, সে এলেম দ্বারা দুনিয়া ভক্ষণ করে। তিনি ভাল আলেমের গুণস্বরূপ বিনয় ও সংসারের প্রতি অনাসক্তি উল্লেখ করেছেন। দুনিয়ার আলেম সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا -

"যখন আল্লাহ তা'আলা কিতাবপ্রাপ্তদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন, তারা এই কিতাব মানুষের সামনে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেবে এবং গোপন করবে না, তখন তারা এই অঙ্গীকার পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং এর বিনিময়ে সামান্য দুনিয়া ক্রয় করে নিল। আখেরাতের আলেমদের শানে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خٰشِعِينَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ -

"কিতাবধারীদের মধ্যে এমনও লোক রয়েছে, যে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহর জন্যে বিনয়াবনত হয়ে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে নিকৃষ্ট দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করে না। তাদের জন্যেই তাদের পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে।"

জনৈক মনীষী বলেন ঃ আলেমগণ পয়গম্বরগণের দলভুক্ত হয়ে উত্থিত হবে। বিচারকদের হাশর হবে রাজা বাদশাহদের দলে। যে ফেকাহবিদ এলেম দ্বারা দুনিয়া হাসিল করে, সে-ও বিচারকদের অনুরূপ। আবু দারদা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জনৈক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন, যারা দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশে ফেকাহবিদ হয়, আমল না করার জন্যে এলেম শেখে, আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়া তলব করে, মানুষের দৃষ্টিতে ছাগলের চামড়া পরিধান করে এবং তাদের অন্তর ব্যাঘ্রের মত, মুখ মধুর চেয়ে মিষ্ট, অন্তর ইলুয়ার চেয়ে তিক্ত, আমাকেই প্রতারণা করে এবং আমার সাথেই ঠাট্টা করে, তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি তাদের জন্যে এমন অনর্থ সৃষ্টি করব, যা সহনশীল ব্যক্তিও সইতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ এ উম্মতের আলেম দুব্যক্তি– এক, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, সে মানুষের মধ্যে তা ব্যয় করে এবং অর্থের লোভ করে না। এরূপ ব্যক্তির প্রতি আকাশের পাখী, সমুদ্রের মাছ, পৃথিবীর চতুষ্পদ জন্তু এবং কেরামান কাতেবীন রহমতের দোয়া করে। সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে নেতা ও সম্ভ্রান্ত হয়ে আসবে; এমনকি, রসূলগণের সঙ্গে থাকবে। দুই, যাকে আল্লাহ তা'আলা এলেম দিয়েছেন, কিন্তু সে তা মানুষকে দান করতে কৃপণতা করে, অর্থের লোভ করে এবং এর বিনিময়ে নিকৃষ্ট দুনিয়া ক্রয় করে। এরূপ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিহিত অবস্থায় আসবে। জনৈক ঘোষক মানুষের সামনে ঘোষণা করবে– সে অমুকের পুত্র অমুক! আল্লাহ তাকে দুনিয়াতে এলেম দিয়েছিলেন কিন্তু, সে কৃপণতা করেছে। মানুষকে এলেম শেখায়নি এবং লোভের হাত প্রসারিত করেছে। সকল মানুষের হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে আযাবের মধ্যে থাকবে।

এর চেয়েও কঠোর রেওয়ায়েত এটি– এক ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর খেদমত করত। সে মানুষের মধ্যে প্রচার করতে থাকে যে, আমাকে মূসা সফিউল্লাহ একথা বলেছেন, মূসা নাজিউল্লাহ এরূপ বলেছেন এবং মূসা কলীমুল্লাহ এমন বলেছেন। অবশেষে তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ হয়ে যায়। সেব্যক্তি চলে যাওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ) তার খোঁজ নিতে শুরু করলেন; কিন্তু কোথাও সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে এক ব্যক্তি একটি শূকরের গলায় কালো রশি বেঁধে উপস্থিত

হল এবং আরজ করল ঃ আপনি অমুক ব্যক্তিকে চেনেন? মূসা (আঃ) বললেন ঃ হাঁ। লোকটি বলল ঃ এ শূকরটিই সেব্যক্তি। মূসা (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন, ইলাহী! একে আসল আকৃতিতে ফিরিয়ে দিন, যাতে তাকে এরূপ দশা হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা ওহী পাঠালেন। আদম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত পয়গম্বরগণ ও ওলীগণ আমাকে যেসব গুণে ডেকেছে, যদি তুমি সেসব গুণে আমাকে আহ্বান কর, তবুও আমি তোমার আবেদন মঞ্জুর করব না, কিন্তু যে কারণে আমি তার আকৃতি বিকৃত করে দিয়েছি, তা বলে দিচ্ছি। এ ব্যক্তি দ্বীনের বদলে দুনিয়া অন্বেষণ করত।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আরও কঠোর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আলেমের কাছে বলা যদি শ্রবণের চেয়ে উত্তম হয়, তবে এটা তার জন্যে একটি বিপদ। অথচ বলার মধ্যে সাজানো গুছানো ও বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। বক্তা ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে না। চুপ থাকার মধ্যে নিরাপত্তা ও বুদ্ধিমত্তা নিহিত। কোন কোন আলেম তাদের এলেম কুক্ষিগত করে রাখে; অন্যের কাছেও এলেম থাকুক এটা তারা চায় না। এরূপ আলেম দোযখের প্রথম স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম এলেমের ব্যাপারে বাদশাহর মত হয়ে থাকে। কোন আপত্তি তোলা হলে অথবা শৈথিল্য প্রদর্শন করা হলে, তারা রেগে-মেগে আগুন হয়ে যায়। এরূপ আলেম দোযখের দ্বিতীয় স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম তাদের এলেম ও উত্তম হাদীসগুলো বিশেষভাবে ধনীদের জন্যে উৎসর্গ করে, যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে এই এলেমের যোগ্য মনে করে না। এরূপ আলেম দোযখের তৃতীয় স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম নিজেদেরকে মুফতী হিসাবে আখ্যায়িত করে এবং ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পদ গ্রহণকারীদেরকে পছন্দ করেন না। এরূপ আলেম দোযখের চতুর্থ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম দোযখের পঞ্চম স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম নিজের এলেমকে মানুষের মধ্যে মর্যাদা লাভের উপায় সাব্যস্ত করে। এরূপ আলেম দোযখের ষষ্ঠ স্তরে থাকবে। কোন কোন আলেম অহংকার ও আত্মম্ভরিতাকে নগণ্য বলে মনে করে, রূঢ় ভাষায় ওয়ায করে এবং কেউ উপদেশ দিলে নাক সিঁটকায়। এরূপ আলেম দোযখের সপ্তম স্তরে থাকবে। তোমার উচিত এলেমে চুপ থাকা, যাতে শয়তানের উপর প্রবল

হতে পার। কোন হাসির কথা ছাড়া কখনও হাসবে না এবং প্রয়োজন ছাড়া স্বস্থান ত্যাগ করবে না। অন্য এক হাদীসে আছে–

ان العبد لينتشر له من الثناء ما يملا ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جناح بعوضه .

অর্থাৎ, "মানুষের সুখ্যাতি এত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, যা পূর্ব ও পশ্চিমকে পূর্ণ করে দেয়। অথচ আল্লাহর কাছে তা মাছির ডানার সমানও নয়।"

আরও বর্ণিত আছে, একবার হযরত হাসান বসরী ওয়াযের মজলিস থেকে উঠলে জনৈক খোরাসানী বিত্তশালী ব্যক্তি পাঁচ হাজার দেরহাম ও দশ থান চিকন কাপড়ের একটি পুঁটলি তাঁকে নযরানা হিসাবে পেশ করল। সে আরজ করল ঃ দেরহামগুলো খরচ করার জন্যে আর কাপড় পরিধান করার জন্যে পেশ করলাম। হযরত হাসান বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আপদমুক্ত রাখুন। এই দেরহাম ও থান তুলে নাও এবং নিজের কাছেই রেখে দাও। আমার এর প্রয়োজন নেই। যেব্যক্তি আমার মজলিসে বসে এমন নযরানা কবুল করে, সে যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে যাবে, তখন তার দ্বীনদারী থাকবে না। জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে কোন আলেমের কাছে বসো না; বরং এমন আলেমের কাছে বসো, যে পাঁচটি বিষয় থেকে পাঁচটি বিষয়ের দিকে আহ্বান করে– (১) সন্দেহ থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের দিকে, (২) রিয়া থেকে এখলাসের দিকে, (৩) সংসারাসক্তি থেকে সংসার ত্যাগের দিকে, (৪) অহংকার থেকে বিনয়ের দিকে, (৫) শত্রুতা থেকে শুভেচ্ছার দিকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِىْ زِيْنَتِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ قَارُوْنُ اِنَّهٗ لَذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ وَّقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا وَّلَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الصّٰبِرُوْنَ .

অর্থাৎ, অতঃপর কারূন সেজেগুজে তার সম্প্রদায়ের মধ্যে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত, তারা বলল ঃ হায়, কারূনের মত ধন আমরা কিরূপে পাব! নিশ্চয় সে মহা ভাগ্যবান। আর যারা এলেম প্রাপ্ত হয়েছিল তারা বলল ঃ তোমাদের জন্য দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া সওয়াব তাদের জন্যে উত্তম, যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে। একথা তাদের মনেই লাগে, যারা সবরকারী।

এ আয়াতে আলেমদের এই বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা দুনিয়ার উপর আখেরাতকে অগ্রাধিকার দেয় এবং তা অবলম্বন করে। আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁদের কাজ কথার বিপরীত হয় না। বরং তাঁরা কোন কাজ করার কথা তখনই বলেন, যখন নিজেরা তা করে নেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ

তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের কথা বল আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ـ

তোমরা যা করবে না তা বলবে, এটা আল্লাহর কাছে বড় অপরাধ। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে–

وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ـ

তোমাদেরকে যা করতে নিষেধ করি, আড়ালে আমি করব– এটা আমি চাই না।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ـ আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদেরকে জ্ঞান দান করবেন। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا –আল্লাহকে ভয় কর এবং জ্ঞানার্জন কর। وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا –আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে বললেন ঃ হে মরিয়ম তনয়, নিজেকে উপদেশ দাও। নিজে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে গেলে অপরকে উপদেশ দাও। নতুবা আমাকে লজ্জা কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

مررت ليلة اسرى بى باقوام كان تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من انتم قالوا كنا نامر بالخير ولا ناتيه وننهى عن الشر وناتيه ـ

অর্থাৎ, মে'রাজের রাতে আমি এমন লোকদের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিল। আমি বললাম ঃ তোমরা কারা? তারা বলল ঃ আমরা অপরকে সৎকাজ করতে বলতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না। অপরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু নিজেরা তা করতাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ পাপাচারী আলেম ও মূর্খ আবেদের কারণে আমার উম্মত বরবাদ হবে। সকল মন্দের মন্দ হচ্ছে মন্দ আলেম এবং সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভাল আলেম। আওযায়ী বলেন ঃ খৃস্টানদের গোরস্থান এই মর্মে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করল যে, কাফের মৃতদের দুর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলে পাঠালেন ঃ মন্দ আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ তোমাদের মধ্যকার দুর্গন্ধের চেয়ে বেশী। ফোযায়ল ইবনে আয়ায বলেন ঃ আমি শুনেছি, কেয়ামতে পৌত্তলিকদের পূর্বে মন্দ আলেমদের হিসাব-নিকাশ হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন ঃ যে জানে না, তার তো একবার দুর্ভোগ হবে; আর যে জানে এবং আমল করে না, তার দুর্ভোগ হবে সাত বার। শা'বী (রহঃ) বলেন, জান্নাতের কিছু লোক দোযখের কোন কোন লোককে দেখে বলবেন ঃ তোমরা দোযখে গেলে কেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের শিক্ষা দানের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন? তারা বলবে ঃ আমরা অপরকে সৎ কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা পালন করতাম না। হাতেম আসাম্ম (রহঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সেই আলেমের চেয়ে অধিক অনুতাপ আর কারও হবে না, যে মানুষকে এলেম শিক্ষা দিয়েছে এবং মানুষ তদনুযায়ী আমল করেছে, কিন্তু সে আমল করেনি। মানুষ তো তার সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে, কিন্তু সে নিজে ধ্বংস হয়েছে।

মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আলেম যখন তার এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তখন তার উপদেশ মানুষের মন থেকে এমনভাবে ফসকে যায়, যেমন মসৃণ পাথরের উপর থেকে পানির ফোঁটা

গড়িয়ে পড়ে। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ মক্কা মোয়াজ্জমায় আমি এক পাথরের কাছ দিয়ে গেলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ আমাকে উল্টিয়ে জ্ঞান অর্জন কর। আমি পাথরটি উল্টিয়ে দিলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ তুমি যা জান, তদনুযায়ী আমল কর না। সুতরাং এমন বিষয় কেন জানতে চাও, যা তোমার জানা নেই। ইবনে সাম্মাক (রহঃ) বলেন ঃ অনেক মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহকে ভুল বসে আছে। অনেকে আল্লাহর সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, কিন্তু নিজেরা ভয়হীন। অনেক মানুষ অপরকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয়, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে। অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি আহ্বান করে, কিন্তু নিজেরা আল্লাহ থেকে পলায়ন করে। অনেক মানুষ আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, কিন্তু তার আয়াতসমূহ থেকে দূরে থাকে।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ আমরা যখন কথাবার্তা শুদ্ধ করলাম, তখন তাতে আর ভুল করলাম না, কিন্তু আমলে ভুল করলাম, তা ঠিক করিনি। আওযায়ী বলেন ঃ যখন বক্তব্যে অলঙ্কারের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে যায়, তখন বিনয় ও নম্রতা অবশিষ্ট থাকে না। আবদুর রহমান ইবনে গনম বলেন ঃ আমার কাছে দশ জন সাহাবী এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা মসজিদে কোবায় জ্ঞানচর্চায় রত ছিলেন, এমন সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে তশরীফ আনলেন এবং বললেন ঃ যে পরিমাণ ইচ্ছা শিখে নাও, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সওয়াব দেবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম শেখে এবং তদনুযায়ী আমল করে না, সে এমন, যেমন কোন নারী সংগোপনে যিনা করে এবং গর্ভ সঞ্চার হয়ে যায়। এর পর যখন গর্ভ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন সে লাঞ্ছিত হয়। যেব্যক্তি এলেম অনুযায়ী আমল করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাকেও কেয়ামতের দিন সর্বসমক্ষে লাঞ্ছিত করবেন। হযরত মুআয (রহঃ) বলেন ঃ আলেমের পদস্খলনকে ভয় কর। কেননা, মানুষের মধ্যে তার কদর বেশী। তার পদস্খলনে মানুষ তার অনুসরণ করে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন আলেমের পদস্খলন ঘটে, তখন তার পদস্খলনে এক বিশ্ব পদস্খলিত হয়ে পড়ে। তিনি আরও বলেন ঃ তিনটি বিষয়ের কারণে দুনিয়ার মানুষ বরবাদ হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আলেমের পদস্খলন। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এমন এক সময় আসবে, যখন মনের মিষ্টতা তিক্ত হয়ে যাবে। তখন

এলেম দ্বারা আলেমের উপকার হবে না এবং তালেবে এলেমও উপকৃত হবে না। তখন আলেমদের অন্তর হবে লোনা মাটির মত, যার উপর পানির ফোঁটা পড়লেও সামান্য মিষ্টতাও অনুভূত হয় না। এটা তখন হবে যখন আলেমদের অন্তর দুনিয়ার মহব্বতের প্রতি আকৃষ্ট হবে। তখন আল্লাহ্ তাআলা অন্তর থেকে জ্ঞানের ঝরণা বের করে হেদায়েতের প্রদীপ নির্বাপিত করে দেবেন। তখন আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করলে তারা মুখে বলবে ঃ আল্লাহকে ভয় করি, কিন্তু পাপাচার তাদের আমলের মধ্যে প্রকট থাকবে। ভাষার ছড়াছড়ি হবে এবং অন্তর দুষ্প্রাপ্য হবে। আল্লাহর কসম, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, এটা এজন্যে হবে যে, ওস্তাদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখাবে এবং শাগরেদরা গায়রুল্লাহর জন্যে শেখবে। তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত আছে– যে বিষয় তুমি জান না, তার এলেম অন্বেষণ করো না, যতটুকু জান তদনুযায়ী আমল কর। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা যে যমানায় রয়েছ, তাতে কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ ছেড়ে দিলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতি সত্বর এমন এক সময় আসবে, যখন কেউ তার এলেমের এক দশমাংশ অনুযায়ী আমল করলেও মুক্তি পেয়ে যাবে। এটা হবে মিথ্যুকদের আধিক্যের কারণে। জেনে রাখ, আলেম হল কাযী তথা বিচারপতির মত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

القضاة ثلثة قاضى قضى بالحق وهو يعلم فذالك في الجنة وقاضى قضى بالجور وهو يعلم اولا يعلم فهما في النار -

অর্থাৎ, বিচারপতি তিন প্রকার– এক, যে সত্য বিচার করে এবং সে আলেম। সে জান্নাতে থাকবে। দুই, যে অন্যায় বিচার করে এবং সে আলেম অথবা– তিন, আলেম নয়। এরা উভয়েই জাহান্নামে থাকবে।

কা'ব (রহঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় এমন আলেম হবে, যারা মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হতে বলবে এবং নিজেরা অনাসক্ত হবে না, মানুষকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং নিজেরা ভয় করবে না, মানুষকে শাসকবর্গের কাছে যেতে বারণ করবে এবং নিজেরা তাদের কাছে যাবে। এরা আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়া অবলম্বন করবে এবং মুখের জোরে

খাবে। ধনীদেরকে কাছে বসাবে– ফকীরদেরকে নয়। এরা এলেম নিয়ে লড়াই করবে, যেমন নারীরা পুরুষকে নিয়ে লড়াই করে। তাদের কোন সহচর অপরের কাছে বসলে তারা তার উপর রাগান্বিত হবে। এরা হবে অহংকারী এবং আল্লাহ্ তাআলার দুশমন।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান কোন সময় এলেমের মাধ্যমেই তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করবে। প্রশ্ন করা হল ঃ এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন ঃ শয়তান বলবে– এলেম শেখ এবং শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমল করো না। সুতরাং মানুষ এলেমে ব্যাপৃত থাকবে এবং আমলে টালবাহানা করবে। অবশেষে সে কোন আমল না করেই মারা যাবে। সিররী সকতী (রহঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি এলমে জাহেরের প্রতি লোভী ছিল। সে এবাদতের জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করলে আমি তার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, কেউ বলছে ঃ আল্লাহ তোমাকে বিনাশ করুন, তুমি এলেমকে আর কত নাশ করবে? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমি তো এলেমকে স্মরণ করি। সে বলল ঃ এলেমকে স্মরণ করা হচ্ছে এলেম অনুযায়ী আমল করা। এ স্বপ্ন দেখার পর আমি এলেমের অন্বেষণ বর্জন করে আমলে আত্মনিয়োগ করেছি। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ অধিক রেওয়ায়েত দ্বারা এলেম হয় না, বরং এলেম হচ্ছে খোদাভীতি। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যত ইচ্ছা এলেম শেখ, কিন্তু আমল না করা পর্যন্ত আল্লাহ সওয়াব দেবেন না। কেননা, এলেম দ্বারা বোকাদের উদ্দেশ্য রেওয়ায়েত করা, আর আলেমদের উদ্দেশ্য নিজেদের পাহারা দেয়া। মালেক বলেন ঃ এলেম অর্জন করা ও তা ছড়িয়ে দেয়া উভয়ই ভাল, যদি নিয়ত ঠিক থাকে, কিন্তু যে বস্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার সাথে থাকে তার উপর অন্য বস্তু অবলম্বন করো না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমল করার জন্যে কোরআন নাযিল হয়েছে। তোমরা এর পাঠ ও পাঠ দানকেই আমল সাব্যস্ত করে নিয়েছ। সত্বরই কিছু লোক হবে, যারা একে বর্শার মত সোজা করবে। তারা ভাল লোক হবে না। যে আলেম আমল করে না সে রোগীর মত, যে ওষুধের গুণাগুণ বর্ণনা করে, অথবা ক্ষুধার্ত ব্যক্তির মত, যে সুস্বাদু খাদ্যের নাম উচ্চারণ করে কিন্তু নিজে তা পায় না। এরূপ লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ وَلَكُمُ

اَلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُوْنَ। তোমাদের জন্যে দুর্ভোগ যা বল তার কারণে। হাদীসে আছে– আমি আমার উম্মতের জন্যে যে বিষয়ের ভয় করি, তা হচ্ছে আলেমের পদস্খলন। কোরআনের বর্ণনা মতে আখেরাতের আলেমদের একটি আলামত, তাদের মনোযোগ এমন এলেমের দিকে থাকে, যা আখেরাতে কাজে আসে এবং এবাদতে উৎসাহ যোগায়। যেব্যক্তি আমল থেকে মুখ ফিরিয়ে তর্কবিতর্কে মেতে থাকে, সে সেই রোগীর মত, যে চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং চিকিৎসক কোথাও যাওয়ার জন্যে উদ্যত থাকে। সংকীর্ণ সময়ে রোগী চিকিৎসকের সাথে ওষুধের গুণাগুণ ও চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় মেতে উঠে এবং নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে না। এরূপ ব্যক্তির বোকামিতে কোন সন্দেহ আছে কি? রেওয়ায়েতে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল ঃ আমাকে কিছু এলেমের কথাবার্তা শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহ তা'আলাকে চিনেছ? লোকটি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ তা হলে যাও। প্রথমে এসব বিষয়ে পাকাপোক্ত হও। এরপর তোমাকে নতুন নতুন বিষয়ও বলে দেব।

শাকীক বলখী (রহঃ)-এর শাগরেদ হাতেম আসামের মত শিক্ষা হওয়া উচিত। বর্ণিত আছে, একদিন শাকীক হাতেমকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কতদিন ধরে আমার সাথে রয়েছ ? হাতেম বললেন ঃ তেত্রিশ বছর ধরে। শাকীক বললেন ঃ এ সময়ের মধ্যে তুমি আমার কাছ থেকে কি শিখলে? হাতেম বললেন ঃ আমি আটটি মাসআলা শিক্ষা করেছি। শাকীক বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমার সময় তোমার জন্যে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তুমি মাত্র আটটি বিষয় শিখলে ? হাতেম বললেন ঃ ওস্তাদ, আমি বেশী শিখিনি। মিথ্যা বলা আমি পছন্দ করি না। শাকীক বললেন ঃ আচ্ছা, বল তো সে আটটি বিষয় কি, যা তুমি শিখেছ ? হাতেম বললেন ঃ প্রথম, আমি মানুষকে দেখলাম, প্রত্যেকের একটি প্রিয় বস্তু থাকে যা কবর পর্যন্ত তার সাথে থাকে। যখন সে কবরে পৌঁছে যায়, তখন সে প্রিয় বস্তু থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাই আমি সৎকর্মকে আমার প্রিয় বস্তু সাব্যস্ত করেছি, যাতে আমি কবরে গেলে আমার প্রিয় বস্তুও আমার সাথে থাকে। শাকীক বললেন ঃ তুমি চমৎকার শিখেছ। এখন বাকী সাতটি বল। হাতেম বললেন ঃ দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছি ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ـ

অর্থাৎ, "এবং কেউ তার পালনকর্তার সম্মুখে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং নিজেকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার ঠিকানা।" আমি বুঝেছি, আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যথার্থ। তাই আমি খেয়াল-খুশী দূর করার জন্যে নিজেকে শ্রমে নিযুক্ত করেছি। ফলে আমি আল্লাহর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

তৃতীয়, দুনিয়াতে দেখলাম, যার কাছে যে মূল্যবান বস্তু রয়েছে, তাকে সে হেফাযতে তুলে রাখে। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলাকে বলতে দেখলাম– مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা অবশিষ্ট থাকবে।"

এরপর মূল্যবান যা কিছু আমার হাতে এসেছে, তা আল্লাহর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি, যাতে সেখানে মওজুদ থাকে।

চতুর্থ, আমি প্রত্যেক মানুষকে ধন-সম্পদ, বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতি আকৃষ্ট পেয়েছি, কিন্তু এসব বিষয়ে চিন্তা করে দেখলাম, এগুলো তুচ্ছ। এর পর আল্লাহ তা'আলার উক্তির দিকে লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন– اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ

নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক সম্মানিত, যে অধিক পরহেযগারী অবলম্বন করেছে।

পঞ্চম, আমি মানুষকে দেখলাম, পরস্পরের প্রতি কুধারণা করে এবং একে অপরকে মন্দ বলে। এর কারণ হিংসা। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তি খোঁজ করে দেখলাম, তিনি বলেন ঃ

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ـ

অর্থাৎ আমি মানুষের মধ্যে পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বন্টন

করে দিয়েছি। তাই আমি হিংসা পরিত্যাগ করে মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছি। আমি জেনেছি, রুজির বন্টন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয়। তাই আমি মানুষের সাথে শত্রুতা ত্যাগ করেছি।

ষষ্ঠ, আমি মানুষকে পারস্পরিক হানাহানি, মারামারি ও কাটাকাটিতে লিপ্ত দেখেছি। এরপর আমি আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলাম। তিনি বলেন ঃ

إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ـ

অর্থাৎ নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তাকে দুশমনরূপে গ্রহণ কর। তাই আমি কেবল শয়তানকেই আমার শত্রু সাব্যস্ত করেছি এবং তার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছি। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তার শত্রুতার সাক্ষ্য দিয়েছেন। আমি শয়তান ছাড়া অন্য সকল মানুষের শত্রুতা বর্জন করেছি।

সপ্তম, আমি মানুষকে দেখেছি, প্রত্যেকেই এক টুকরা রুটির আকাঙ্ক্ষী। এ ব্যাপারে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে এবং অবৈধ কাজকর্মের দিকে পা বাড়ায়। এর পর আমি আল্লাহর এরশাদের প্রতি লক্ষ্য করেছি। তিনি বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا ـ

অর্থাৎ পৃথিবীস্থ পত্যেক প্রাণীর রিযিক আল্লাহর যিম্মায়। এতে আমি বুঝলাম, আমি আল্লাহ তা'আলার সেই প্রাণীদেরই একজন, যাদের রিযিক তাঁর যিম্মায়। তাই আমি এমন সব কাজে মশগুল হয়েছি, যা আমার যিম্মায় আল্লাহর হক এবং আল্লাহর যিম্মায় আমার যা হক, তার অন্বেষণ বর্জন করেছি।

অষ্টম, আমি প্রত্যেক মানুষকে দেখলাম, বিশেষ কিছুর উপর ভরসা করে। কেউ বিষয়সম্পত্তির উপর, কেউ ব্যবসায়ের উপর এবং কেউ নিজের স্বাস্থ্যের উপর ভরসা করে। এভাবে প্রত্যেক সৃষ্টি তার মতই আরেক সৃষ্টির উপর ভরসা করে থাকে। এরপর আল্লাহ তা'আলার উক্তির প্রতি লক্ষ্য করলাম।

তিনি বলেন ঃ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থাৎ যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তাই আমি আল্লাহ তা'আলার উপরই ভরসা করেছি। তিনিই আমার জন্যে যথেষ্ট।

শাকীক বলখী (রহঃ) বললেন ঃ হে হাতেম! আল্লাহ তোমাকে তওফীক দিন। আমি তওরাত, ইনজীল, যবুর ও কোরআন পাকে চিন্তা করে সবগুলোর মূল এই আটটি বিষয়কে পেয়েছি। যে কেউ এ আটটি বিষয় অনুযায়ী আমল করবে, সে যেন এই আসমানী কিতাব চতুষ্টয় অনুযায়ীই আমল করবে। সারকথা, এ ধরনের এলেম উপলব্ধি করার ইচ্ছা আখেরাতের আলেমগণই করেন। দুনিয়াদার আলেমরা এমন এলেমে মশগুল হয়, যা থেকে ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ হয়; তারা সে এলেম ছেড়ে দেয়, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন।

যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ আমি বুযুর্গগণকে দেখেছি, তাঁরা একে অপরের কাছ থেকে পরহেযগারী ছাড়া অন্য কিছু শিখতেন না। আজকাল মানুষ কালাম শাস্ত্র ছাড়া অন্য কিছু শেখে না।

আখেরাতের আলেমদের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা পানাহারের স্বাচ্ছন্দ্য, পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা এবং গৃহ ও আসবাবপত্রের সাজসজ্জার দিকে আকৃষ্ট হন না। বরং এসব ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন এবং সামান্য পরিমাণ গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করেন। কারণ, এসব বিষয়ের আকর্ষণ যত কম হবে, ততই আল্লাহ্র নৈকট্য বৃদ্ধি পাবে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি এর প্রমাণ ঃ

হাতেম আসাম্মের শাগরেদ আবু আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন ঃ আমি হাতেমের সাথে রায় প্রদেশে গেলাম এবং আমাদের তিনশ' বিশ ব্যক্তির কাফেলা হজ্জের উদ্দেশে রওয়ানা হল। সকলেই ছিল কম্বল পরিহিত। কারও কাছে খাদ্যের থলে ছিল না। আমরা এক সওদাগরের বাড়ীতে মেহমান হলাম। লোকটি খুব সামর্থ্যবান না হলেও অতিথিবৎসল ছিল। সে রাত্রে আমাদের আতিথেয়তা করল। সকালে সে হাতেমকে বলল ঃ আপনার কিছু প্রয়োজন থাকলে বলুন। কেননা, আমি একজন অসুস্থ ফেকাহ্‌বিদকে দেখতে যাব। তিনি বললেন ঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া সওয়াবের কাজ। আর ফেকাহ্‌বিদকে দেখতে যাওয়া তো এবাদত।

আমিও তোমার সাথে যাব। অসুস্থ ফেকাহ্‌বিদ ছিল রায়ের বিচারপতি মোহাম্মদ ইবনে মোকাতেল। আমরা যখন তাঁর ঘরের দরজায় পৌঁছলাম, তখন কুরসীবিশিষ্ট সুরম্য দরজা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম, একজন আলেমের দরজাও এমন হতে পারে! অনুমতি পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে আমরা দেখলাম, বাসভবনটি সুবিস্তৃত, সুন্দর গালিচা বিছানো ও সুদৃশ্য পর্দা ঝুলানো। হাতেম আরও বিস্ময়াবিষ্ট হলেন। এরপর আমরা সেই স্থানে গেলাম, যেখানে বিচারপতি ছিলেন। সেখানে নরম গদি বিছানো ছিল এবং তার উপর বিচারপতি শায়িত ছিলেন। শিয়রের দিকে জনৈক গোলাম পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সওদাগর বিচারপতির শিয়রের দিকে বসে কুশল জিজ্ঞেস করল। হাতেম দাঁড়িয়ে রইলেন। বিচারপতি তাঁকে বসার জন্যে ইশারা করলে তিনি বললেন ঃ আমি বসব না। বিচারপতি শুধাল ঃ আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? হাতেম বললেন ঃ হাঁ, আমি একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে চাই। বিচারপতি বললেন ঃ জিজ্ঞেস করুন। হাতেম বললেন ঃ আপনি উঠে বসলে জিজ্ঞেস করব। বিচারপতি উঠে বসলে হাতেম বললেন ঃ আপনি কার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন? বিচারপতি বললেন ঃ বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণের কাছ থেকে, যাঁরা আমার সামনে হাদীস বর্ণনা কচ্ছেন। হাতেম শুধালেন ঃ তাঁরা কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ সাহাবায়ে করামের কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ সাহাবায়ে কেরাম কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ)-এর কাছ থেকে। প্রশ্ন হল ঃ তিনি কার কাছ থেকে শিখেছেন? উত্তর হল ঃ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে। হাতেম বললেন ঃ যে এলেম আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিবরাঈল, জিবরাঈলের কাছ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর কাছ থেকে সাহাবায়ে কেরাম, তাঁদের কাছ থেকে বিশ্বাসযোগ্য আলেমগণ এবং তাঁদের কাছ থেকে আপনি লাভ করেছেন, তাতে আপনি কোথাও একথাও শুনেছেন কি যে, যেব্যক্তির ঘরে পরিচারক থাকে, স্বাচ্ছন্দ্য বেশী থাকে, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড়। বিচারপতি বলল ঃ না শুনিনি। হাতেম শুধালেন ঃ তা হলে কি শুনেছেন? বিচারপতি বলল ঃ শুনেছি, যেব্যক্তি সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়, আখেরাতের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে, মিসকীনদেরকে ভালবাসে এবং আখেরাতের জন্য সাজসরঞ্জাম

পূর্বেই পাঠিয়ে দেয়, তার মর্তবা আল্লাহ তাআলার কাছে বড় হবে। হাতেম বললেন ঃ তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম এবং সৎকর্মপরায়ণদের অনুসরণ করছেন, না ফেরআউন ও নমরূদের অনুসরণ করছেন, যারা সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দিয়ে দালান তৈরী করেছিল? হে মন্দ আলেমগণ! আপনাদের মত লোকদেরকে দেখেই দুনিয়ালোভী মূর্খরা বলে, আলেমদের এ অবস্থা হলে তাদের অবস্থা কি এর চেয়েও খারাপ হবে না? একথা বলে হাতেম বিচারপতির কাছ থেকে চলে এলেন। বিচারপতি ইবনে মোকাতেলের অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। রায়ের লোকজন বিচারপতি ও হাতেমের এ কথোপকথনের কথা জানতে পেরে হাতেমকে বলল ঃ কাযভীনে তানাকেসী এই বিচারপতির চেয়েও অধিক জাঁকজমকপ্রিয়। হাতেম ইচ্ছা করেই তার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি একজন অনারব ব্যক্তি। আমি চাই, আপনি আমাকে ধর্মের সূচনা এবং নামাযের চাবি অর্থাৎ, ওযু শিখিয়ে দিন। তানাকেসী বলল ঃ খুব ভাল কথা। অতঃপর সে গোলামকে পানি আনতে বলল। গোলাম পানি নিয়ে এলে তানাকেসী বসে ওযু করল এবং তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করল। এরপর বলল ঃ এভাবে ওযু করা হয়। হাতেম বললেন ঃ আপনি দাঁড়িয়ে থাকুন। আমিও ওযু করব, যাতে আমার পছন্দনীয় বিষয়টি পাকাপোক্ত হয়ে যায়। অতঃপর হাতেম চার চার বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন। তানাকেসী বলল ঃ মিয়া সাহেব, আপনি পানির অপচয় করেছেন। কারণ, আপনি চার বার অঙ্গ ধৌত করেছেন। হাতেম বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, আমি এক অঞ্জলি পানির অপচয় করেছি, আর আপনি এত সব বিলাস সামগ্রী সঞ্চয়ের মধ্যে অপচয় করেননি? তানাকেসী টের পেয়ে গেল, ওযু শিক্ষা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না? বরং এ বিষয়টি প্রকাশ করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এ প্রশ্ন শুনে তানাকেসী গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত আর জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করল না।

এর পর হাতেম বাগদাদে গেলে বাগদাদের অধিবাসীরা তাঁর কাছে এসে বলল ঃ হে আবু আবদুর রহমান! আপনি একজন অনারব লোক– থেমে থেমে কথা বলেন, কিন্তু যে কেউ আপনার সাথে কথা বলে, আপনি তাকে জব্দ করে দেন। ব্যাপার কি? হাতেম বললেন ঃ আমার তিনটি অভ্যাস আছে, যার বদৌলত আমি প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হই। প্রথম,

যখন প্রতিপক্ষ হক কথা বলে, তখন আমি আনন্দিত হই। আর যখন সে ভুল কথা বলে তখন আমি দুঃখিত হই এবং নিজেকে সংযত রাখি। এ সংবাদ হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ সোবহানাল্লাহ, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল। লোকেরা তাঁকে হাতেমের কাছে নিয়ে এলে ইমাম আহমদ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আবু আবদুর রহমান! নিরাপত্তা কিসের মধ্যে? হাতেম বললেন ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! যে পর্যন্ত আপনার মধ্যে চারটি অভ্যাস সৃষ্টি না হবে, আপনি দুনিয়া থেকে নিরাপত্তা পাবেন না। প্রথম, মানুষ মূর্খতা প্রদর্শন করলে আপনি তাদেরকে মার্জনা করবেন। দ্বিতীয়, নিজের মূর্খতাকে তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। তৃতীয়, নিজের বস্তু, তাদেরকে দেবেন। চতুর্থ, আপনি তাদের বস্তু আশা করবেন না। এরূপ হয়ে গেলে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন।

হাতেম মদীনা মুনাওয়ারায় গেলে সেখানকার লোকজন তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে আগমন করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্ মদীনা? উত্তরে বলা হল, এটা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রাসাদ কোথায়? আমি সেখানে নামায পড়ব। লোকেরা বলল ঃ তাঁর তো কোন প্রাসাদ ছিল না। তাঁর বাসগৃহ খুবই নিম্নস্তরের ছিল। হাতেম বললেন ঃ তাঁর সাহাবীগণের প্রাসাদই দেখিয়ে দাও। তারা বলল ঃ তাঁদেরও কোন প্রাসাদ ছিল না। তাঁদের বাসগৃহ ভূমি সংলগ্ন ছিল। হাতেম বললেন ঃ তাহলে এটা কি ফেরআউনের শহর? লোকেরা তাঁকে গ্রেফতার করে সুলতানের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ এ অনারব লোকটি বলে, এটা ফেরআউনের শহর। শাসনকর্তা বলল, সে কেন এরূপ বলে? হাতেম বললেন ঃ তাড়াতাড়ি করবেন না। আমি একজন অনারব মুসাফির। শহরে এসে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, এ মদীনা কার? তারা বলল ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মদীনা। আমি বললাম ঃ তাঁর প্রাসাদ কোথায়? এভাবে পূর্ণ ঘটনা হুবহু বর্ণনা করে হাতেম বললেন ঃ আল্লাহ বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর রসূলের মধ্যে তোমাদের জন্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে।

এখন আমি জিজ্ঞেস করছি– আপনারা কার অনুসরণ করছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর না ফেরআউনের? ফেরাউন সর্বপ্রথম চুনা ও ইট দ্বারা দালান নির্মাণ করেছে। শাসনকর্তা নিরুত্তর হয়ে হাতেমকে মুক্ত করে দিল।

সংসার নির্লিপ্ততা ও সাজসজ্জা বর্জনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী মনীষীগণের আচার-অভ্যাস সম্পর্কে যথাস্থানে আরও বর্ণিত হবে। সুচিন্তিত অভিমত, বৈধ বিষয়-সম্পত্তি দ্বারা সাজসজ্জা করা হারাম নয়। কিন্তু তাতে সহজ থাকা তার প্রতি মহব্বতের কারণ হয়ে যায়। ফলে তা বর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এগুলো থেকে বেঁচে থাকাই হল সাবধানতা। কারণ, যেব্যক্তি দুনিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে, সে নিশ্চিতই দুনিয়া থেকে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে না। যদি দুনিয়ার মধ্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও নিরাপদ থাকা যেত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়া বর্জনের উপর এত জোর দিতেন না। এমনকি বর্ণিত আছে, نزع القميص المعلم তিনি ডোরাদার জামা খুলে ফেললেন। نزع خاتم الذهب فى اثناء الخطبة তিনি খোতবার মাঝখানে স্বর্ণের আংটি খুলে ফেললেন। সংসার বর্জন সম্পর্কে এছাড়া আরও অনেক বিষয় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইয়াযীদ নওফলী হযরত মালেক ইবনে আনাসকে এই মর্মে পত্র লেখেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد فى الاولين والاخرين.

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মালেক ইবনে আনাসের প্রতি– হামদ ও সালামের পর– আমি শুনেছি, আপনি মিহিন বস্ত্র পরিধান করেন, পাতলা চাপাতি রুটি ভক্ষণ করেন, নরম শয্যায় উপবেশন করেন এবং দারোয়ান নিযুক্ত করেছেন। অথচ আপনি এলেমের আসনে সমাসীন। মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সওয়ার হয়ে আপনার কাছে আসে। তারা আপনাকে নেতা বানিয়ে রেখেছে এবং আপনার কথা মান্য করে। অতএব আপনার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং বিনয় ও নম্রতা

নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেয়া। আমি উপদেশকল্পে এ পত্র লেখছি। এ খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। ওয়াসসালাম। হযরত মালেক ইবনে আনাস এ পত্রের জওয়াবে লেখলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم -

মালেক ইবনে আনাসের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযীদের প্রতি– আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আপনার পত্র পেয়েছি এবং স্নেহ ও উপদেশে ধন্য হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তাকওয়া দ্বারা লাভবান করুন এবং এ উপদেশের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দিন। আমিও আল্লাহ তাআলার কাছে তওফীক প্রার্থনা করছি। তাঁর সাহায্য ছাড়া গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর আনুগত্য করার সাধ্য কারও নেই। আপনি মিহিন বস্ত্র ও পাতলা চাপাতি রুটি ইত্যাদির কথা যা কিছু লেখেছেন, সবই সত্য। আমি বাস্তবে তাই করি এবং এজন্যে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ -

অর্থাৎ কে হারাম করল আল্লাহর সাজসজ্জাকে, যা তিনি তার বান্দাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং পাক পবিত্র খাদ্য বস্তুকে?

আমি জানি, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জন করা উত্তম। আপনি আমার কাছে পত্র লেখা অব্যাহত রাখবেন। আমিও আপনার কাছে পত্র লেখা পরিহার করব না। ওয়াসসালাম।

দেখ, ইমাম মালেক কেমন অকপটে স্বীকার করে নিলেন, এগুলো অবলম্বন করার চেয়ে বর্জনই করা উত্তম। এগুলো যে-মোবাহ বা বৈধ, তা-ও তিনি বলে দিলেন। বাস্তবে তাঁর উভয় উক্তিই সত্য। ইমাম মালেকের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি এ ধরনের উপদেশের মধ্যে ইনসাফ ও স্বীকারোক্তি করতে পারেন, তবে তিনি বৈধ কাজের সীমানা জানতেও সক্ষম হবেন। ফলে তিনি বৈধ কাজ করে দ্বীনে শৈথিল্য, রিয়া ও

অপছন্দনীয় বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবেন। কিন্তু অন্যান্য লোকদের এরূপ মনোবল নেই যে বৈধ কাজের সীমা লংঘন করবে না। কেননা, বৈধ কাজ দ্বারা আনন্দ লাভ করার মধ্যে বিপদাশংকা অনেক। এটা আল্লাহর ভয় থেকেও অনেক দূরে। যাঁরা আখেরাতের আলেম, তাঁদের বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহর ভয়। আল্লাহর ভয়ের দাবী হচ্ছে আশংকাব বিষয় থেকে দূরে থাকা। আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি আলামত শাসকবর্গ থেকে দূরে থাকা। যে পর্যন্ত আলাদা থাকা সম্ভব হবে, তাদের কাছে যাবে না; বরং তাদের সাক্ষাৎ থেকেও বেঁচে থাকবে, যদিও তারা স্বয়ং আলেমগণের কাছে আসে। কেননা, দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ। এর লাগাম শাসকবর্গের হাতে। যেব্যক্তি শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করে, তাকে কিছু না কিছু তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে ভ্রষ্টতার কাজ করতে হয়। অথচ তারা হয়ে থাকে জালেম। প্রত্যেক দ্বীনদার ব্যক্তিকে তাদের থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং তাদের জুলুম ও অন্যায় কর্মকান্ডের নিন্দা করা ওয়াজেব। যেব্যক্তি তাদের কাছে যাবে, সে তাদের সাজসজ্জা ও আড়ম্বরের প্রতি মনোনিবেশ করে নিজের উপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতকে হেয় মনে করবে, অথবা তা অপছন্দ করার ব্যাপারে নীরব থাকবে। এটা হবে দ্বীনের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন। অথবা সে তাদের ক্রিয়াকর্ম বৈধ প্রতিপন্ন করার জন্যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কথাবার্তা বলবে। এটা হবে প্রকাশ্য মিথ্যা। অথবা সে তাদের দুনিয়া থেকে কিছু লাভ করতে চাইবে। এটা হারাম। হালাল ও হারাম অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করব যে, শাসকবর্গের সম্পদ থেকে কোন্‌টি গ্রহণ করা জায়েয আর কোন্‌টি নাজায়েয– ভাতা হোক, পুরস্কার হোক অথবা জায়গীর ইত্যাদি হোক। সারকথা, শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা করা সকল অনিষ্টের চাবিকাঠি। আখেরাতের আলেমগণের তরীকা হচ্ছে সাবধানতা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

"যে জঙ্গলে থাকে, সে জুলুম করে। যে শিকারের পেছনে পড়ে সে গাফেল হয় এবং যে বাদশাহর কাছে যায়, সে ফেতনায় পতিত হয়।" তিনি আরো বলেন ঃ

সত্বরই তোমাদের উপর শাসকবর্গ নিযুক্ত হবে, যাদের কিছু কাজ ভাল হবে এবং কিছু হবে মন্দ। সুতরাং যেব্যক্তি তাদের সাথে পরিচিত হবে না, সে দোষমুক্ত থাকেবে, যে তাদেরকে খারাপ মনে করবে সে বেঁচে

যাবে। কিন্তু যেব্যক্তি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের অনুসরণ করবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন। বলা হল ঃ আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব না? তিনি বললেন– না। যতদিন তারা নামায পড়ে, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো না।

সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ জাহান্নামে একটি জঙ্গল রয়েছে। তাতে সে আলেম থাকবে, যে বাদশাহদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। হুযায়ফা বলেন ঃ নিজেকে ফেতনার জায়গা থেকে বাঁচিয়ে রাখ। জিজ্ঞেস করা হল ঃ ফেতনার জায়গা কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ শাসকবর্গের দরজা। তোমাদের কেউ যখন তাদের কাছে যায়, তখন মিথ্যা বিষয়ে তাদের প্রত্যয়ন করে এবং তার শানে এমন কথা বলে, বাস্তবে যা তার মধ্যে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের উপর আলেমগণ রসূলের আমানতদার, যে পর্যন্ত শাসকবর্গের সাথে মেলামেশা না করে। যখন এরূপ করে, তখন তারা রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদেরকে ভয় কর এবং তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। কেউ আ'মাশকে বলল ঃ আপনি এলেম জীবিত করে দিয়েছেন এ জন্যে যে, আপনার কাছে অনেক মানুষ এলেম শেখে। তিনি বললেন ঃ একটু সবর কর। যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদের এক তৃতীয়াংশ পাকাপোক্ত হওয়ার আগেই মরে যায়, এক তৃতীয়াংশ শাসকবর্গের দরজার সাথে চিমটে থাকে। তারা সর্বনিকৃষ্ট মানুষ। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশের মধ্যে কম লোকই সাফল্য অর্জন করে। এ কারণেই সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব বলেন ঃ যখন আলেমকে দেখ, সে শাসকবর্গকে ঘিরে রয়েছে, তখন তার কাছ থেকে বেঁচে থাক। কারণ, সে চোর। আওযায়ী বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সে আলেমের চেয়ে মন্দ কেউ নেই, যে শাসনকর্তার কাছে যায়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ সর্বনিকৃষ্ট আলেম সে, যে শাসকদের কাছে যায় এবং সর্বোত্তম শাসক সে যে আলেমদের কাছে যায়। মকহুল দামেশকী বলেন ঃ যেব্যক্তি কোরআন শেখে এবং দ্বীনে ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, এরপর খোশামোদ ও লোভের পথে শাসনকর্তার সংসর্গ অবলম্বন করে, সে পদে পদে দোযখের অগ্নিতে প্রবেশ করে। সামনুন বলেন ঃ আলেমের জন্যে এটা খুবই মন্দ কথা যে, কেউ তার মজলিসে এসে শুনে, সে শাসনকর্তার কাছে চলে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমি বুযুর্গদের এই উক্তি শুনেছি, যখন আলেমকে দুনিয়াপ্রেমিক দেখ, তখন তাকে দ্বীনের

ব্যাপারে দোষী মনে করো। আমি এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আমি শাসনকর্তার কাছ থেকে বের হয়ে এসে আত্মসমালোচনা করে দেখেছি, এলেম থেকে আমি অনেক দূরে সরে পড়েছি। অথচ আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শাসকদের সাথে মেলামেশা করি, তা তোমরা দেখ ও জান। আমি কঠোর ভাষায় তাদের সমালোচনা করি এবং প্রায়ই তাদের খাহেশের বিরোধিতা করি। আমি তাদের কাছে যতদূর সম্ভব না যাওয়ারই চেষ্টা করি। এছাড়া আমি তাদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করি না এবং তাদের ঘরের পানি পর্যন্ত পান করি না। এরপর তিনি বলেন ঃ আমাদের যুগের আলেমরা বনী ইসরাঈলের আলেমদের চেয়েও অধম। তারা বাদশাহদেরকে বৈধ বিষয়াদি বলে এবং তাদের পছন্দ অনুযায়ী কথাবার্তা শুনায়। অথচ যেসব কথাবার্তা বলা তাদের উপর ওয়াজেব, সেগুলো শুনালে শাসকরা তাদেরকে ঘৃণা করবে এবং তাদের কাছে যাওয়া পছন্দ করবে না। যদিও এটা আল্লাহর কাছে তাদের নাজাতের ওসিলা হতে পারে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে একজন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গপ্রাপ্ত ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের ভাষায় ইনি ছিলেন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)। হাসান বলেন ঃ তিনি শাসকবর্গের কাছে যেতেন না; বরং তাদেরকে ঘৃণা করতেন। তাঁর ছেলেরা তাঁকে বলল ঃ যারা ইসলামে অগ্রণী এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংসর্গ লাভে আপনার সমান নয়, তারা শাসকবর্গের কাছে যায়। যদি আপনিও যেতেন তবে আমাদের জন্যে তা কল্যাণকর হত। তিনি বলেন ঃ বৎসগণ! দুনিয়া মৃত। কিছু লোক একে ঘিরে রেখেছে। আল্লাহর কসম, আমি যথাসম্ভব তাদের সাথে শরীক হবো না। ছেলেরা বলল ঃ তা হলে আপনি জীর্ণ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন। তিনি বললেন ঃ আমি ঈমানের সাথে জীর্ণ অবস্থায় মরে যাওয়াকে মোনাফেকীর মাধ্যমে বিত্তশালী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা উত্তম মনে করি। হাসান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি ছেলেদেরকে হারিয়ে দিলেন এবং চমৎকার প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। কারণ, তিনি জেনে নিয়েছেন, মাটি মাংস ও মদ খেয়ে ফেলবে, কিন্তু ঈমান খাবে না। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শাসকদের কাছে গেলে মানুষ নিশ্চিতই মোনাফেকী থেকে বাঁচতে পারে না, যা ঈমানের পরিপন্থী।

হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) সালমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ হে সালমা! শাসকবর্গের দরজায় যেয়ো না। কারণ, তুমি তাদের দুনিয়া থেকে তখনই কিছু অংশ পাবে, যখন তারা তোমার দ্বীন থেকে উৎকৃষ্ট অংশটি নিয়ে নেবে।

এ বিষয়টি আলেমদের জন্যে একটি বড় ফেতনা এবং তাদের বিরুদ্ধে শয়তানের একটি বড় হাতিয়ার। বিশেষতঃ এমন আলেমদের বিরুদ্ধে, যাদের কণ্ঠস্বর ভাল এবং কথাবার্তা সুমিষ্ট। শয়তান তাদেরকে একথাই বুঝায় যে, শাসকবর্গের কাছে গেলে এবং তাদেরকে উপদেশ দিলে তারা জুলুম থেকে বিরত থাকবে, শরীয়তের বিধি-বিধান তাদের মধ্যে জারি ও কায়েম হয়ে যাবে। শয়তান ক্রমান্বয়ে তাদের অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, শাসকদের কাছে যাওয়া ধর্মীয় কাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এরপর যখন আলেম তাদের কাছে যায়, তখন নম্র ভাষা ব্যবহার ও ধর্মের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন না করে পারে না। তাদের তারীফ ও খোশামোদ না করেও পারে না। এতে দ্বীনের ক্ষতি হয়।

পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলতেন, আলেমগণ যখন জানতেন, তখন আমল করতেন, আমলে মশগুল হওয়ার পর অজ্ঞাত হতেন, অজ্ঞাত হওয়ার পর তাদের অন্বেষণ হত এবং অন্বেষণ হওয়ার পর তাঁরা পালিয়ে ফিরতেন।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) হযরত হাসান বসরীকে এই মর্মে চিঠি লেখলেন ঃ হামদ ও সালাতের পর নিবেদন, আপনি আমাকে এমন লোকদের সন্ধান দিন, যাঁদের কাছ থেকে আমি আল্লাহ্ তাআলার ব্যাপারাদিতে সাহায্য নিতে পারি। তিনি জওয়াবে লেখলেন ঃ দ্বীনদাররা তো আপনার কাছে যাবার নয়। দুনিয়াদার আপনার কাম্য নয়। কাজেই আপনি অভিজাত ব্যক্তিবর্গকে সাথে রাখুন। তারা তাদের আভিজাত্য বিশ্বাসঘাতকতার আবর্জনা থেকে হেফাযতে রাখে। এ পত্র ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে লেখা হয়েছিল, যিনি সমকালীন যুগের সর্বাধিক সংসার নির্লিপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। অতএব, এমন শাসকের কাছ থেকে দ্বীনদারদের দূরে থাকা শর্ত হলে, অন্যান্য শাসকের সাথে মেলামেশা করা কেমন করে ঠিক হবে!

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, কোন বিষয়ে তাড়াহুড়া করে ফতোয়া না দেয়া, বরং যে পর্যন্ত ফতোয়া দেয়া থেকে

বেঁচে থাকার উপায় জানা থাকে, সে পর্যন্ত বেঁচে থাকা। সুতরাং কেউ যদি কোন আলেমকে এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করে, যার বিধান সে কোরআন অথবা অকাট্য হাদীস অথবা ইজমা অথবা জাহেরী কিয়াস থেকে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে বিধান বলে দেবে। আর যদি এমন প্রশ্ন করে, যাতে সন্দেহ হয়, তবে বলে দেবে— আমি জানি না। যদি এমন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, যার বিধান আলেম ব্যক্তির ইজতিহাদ ও অনুমান দ্বারা সঠিক জানা রয়েছে, তবে এতে সাবধানতা অবলম্বন করবে, বরং অন্যের কাছ থেকে জেনে নিতে বলবে, যদি অন্য ব্যক্তি ঠিক ঠিক বলতে পারে। এটাই সাবধানতা। কেননা, ইজতিহাদের বিপদাশংকা নিজের ঘাড়ে রাখা গুরুতর ব্যাপার। হাদীসে বলা হয়েছে—

এলেম তিন প্রকার—(১) বিধান ব্যক্তকারী কোরআন, (২) প্রতিষ্ঠিত সুন্নত এবং (৩) আমি জানি না। শা'বী বলেন ঃ আমি জানি না হচ্ছে অর্ধেক এলেম। যেব্যক্তি না জানার ক্ষেত্রে আল্লাহর ওয়াস্তে চুপ থাকে, তার সওয়াব সে ব্যক্তি থেকে কম নয়, যে সঠিক জওয়াব বলে দেয়। কারণ, না জানার কথা স্বীকার করা নফসের জন্যে খুবই কঠিন। মোট কথা, এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও মনীষীগণের রীতি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে কেউ ফতোয়া জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন ঃ অমুক শাসকের কাছে যাও, সে এ ধরনের বিষয়াদির যিম্মাদার। এ মাসআলা তার ঘাড়ে রেখে দাও।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মানুষকে প্রত্যেক মাসআলায় ফতোয়া দেয়, সে উন্মাদ। তিনি আরও বলেন ঃ এলেমের ঢাল হচ্ছে আমি জানি না। এটি বিস্মৃত হলে কল্যাণ নেই।

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন ঃ শয়তানের জন্যে সে আলেমের চেয়ে কঠিন কেউ নেই, যে এলেম সহকারে বলে এবং এলেম সহকারে চুপ থাকে। শয়তান বলে, তাকে দেখ, তার বলার চেয়ে তার চুপ থাকা আমার উপর বেশ কঠিন। জনৈক বুযুর্গ আবদালের এই গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর খাদ্য হল উপবাস এবং যে পর্যন্ত তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে না, সে পর্যন্ত তিনি কথা বলেন না। কারও জিজ্ঞাসার জওয়াব দেয়ার লোক থাকলে তিনি চুপ থাকেন। বাধ্য হলে নিজে জওয়াব দেন। জিজ্ঞাসার পূর্বে বলাকে তিন কথা বলার গোপন অভিলাষ বলে মনে করেন।

হযরত আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে গেলেন। লোকটি তখন বক্তৃতা করছিল। তারা বললেন ঃ সে যেন বলছে– আমাকে জেনে নাও। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সে ব্যক্তি আলেম, যাকে কোন মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে সে মনে করে যেন তার চোয়াল টেনে বের করা হচ্ছে।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে পুল বানিয়ে দোযখ অতিক্রম করতে চাও। আবু জাফর নিশাপুরী বলেন ঃ আলেম সে ব্যক্তি, যে জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে ভয় করে যে, কেয়ামতে এ প্রশ্ন যেন না উঠে, জওয়াব কোথা থেকে দিয়েছিলে? ইবরাহীম তায়মীকে কেউ মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁদতেন এবং বলতেন ঃ তুমি আর কাউকে পেলে না, আমার উপর চড়াও হলে? আবুল আলিয়া, ইবরাহীম নখয়ী, ইবরাহীম আদহাম ও সুফিয়ান সওরী (রহঃ) দুই অথবা তিন ব্যক্তির সামনে কিছু বর্ণনা করতেন। বেশী লোক জমায়েত হয়ে গেলে নীরব থাকতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

আমি জানি না, ওযায়র নবী কিনা, আমি জানি না ইয়ামন সম্রাট তুব্বা অভিশপ্ত কিনা। আমি এটাও জানি না যে, যুলকারনাইন নবী ছিলেন কিনা? রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল, উত্তম জায়গা এবং সর্বনিকৃষ্ট জায়গা কোনটি? তখন তিনি বললেন ঃ আমি জানি না। অবশেষে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলে তিনি তাঁকে এ প্রশ্ন করলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ আমি জানি না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাকে বললেন ঃ সর্বোত্তম জায়গা মসজিদ আর সর্বনিকৃষ্ট জায়গা বাজার। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে কেউ দশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি একটির জওয়াব দিতেন এবং নয়টির ব্যাপারে নীরব থাকতেন। আর হযরত ইবনে মসঊদ নয়টির জওয়াব দিতেন এবং একটির জওয়াবে নীরব থাকতেন। পূর্ববর্তী ফেকাহবিদদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁরা বলে দিতেন ঃ আমি জানি না। জানি বলার লোক খুব কম ছিল। সুফিয়ান সওরী, মালেক ইবনে আনাস, আহমদ ইবনে হাম্বল, ফোযায়ল ইবনে আয়ায ও বিশর ইবনে হারেস প্রমুখ ফেকাহবিদ এমনি ছিলেন। তাঁরা প্রায়ই জানি না বলতেন।

আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রঃ) বলেন ঃ আমি এই মসজিদে একশ' বিশ জন সাহাবী দেখেছি। তাঁদের কারও কাছে কোন

প্রশ্ন উপস্থিত হলে তাঁরা তা অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিতেন এবং অন্যজন তৃতীয় জনের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্রশ্নটি আবার প্রথম জনের জাছে ফিরে আসত। বর্ণিত আছে, আসহাবে সুফফার মধ্য থেকে একজনের কাছে একটি ভাজা করা ছাগল হাদিয়াস্বরূপ পাঠানো হয়। তাঁরা তখন খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছিলেন। তিনি ছাগলটি অন্য একজনের কাছে হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দেন। দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের কাছে হাদিয়া প্রেরণ করলেন। এভাবে ক্রমে ক্রমে আবার প্রথম সাহাবীর কাছে ফিরে এল। এখন চিন্তা কর, আমাদের যুগে আলেমদের অবস্থা কেমন পাল্টে গেছে ? পূর্ববর্তীগণ যে বিষয় থেকে পালাতেন, আজ তাই কাম্য হয়ে গেছে এবং পূর্বে যা কাম্য ছিল, আজ তা ঘৃণার বস্তু হয়ে গেছে। ফতোয়া দেয়ার দায়িত্ব থেকে বেঁচে থাকার কথা এ হাদীস থেকেও জানা যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তিন প্রকার ব্যক্তিই ফতোয়া দিবে– শাসক, শাসিত অথবা যে নিজেকে মুফতীরূপে প্রকাশ করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ সাহাবায়ে কেরাম চারটি বিষয় একে অপরের কাছে সমর্পণ করতেন– নামাযের ইমামত, ওসিয়ত, আমানত ও ফতোয়া। কেউ কেউ বলেন ঃ যার এলেম-কালাম কম হত, সে তড়িঘড়ি ফতোয়া দিতে প্রস্তুত হয়ে যেত। আর যে বেশী পরহেযগার হত, সে ফতোয়াকে বেশী পরিমাণে অপরের কাছে সমর্পণ করত। সাহাবী ও তাবেয়ীগণ পাঁচটি বিষয়ে মশগুল থাকতেন– কোরআন তেলাওয়াত, মসজিদ আবাদকরণ, আল্লাহর যিকির, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা। এর কারণ তাঁরা হাদীসে শুনেছিলেন ঃ

মানুষের প্রত্যেকটি কথা তার জন্যে ক্ষতিকর– মঙ্গলজনক নয়, তিনটি কথা ব্যতীত– (১) সৎকাজে আদেশ (২) অসৎ কাজে নিষেধ এবং (৩) আল্লাহর যিকির। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ـ

অর্থাৎ তাদের অনেক পরামর্শের মধ্যে কল্যাণ নেই, কিন্তু যে খয়রাত অথবা সৎকাজ অথবা মানুষের মধ্যে সন্ধির আদেশ করে। জনৈক আলেম ইজতিহাদকারী ও ফতোয়াদাতাদের মধ্য থেকে একজনকে স্বপ্নে দেখে

জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি যে ফতোয়া দিতেন এবং ইজতিহাদ করতেন, তার অবস্থা কিরূপ পেলেন ? জওয়াবে সে নাক সিঁটকিয়ে ও মুখ ফিরিয়ে বলল ঃ আমি এর কোন মর্যাদা পাইনি এবং এর পরিণাম ভাল হয়নি। ইবনে হাসীন বলেন ঃ আলেমরা এমন প্রশ্নের জওয়াব বলে দেয়, যা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সামনে পেশ করা হলে তিনি সকল বসরী সাহাবীকে একত্রিত করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

মোট কথা, নীরব থাকা আলেমগণের একটি চিরন্তন রীতি ছিল। তাঁরা প্রয়োজন ব্যতীত কখনও কথা বলতেন না। হাদীসে আছে– তোমরা যখন কাউকে নীরবতা পালনকারী ও সংসারের প্রতি অনাসক্ত দেখ, তখন তার কাছে যাও। কারণ, তাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেম দু'প্রকার। এক, জনসাধারণের আলেম, সে মুফতী। এ ধরনের আলেম বাদশাহদের মোসাহেব হয়ে থাকে! দুই– বিশিষ্টদের আলেম। তাঁরা তওহীদ ও অন্তরের ক্রিয়াকর্মের আলেম। তাঁরা বিচ্ছিন্ন ও একা থাকেন।

কেউ কেউ বলেন ঃ যখন এলেম বেশী হয়, তখন কথা কমে যায় আর যখন কথা বেশী হয় তখন এলেম কমে যায়। হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর কাছে এক পত্র লেখেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের মধ্যে ভ্রাতৃবন্ধন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পত্রের মর্ম ছিল এই ঃ ভাই, আমি শুনেছি মানুষ আপনাকে চিকিৎসকের আসনে বসিয়েছে। আপনি রোগীদের চিকিৎসা করেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, যদি আপনি বাস্তবিকই চিকিৎসক হন, তবে কথা বলবেন। কারণ, আপনার কথা রোগমুক্তি। আর যদি আপনি চিকিৎসক সেজে থাকুন, তবে ভাই আল্লাহকে ভয় করুন এবং মুসলমানকে প্রাণে মারবেন না। এ পত্র পাওয়ার পর হযরত আবুদ্দারদাকে কেউ ওষুধের কথা জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছু বলতেন না। হযরত আনাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ আমাদের নেতা হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-কে প্রশ্ন কর। হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ঃ জাবের ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস কর। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবকে দেখিয়ে দিতেন। বর্ণিত আছে, জনৈক সাহাবী হযরত হাসান বসরীর সামনে বিশটি হাদীস বর্ণনা করলেন। কেউ এগুলোর তফসীর জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আমি রেওয়ায়েত ছাড়া কিছুই জানি না। এরপর হাসান বসরী রেওয়ায়েতের মাধ্যমে এক একটি

হাদীসের আলাদা তফসীর করলেন। শ্রোতারা তাঁর তফসীর ও স্মৃতিশক্তি দেখে মুগ্ধ হল। বর্ণনাকারী সাহাবী এক মুঠি কংকর তুলে তাঁদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন ঃ তোমরা আমাকে এলেমের কথা জিজ্ঞেস কর, অথচ তোমাদের এখানে এমন আলেম বিদ্যমান রয়েছে।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হল, তারা এলমে বাতেন শিক্ষা করা, অন্তরের দেখাশুনা করা, আখেরাতের পথ চেনা ও তাতে চলার প্রতি অধিক যত্নবান থাকেন এবং মোজাহাদা ও মোরাকাবা দ্বারা এসব বিষয়ের স্বরূপ জানার সত্যিকার আগ্রহ পোষণ করেন। কেননা, মোজাহাদা থেকে মোশাহাদা এবং অন্তর জ্ঞানের সূক্ষ্মতা সৃষ্টি হয়। এর পর এ থেকে অন্তরে প্রজ্ঞার ঝরণা প্রবাহিত হয়– শুধু কিতাবী শিক্ষা এ ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। বরং মানুষ যদি মোজাহাদা করে, অন্তরের দেখাশুনা করে, যাহেরী ও বাতেনী আমল করতে থাকে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত মন ও স্বচ্ছ চিন্তা নিয়ে বসে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই দিকে মনোযোগী হয়, তবে অপরিমিত ও অসীম প্রজ্ঞার আলোতে তার অন্তর খুলে যায়। এসব বিষয়ই হচ্ছে এলহামের চাবি ও কাশফের উৎস। অনেক শিক্ষার্থী বহু দিন পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে, কিন্তু যতটুকু শুনেছিল, তা থেকে এক অক্ষরও অগ্রসর হতে পারে না। আর অনেক শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় এলেম হাসিল করে আমল ও অন্তরের দেখাশুনার প্রতি যেই মনোনিবেশ করে, অমনি আল্লাহ তা'আলা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা তার জন্যে খুলে দেন, যা দেখে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি হয়রান হয়ে যায়। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে সে বিষয়েরও এলেম দান করেন, যা সে শেখেনি। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে– হে বনী ইসরাঈল! একথা বলো না যে, এলেম আকাশে রয়েছে, তাকে কে নামাবে ? অথবা এলেম ভূগর্ভে রয়েছে, তাকে কে উপরে উঠাবে ? অথবা এলেম সমুদ্রের উপরে রয়েছে, তাকে এপারে কে আনবে ? এলেম তো তোমাদের অন্তরে রক্ষিত। তোমরা আমার সামনে আধ্যাত্মবিদদের ন্যায় শিষ্টাচার প্রদর্শন কর এবং সিদ্দীকদের চরিত্র অবলম্বন কর। আমি তোমাদের অন্তরে সে এলেম প্রকাশ করে দেব, যা তোমাদেরকে আবৃত করে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী বলেন ঃ আলেম আবেদ, যাহেদ সকলেই দুনিয়া থেকে গেছেন এবং তাদের অন্তর তালাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু সিদ্দীক ও শহীদদের

অন্তর রয়েছে খোলা। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন–

وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ আল্লাহর কাছেই অদৃশ্যের চাবিসমূহ। তিনি ব্যতীত কেউ এ চাবির খবর রাখে না। যদি দিলওয়ালাদের দিলের উপলব্ধি বাতেনের নূরের মাধ্যমে এলমে যাহেরের উপর প্রবল না হত, তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা বলতেন না ঃ তুমি নিজের মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

বান্দা নিরন্তর নফল এবাদত দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। অবশেষে আমি তাকে বন্ধু করে নেই। আমি যখন তাকে বন্ধু করে নেই তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে শুনে-------। কেননা, কোরআন মজীদের অনেক গোপন রহস্য যিকির ফিকিরে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির অন্তরে এসে যায়। এসব রহস্য তফসীরে কোথাও থাকে না এবং তফসীরবিদদেরও জানা থাকে না। কেবল সে ব্যক্তিরই জানা থাকে, যে মারেফত লাভের ইচ্ছায় আপন অন্তরের পরিচর্যা করে। এসব রহস্যবিদদের সামনে পেশ করা হলে তাঁরাও এগুলোকে ভাল বলে এবং তাঁরাও জানতে পারে যে, এ আলো স্বচ্ছ অন্তরের এবং আল্লাহ্ তা'আলার কৃপার। এলমে মোকাশাফা ও এলমে মোআমালার অবস্থাও তেমনি। এসব এলেমের প্রত্যেকটি যেন এক অতল সমুদ্র। প্রত্যেক জ্ঞানান্বেষী তার অংশ অনুযায়ী এবং ভাল আমলের তওফীক অনুযায়ী এতে অবগাহন করতে সমর্থ হয়। এ ধরনের আলেমগণের ব্যাপারে হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসে বলেন ঃ মানুষের অন্তর একটি পাত্র বিশেষ– যে অন্তরে কল্যাণ বেশী, তাই উত্তম। মানুষ তিন প্রকার ঃ এক– আলেমে রব্বানী, দুই– যে মুক্তির জন্যে এলেম অর্জন করে। সে নিম্নস্তরের বোকা। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, বোকারা প্রত্যেক মিথ্যার প্রতি আহ্বানকারীর অনুসারী হয়ে যায়। এরা কোন এলেমের নূর থেকে আলো লাভ করে মজবুত বিষয়ের আশ্রয় নেয় না। এলেম ধন-সম্পদ অপেক্ষা উত্তম। এলেম তোমার হেফাযত করে, আর তুমি ধন-সম্পদের হেফাযত কর। এলেম ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়। ধন-সম্পদ ব্যয় করলে হ্রাস পায়। এলেমের মহব্বত একটি গ্রহণযোগ্য দ্বীন, যদ্দ্বারা জীবনে আনুগত্য অর্জিত হয় এবং মৃত্যুর পর উত্তম ব্যবহার পাওয়ার উপায়। এলেম শাসক এবং

ধন-সম্পদ শাসিত। ধন-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেলে তার উপকারিতা দূর হয়ে যায়। যারা ধনী ছিল এবং দল বলের অধিকারী ছিল, তারা সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু আলেমগণ মহাকালের অন্ত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকবেন। এর পর হযরত আলী (রাঃ) একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বুকের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এখানে অনেক এলেম আছে, যদি এগুলো আয়ত্তকারী পাওয়া যায়। আমি আপদমুক্ত শিক্ষার্থী পাই না। এমন পাই যারা দ্বীনের হাতিয়ারকে দুনিয়া অন্বেষণে ব্যবহার করে, আল্লাহর নেয়ামত দ্বারা তাঁর ওলীদের প্রতি কটূক্তি করে এবং আল্লাহর প্রমাণ নিয়ে তার সৃষ্টিকে দাবিয়ে রাখে। অথবা এমন পাই, যারা সত্যপন্থীদের অনুগত কিন্তু প্রথম সন্দেহ থেকেই তাদের অন্তরে সংশয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জেনে রাখ, বাতেনের বোঝা এরাও বহন করতে পারে না, বরং এরা লোভী, খায়েশের দাস, অর্থলিপ্সু এবং প্রবৃত্তির অনুসারী । চতুষ্পদ জন্তুদের সাথে এদের মিল রয়েছে। ইলাহী, যখন এলেম আয়ত্তকারীরা মরে যাবে, যারা আল্লাহর নিদর্শনকে আল্লাহর উদ্দেশেই কায়েম করবে। তাঁরা হয় প্রকাশ্যে থাকবে, না হয় আত্মগোপনকারী ও পরাভূত হয়ে থাকবেন, যাতে আল্লাহর নিদর্শনসমুহ অকেজো হয়ে না যায়। তাঁরা সংখ্যায় অল্প এবং মর্যাদায় অধিক হবে। তাঁদের অস্তিত্ব বাহ্যতঃ নিরুদ্দেশ এবং তাঁদের চিত্র অন্তরে বিদ্যমান থাকবে। আল্লাহ তাঁআলা তাদের মাধ্যমে আপন নিদর্শনসমূহের হেফাজত করবেন, যাতে তাঁরা এসব নিদর্শনকে তাঁদের মত লোকদের কাছে সমর্পণ করে এবং তাঁদের অন্তরে সেগুলো বপন করে দিতে পারেন। এলেম তাঁদেরকে বস্তুর স্বরূপ ও বিশ্বাসের গভীরে পৌঁছে দেয়। ধনীরা যে বিষয়কে কঠিন মনে করে, তা তাঁদের কাছে সহজ। গাফেলরা যে বিষয়ে আতংকিত হয়, তাঁরা তা দ্বারা মনোরঞ্জন করেন। সৃষ্টির মধ্যে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার ওলী ও আমানতদার ; তাঁর দ্বীনের প্রতি আহ্বায়ক এবং তাঁর সাম্রাজ্যের সম্রাট। এরপর হযরত আলী (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ আমি তাঁদের দীদারের জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। তাঁর বর্ণিত শেষোক্ত বিষয়বস্তু আখেরাতের আলেমগণের বিশেষণ। অধিক আমল ও অধিক মোজাহাদা দ্বারা এই এলেম অর্জিত হয়।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া। কেননা, বিশ্বাস দ্বীনের মূলধন। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ

বিশ্বাস হচ্ছে পূর্ণ ঈমান। অতএব এলমে একীন তথা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। অর্থাৎ, বিশ্বাসের সূচনা জানতে হবে। এরপর এটি অর্জনের পন্থা অন্তরের জন্যে আপনা-আপনি প্রকাশ হয়ে যাবে। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বিশ্বাস অর্জন কর। এর অর্থ, বিশ্বাসী লোকদের কাছে বস, তাঁদের কাছে বিশ্বাসের এলেম শ্রবণ কর এবং প্রতিনিয়ত তাঁদের অনুগামী হও, যাতে তোমার বিশ্বাস শক্তিশালী হয়, যেমন তাঁদের বিশ্বাস শক্তিশালী। কেননা, অল্প বিশ্বাস অনেক আমলের তুলনায় উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে বর্ণনা করা হল, এক ব্যক্তির বিশ্বাস ভাল, কিন্তু সে অনেক গোনাহ করে। অন্য এক ব্যক্তি এবাদতে খুব মেহনত করে, কিন্তু বিশ্বাস কম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এমন কোন লোক নেই, যার গোনাহ নেই। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি যার মজ্জা এবং বিশ্বাস যার অভ্যাস, গোনাহ তার ক্ষতি করে না। কেননা, যখন গোনাহ করে তখন তওবা এস্তেগফার করে এবং অনুতপ্ত হয়। ফলে তা গোনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে কিছু অতিরিক্ত হয়, যদ্দ্বারা সে জান্নাতে যায়। এজন্য রসূল করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে বস্তু তোমাদেরকে পরিমিত দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে বিশ্বাস ও সবর । যেব্যক্তি এ উভয়টি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হয়, সে যদি রাত্রি জাগরণ ও দিনের রোযা কখনও না করে, তবু তার ভয়ের কারণ নেই।

লোকমান (রহঃ) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে একথাও বলেছিলেন ঃ বৎস! বিশ্বাস ছাড়া আমল করার সাধ্য হয় না। মানুষ ততটুকুই করে যতটুকু সে বিশ্বাস করে। আমলকারীর বিশ্বাস কম না হওয়া পর্যন্ত সে আমলে ক্রটি করে না।

ইয়াহইয়া ইবনে মাআয (রাঃ) বলেন ঃ তওহীদ একটি নূর, আর শেরক একটি আগুন। শেরকের আগুন দ্বারা মুশরিকদের যত সৎকর্ম জ্বলে পুড়ে যায় । অপরপক্ষে তওহীদের নূর দ্বারা তওহীদপন্থীদের তার চেয়ে বেশী গোনাহ্ জ্বলে পুড়ে ছাই হয়। এখানে নূরের অর্থ বিশ্বাস। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় "মুকিনীন" তথা বিশ্বাসীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, বিশ্বাস সৎকর্ম ও সৌভাগ্যের উপায়।

এখন প্রশ্ন হয়, বিশ্বাসের অর্থ কি? এর শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়ার উদ্দেশ্য কি? এটা না বুঝা পর্যন্ত বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। এ প্রশ্নের

জওয়াব হচ্ছে, দুই শ্রেণীর লোক একীন তথা বিশ্বাস শব্দটিকে দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহার করে। এক– মোনাযারা ও কালামশাস্ত্রীদের পরিভাষা। তারা বলে ঃ একীন অর্থ সন্দেহ না হওয়া। কারণ, কোন কিছুকে সত্য বলে জানার চারটি স্তর রয়েছে– (১) সত্য বলে জানা ও মিথ্যা বলে জানা সমান সমান। একে সন্দেহ বলে। উদাহরণতঃ তোমাকে কোন বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দেবেন কি দেবেন না? ব্যক্তিটির অবস্থা তোমার জানা নেই। এমতাবস্থায় তুমি হাঁ অথবা না কিছুই বলবে না; বরং উভয় বিষয়ের সম্ভাব্যতা তোমার কাছে সমান হবে। একে বলা হয় সন্দেহ। (২) তোমার মন সত্য ও মিথ্যা উভয় দিকের মধ্য থেকে এক দিকে ঝুঁকে থাকবে এবং তুমি এটাও জানবে যে, অপর দিকটিও হতে পারে; কিন্তু তার হওয়া প্রথম দিক অগ্রাধিকার দেয়ার পরিপন্থী নয়। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে তুমি সৎ ও মুত্তাকী বলে জান। তার অবস্থা তোমাকে জিজ্ঞেস করা হল, সে এই অবস্থায় মরে গেলে তার আযাব হবে কি হবে না? এ ক্ষেত্রে তোমার মন তার আযাব না হওয়ার দিকে ঝুঁকে থাকবে। কারণ, তার ভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ সুস্পষ্ট। কিন্তু তুমি আযাব হওয়ারও কোন কারণ তার অভ্যন্তরে ধরে নিতে পার। এ ধরে নেয়া প্রথম বিশ্বাসের সাথে জড়িত। এ ধরনের বিশ্বাসকে বলা হয় "যন" (ধারণা)। (৩) কোন বিষয়ের সত্যতা মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, তার বিরপীতটা মনে উদয়ই হয় না এবং হলেও মন তা মেনে নিতে সম্মত হয় না। কিন্তু এ সত্যায়ন সত্যিকার মারেফত সহকারে না থাকা। অর্থাৎ, যদি খুব চিন্তা করা হয় এবং বিপরীতটির সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়, তবে তা সম্ভবপর হওয়ার অবকাশ অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাওয়া। এ সত্যায়নকে একীনের কাছাকাছি বিশ্বাস বলা হয়। শরীয়তের যাবতীয় বিষয়ে জনসাধারণের বিশ্বাস এমনি ধরনের হয়ে থাকে। কেবল শুনে শুনেই তা তাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এমনি প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারী তার মাযহাবের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস করে এবং মনে করে, তার ইমামই সঠিক। যদি কেউ বলে, তোমার ইমাম ভুলও করতে পারেন, তবে সে তা মানতে রাযী হয় না। (৪) সত্যিকার মারেফতের স্তর, যা প্রমাণ দ্বারা অর্জিত হয়। এতে নিজেরও সন্দেহ থাকে না, অপরকেও সন্দেহে ফেলার কল্পনা করা যায় না। মোনাযারা ও কালামশাস্ত্রীদের কাছে এটাই একীন তথা নিশ্চিত বিশ্বাস। এ পরিভাষা

অনুযায়ী একীন শক্তিশালী ও দুর্বল হতে পারে না। কেননা, সন্দেহাতীত হওয়া সবল বা দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা দূর করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিভাষা ফেকাহবিদ, সূফী ও অধিকাংশ আলেমের। তাঁদের মতে, যার মধ্যে ধারণা ও সন্দেহের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, তাই একীন। এতে অন্তরে প্রবল হওয়ার প্রতি লক্ষ্য করা হয়। ফলে একথা বলা যায়, মৃত্যুর উপর অমুক ব্যক্তির একীন দুর্বল। অথবা সে মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ করে না। অথবা এরূপ বলা যায়, রুজি পৌঁছার উপর অমুক ব্যক্তির একীন শক্তিশালী। অথচ মাঝে মাঝে তার রুজি না পাওয়াও সম্ভব। সারকথা, মন যখন কোন বিষয়কে সত্য বলার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এটা তার মনে এমনভাবে প্রবল হয়ে যায় যে, মনের উপর তারই রাজত্ব চলে এবং তারই দিক থেকে ভাল কাজের আগ্রহ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা হয়, তখন এ অবস্থাকে একীন বলা হয়। এখন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী মৃত্যুর ব্যাপারে সকলের একীন সমান। অর্থাৎ, এতে কারও কোন প্রকার সন্দেহ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী একীন সকলের নেই। কেননা, কিছু লোক রয়েছে যারা কোন সময় মৃত্যুর কথা চিন্তাই করে না এবং তার প্রস্তুতিও নেয় না। মনে হয়, তাদের মৃত্যুর একীন নেই। পক্ষান্তরে কিছু লোকের মনকে এই একীন এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, তারা তাদের সমগ্র শক্তি এর প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করে রেখেছে; এর মধ্যে বিপরীত দিকটির কোন অবকাশই রাখেনি। এরূপ একীনকে শক্তিশালী একীন বলা হয়। এ প্রসঙ্গেই কোন মনীষী বলেছেন ঃ যে একীনে কোন সন্দেহ নেই, অথচ তা সেই সন্দেহের অনুরূপ যাতে কোন একীন নেই, তা মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু বলে আমার মনে হয় না।

আমরা আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখেছি যে, তারা বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোযোগী হন। এতে আমাদের উদ্দেশ্য উভয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশ্বাস। অর্থাৎ, প্রথমে সন্দেহ দূর হওয়া, অতঃপর মনের উপর বিশ্বাস এমন প্রবল হওয়া যে, তারই আদেশ কার্যকর হয়। এটা জানার পর তুমি একথার উদ্দেশ্যও জানতে পারবে যে, একীন তিন প্রকার– (১) একীনের শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া, (২) একীনের কম ও বেশী হওয়া এবং (৩) একীনের প্রকাশ্য ও গোপন হওয়া।

দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী শক্তিশালী ও দুর্বল হওয়া হচ্ছে, মনের উপর তার প্রাবল্য কেমন? এতে একীনের অশেষ অসংখ্য স্তর রয়েছে। মৃত্যুর প্রস্তুতিতে এসব স্তরের পার্থক্য অনুযায়ী মানুষও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। একীন যে প্রকাশ্য ও গোপন হয়, তাও অস্বীকার করা যায় না। আর একীন যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়, সেগুলো কম বেশী হওয়ার কারণে একীনও কম বেশী হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়– অমুক ব্যক্তি তার চেয়ে বেশী আলেম। অর্থাৎ, তার জানা বিষয়াদি বেশী। এজন্যই আলেম কখনও শরীয়তের সকল বিষয়ের উপর শক্তিশালী একীন রাখে এবং কখনও কতক বিষয়ের উপর একীন রাখে।

এখন একীনের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কি এবং কোন্ কোন্ কিষয়ে একীন কাম্য তা জানা দরকার। প্রকাশ থাকে যে, পয়গম্বরগণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছেন, সেগুলো সবই একীনের স্থান। অতএব বুঝা যায়, এগুলো গুনে শেষ করা সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা এখানে কয়েকটি মূল বিষয় উল্লেখ করছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তওহীদ। অর্থাৎ, সকল বস্তুকে সকল কারণের মূল কারণ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে মনে করতে হবে এবং মধ্যবর্তী কারণসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না; বরং মধ্যবর্তী কারণসমূহকে আল্লাহর অনুগত মানতে হবে– তাদের কোন প্রভাব স্বীকার করা যাবে না। যেব্যক্তি এসব বিষয়কে সত্য জ্ঞান করবে, তাকে তওহীদপন্থী বলা হবে। সত্য জ্ঞান করার সাথে সাথে যদি মন থেকে সন্দেহও দূর হয়ে যায়, তবে প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী সে মুকিন তথা একীনকারী হবে।

যদি ঈমানের সাথে সত্য জ্ঞান এমন প্রবল হয় যে, মধ্যবর্তী বিষয়সমূহের প্রতি ক্রুদ্ধ, সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ হওয়ার মনোভাব অন্তর থেকে দূরীভূত হয়ে যায় এবং সেগুলোকে পুরস্কারের ফরমান লেখকের তুলনায় তার কলম ও হাতের মত মনে করে, কলম ও হাতের প্রতি কেউ কৃতজ্ঞ হয় না এবং অসন্তুষ্টও হয় না; বরং এগুলোকে পুরস্কারদাতার হাতিয়ার মনে করে, তবে দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী তাকে একীনকারী বলা হবে। এই একীন প্রথম একীন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তার ফল ও প্রাণ। যখন মানুষের কাছে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জড় পদার্থ, উদ্ভিদ, জীব-জন্তু এবং সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের এমন অধীন, যেমন লেখকের হাতে কলম, তখন তার অন্তরে তাওয়াক্কুল, সন্তুষ্টি ও

শিরোধার্যতা প্রবল হবে এবং সে ক্রোধ, প্রতিহিংসা ও অসচ্চরিত্র থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

একীনের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রিযিকের দায়িত্ব সম্পর্কে একীন করা। আল্লাহ বলেন ঃ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রাণী রয়েছে, সকলের রিযিকই আল্লাহর যিম্মায়। এতে আল্লাহ তাআলা রিযিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ প্রতিশ্রুত এই রিযিক অবশ্যই পৌঁছবে এবং ভাগ্যে যা আছে তা অবশ্যই প্রেরণ করা হবে। এ বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ শরীয়তের আইন অনুযায়ী রিযিক অন্বেষণ করেও যা পাবে না তার জন্যে আফসোস করবে না এবং লোভ-লালসায় লিপ্ত হবে না। এ বিশ্বাস থেকেও কিছু আনুগত্য ও উত্তম চরিত্র প্রকাশ পাবে।

তৃতীয় স্তর, অন্তরে নিম্নোক্ত আয়াতের বিষয়বস্তু প্রবল হবে ঃ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ অর্থাৎ "অতঃপর যে কণা পরিমাণ সৎকর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে এবং যে কণা পরিমাণ অসৎ কর্ম করবে, সে তা প্রত্যক্ষ করবে।" অর্থাৎ, সওয়াব ও আযাবে বিশ্বাস করতে হবে। এমনকি, বুঝতে হবে যে, সওয়াবের সাথে সৎকর্মের সম্পর্ক উদরপূর্তির সাথে রুটির সম্পর্কের মত এবং আযাবের সাথে গোনাহর সম্পর্ক মরে যাওয়ার সাথে বিষপান বা সর্প দংশনের সম্পর্কের মত। মানুষ উদরপূর্তির জন্য যেমন রুটির অন্বেষণ প্রয়াসী হয় এবং অল্প বিস্তর যাই পায় তার হেফাযত করে, তেমনি সৎকর্ম করতে প্রয়াসী এবং কমবেশী যাই হোক, তা অর্জন করতে আগ্রহী হতে হবে। মানুষ যেমন কম ও বেশী বিষ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তেমনি সামান্য, অসামান্য, কম বেশী সকল প্রকার গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ বিষয়ে একীন প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী অধিকাংশ মুমিনের হয়ে থাকে; কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী বিশেষভাবে নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের হয়ে থাকে। এ বিশ্বাসের ফল এই হয় যে, মানুষ তার উঠাবসা, চলাফেরা ও বিপদাশংকা নিরীক্ষণ করতে থাকে এবং সর্বপ্রকার মন্দ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে অতিমাত্রায় সচেষ্ট হয়। একীন যত বেশী প্রবল হয়, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং সৎকর্মের প্রস্তুতি তত বেশী হয়।

চতুর্থ স্তর, আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমার সম্পর্কে জানেন এবং আমার মনের কুমন্ত্রণা, গোপন আশংকা ও চিন্তাসমূহ প্রত্যক্ষ করেন– এরূপ একীন করতে হবে। প্রথম পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন প্রত্যেক মুমিনের অর্জিত হয়। অর্থাৎ, কেউ এতে সন্দেহ করে না। কিন্তু দ্বিতীয় পরিভাষা অনুযায়ী এই একীন দুর্লভ। তবে যাঁরা সিদ্দীক, তাঁরা এই একীনের অধিকারী হন। এর ফলস্বরূপ মানুষ একান্তেও তার সব কাজকর্মে আদব এবং শিষ্টাচার বজায় রাখে। কোন ব্যক্তি বাদশাহের দৃষ্টির সামনে উপবিষ্ট থাকলে সে সব সময় মাথা নীচু করে সকল কাজে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং শিষ্টাচার বিরোধী কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। তেমনি মানুষ যখন জানবে, আল্লাহ তাআলা তার বাতেন সম্পর্কে যাহেরের মতই অবগত, তখন সে তার যাহেরী আমল ও বাতেনী চিন্তাভাবনা একই রূপ রাখতে চেষ্টা করবে। এ একীনে মানুষের মধ্যে লজ্জা, ভয়, বিনয়, নম্রতা, ও উত্তম চরিত্র সৃষ্টি করে এবং বড় বড় আনুগত্যের কারণ হয়। একীন যেন একটি বৃক্ষ, এসব চরিত্র যেন তার শাখা প্রশাখা। চরিত্র থেকে উদ্ভূত আমল ও আনুগত্য যেন ফল ও কলি, যা শাখা থেকে নির্গত হয়।

মোট কথা, একীনের মূল ভিত্তি এবং তার স্তর উপরোক্ত স্তরগুলো ছাড়া আরও অনেক রয়েছে। চতুর্থ খণ্ডে ইনশাআল্লাহ এগুলো বর্ণিত হবে। একীনের শাব্দিক অর্থ বুঝাবার জন্যে এখানে এতটুকুই যথেষ্ট।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে অনুধ্যান ও বিনয় সহকারে মাথানত করে চুপ থাকা– আকার আকৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন বা নীরবতা সব কিছুতেই ভয়ের প্রতিফলন হওয়া; তাঁকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হওয়া এবং তাঁর বাহ্যিক অবস্থাই আমলের দলীল হওয়া। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ গাম্ভীর্যের সাথে বিনয় ও নম্রতার চেয়ে উত্তম পোশক আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করেননি। এটা পয়গম্বরগণের পোশাক এবং সিদ্দকী ও আলেমগণের লক্ষণ। বেশী কথা বলা, হাসিতে ডুবে থাকা, নড়াচড়া ও কথাবার্তায় পটু হওয়া– এগুলো সব আস্ফালন এবং আল্লাহর মহাশাস্তি ও গজব থেকে গাফেল থাকার লক্ষণ। এটা দুনিয়াদারদের রীতি, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে; আলেমগণের রীতি নয়। কেননা, সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ আলেম তিন প্রকার– (১) যে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে জ্ঞাত, কিন্তু তাঁর শাস্তির প্রকার সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে আদেশ করে। এ ধরনের এলেম

আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে না। (২) যে আল্লাহকে জানে কিন্তু তাঁর আদেশ ও শাস্তির প্রকার জানে না, এরা সাধারণ ঈমানদার। (৩) যাঁরা আল্লাহকেও জানে এবং তাঁর আদেশ ও শাস্তির প্রকার সম্পর্কেও অবগত, তাঁরা সিদ্দীক। ভয় ও বিনয় কেবল তাঁদের উপরই প্রবল থাকে।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন– এলেম অর্জন কর এবং এলেমের জন্যে গাম্ভীর্য ও সহনশীলতা অনুশীলন কর। যাঁর কাছে শিখবে তাঁর প্রতি বিনয়ী হও। তোমার কাছে যে জ্ঞান অর্জন করবে তাঁর পক্ষেও তোমার প্রতি বিনয়ী হওয়া উচিত। অত্যাচারী আলেম হয়ো না। এরূপ হলে তোমার এলেম মূর্খতা অপেক্ষাও মন্দ হবে। কেউ বলেন ঃ যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে এলেম দান করেন, তখন তাঁকে এলেমের সাথে সহনশীলতা, বিনয়, সচ্চরিত্রতা ও নম্রতাও দান করেন। একেই বলা হয় কল্যাণকর এলেম। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ্ যাঁকে এলেম, সংসার নির্লিপ্ততা, বিনয় ও সচ্চরিত্র দান করেন, সে মোত্তাকীদের ইমাম হয়ে থাকে।

হাদীস শরীফে আছে– আমার উম্মতের মধ্যে এমন উত্তম লোক রয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার অপরিসীম রহমত দেখে প্রকাশ্যে হাসে এবং তাঁর আযাবের ভয়ে সংগোপনে ক্রন্দন করে। তাদের দেহ পৃথিবীতে আর অন্তর আকাশে। তাদের প্রাণ ইহজগতে এবং জ্ঞান বুদ্ধি পরজগতে। তারা গাম্ভীর্য সহকারে চলে এবং ওসিলা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। অর্থাৎ, যে বিষয় নৈকট্যের কারণ মনে করে তা পালন করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ সহনশীলতা এলেমের উযীর, নম্রতা তার পিতা এবং বিনয় তার পোশাক। বিশর ইবনে হারেস বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম দ্বারা রাজত্ব কামনা করে, আল্লাহর নৈকট্য তার সাথে শত্রুতা রাখে। কারণ, সে আকাশ ও পৃথিবীতে ঘৃণিত। বনী ইসরাঈলের কাহিনীসমূহে বর্ণিত আছে– জনৈক দার্শনিক ব্যক্তি দর্শনশাস্ত্রে তিনশ' ষাটটি গ্রন্থ রচনা করে একজন খ্যাতিমান দার্শনিক হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা তখনকার পয়গম্বরের প্রতি ওহী পাঠান, অমুক ব্যক্তিকে বলে দাও, তুমি তোমার গ্রন্থ দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে দিয়েছ। কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই আমার নিয়ত করনি। তাই আমি কিছুই কবুল করিনি। দার্শনিক একথা শুনে অত্যন্ত অনুতপ্ত হল। সে জনগণের সাথে মিশে গেল, বাজারে ঘুরাফেরা করল, বনী ইসরাঈলের সাথে পানাহার অবলম্বন করল এবং মনে মনে বিনয়ী হল। তখন আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরের প্রতি

ওহী পাঠালেন– তাকে বলে দাও, এখন সে আমার সন্তুষ্টির তওফীক প্রাপ্ত হয়েছে।

আওযায়ী বেলাল ইবনে সা'দের এই উক্তি বর্ণনা করেন ঃ তোমরা শাহ্নার সিপাহীকে দেখলে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর, অথচ নেতৃত্বলিপ্সু দুনিয়ার আলেমদেরকে দেখে খারাপ মনে কর না। পক্ষান্তরে এরা সিপাহীর তুলনায় অধিক ঘৃণার যোগ্য।

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা এবং সদাসর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা। অতঃপর কেউ প্রশ্ন করল ঃ কোন্ বন্ধু উত্তম? তিনি বললেন ঃ সে বন্ধু উত্তম যে তোমাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করে এবং তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ মন্দ সঙ্গী কে? তিনি বললেন ঃ তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে যে তোমাকে সাহায্য করে না, সে-ই মন্দ সঙ্গী। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক আলেম কে? তিনি বললেন ঃ যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে। আরজ করা হল ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে, বলে দিন, যাতে আমরা তার সংসর্গে বসতে পারি। তিনি বললেন ঃ যাদের দিকে তাকালে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, তারা উত্তম। প্রশ্ন হল ঃ সর্বাধিক মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন ঃ আমি মাগফেরাত কামনা করি। (এ কথাটি মন্দ লোকের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্যে বলা হয়েছে।) পুনরায় আরজ করা হল ঃ আপনি বলে দিন। তিনি বললেন ঃ সর্বাধিক মন্দ লোক হচ্ছে বিপথগামী আলেম।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতে সে ব্যক্তিই অধিক নিশ্চিন্ত থাকবে, যে দুনিয়াতে অধিক চিন্তা ভাবনা করত। আখেরাতে সে ব্যক্তিই হাসবে, যে দুনিয়াতে ক্রন্দন করত। আখেরাতে সর্বাধিক সুখী সে-ই হবে, যে দুনিয়াতে বহু দিন কষ্ট ভোগ করেছে। হযরত আলী (রাঃ) এক খোতবায় বলেন ঃ তাকওয়া অবলম্বন করা সত্ত্বেও কারও আমলের ফসল যাতে ফ্যাকাসে ও ধ্বংস না হয়ে যায়, সে দায়িত্ব আমার। মানুষের মধ্যে সেই অধিক মূর্খ, যে তাকওয়ার মূল্য বুঝে না। আল্লাহ তাআলার কাছে সেই মন্দ, যে এলেম সকল জায়গা থেকে সংগ্রহ করে ফেতনার অন্ধকারে হানা দেয় এবং নীচ লোকেরা তার নাম রাখে আলেম। তিনি আরও বলেন ঃ যখন তোমরা এলেম শুন, চুপ থাক এবং হাস্য-রসের

সাথে মিশ্রিত করো না। নতুবা অন্তরে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেম যখন একবার হাসে, তখন এক গ্রাস এলেম মুখ দিয়ে বের করে দেয়। কেউ বলেন ঃ ওস্তাদের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকলে তার কারণে শাগরেদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হবে। প্রথম– সবর, দ্বিতীয়– বিনয় এবং তৃতীয়– সচ্চরিত্র। পক্ষান্তরে শাগরেদের মধ্যে তিনটি বিষয় থাকলে ওস্তাদ পূর্ণ নেয়ামত প্রাপ্ত হয়– জ্ঞানবুদ্ধি, শিষ্টাচার ও উত্তম বোধশক্তি। সারকথা, কোরআনে বর্ণিত চরিত্র থেকে আখেরাতের আলেমগণ মুক্ত নন। তারা আমলের জন্যে কোরআন পাঠ করেন– কেবল পড়া ও পড়ানোর জন্যে নয়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ এটা দেখেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম কোরআনের পূর্বে ঈমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কোন সূরা নাযিল হলে আমরা তার হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধ এবং সূরার মধ্যে বিরতির জায়গা জেনে নিতাম। এখন আমি এমন লোক দেখছি, যারা ঈমানের পূর্বে কোরআন প্রাপ্ত হয়। তারা আলহামদু থেকে নিয়ে কোরআনের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফেলে, কিন্তু জানে না তাতে কি আদেশ নিষেধ রয়েছে এবং বিরতি কোথায় হবে? তারা কোরআনকে পচা খেজুরের মত ছড়িয়ে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ পাঁচটি চরিত্র আখেরাতের আলেমগণের লক্ষণ। এগুলো কোরআন মজীদের পাঁচটি আয়াত থেকে বুঝা যায়– ভয়, নম্রতা, বিনয়, সচ্চরিত্র ও দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাত অবলম্বন। ভয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ –একমাত্র আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।

নম্রতা এই আয়াত থেকে জানা যায়– خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا –তারা আল্লাহর কাছে নম্র, তাঁর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে না।

বিনয় এই আয়াত থেকে বুঝা যায়– وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ – আপনি আপনার অনুসারী মুমিনদের জন্যে বাহু নত রাখুন।

সচ্চরিত্র এই আয়াত থেকে বুঝা যায়- فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ -আল্লাহর রহমতে আপনি তাদের জন্যে নম্র স্বভাব হয়েছেন।

সংসারের প্রতি নির্লিপ্ততা এ আয়াত থেকে জানা যায়- وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا - -জ্ঞানপ্রাপ্তরা বলল ঃ তোমাদের দুর্ভোগ, আল্লাহর দেয়া সওয়াব মুমিন ও সৎকর্মীর জন্যে উত্তম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করলেন- فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ -অর্থাৎ আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন।

জনৈক ব্যক্তি আরজ করল ঃ বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ কি ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নূর যখন অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন তা গ্রহণ করার জন্যে বক্ষ খুলে যায়। জিজ্ঞেস করা হল ঃ এর কোন পরিচয় আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এর পরিচয় হল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হবে, পরকালের প্রতি মনোযোগী হবে এবং মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তারা অধিকাংশ কথাবার্তা এলেম ও আমল সম্পর্কে বলেন; বরং যেসব বিষয় আমল নষ্ট করে, মনকে পেরেশান করে, কুমন্ত্রণা জাগ্রত করে এবং অনিষ্ট সৃষ্টি করে, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেন না। কেননা, অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা দ্বীনের মূল। আর যারা দুনিয়াদার আলেম তারা রাজ্যশাসন ও মামলা-মোকদ্দমার খুঁটিনাটি শাখা-প্রশাখা শিক্ষা করে। তারা এমন সব মাসআলা গড়ার কাজে পরিশ্রম করে, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত কখনও বাস্তবে রূপ নেয় না, নিলেও তাদের জন্যে নয়- অন্যের জন্যে। অথচ যেসব বিষয় তাদের সাথে প্রতিনিয়ত লেগে থাকে, সেগুলো তারা ত্যাগ করেই বসে রয়েছে। যারা মানুষের কাছে নৈকট্যশীল ও প্রিয় হওয়ার উদ্দেশে এ ধরনের অবাস্তব ও অনাবশ্যক কাজ করে, তারাই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যাহত।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতিদান এই, তারা দুনিয়াতেও মানুষের প্রিয় হয় না এবং আখেরাতেও আল্লাহর কাছে তাদের কর্মসমূহ মূল্যহীন; বরং তারা বিপদাপদে জড়িত হয়ে তিক্ত জীবন যাপন করে। তারা কেয়ামতে রিক্তহস্তে যাবে এবং আখেরাতের আলেমগণের সাফল্য ও সৌভাগ্য দেখে অনুতাপ করবে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর কথাবার্তা বেশীর ভাগ পয়গম্বরগণের কথাবার্তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং চরিত্র ও জীবনপদ্ধতিতে তিনি অন্যের তুলনায় বেশীর ভাগ সাহাবায়ে কেরামের নিকটবর্তী ছিলেন। তাঁর এ দু'টি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সবাই একমত। তাঁর অধিকাংশ ওয়ায-নসীহত, অন্তরের বিপদাশংকা, আমলের অনিষ্ট, নফসের কুমন্ত্রণা, নফসের গোপন ও সূক্ষ্ম খাহেশাতের অনিষ্ট সম্পর্কে হত। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি এমন ওয়ায করেন যা আমরা অন্যদের কাছে শুনি না। আপনি এই ওয়ায কোথায় শিখলেন? তিনি বললেন ঃ সাহাবী হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ)-এর কাছ থেকে শিখেছি। হুযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি এমন কথাবার্তা বলেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একশ' সাহাবীর মধ্যে কারও মুখে শুনি না। আপনি এই কথাবার্তা কোথা থেকে আয়ত্ত করলেন? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমি এটা লাভ করেছি। অন্যরা তাঁকে কল্যাণের অবস্থা জিজ্ঞেস করত, আমি অনিষ্টের অবস্থা জিজ্ঞেস করতাম। আমি কোথাও অনিষ্টে লিপ্ত হয়ে পড়ি– এই আশংকায়ই এরূপ করতাম। কল্যাণ আমার কাছে আসবে– এটা আমি জানতাম। এক রেওয়ায়েতে আছে– আমি জানতাম, যে অনিষ্ট চেনে না সে কল্যাণও চেনে না। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এ ধরনের প্রশ্ন করত– যে এমন ধরনের কাজ করে সে কি সওয়াব পাবে? অর্থাৎ, তাঁরা আমল ও ফযীলত সম্পর্কে প্রশ্ন রাখত আর আমি জিজ্ঞেস করতাম– ইয়া রসূলাল্লাহ, কিসে অমুক অমুক আমল নষ্ট করে দেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন দেখলেন, আমি কেবল আমল নষ্টকারী বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করি, তখন তিনি আমাকে বিশেষভাবে এ শিক্ষাই দান করলেন। হযরত হুযায়ফা নেফাক ও তার সূক্ষ্ম কারণাদি জানার ব্যাপারেও একক ছিলেন। হযরত ওমর, ওসমান ও বড় বড় সাহাবীগণ তাঁকে ফেতনার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। মোনাফেকদের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি তাদের

সংখ্যা বলে দিতেন– নাম বলতেন না। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে নিজের অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন– আমার মধ্যে কোন নেফাক তো নেই? তিনি তাঁকে নেফাক থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলতেন। হযরত ওমরকে কোন জানাযার নামায পড়ার জন্যে ডাকা হলে তিনি দেখতেন, সেখানে হুযায়ফা উপস্থিত আছেন কিনা? উপস্থিত থাকলে তিনি নামায পড়তেন, নতুবা পড়তেন না। হযরত হুযায়ফার উপাধি ছিল 'ছাহিবুস সির' অর্থাৎ রহস্যজ্ঞানী। মোট কথা, অন্তরের স্তর ও অবস্থার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা আখেরাতের আলেমগণের রীতি। কেননা, আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্যে অন্তরই প্রচেষ্টা চালায়। বর্তমানে এ শাস্ত্র দুর্লভ ও প্রাচীন হয়ে গেছে। কোন আলেম এ শাস্ত্রে কোন বিষয়ের প্রয়াসী হলে মানুষ আশ্চর্যবোধ করে এবং বলে ঃ এটা কেবল ওয়ায়েযদের ধোকা। তারা কেবল বিবাদ বিতর্কের মধ্যেই সত্যিকার বিষয় নিহিত আছে বলে মনে করে। কেননা, সত্য তিক্ত এবং তা জানা কঠিন। এর পথও অত্যন্ত সূক্ষ্ম। বিশেষতঃ অন্তরের গুণাবলী জানা ও অন্তরকে মন্দ চরিত্র থেকে পাক পবিত্র করা তো মৃত্যু যন্ত্রণার শামিল। সুতরাং এমন পথের দিকে মানুষ বেশী আকৃষ্ট হবে কেমন করে। কথিত আছে, বসরায় একশ' বিশ জন ওয়ায়েয ছিল, কিন্তু তাদের তিন ব্যক্তি ছাড়া কেউ একীন ও অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করত না। এ তিন জন ছিলেন সহল তস্তরী, ছবিহী ও আবদুর রহীম। তাদের ওয়াযে অসংখ্য জনসমাগম হত, কিন্তু এই তিন জনের ওয়াযে দশ জনের বেশী শ্রোতা থাকত না। কেননা, বিশেষ লোকগণই উৎকৃষ্ট বস্তুর যোগ্য হয়ে থাকে। আর জনগণকে যা দেয়া হয়, তা সহজ হয়ে থাকে। তার প্রার্থী হয় অনেক।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা তাঁদের জ্ঞান গরিমায় অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তরের স্বচ্ছ উপলব্ধির উপর ভরসা করেন, কিতাব বা গ্রন্থের উপর করেন না। অন্যের কাছ থেকে শোনা বিষয়ের উপরও তাঁরা ভরসা করেন না। তাঁরা কেবল শরীয়তের কর্ণধার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তকলীদ তথা অনুসরণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের তকলীদও এদিক দিয়ে করেন, তাঁদের কাজকর্মগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শোনার উপর ভিত্তিশীল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কথা বলেছেন এবং যেসব কাজ করেছেন, সেগুলো অবশ্যই কোন তাৎপর্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল। কাজেই তাঁর

উক্তি ও কর্ম অনুসরণ করার পর সেগুলোর যথাযথ তাৎপর্য অনুসন্ধান করা উচিত। কেননা, আলেম যদি যা শুনে তাই মনে রাখে, তবে সে এলেমের পাত্র হবে- আলেম হবে না। এজন্যেই আগেকার দিনে এধরনের ব্যক্তিকে এলেমের পাত্র বলা হত, আলেম বলা হত না। সুতরাং যে কেবল মুখস্থ করে এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত নয়, তাকে আমরা আলেম বলব না। পক্ষান্তরে যার অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায় এবং সে হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হয়ে যায়, সে আপনা আপনি অনুসৃত হয়ে যায়। অপরের তকলীদ করা তার উচিত নয়। এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া কেউ এমন নয়, যার সব কথাই মেনে নেয়া যায়- কতক মেনে নেয়া হয় এবং কতক মেনে নেয়া হয় না। ইবনে আব্বাস ফেকাহ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ)-এর কাছে শিখেছিলেন এবং কেরাআত হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-ক শুনিয়েছিলেন। এরপর উভয় শাস্ত্রে উভয় ওস্তাদের সাথে মতভেদ করেছেন। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে আমরা যা কিছু পেয়েছি, তা তো আমরা শিরোধার্য করে নেই। আর সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে যা পেয়েছি, তার কিছু অংশ গ্রহণ করি এবং কিছু অংশ করি না। তাবেয়ীগণের কাছ থেকে যা পেয়েছি- সেক্ষেত্রে তাঁরাও মানুষ এবং আমরাও মানুষ। সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থার ইঙ্গিত স্বচক্ষে দেখেছেন। ইঙ্গিত দ্বারা তাঁরা যা জেনেছেন, তার সাথে তাঁদের অন্তর সম্পৃক্ত হয়েছে। এ সম্পর্কের কারণে তাঁরা সত্যের উপর স্থির রয়েছেন। ইঙ্গিত দ্বারা যা বুঝা যায়, তা রেওয়ায়েত ও ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

অপরের কাছ থেকে শোনা কথার উপর ভরসা করা যখন অপছন্দীয় তকলীদ, তখন কিতাব ও রচনাবলীর উপর ভরসা করা আরও অবান্তর। বরং কিতাব ও রচনাবলী নতুন জিনিস। সাহাবায়ে কেরামের যুগ এবং কিছুটা তাবেয়ীগণের যুগে কোন কিতাব অথবা রচনা ছিল না। হিজরতের একশ' বিশ বছর পরে সমস্ত সাহাবী ও কিছু সংখ্যক তাবেয়ীর ওফাতের পর রচনার সূত্রপাত হয়। সাহাবায়ে কেরাম তো হাদীসের কেতাব লেখা ও রচনা করা খারাপ মনে করতেন। তাঁরা আশংকা করতেন, মানুষ কিতাবের উপর ভরসা করে হাদীস মুখস্থ করা, কোরআন পাঠ করা এবং বুঝা ছেড়ে দিতে পারে। তাঁরা বলতেন ঃ আমরা যেমন মুখস্থ করি,

তোমরাও মুখস্থ কর। এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং আরও কয়েকজন সাহাবী কোরআন মজীদকে মাসহাফ তথা গ্রন্থাকারে একত্রিত করা উপযুক্ত মনে করেননি। তাঁরা বলতেন ঃ যে কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) করেননি, আমরা তা কিরূপে করতে পারি ? কাজেই কোরআনকে এমনিভাবে রেখে দাও এবং একে অপরের কাছ থেকে শিখে নাও। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ) ও অবশিষ্ট সাহাবীগণ এই আশংকায় কোরআন লেখতে বললেন যে, মানুষ অবহেলা ও শৈথিল্য করবে অথবা পড়ার ক্ষেত্রে কোন শব্দ অথবা মিলের খেলাফ হলে তা দূর করার জন্যে কোন মূল পাওয়া যাবে না। এভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর মনও এ কাজের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে গেল এবং তিনি কোরআন মজীদ সংগ্রহ করে মাসহাফে তথা পান্ডুলিপি আকারে সংরক্ষণ করলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম মালেককে মুয়াত্তা রচনা করতে নিষেধ করতেন এবং বলতেন ঃ যে কাজ সাহাবায়ে কেরাম করেননি, আপনি তার উদ্ভাবন করবেন না। কথিত আছে, ইসলামে সর্বপ্রথম রচিত কিতাব হচ্ছে ইবনে জুরায়জের কিতাব– যাতে মনীষীগণের উক্তি এবং মুজাহিদ, আতা ও হযরত ইবনে আব্বাসের শাগরেদদের বর্ণিত তফসীরসমূহ লিপিবদ্ধ হয়। এটি মক্কা মোয়াযযমায় সংকলিত হয়। এরপর মা'মার ইবনে রাশেদ সানআনীর হাদীস সম্বলিত কিতাব ইয়ামনে গ্রন্থিত হয়। এরপর ইমাম মালেকের মুয়াত্তা এবং সুফিয়ান সওরীর জামে' রচিত হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে কালাম শাস্ত্রের রচনাবলী প্রকাশ পায় এবং প্রচুর পরিমাণে কলহ-বিবাদ ও বাজে বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। মানুষ এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং কিসসা ও ওয়ায বলার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

তখন থেকে একীন শাস্ত্র হ্রাস পেতে থাকে এবং পরে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, অন্তরের এলেম ও নফসের ভালমন্দ অবস্থা জানা একটি দুরূহ ব্যাপারে পরিণত হয়ে যায়। কয়েকজন আগ্রহী ব্যক্তি ছাড়া সবাই এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এখন সে-ই আলেম কথিত হয়, যে মোনাযারা করে, কালাম শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ওয়াযে খুব চটকদার ভাষায় ও ছন্দপূর্ণ বাক্যে কিসসা-কাহিনী বর্ণনা করে। এর কারণ, এগুলো জনসাধারণ শুনে, যারা জানে না, কোন্‌টি বাস্তব এলেম এবং কোন্‌টি অবাস্তব। সাহাবায়ে কেরামের তরীকা ও এলেম তাঁদের জানা নেই যাতে তার সাথে মিলিয়ে দেখে নেবে যে, আজকালকার আলেমরা তাঁদের

সম্পূর্ণ বিপরীত। এদিক দিয়েই জনসাধারণ যাকে কিছু বলতে শুনেছে, তাকে আলেম বলে দিয়েছে। পরবর্তীরাও এ ব্যাপারে পূর্ববর্তীদেরই পদাংক অনুসরণ করেছে। ফলে আখেরাতের এলেম শিকায় উঠেছে। পূর্বেকার যুগে যখন দ্বীনের এই ঢিলে অবস্থা, তখন বর্তমানকালের অবস্থা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়ে না। এখন যদি কেউ কালাম শাস্ত্র অস্বীকার করে, তবে উন্মাদ বলা হয়। কাজেই এখন নীরবে নফসের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করাই উত্তম।

আখেরাতের আলেমগণের আরেকটি লক্ষণ, তাঁরা বেদআত তথা নবাবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে সযত্নে বেঁচে থাকেন, যদিও সকল জনসাধারণ সে বিষয়ে একমত হয়ে যায়। যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে নতুন আবিষ্কৃত হয়, তাতে জনসাধারণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার দরুন বিভ্রান্ত হন না। তাঁরা সাহাবায়ে কেরামের জীবনালেখ্য ও কাজকর্মের অন্বেষণে ব্রতী হন এবং দেখেন, তাঁদের শক্তি কি কি বিষয়ে নিয়োজিত ছিল– শিক্ষকতায়, রচনায়, মোনাযারায়, বিচারক ও শাসক হওয়ায়, ওয়াকফের মুতাওয়াল্লী হওয়ায়, এতীমের মালের রক্ষক হওয়ায়, শাসকদের সাথে উঠাবসা করায় নিয়োজিত ছিল, না ভয়, চিন্তা-ভাবনা ও মোজাহাদায়, যাহের ও বাতেনের মোরাকাবায়, ছোট বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষায়, নফসের গোপন খায়েশ জানায় এবং শয়তানের চক্রান্ত উদঘাটন করায় তাঁরা মশগুল ছিলেন ? একথা নিশ্চিতরূপে জেনে নাও, সে ব্যক্তিই বেশী আলেম এবং সত্যের অধিক নিকটবর্তী, যাঁর সাহাবায়ে কেরামের সাথে অধিক মিল রয়েছে এবং পূর্ববর্তী মনীষীদের পন্থা সম্পর্কে যে অধিক ওয়াকিফহাল । কেননা, দ্বীন তাঁদের কাছ থেকেই নেয়া হয়েছে। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে অধিক দ্বীনদার । একথা তিনি তখন বলেছিলেন, যখন কেউ তাঁকে বলেছিল ঃ আপনি অমুক ব্যক্তির বিরোধিতা করেছেন। মোট কথা, তোমার কাজকর্ম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যমানার অনুরূপ হলে সমকালীন লোকদের বিরোধিতার পরওয়া করো না। কারণ, লোকেরা তাঁদের মনের খাহেশ অনুযায়ী একটি নীতি ঠিক করে নিয়েছে এবং তারা একথা স্বীকার করতে সম্মত নয় যে, তাদের নীতি জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ফলে তারা দাবী করে, এ নীতি ছাড়া জান্নাত লাভের কোন পথ নেই। এ কারণেই হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ ইসলামে দুই শ্রেণীর নতুন

লোক সৃষ্টি হয়ে গেছে– (১) যাদের নীতি খারাপ, কিন্তু তারা বলে যে, জান্নাত তার জন্যই, যার নীতি তাদের নীতির অনুরূপ। (২) ধনী দুনিয়াদার, যারা দুনিয়ার জন্যই সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয় এবং দুনিয়াই অন্বেষণ করে। সুতরাং তুমি উভয় শ্রেণীকে বর্জন কর এবং তাদেরকে জাহান্নামে যেতে দাও। যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকে, যাকে ধনীরা তাদের দুনিয়ার দিকে আর বেদআতীরা তাদের ভ্রষ্ট নীতির দিকে ডাকে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় দল থেকে দূরে রাখেন এবং সে পূর্ববর্তী মনীষীদের কর্মপন্থা অনুসরণ করে, তবে তুমিও তাঁর মতই হয়ে যাও। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে মওকুফ ও মরফু উভয় পন্থায় বর্ণিত আছে, শিক্ষণীয় বিষয় দুটিই– একটি কালাম ও অপরটি চরিত্র । কালামের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কালাম এবং চরিত্রের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চরিত্র । সাবধান, তোমরা নতুন বিষয়াদি থেকে দূরে সরে থাক। সর্বনিকৃষ্ট বিষয় হচ্ছে নতুন বিষয় । নতুন বিষয় মানেই বেদআত এবং প্রত্যেক বেদআতই পথভ্রষ্টতা । খবরদার, নিজের জীবনকে বেশী মনে করো না, নতুবা তোমাদের অন্তর কঠোর হয়ে যাবে। মনে রেখো, যে বস্তু আসবে তা কাছেই । দূরে সে বস্তু যা আসে না।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ কারণে বলেন ঃ সে ব্যক্তিই সুখী যে নিজের দোষ দেখে অন্যের দোষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, হালাল উপায়ে উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে মেলামেশা করে এবং গোনাহগারদের কাছ থেকে বেঁচে থাকে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলতেন ঃ শেষ যমানায় সচ্চরিত্র হওয়া অনেক আমলের তুলনায় উত্তম হবে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যখন তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে সৎকর্মে অগ্রণী । সত্বরই তোমাদের পরে এমন এক সময় আসবে, যখন উত্তম হবে সে ব্যক্তি যে দৃঢ়পদ থাকে এবং কর্ম সম্পাদনে তড়িঘড়ি করে না। কেননা, সন্দেহ সংশয় হবে অনেক– এ উক্তি যথার্থ । কেননা, এ যুগে কাজকর্মে যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে বিরতি না দেয় এবং যেসব কাজে সবাই লিপ্ত, তাতে সেও লিপ্ত হয়ে যায়, তবে সকলের মত সে-ও বরবাদ হবে।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরও বিস্ময়কর উক্তি করেছেন। তিনি বলেন ঃ এসময়ে তোমাদের পুণ্য পূর্ববর্তী সময়ের পাপ, আর এখন যাকে তোমরা পাপ মনে কর তা পূর্বযুগে পুণ্য ছিল। তোমরা যতক্ষণ সত্যকে

চিনবে, ততক্ষণ কল্যাণ প্রাপ্ত হবে। তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। বর্তমান যুগের অধিকাংশ পুণ্য কাজ সাহাবায়ে কেরামের যুগে অস্বীকৃত ছিল। উদাহরণতঃ আজকাল পুণ্যের ধোঁকায় মসজিদসমূহের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যবর্ধন এবং দালানের কারুকার্যে বিস্তর অর্থ ব্যয় করা হয়। মসজিদে কার্পেট বিছানো হয়। অথচ পূর্বে মসজিদে চট বিছানোও বেদআতরূপে গণ্য হত। কথিত আছে, মসজিদে ফরাশ ইত্যাদি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের আবিষ্কার। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ মসজিদের মাটিতে কমই ফরাশ বিছাতেন। মোনাযারা বিতর্কের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করাকেও আজকাল বড় পুণ্য কাজ মনে করা হয়। অথচ পূর্বে একে খুব মন্দ কাজ মনে করা হত। কোরআন পাঠ এবং আযানে সুরেলা কণ্ঠও এরই অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) যথার্থই বলেছেন ঃ তোমরা এখন এমন এক যমানায় রয়েছ, যাতে খাহেশ এলেমের অনুসারী, কিন্তু এক সময় আসবে যখন এলেম খাহেশের অনুসারী হবে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলতেন ঃ মানুষ সুন্নত পরিত্যাগ করে নতুন নতুন বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত রয়েছে । এগুলোর মধ্যে এলেম খুব কম । আল্লাহ্ সাহায্য করুন । মালেক ইবনে আনাস বলেন ঃ মানুষ আজকাল যা জিজ্ঞেস করে, অতীতে তা জিজ্ঞেস করত না। আলেমগণ হারাম ও হালাল বর্ণনা করতেন না। আমি তাঁদেরকে মোস্তাহাব ও মকরূহ্ বর্ণনা করতে দেখেছি । অর্থাৎ, তাঁদের দৃষ্টি কেবল মোস্তাহাব ও মকরূহ বিষয়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাকত । হারাম থেকে তাঁরা বেঁচেই থাকতেন। আবু সোলায়মান দুররানী (রহঃ) বলতেন ঃ কারও অন্তরে কোন ভাল বিষয় ইলহাম হলে সুন্নতে তার অস্তিত্ব আছে কিনা, যাচাই না করা পর্যন্ত আমল করা উচিত নয়। সুন্নতে তার অস্তিত্ব পাওয়া গেলে আল্লাহর শোকর করে আমল করবে। এ কথা বলার কারণ, আজকাল নতুন নতুন অনেক বিষয় শুনে মানুষ অন্তরে তা প্রতিষ্ঠিত করে নেয়। এতে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট হয়। ফলে মিথ্যাকে সত্য মনে করতে থাকে। তাই সাবধানতা জরুরী। এ কারণেই মারওয়ান ঈদের নামাযে ঈদগাহের সন্নিকটে মিম্বর তৈরী করালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে মারওয়ান! এটা কি বেদআত? মারওয়ান বলল ঃ এটা বেদআত নয়; বরং উত্তম কাজ। আপনি জানেন, অনেক লোক সমাগত হয়। তাই আমি সকলের কাছে আওয়ায পৌঁছাতে চেয়েছি। তিনি বললেন

ঃ আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তা থেকে উত্তম কাজ তুমি কখনও করবে না। আজ আমি তোমার পেছনে নামায পড়ব না। হযরত আবু সায়ীদের এ অস্বীকৃতির কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের খোতবা এবং বৃষ্টির জন্যে দোয়া করার সময় ধনুক অথবা লাঠির উপর ভর দিতেন; মিম্বরে আরোহণ করতেন না। এক হাদীসে আছে–

من احدث فى ديننا ما ليس منه فهو رد 'যেব্যক্তি আমাদের দ্বীনে এমন নতুন বিষয় সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, সে প্রত্যাখ্যাত।' অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– যেব্যক্তি আমার উম্মতকে ধোঁকা দেয়, তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিসম্পাত। কেউ আরজ করল ঃ আপনার উম্মতকে ধোঁকা দেয়ার অর্থ কি? তিনি বললেন ঃ বেদআত সৃষ্টি করে তার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ তাআলার এক ফেরেশতা প্রত্যহ ঘোষণা করে– যেব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নতের খেলাফ করে, সে তাঁর শাফাআত থেকে বঞ্চিত হবে। যেব্যক্তি সুন্নত বিরোধী বেদআত সৃষ্টি করে দ্বীনের ব্যাপারে গোনাহগার হয়, সে অন্যান্য গোনাহগারের তুলনায় এমন, যেমন বাদশাহকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টায় নিয়োজিত ব্যক্তি সে ব্যক্তির তুলনায়, যে কোন বিশেষ কাজে বাদশাহর কথা অমান্য করে। এ ত্রুটি বাদশাহ কখনও ক্ষমা করে দেন, কিন্তু সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তির দোষ কখনও ক্ষমা করেন না। কোন এক মনীষী বলেন ঃ পূর্ববর্তীরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সে বিষয়ে চুপ থাকা অন্যায় এবং যে বিষয়ে তাঁরা চুপ রয়েছেন, সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা বাড়াবাড়ি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ মধ্যবর্তী পথ আঁকড়ে ধর। যে এ পথ থেকে এগিয়ে চলে যায়, সে ফিরে আসুক এবং যে পেছনে থেকে যায় সে এগিয়ে যাক। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ পথভ্রষ্টরা অন্তরে পথভ্রষ্টতারও মিষ্টতা অনুভব করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا ـ

অর্থাৎ, যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকে পরিণত করেছে, তাদেরকে পরিত্যাগ কর।

তিনি আরও বলেন ঃ فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا
অর্থাৎ, যার সামনে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করে পেশ করা হয়, সে তাকে কল্যাণকর মনে করে।

অতএব যে বিষয় সাহাবায়ে কেরামের পরে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা সবই ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইবলীস তার সাঙ্গোপাঙ্গকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। তারা ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে ফিরে এলে ইবলীস জিজ্ঞেস করল ঃ তোমরা কি করলে? তারা বলল ঃ আমরা সাহাবীদের মত লোক দেখিনি। তাঁদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন চক্রান্তই সফল হয় না। আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ইবলীস বলল ঃ বাস্তবিকই তোমাদের সাধ্য হবে না। কেননা, তাঁরা তাঁদের নবীর সংসর্গলাভ এবং কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু শীঘ্র তাঁদের পরে কিছু লোক জন্ম নেবে, যাদের কাছে তোমরা সাফল্য অর্জন করতে পারবে। এরপর তাবেয়ীদের যুগ এলে ইবলীস আবার তার দলবল ছড়িয়ে দিল। তারা পূর্বের ন্যায় ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসে বলল ঃ আমরা তাঁদের মত অধিক আশ্চর্যজনক লোক দেখিনি। কোথাও আমাদের চক্রান্ত সফল হলে এবং কিছু গোনাহ করাতে পারলে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা তাঁদের পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আল্লাহ তাঁদের পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেন্। ইবলীস বলল ঃ তোমরা তাঁদের কাছ থেকেও কিছু পাবে না। কারণ, তাঁদের তওহীদ সঠিক এবং নবীর সুন্নত অনুসরণের কারণে সবল। তাঁদের পর এক সম্প্রদায় আসবে, যাদের দ্বারা তোমাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। খাহেশের লাগাম ধরে তোমরা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ফেরাতে পারবে। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করলেও তাদের ক্ষমা করা হবে না। তারা এমন তওবা করবে না যে, আল্লাহ্ তাঁদের তওবার দৌলতে পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দেবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এরপর প্রথম শতাব্দীর পরবর্তী লোকদের মধ্যে শয়তান বেদআত ছড়িয়ে একে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দিল। ফলে তারা বেদআতকে হালাল জ্ঞান করল এবং দ্বীনের কাজ বলে ধরে নিল। তারা বেদআত করে ক্ষমা প্রার্থনাও করে না এবং তওবাও করে না। ইবলীস তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা টেনে নেয়। যদি বল, ইবলীস তো কারও সাথে কথা বলে না, অতএব বর্ণনাকারী এসব কথা কোথেকে জানলেন? এর জওয়াব, আধ্যাত্ম পুরুষের কাছে জগতের বহু গোপন রহস্য উদঘাটিত হয়। কখনও তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের অন্তরে অপ্রকাশিত

বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়ে যায়। একে বলা হয় ইলহাম। কখনও সত্য স্বপ্নের আকারে তাঁরা রহস্য অবগত হয়ে যান এবং কখনও জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্টান্ত দেখে রহস্য জেনে নেন। জাগ্রত অবস্থায় জেনে নেয়া নবুওয়তের একটি সুউচ্চ স্তর। যেমন, সত্য স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬তম স্তর। খবরদার, এই এলেম পাঠ করে তুমি সম্পূর্ণ তোমার বিবেকের বাইরের বিষয়সমূহ অস্বীকার করতে শুরু করো না। এ ব্যাপারে বড় বড় পণ্ডিতও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, যারা দাবী করত, তাঁরা সকল যুক্তিশাস্ত্রে বিজ্ঞ। বলাবাহুল্য, যে যুক্তিশাস্ত্র ওলীআল্লাহগণের এসব বিষয়কে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে, তা থেকে মূর্খতাই শ্রেয়ঃ। যারা ওলীদের এসব বিষয় অস্বীকার করে, তারা পয়গম্বরগণকেও অস্বীকার করতে পারে। ফলতঃ তারা ধর্মচ্যুত হয়ে যায়।

জনৈক সাধক বলেন ঃ আবদালগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন। কারণ, এ যুগের আলেমগণকে দেখার সাধ্য তাঁদের নেই। তাঁদের মতে এ যুগের আলেমরা আল্লাহ তাআলাকে জানে না। অথচ নিজেদের এবং মূর্খদের ধারণায় তারা আলেম। সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ গাফেলদের কথা এবং দুনিয়ায় মগ্ন আলেমদের কথা শোনা উচিত নয়। বরং তারা যে কথা বলে, তাতে তাদেরকে দোষী মনে করা উচিত। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি তার প্রিয় বিষয়বস্তুর মধ্যে মগ্ন থাকে এবং যে বিষয় প্রিয় বিষয়বস্তুর অনুকূল নয়, তা প্রতিহত করতে সচেষ্ট হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ـ

অর্থাৎ, "যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং সীমালংঘন করাই যার কাজ, তার কথা মেনে চলো না।"

যারা দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ, অথচ নিজেদেরকে আলেম মনে করে, তাদের তুলনায় মূর্খ জনসাধারণও ভাল। কারণ, পাপী জনসাধারণ তাদের ত্রুটি ও গোনাহ্ স্বীকার করে এবং তজ্জন্য তওবা এস্তেগফার করে। কিন্তু এই আলেমরূপী জাহেলরা এমন এলেমে মশগুল থাকে, যদ্দারা দুনিয়া

অর্জন করা যায়। তাঁরা দ্বীনের পথে চলা থেকে গাফেল হয়ে তওবা এস্তেগফার কিছুই করে না এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই একই ধ্যানে মগ্ন থাকে। আল্লাহ যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন তাদের ছাড়া অধিকাংশ লোকেরই এ অবস্থা। তাদের সংশোধনের আশা নেই। তাই দ্বীনদার সাবধানী ব্যক্তির জন্যে নিরাপদ পন্থা হচ্ছে তাদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনে বসে থাকা। সেমতে এ সম্পর্কে ইনশাআল্লাহ "নির্জনবাস" অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই ইউসুফ ইবনে আসবাত হুযায়ফা মারআশীকে লেখেছিলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি ধারণা করেন, আমি এমন পর্যায়ে রয়েছি, আমার সাথে খোদা স্মরণকারী কেউ নেই। কাউকে পাওয়া গেলে তার সাথে যিকির করা গোনাহের কাজই হয়। আর এ কথা যথার্থ। কেননা, মানুষের সাথে মেলামেশা করলে গীবত করা অথবা গীবত শুনা থেকে বাঁচা যায় না। অথবা মন্দ কাজ দেখে চুপ থাকতে হয়। অথচ এলেম শিক্ষা দেয়া অথবা শিক্ষা করা মানুষের উত্তম অবস্থা। চিন্তা করলে দেখা যায়, এলেমকে দুনিয়া অন্বেষণের উপায় ও মন্দ কাজের ওসিলা করাই শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ওস্তাদ হবে তার সাহায্যকারী ও মন্দ কাজের উপকরণ প্রস্তুতকারী। যেমন, কেউ ডাকাতের হাতে তরবারি বিক্রয় করে। এলেমও তরবারি সদৃশ। এতে কল্যাণের যোগ্যতা এমন, যেমন তরবারিতে জেহাদের যোগ্যতা। কাজেই যেব্যক্তি ডাকাতির জন্যে তরবারি কিনতে চায় বলে ইঙ্গিতে জানা যায়, তার কাছে তরবারি বিক্রয় করা জায়েয নয়।

এ পর্যন্ত আখেরাতের আলেমগণের বারটি লক্ষণ উল্লেখ করা হল। এর প্রত্যেকটিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের কিছু কিছু চরিত্র বিধৃত হয়েছে। অতএব তুমি হয় এসব গুণে গুণান্বিত হয়ে যাও, না হয় নিজের ত্রুটি স্বীকার করে এসব গুণে বিশ্বাসী হয়ে থাক। কিন্তু খবরদার, এ দু'পথ ছাড়া তৃতীয় পথ অবলম্বন করো না। নতুবা তুমি দুনিয়ার উপায়কে দ্বীন বলতে শুরু করবে এবং মিথ্যুকদের চরিত্রকেই খাঁটি আলেমগণের চরিত্র বলে সাব্যস্ত করবে। ফলে মূর্খতা ও অস্বীকারের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্তদের দলে ভিড়ে যাবে, যাদের বাঁচার কোন আশাই নেই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তানের প্রতারণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবেক ও তার মাহাত্ম্য

প্রকাশ থাকে যে, বিবেকের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না- বিশেষতঃ জ্ঞানের মাহাত্ম্য জেনে নেয়ার পর। কেননা, বিবেক হচ্ছে জ্ঞানের উৎসমূল। বিবেকের তুলনায় জ্ঞান এমন, যেমন বৃক্ষের তুলনায় ফল অথবা সূর্যের তুলনায় আলো। অতএব যে বিষয়টি দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়, তা শ্রেষ্ঠ হবে না কেন? চতুষ্পদ জন্তু হিতাহিত জ্ঞান কম থাকা সত্ত্বেও বিবেকের সামনে মাথা নত করে। সেমতে যে জন্তু সর্বাপেক্ষা বড় এবং বেশী ক্ষতিকর ও ভীতিপ্রদ, সে জন্তুও মানুষকে দেখে মাথা নুইয়ে দেয় এবং ভয় পায়। কারণ, এতটুকু বোধশক্তি তার আছে যে, মানুষ তার উপর প্রবল হয়ে যাবে। কেননা, সে যে কলাকৌশল জানে, তা আর কেউ জানে না। এজন্যেই রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ বৃদ্ধ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন, যেমন নবী তার সম্প্রদায়ের মধ্যে। এটা বিপুল অর্থ-সম্পদ, বিশাল দেহ এবং অধিক শক্তির কারণে নয়; বরং অধিক অভিজ্ঞতার কারণে, যা বিবেকের ফসল। এ কারণেই তুর্কী, কুর্দী ও আরব জনসাধারণকে দেখা যায়, তারা মূর্খতায় চতুষ্পদ জন্তুদের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও মজ্জাগতভাবে বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। এ কারণেই জনৈক শত্রু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শহীদ করতে চাইল এবং তার দৃষ্টি তাঁর নূরোজ্জ্বল তথা জ্যোতির্ময় মুখমন্ডলের উপর পতিত হল, তখন সে কেঁপে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উজ্জ্বল ললাটে বিরাজমান নবুওয়তের নূর শত্রুর দৃষ্টিতে ঝলসে উঠল।

মোট কথা, বিবেকের শ্রেষ্ঠত্ব জাজ্বল্যমান বিষয়। কিন্তু এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে যেসব কোরআনী আয়াত ও হাদীস বর্ণিত রয়েছে, এখানে সেগুলো উল্লেখ করাই আমাদের লক্ষ্য।

আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বিবেককে নূর বলে অভিহিত করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর (আলো)।

তিনি বিবেক থেকে উদ্ভূত এলেমকে রূহ, ওহী ও হায়াত (জীবন) বলে ব্যক্ত করেছেন। সেমতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَكَذَالِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ـ

অর্থাৎ, "এমনিভাবে আমি আমার আদেশে আপনার কাছে রূহ্ প্রেরণ করেছি।"

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ ـ

অর্থাৎ, "যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আলো দিয়েছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে।"

আল্লাহ তাআলা যেসব জায়গায় "নূর ও জুলুমাত" তথা আলো ও অন্ধকার উল্লেখ করেছেন, সেখানে অর্থ, এলেম ও মূর্খতা বলা হয়েছে ঃ

يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ـ

অর্থাৎ, "তিনি তাঁদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসেন।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহকে চেন এবং পরস্পর একে অপরকে বিবেকের উপদেশ দাও। এতে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ জানতে পারবে। জেনে রাখ, বিবেক তোমাদেরকে তোমাদের পরওয়ারদেগারের কাছে মাহাত্ম্য দান করবে। জেনে রাখ, সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহ্র আনুগত্য করে, যদিও সে দেখতে কুশ্রী, মান্যতায় নিকৃষ্ট এবং মর্যাদায় কম হয়। আর জাহেল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার নাফরমানী করে। তার তুলনায় শূকর ও বানর অধিক বিবেকবান। দুনিয়াদার তোমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তুমি বিভ্রান্ত হয়ো না, তা হলে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তিনি বলেন ঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তাআলা বিবেক সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে বলেছেন– সামনে এস। সে সামনে এলে বললেন ঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর। সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল। এর পর আল্লাহ তাআলা বললেন ঃ আমার ইযযত ও মাহাত্ম্যের কসম, আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার মাধ্যমেই সম্মান ছিনিয়ে নেব, তোমার মাধ্যমেই

সম্মান দেব, তোমার কারণেই সওয়াব দেব এবং তোমার কারণেই শাস্তি দেব।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তির অতিরঞ্জিত প্রশংসা হলে তিনি বললেন ঃ লোকটির বিবেক কেমন? লোকেরা বলল ঃ আমরা এবাদত ও বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের ব্যাপারে তার অধ্যবসায়ের কথা আপনার কাছে উল্লেখ করছি, আর আপনি তার বিবেকের অবস্থা জানতে চাইছেন, এটা কেন? তিনি বললেন ঃ বিবেকহীন ব্যক্তি মূর্খতার কারণে পাপাচারীর চেয়ে বেশী পাপ করে ফেলে। আসন্ন কেয়ামতে আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল হওয়ার স্তর বিবেক অনুযায়ী উচ্চতর হবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের উপার্জনের মধ্যে বিবেক বুদ্ধির সমান কোন কিছু নেই। বিবেক-বুদ্ধি মানুষকে হেদায়াতের দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং ধ্বংসের কবল থেকে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষের বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন সঠিক হয় না। এক হাদীসে আছে–

"মানুষ তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার ও রাত্রি জাগরণকারীর স্তরে উন্নীত হয়। কারও বিবেক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সচ্চরিত্রতা পূর্ণ হয় না। বিবেক পূর্ণ হয়ে গেলে ঈমান পূর্ণ হয়, পরওয়ারদেগারের আনুগত্য অর্জিত হয় এবং সে তার দুশমন শয়তানের নাফরমান হয়ে যায়।"

আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বস্তুর একটি ভরসা আছে। ঈমানদারের ভরসা হল বিবেক। অতএব তার এবাদত তার বিবেক অনুযায়ীই হবে। তুমি কি শুননি, দোযখে কাফেররা বলবে–

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ -

অর্থাৎ, "যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক খাটাতাম, তবে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না।"

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) তামীম দারীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার মধ্যে সর্দার কোন্‌টি? সে বলল ঃ বিবেক। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এ প্রশ্নই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে

করেছিলাম। তিনিও এ উত্তরই দেন এবং বলেন ঃ আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নেতৃত্ব কি? তিনি বললেন ঃ বিবেক। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন লোকেরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অত্যধিক প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ লোকসকল, প্রত্যেক বস্তুর একটি বাহন আছে, মানুষের বাহন হচ্ছে বিবেক। তোমাদের মধ্যে তার যুক্তি প্রমাণই উত্তম, যার বিবেক বেশী। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে মানুষকে একথা বলাবলি করতে শুনলেন ঃ অমুক অমুকের চেয়ে বেশী বীর প্রমাণিত হয়েছে এবং যুদ্ধের পরীক্ষায় অমুক অমুকের চেয়ে অধিক উত্তীর্ণ হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এসব বিষয় তোমরা জান না। লোকেরা আরজ করল ঃ তা কিভাবে? তিনি বললেন ঃ তারা ততটুকু যুদ্ধ করেছে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিবেক দান করেছিলেন। তাদের জয়-পরাজয়ও তাদের বিবেক অনুসারে হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছে, তাদের স্তর বিভিন্ন রূপ হয়েছে। কেয়ামতের দিন তারা তাদের বিবেক ও নিয়ত অনুসারে মর্যাদা লাভ করবে। বারা ইবনে আযেবের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ফেরেশতারা বিবেক দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার এবাদতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঈমানদাররা তাদের বিবেক দ্বারা চেষ্টা করেছেন। অতএব যে আল্লাহর এবাদত করে, তার বিবেকও বেশী। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলাম, দুনিয়াতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন ঃ বিবেকের দ্বারা! আমি বললাম ঃ আখেরাতে কোন্ বিষয়ের দ্বারা? তিনি বললেন, বিবেক দ্বারা। আমি আরজ করলাম ঃ তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিদান হবে না? তিনি বললেন ঃ আয়েশা, তারা কর্ম ততটুকু করে থাকবে, যতটুকু আল্লাহ তাদেরকে বিবেক দিয়ে থাকবেন। অতএব বিবেক অনুপাতেই কর্ম হবে এবং তার প্রতিদান দেয়া হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক বিষয়ের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার আছে। মুমিনের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার হচ্ছে বিবেক। প্রত্যেক বস্তুর স্তম্ভ আছে। দ্বীনের স্তম্ভ বিবেক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একটি রক্ষক আছে। এবাদতকারীদের রক্ষক বিবেক। প্রত্যেক সওদাগরের পুঁজি আছে। মুজতাহিদদের পুঁজি বিবেক। প্রত্যেক

আহলে বায়তের জন্যে এক ব্যবস্থাপক আছে। সিদ্দীকগণের গৃহের ব্যবস্থাপক বিবেক। প্রত্যেক জনশূন্য স্থানের আবাদী আছে। আখেরাতের আবাদী বিবেক। প্রত্যেক মানুষের পেছনে এক কীর্তি থাকে, যার কারণে তার আলোচনা হয়। সিদ্দীকগণের এরূপ কীর্তি হল বিবেক। প্রত্যেক সফরের জন্যে একটি তাঁবু আছে। ঈমানদারদের তাঁবু বিবেক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মুমিনদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে কায়েম থাকে, তার বান্দাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, পূর্ণ বিবেকবান হয়ে নিজেকে উপদেশ দেয়, চক্ষুষ্মান হয়ে বিবেক অনুযায়ী সারা জীবন আমল করে এবং সাফল্য ও মুক্তি অর্জন করে। তিনি আরও বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে পূর্ণ বিবেকবান সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলাকে অধিক ভয় করে এবং সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহে যার দৃষ্টি সর্বাধিক ভাল হয়, যদিও নফল এবাদত কম করে।

বিবেকের স্বরূপ ও প্রকার

বিবেকের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ লোক এদিকে লক্ষ্য রাখেনি, এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরূপ বিভিন্ন অর্থবোধক শব্দের একক সংজ্ঞা তালাশ করা উচিত নয়; বরং বিভিন্ন প্রকারের অবস্থা আলাদা আলাদা ব্যক্ত করা দরকার । প্রথম অর্থ ঃ বিবেক এমন একটি গুণ, যদ্দ্বারা মানুষ সকল চতুষ্পদ জন্তু থেকে স্বতন্ত্র হয়েছে। অর্থাৎ, যদ্দ্বারা মানুষের মধ্যে চিন্তাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ ও গোপন কারিগরি সম্পর্কে চিন্তা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। হারেস ইবনে আসাদ মুহাসেবী এ অর্থ করেছেন। বিবেকের সংজ্ঞায় তিনি বলেন ঃ বিবেক এমন একটি শক্তি, যদ্দ্বারা মানুষ চিন্তাগত শাস্ত্র উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করে। এটা যেন একটা নূর, যা অন্তরে রাখা হয় এবং যদ্দ্বারা মানুষ উপলব্ধি করার যোগ্য হয় । যেব্যক্তি এ সংজ্ঞা অস্বীকার করে এবং বিবেককে কেবল প্রকাশ্য শাস্ত্র জানার মধ্যে সীমিত করে, সে ইনসাফ করে না। কেননা, যেব্যক্তি শাস্ত্র সম্পর্কে গাফেল অথবা যেব্যক্তি নিদ্রামগ্ন, তাদের উভয়কেই বিবেকবান বলা হয়; অথচ শাস্ত্র তখন তাদের মধ্যে অর্জিত থাকে না। কিন্তু কেবল শক্তি ও যোগ্যতা থাকার কারণেই তাদেরকে বিবেকবান বলা হয় ।

দ্বিতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন বালকের সত্তার

ভেতর পাওয়া যায়। অর্থাৎ বৈধ বিষয়সমূহের বৈধ হওয়া এবং অসম্ভব বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান । উদাহরণতঃ এ বিষয়ের জ্ঞান, দুই একের দ্বিগুণ এবং এক ব্যক্তির একই সময়ে দু'স্থানে থাকা সম্ভব নয় । কোন কোন কালামশাস্ত্রী বিবেকের এ অর্থই করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ বিবেক হচ্ছে কতক জাজ্বল্যমান জ্ঞান; যেমন সম্ভবপর বিষয়সমূহের সম্ভবপর হওয়ার এবং অসম্ভব বিষয়সমুহের অসম্ভব হওয়ার জ্ঞান। এ অর্থও সঠিক । কেননা, এসব জ্ঞান বিদ্যমান আছে এবং এগুলোকে বিবেক বলাও ন্যায়সঙ্গত । কিন্তু এর মধ্যে অনিষ্ট হচ্ছে, পূর্বোল্লিখিত শক্তিকে অস্বীকার করা এবং বলা, এসব জাজ্বল্যমান জ্ঞান ছাড়া বিবেক অন্য কিছু নয়। তৃতীয় অর্থ এমন জ্ঞান, যা দৈনন্দিন অবস্থা অবলোকন ও তার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত হয়। কেননা, যেব্যক্তি অভিজ্ঞতায় পারদর্শী ও ওয়াকিফহাল, তাঁকেই নিয়মানুযায়ী বিবেকবান বলা হয়। পক্ষান্তরে যে অভিজ্ঞতাগুণে গুণান্বিত নয়, তাকে জাহেল, স্থূলবুদ্ধি, অনভিজ্ঞ প্রভৃতি বলা হয়। চতুর্থ অর্থ– উপরোক্ত স্বভাবগত শক্তি এতদূর হওয়া যে, বিষয়সমূহের পরিণাম জানতে থাকা এবং তাৎক্ষণিক আনন্দের প্রবৃত্তিকে উচ্ছেদ করা ও দাবিয়ে রাখা। এ শক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে বিবেকবান বলা হয়। সে তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তির প্ররোচনা অনুযায়ী কাজ করে না। এ প্রকার বিবেক মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এর মাধ্যমেই সে জন্তু জানোয়ার থেকে স্বতন্ত্র।

সারকথা, প্রথম প্রকার বিবেক সবকিছুর মূল উৎস। দ্বিতীয় প্রকার প্রথম প্রকারের শাখা এবং তার নিকটবর্তী । তৃতীয় প্রকারও দ্বিতীয় প্রকারের শাখা। কেননা, স্বভাবগত শক্তি ও জাজ্বল্যমান জ্ঞান থেকে অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জিত হয়। চতুর্থ প্রকার শেষ ফলাফল ও চূড়ান্ত লক্ষ্য । প্রথমোক্ত দু'প্রকার বিবেক সৃষ্টিগতভাবে অর্জিত হয় এবং শেষোক্ত দু'প্রকার অধ্যবসায়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এজন্যই হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ বৎস! আমার মতে বিবেক দুপ্রকার– স্বভাবগত ও অধ্যবসায়গত। স্বভাবগত বিবেকের কোন প্রভাব অন্তরে না থাকলে অধ্যবসায়গত বিবেক দ্বারা কোন উপকার হয় না। এ হাদীসে প্রথমোক্ত বিবেক বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বিবেকের চেয়ে মহৎ কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি। চতুর্থ প্রকার বিবেককেই এ হাদীসে বুঝানো হয়েছে। মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করে, তখন তুমি তোমার বিবেক দ্বারা নৈকট্য অর্জন কর। আবু দারদার উদ্দেশে

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তিতেও তাই বুঝানো হয়েছে– তুমি অধিক বিবেকবান হও, যাতে পরওয়ারদেগারের অধিক নিকটবর্তী হতে পার। আবু দারদা আরজ করলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোন, আমার জন্যে এটা কিরূপে সম্ভবপর হবে ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হারাম বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাক, তাঁর ফরয কর্ম সম্পাদন কর এবং সৎকর্ম অবলম্বন কর। এতে দুনিয়াতে তোমার মাহাত্ম্য বাড়বে এবং এ কারণে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমার নৈকট্য অর্জিত হবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত ওমর, উবাই ইবনে কা'ব ও আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সর্বাধিক আলেম কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। প্রশ্ন করা হল ঃ সর্বাধিক এবাদতকারী কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। আবার প্রশ্ন হল ঃ সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ বিবেকবান। তাঁরা আবার আরজ করলেন ঃ যেব্যক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারী, বাহ্যতঃ শুদ্ধভাষী, দানশীল ও উচ্চ মার্যাদাশীল, সে-ই কি বিবেকবান নয় ? তিনি বললেন ঃ এগুলো তো পার্থিব জীবনের বিষয়। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীদের জন্যে আখেরাত ভাল। অতএব সে-ই বিবেকবান, যে মুত্তাকী– খোদাভীরু, যদিও সে দুনিয়াতে নীচ ও লাঞ্ছিত হয়। এক হাদীসে আছে– সে-ই বিবেকবান যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাঁর রসূলগণের সত্যায়ন করে এবং তাঁর এবাদত করে।

মনে হয়, মূল অভিধানে এবং ব্যবহারে আকল তথা বিবেক শব্দটি সেই মজ্জাগত শক্তির অর্থ বুঝানোর জন্যেই নির্দিষ্ট ছিল। তবে জ্ঞান ও শাস্ত্র অর্থে এর ব্যবহার হয় এজন্যে যে, জ্ঞান সে শক্তিরই ফলাফল। ফলাফল দ্বারাও কোন বস্তুকে সংজ্ঞায়িত করা হয়। যেমন, বলা হয়– এলেম হল খোদাভীতি আর সে ব্যক্তিই আলেম যে আল্লাহকে ভয় করে। এখানে খোদাভীতি এলেমের ফল। এমনিভাবে অপ্রকৃতরূপে বিবেক শব্দটি তার ফলাফলের অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য আভিধানিক আলোচনা নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিবেকের মধ্যে এই চারটি প্রকারই বিদ্যমান আছে। এ চারটির জন্যেই বিবেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। প্রথম প্রকার ছাড়া কোনটির অস্তিত্বে মতভেদ নেই। কিন্তু প্রথমটিও বিদ্যমান এবং সবগুলোর মূল– এটাই বিশুদ্ধ মত। সবগুলো জ্ঞান মজ্জাগত শক্তির মধ্যে আগত এবং প্রকাশ তখনই পায়, যখন কোন কারণ

এগুলোকে বিদ্যমান করে দেয়। এগুলো বাইরে থেকে শক্তির মধ্যে আসে না, বরং তাতে লুক্কায়িত রয়েছে। এরপর কোন কারণবশতঃ প্রকাশ পায়। উদাহরণতঃ কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে এবং একত্রিত হয়ে অনুভূত হয়। বাইরে থেকে কোন কিছু পানির জন্যে কূপে নিক্ষেপ করা হয় না। বাদামের মধ্যে তেল এবং গোলাপ ফুলের মধ্যে গন্ধ এমনিভাবে লুক্কায়িত থাকে। এজন্যেই আল্লাহ্ তা আলা বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى ـ

অর্থাৎ যখন আপনার পালনকর্তা আদম সন্তানদের ঔরস থেকে তাদের সন্তান-সন্ততিকে বের করলেন এবং তাদেরকে তাঁদের ব্যাপারে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? তারা বলল ঃ অবশ্যই।

এখানে তওহীদের স্বীকারোক্তি নেয়ার অর্থ আধ্যাত্মিক স্বীকারোক্তি নেয়া– মৌখিক নয়। কেননা, মৌখিক দিক দিয়ে তো কেউ স্বীকার করে এবং কেউ করে না। নিম্নোক্ত আয়াতেও তেমনি অর্থ বুঝানো হয়েছে ঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ـ

অর্থাৎ যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের সৃষ্টিকর্তা কে, তবে তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। অর্থাৎ অবস্থা বিবেচনা করা হলে তাদের মন ও বাতেন এ সাক্ষ্য দেবে। আরও বলা হয়েছে–

فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই প্রত্যেক মানুষের মজ্জা স্বভাব।

কেননা, আল্লাহকে উপলব্ধি করার যোগ্যতা তার মধ্যে খুব নিকটবর্তী। এজন্যই মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত– এক, যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে এবং আপন মজ্জাগত বিষয়টি ভুলে গেছে। সে হচ্ছে কাফের। দুই, যে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং আল্লাহর কথা স্মরণ করে নিয়েছে। উদাহরণতঃ কোন সাক্ষী গাফিলতির কারণে ঘটনার কথা ভুলে যায়,

এরপর স্মরণ হয়। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা স্মরণ করার কথা অনেক জায়গায় এরশাদ করেছেন। যেমন- لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (যাতে তারা স্মরণ করে)- وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ (এবং যাতে বুদ্ধিমানরা স্মরণ করে)- وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ (এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর এবং তাঁর সেই অঙ্গীকার স্মরণ কর, যা তিনি তোমাদের সাথে সম্পাদন করেছেন।) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (আর আমি কোরআনকে স্মরণ করার জন্যে সহজ করেছি। অতএব আছে কি কোন স্মরণকারী?)

বর্ণিত প্রকারকে "স্মরণ করা" বলা অবান্তর নয়। কেননা, স্মরণ করা দু'প্রকার- (১) যে বিষয় অন্তরে উপস্থিত ছিল, পরে বিলুপ্ত হয়েছে, তা স্মরণ করা এবং (২) মানুষের মজ্জায় আগত বিষয় স্মরণ করা। যেব্যক্তি বিবেকের নূর দ্বারা দেখে, তার সামনে এসব স্বরূপ সুস্পষ্ট। আর যে তকলীদ (অনুসরণ) ও শ্রবণের উপর ভরসা করে- কাশফ ও দেখার উপর নির্ভর করে না, তার জন্যে অবশ্য এসব বিষয় কঠিন। এ কারণেই তাকে এ ধরনের আয়াতে বিভ্রান্ত হতে দেখা যায়। সে স্মরণ করার অর্থ এবং মনের স্বীকারোক্তির ব্যাখ্যায় নানা রকম আজগুবি কথাবার্তা বলে। হাদীস ও আয়াতসমূহে তার ধারণায় অনেক বিরোধ মনে হতে থাকে। কখনও এটা এত প্রবল হয়ে যায় যে, সে এসব হাদীস ও আয়াতকে ঘৃণার চোখে দেখতে থাকে এবং এগুলোকে অনর্থক বাজে মনে করতে শুরু করে। বলাবাহুল্য, সে সেই অন্ধ ব্যক্তির মত, যে কোন গৃহে প্রবেশ করে। গৃহে যাবতীয় আসবাবপত্র সাজানো-গুছানো রয়েছে। কিন্তু অন্ধ আসবাবপত্রের উপর পিছলিয়ে পড়ে এবং বলে, এসব পথ থেকে দূরে সরিয়ে স্বস্থানে রাখা হয় না কেন? তাকে বলা হবে, আসবাব তো স্বস্থানেই সাজানো গুছানো ছিল, কিন্তু দোষ তোমার দৃষ্টি শক্তির। তেমনি অন্তর্দৃষ্টির ক্রুটির কারণে হাদীস ও আয়াতসমূহে বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। অথচ তাতে বিরোধ কিছুই নেই, দোষ বিবেকের। অন্তর্দৃষ্টির ক্ষতি চর্মচক্ষুর ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী ও বৃহৎ। কেননা, মন আরোহীর মত এবং দেহ বাহনস্বরূপ।

বলাবাহুল্য, আরোহীর অন্ধ হওয়ায় ঘোড়ার অন্ধ হওয়ার তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। অন্তর্দৃষ্টিকে বাহ্যিক দৃষ্টির সাথে সমন্বয় করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

অর্থাৎ, "অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি।"

আরও বলেছেন ঃ إِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ
অর্থাৎ এভাবেই আমি ইব্রাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখিয়েছি।

এর বিপরীতকে আল্লাহ্ তাআলা অন্ধত্ব বলে অভিহিত করেছেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ -

অর্থাৎ "নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। কিন্তু বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়।"

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ أَعْمٰى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمٰى وَأَضَلُّ سَبِيْلًا -

অর্থাৎ যে এ পৃথিবীতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।

পয়গম্বরগণের জন্যে যেসব বিষয় প্রকাশ পেয়েছিল, সেগুলোর কিছু বাহ্যিক দৃষ্টির এবং কিছু অন্তর্দৃষ্টির ফলে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সবগুলোকে দেখাই বলা হয়েছে। সারকথা, যার অন্তর্দৃষ্টি শক্তিশালী নয়, সে দ্বীনের সারবস্তু ও স্বরূপ লাভ করতে পারে না।

বিবেক কম-বেশী হওয়া

বিবেক কম-বেশী হতে পারে কিনা, এ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। এখানে যথার্থ বিষয়টি বর্ণনা করাই সমীচীন। এ সম্পর্কে প্রকৃত বিষয় হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার বিবেক ছাড়া সব বিবেকই কম-বেশী হতে পারে। একমাত্র বৈধ বিষয়সমূহের সম্ভবপর এবং অবৈধ বিষয়সমূহের অসম্ভব হওয়া এমন এক এলেম, যা কম-বেশী হতে পারে না।

উদাহরণতঃ যেব্যক্তি একথা জানবে, দুই একের বেশী, সে একথাও জানবে, একই বস্তুর দু'স্থানে থাকা অসম্ভব। কিন্তু অবশিষ্ট তিন প্রকার বিবেক কম-বেশী হতে পারে। যেমন– চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ, স্বভাবগত শক্তি এত বেশী হওয়া যে, খাহেশকে উচ্ছেদ করে দেয়। এতে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে, বরং এতে কেবল এক ব্যক্তির অবস্থাও বিভিন্ন রূপ হয়। এ পার্থক্য কখনও খাহেশের পার্থক্যের কারণে হয়। কেননা, বিবেকবান ব্যক্তি কখনও কতক খাহেশ ত্যাগ করতে সক্ষম হয় এবং কতক ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না, যদিও তা ত্যাগ করা অসম্ভব নয়। যেমন– যুবক ব্যক্তি ব্যভিচার ত্যাগ করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু বৃদ্ধ হওয়ার পর যখন বিবেক পূর্ণতা লাভ করে, তখন তা ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। আবার কখনও এ পার্থক্য এ কারণে হয় যে, এলেম দ্বারা খাহেশের ক্ষতি জানা যায়, তাতে পার্থক্য হয়। এ জন্যেই কতক ক্ষতিকর খাদ্য থেকে বেঁচে থাকতে চিকিৎসক সক্ষম হয়, কিন্তু তার সমান বিবেকবান অন্য ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয় না, যদিও তার মোটামুটি বিশ্বাস থাকে, এ খাদ্য ক্ষতিকর। কিন্তু চিকিৎসকের এলেম পূর্ণ বিধায় তার ভয়ও বেশী। এ ক্ষেত্রে ভয় তার খাহেশ উচ্ছেদ করার ব্যাপারে বিবেকের সিপাহী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মুর্খের তুলনায় আলেম গোনাহ ত্যাগ করতে অধিক সক্ষম। কেননা, সে গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত। সুতরাং এলেমের কারণে পার্থক্য হলে এ ধরনের এলেমকেও আমরা বিবেক বলেছি এ জন্যে যে, এ এলেম স্বাভাবিক শক্তি বৃদ্ধি করে। অতএব এ এলেমের পার্থক্য হুবহু বিবেকের পার্থক্য। কখনও এ পার্থক্য কেবল বিবেকশক্তির পার্থক্যের কারণে হয়ে থাকে এ শক্তি বেশী হলে খাহেশকে উচ্ছেদও বেশী করবে।

বিবেকের তৃতীয় প্রকার অভিজ্ঞতাও কম-বেশী হয়। কতক লোক দ্রুত বিষয়বস্তু বুঝে ফেলে এবং তাদের অভিমত প্রায়ই সঠিক হয়। আর কতক লোক এরূপ হয় না। সুতরাং এ প্রকার বিবেকের পার্থক্য অনস্বীকার্য। প্রথম প্রকার যা মূল; অর্থাৎ, স্বাভাবিক শক্তি, এর পার্থক্যও অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, এটা একটা নূরের মত, যা অন্তরের উপর চমকাতে থাকে। এর সূচনা হয় হিতাহিত জ্ঞানের বয়স থেকে। এর পর তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অবশেষে প্রায় চল্লিশ বছর বয়সের সময় পূর্ণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ প্রভাত রশ্মি শুরুতে এমন গোপন থাকে যে,

তা জানা কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সূর্যোদয়ের ফলে তা পূর্ণতা লাভ করে। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার রীতি হচ্ছে, তিনি ধাপে ধাপে আবিষ্কার করেন। সেমতে বালকের মধ্যে বালেগ হওয়ার সময় কামশক্তি একযোগে প্রকাশ পায় না; বরং অল্প অল্প করে প্রকাশ পায়। সুতরাং যেব্যক্তি এই স্বাভাবিক শক্তির মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি অস্বীকার করে, সে যেন বিবেকের গণ্ডির বাইরে অবস্থান করে। আর যেব্যক্তি মনে করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবেক তেমনি ছিল, যেমন কোন গেঁয়ো হয়ে থাকে, সে ব্যক্তি গেঁয়ো থেকেও অধম। এ শক্তিতে তফাৎ না হলে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ কেন হত এবং কেউ এত কম মেধাবী কেন হত যে, অনেক বুঝালে এবং শিক্ষক গলদঘর্ম হলে পরে বুঝতে পারবে? আবার কেউ এত প্রখর মেধাবী কেন হত যে, সামান্য ইশারা দিলেই বুঝে ফেলে এবং কেউ এত কামেল কেন হত, স্বয়ং তার মন থেকেই বিভিন্ন বস্তুর স্বরূপ উথলে উঠে– ওস্তাদের কাছে শিক্ষা করার প্রয়োজনই হয় না। আল্লাহ বলেন ঃ

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ -

অর্থাৎ "তার জ্বালানি নিজে থেকেই প্রজ্বলিত হওয়ার উপক্রম হয়, যদিও তকে আগুন স্পর্শ করে না। আলোর উপর আলো।"

এরূপ কামেল লোক হলেন পয়গম্বরগণ। সূক্ষ সূক্ষ্ম রূপ ও বিষয়াদি স্বয়ং তাঁদের অন্তরে কারও শেখানো ছাড়া এবং কারও কাছ থেকে শুনা ছাড়া উন্মোচিত হয়ে যায়। একে ইলহাম বলে ব্যক্ত করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের বিষয়বস্তুই এ হাদীসে বর্ণন করেছেন ঃ রূহুল কুদুস (জিব্রাঈল) আমার মনে আরোপ করলেন, তোমরা যাকে ইচ্ছা বন্ধু কর, তার কাছ থেকে বিরহ হবে, যত ইচ্ছা জীবিত থাক, মরতে একদিন হবেই এবং যা ইচ্ছা আমল কর, তার প্রতিদান তোমরা পাবেই। নবীগণকে ফেরেশতাদের এভাবে খবর দেয়া ওহী নয়, বরং এটা আলাদা ব্যাপার। কেননা, ওহীর মধ্যে নবী কানে আওয়াজ শুনেন এবং চোখে ফেরেশতাকে দেখেন। ইলহামে এটা নেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) "আমার মনে আরোপ করেছেন" বলে বলেছেন – অন্য কোন শব্দ

বলেননি। ওহীর অনেক স্তর রয়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা এলমে মোআমালার জন্যে উপযুক্ত নয়, বরং এটা এলমে মোকাশাফার বিষয়বস্তু। তুমি এটা মনে করো না যে, যেব্যক্তি ওহীর স্তরসমূহ জানতে পারে, সে ওহীর মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। কেননা, কোন বিষয় জানা এক জিনিস আর তা পাওয়া অন্য জিনিস। উদাহরণতঃ কোন অসুস্থ চিকিৎসকের জন্যে স্বাস্থ্য রক্ষার সকল স্তর জেনে নেয়া অবাস্তব নয় এবং কোন পাপাচারী আলেমের পক্ষে আদলের স্তরসমূহ জানা অসম্ভব নয়, অথচ এ চিকিৎসকের মধ্যে স্বাস্থ্য এবং এ আলেমের আদলের কোন অস্তিত্ব নেই। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নবুওয়ত ও ওলীত্ব সম্পর্কে জানবে, তার নবী বা ওলী হওয়া জরুরী নয়। মোট কথা, কোন কোন মানুষ আত্মোপলব্ধির মাধ্যমেই কোন কোন বিষয় বুঝতে পারে, আবার অনেকে বাইরের সাহায্য ও প্রশিক্ষণ ছাড়া বুঝে না এবং কেউ কেউ এমনও থাকে যাদের জন্য প্রশিক্ষণ উপকারী হয় না। এটা ঠিক ভূমির মত। ভূমি তিন প্রকার হয়ে থাকে – (১) যাতে পানি সঞ্চিত থাকে এবং প্রবল হয়ে তা থেকে আপন আপনি ঝরণা প্রবাহিত হতে থাকে । (২) যাতে কূপ খনন করার প্রয়োজন হয়। কূপ খনন না করলে পানি বের হয় না। (৩) যা খনন করলেও পানি নির্গত হয় না– শুষ্কই থেকে যায়।

বিবেক যে কম-বেশী হয়, হাদীস থেকে এর প্রমাণ আদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর একটি রেওয়ায়েত । তাঁর জিজ্ঞাসার জওয়াবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। এ বক্তব্যের শেষ ভাগে তিনি আরশের মাহাত্ম্য উল্লেখ করে বললেন ঃ "ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করল, ইলাহী, আপনি আরশের চেয়েও বড় কোন কিছু সৃষ্টি করেছেন কি ? এরশাদ হল ঃ হাঁ, বিবেক আরশের চেয়েও বড়। প্রশ্ন হল, এর পরিমাণ কতটুকু ? আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা এটা পুরাপুরি জানতে পারবে না। তোমরা বালুকার সংখ্যা জান কি? উত্তর হল, না। আল্লাহ বললেন ঃ আমি বিবেককেও বালুকার সংখ্যানুযায়ী বিভিন্ন রূপ সৃষ্টি করেছি। কেউ এক রতি পেয়েছে, কেউ দু'রতি, কেউ তিন রতি এবং কেউ চার রতি পেয়েছে। আবার কেউ আট সেরের কাছাকাছি এবং কেউ এক উটের বোঝাই পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকায়েদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেমা তাইয়েবায় আহলে সুন্নতের আকীদা

প্রকাশ থাকে যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্- এ কলেমার সাক্ষ্য দেয়া ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে একটি স্তম্ভ। এর প্রথম বাক্যে তওহীদ এবং দ্বিতীয় বাক্যে রেসালত বিধৃত হয়েছে। প্রথম বাক্য কয়েকটি বিষয় জানা উচিত।

প্রথম ঃ একত্ববাদ; অর্থাৎ একথা জানা যে, আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক, তাঁর মত কেউ নেই। তিনি অমুখাপেক্ষী, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি চিরন্তন, যাঁর কোন শুরু নেই। তিনি সদা প্রতিষ্ঠিত, যাঁর কোন শেষ নেই। তিনি সদা বিদ্যমান, যাঁর কোন অবসান নেই। তিনি অক্ষয়, যাঁর কোন ক্ষয় নেই। তিনি মাহাত্ম্যের গুণাবলী দ্বারা সদা গুণান্বিত রয়েছেন এবং সদা থাকবেন। তিনিই সবার প্রথম এবং সবার শেষ। তিনিই জাহের এবং তিনিই বাতেন।

দ্বিতীয় ঃ পবিত্রতা ; অর্থাৎ, এই বিশ্বাস রাখা যে, আল্লাহ তা'আলা সাকার নন, সীমিত পদার্থ নন, পরিণামবিশিষ্ট নন এবং বিভাজ্য নন। তিনি দেহের অনুরূপ নন, নিজে পদার্থ নন এবং কোন পদার্থ তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও নয়। তি আর্য নন; অর্থাৎ অন্যের উপর ভর দিয়ে কায়েম নন এবং অন্যের উপর ভর দিয়ে যা কায়েম থাকে, তা তাঁর মধ্যে অনুপ্রবিষ্টও নয়। কোন বিদ্যমান বস্তুর অনুরূপ তিনি নন এবং কোন বিদ্যমান বস্তুও তাঁর মত নয় । না তাঁর সমতুল্য কেউ আছে এবং না তিনি কারও অনুরূপ । কোন পরিমাণ তাঁকে সীমিত করতে পারে না এবং কোন দিকও তাঁকে বেষ্টন করে রাখতে পারে না। আকাশ ও পৃথিবী তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। তিনি আরশের উপর এমনভাবে অবস্থিত যেমন তিনি নিজে বলেছেন এবং যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেছেন। অর্থাৎ, তিনি আরশ স্পর্শ করা, তার উপর প্রতিষ্ঠত হওয়া, অবস্থান নেয়া, তাতে অনুপ্রবেশ করা এবং স্থানান্তরিত হওয়া থেকে পবিত্র । আরশ তাঁকে বহন করে না, বরং আরশ ও আরশ বহনকারীদেরকে তাঁর কুদরত বহন করে রেখেছে। সবকিছুই

তাঁর কুদরতের আওতাভুক্ত। তিনি আরশ, আকাশ এবং পৃথিবীর সীমানা পর্যন্ত সবকিছুর উপরে। তিনি এভাবে উপরে যে, আরশেরও নিকটে নন এবং পৃথিবী থেকেও দূরে নন। বরং তাঁর মর্যাদা এসব নৈকট্য ও দূরত্বের অনেক ঊর্ধ্বে । এতদসত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর সন্নিকটে এবং বান্দার ধমনীর চেয়েও নিকটবর্তী । কেননা, তাঁর নৈকট্য দেহের নৈকট্যের অনুরূপ নয়, যেমন তাঁর সত্তা দেহের সত্তার অনুরূপ নয়। তিনি কোন বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন না এবং কোন বস্তু তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না। কোন স্থান তাঁকে বেষ্টন করবে তিনি এ বিষয়ের ঊর্ধ্বে, যেমন তিনি সময়ের বেষ্টনী থেকে মুক্ত । তিনি স্থান ও কালের জন্মের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । তিনি এখনও তেমনি আছেন যেমন পূর্বে ছিলেন। তিনি নিজ গুণাবলীতে সৃষ্টি থেকে আলাদা। তাঁর সত্তায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নেই এবং অন্য কোন কিছুতেই তাঁর সত্তা নেই। তিনি পরিবর্তন ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র। তিনি আপন মাহাত্ম্যের গুণাবলীতে ক্ষয় ও পতন থেকে সর্বদা মুক্ত। তিনি গুণাবলীর পূর্ণতায় কোন সংযোজনের প্রয়োজন রাখেন না। বিবেক দ্বারাই তাঁর অস্তিত্ব আপনা আপনি জানা হয়ে যায় । জান্নাতে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতি তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহ এই হবে যে, দীদার বা দর্শনের আনন্দ পূর্ণ করার জন্যে তিনি আপন সত্তা চর্মচক্ষে দেখিয়ে দেবেন।

তৃতীয় ঃ জীবন ও কুদরত। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা জীবিত, ক্ষমতাবান ও প্রতাপশালী। ক্লান্তি, অবসাদ, অসাবধানতা, নিদ্রা ও ক্ষয় তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর মৃত্যু নেই। আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাঁরই। আধিপত্য, ইযযত, সর্বশক্তিমত্তা, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আকাশমণ্ডলী তাঁর ডান হাতে আবদ্ধ এবং সকল সৃষ্টি তাঁর মুঠোর মধ্যে পতিত। সৃষ্টি ও আবিষ্কারে তিনি স্বতন্ত্র ও একক। মানুষ ও তাদের ক্রিয়াকর্ম তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রিযিক ও মৃত্যু নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কোন কিছু তাঁর কুদরতের বহির্ভূত নয়। তাঁর কদুরতের বস্তুসমূহ অগণিত এবং তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন শেষ নেই।

চতুর্থ ঃ এলেম অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এটা জানা। পাতাল থেকে নিয়ে আকাশের উপর পর্যন্ত যা কিছু হয়, সবই তাঁর নখদর্পণে। আকাশ ও পৃথিবীর কোন অণু পরমাণু তাঁর কাছে গোপন নয়,

বরং গভীর কালো রাতে কালো পাথরের উপর একটি কালো বর্ণের পিপীলিকার ধীর পদক্ষেপ এবং বায়ুর অভ্যন্তরে ধূলিকণার গতিবিধি সম্পর্কেও তিনি সুপরিজ্ঞাত। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জেনে নেন এবং অন্তরের কুমন্ত্রণা, খটকা ও গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। তাঁর এলেম নিত্য ও অনন্ত। তিনি অনন্তকাল থেকে এই এলেম গুণে গুণান্বিত আছেন। তাঁর এলেম তাঁর মধ্যে অনুপ্রবেশ করেনি এবং স্থানান্তর দ্বারা নতুন সৃষ্ট হয়নি।

পঞ্চম ঃ ইচ্ছা অর্থাৎ, এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা এ জগতকে ইচ্ছাপূর্বক সৃষ্টি করেছেন এবং নব নব সৃষ্টির ব্যবস্থাপনা তিনিই করেন। তিনি যা ইচ্ছা করেছেন তা হয়েছে এবং যা ইচ্ছা করেননি তা হয়নি। চোখের নিমেষ অথবা কোন আকস্মিক বিপদ আসা তাঁর ইচ্ছার বাইরে নয়। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাঁর আদেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মুলতবীকারীও কেউ নেই। তাঁর তওফীক ও রহমত ছাড়া বান্দার জন্যে নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই এবং তাঁর ইচ্ছা ব্যতিরেকে এবাদত ও আনুগত্যের কারও শক্তি নেই। যদি সমস্ত মানুষ, জ্বিন, ফেরেশতা ও শয়তান একত্রিত হয়ে বিশ্বের কোন একটি পরমাণুকেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুজ্ঞা ছাড়া গতিশীল অথবা স্থিতিশীল করতে চায়, তবে কখনও তারা তা পারবে না। তাঁর ইচ্ছা গুণও অন্য সকল গুণের ন্যায় তাঁর সত্তার সাথেই প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি অনন্তকাল থেকে এসব গুণে গুণান্বিত। তিনি যখন যে বস্তু হওয়ার ইচ্ছা অনন্তকালের মধ্যে করেছেন, ঠিক তখনই অগ্র-পশ্চাত ব্যতিরেকে তা হয়েছে। তাঁর কোন অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে অমনোযোগী করে না।

ষষ্ঠ ঃ শ্রবণ ও দর্শন। অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। কোন শ্রাব্য বস্তু যতই গোপন, কোন দ্রষ্টব্য বস্তু যতই সূক্ষ্ম হোক, তাঁর শ্রবণ ও দর্শন থেকে অব্যাহতি পায় না। কোন দূরত্ব কিংবা অন্ধকার তাঁর শ্রবণের পথে প্রতিবন্ধক হয় না। তিনি দেখেন, কিন্তু চক্ষু কোটর ও পলক থেকে তিনি মুক্ত, তিনি শুনেন; কিন্তু কর্ণকুহর থেকে পবিত্র। কেনা, তাঁর পবিত্র সত্তা যেমন সৃষ্টির সত্তার মত নয়, তেমনি তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলীর অনুরূপ নয়।

সপ্তম ঃ কালাম অর্থাৎ, এটা জানা যে, আল্লাহ তাআলা কালাম

করেন। সত্তার সাথে কায়েম তাঁর নিত্য ও অনন্ত কালাম দ্বারা তিনি আদেশ, নিষেধ, অঙ্গীকার ও শাস্তির কথা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কালাম সৃষ্টির কালামের মত নয় যে, বায়ু থেকে অথবা বস্তুর আঘাত থেকে আওয়াজ হবে অথবা জিহ্বার নড়াচড়া ও ঠোঁটের মিল থেকে উচ্চারণ সৃষ্টি হবে; বরং তাঁর কালাম উপসর্গ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কোরআন, তওরাত, ইনজীল ও যবুর তাঁর গ্রন্থ, যা তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। কোরআন পাকের তেলাওয়াত মুখে হয়, পত্রে লিখিত হয় এবং অন্তরে হেফয করা হয়; এতদসত্ত্বেও কোরআন নিত্য এবং আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাছ থেকে আলাদা হয়ে পত্রে স্থানান্তরিত হতে পারে না। মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার কালাম কণ্ঠস্বর ও অক্ষর ব্যতিরেকে শ্রবণ করেছেন।

অষ্টম ঃ ক্রিয়াকর্ম অর্থাৎ, এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু বিদ্যমান, তা সবই তাঁর কর্ম দ্বারা সৃষ্ট এবং তাঁরই ন্যায়বিচার থেকে কল্যাণপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা আপন ক্রিয়াকর্মে প্রজ্ঞাময় এবং আপন বিধি-বিধানে ন্যায়বিচারক। তাঁর ন্যায়বিচার বান্দার ন্যায়বিচার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না। কেননা, বান্দা জুলুম করতে পারে, অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে জুলুম কল্পনাও করা যায় না। কেননা, তিনি অন্যের মালিকানা লাভ করেন না। মোট কথা, তিনি ব্যতীত যত মানুষ জ্বিন, ফেরেশতা, শয়তান, আকাশ, পৃথিবী, জীবজন্তু, লতাপাতা, জড় পদার্থ, অজড় পদার্থ, উপলব্ধ ও অনুপলব্ধ বস্তু রয়েছে, সবই তিনি আপন কুদরতের দ্বারা নাস্তি থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অনন্তকালে তিনি একাই বিদ্যমান ছিলেন। এরপর স্বীয় কুদরত প্রকাশ এবং পূর্ব ইচ্ছা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির কোন প্রয়োজন ছিল না। একান্ত কৃপাবশেই তিনি সৃষ্টি করেন। এগুলো তাঁর উপর অপরিহার্য নয়। সুতরাং কৃপা, অনুগ্রহ ও নেয়ামত তাঁরই জন্যে শোভনীয়। কারণ, তিনি বান্দাদেরকে নানারকম আযাব ও বিপদাপদে ফেলে দিতে সক্ষম ছিলেন। এটাও তাঁর জন্যে ন্যায়বিচার হত, জুলুম হত না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে আনুগত্যের বিনিময়ে সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এটা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল কারণে এ প্রতিশ্রুতি দেননি। কেননা, কারও জন্যে কোন কিছু করা তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। তাঁর কাছে কারও কোন

ওয়াজেব প্রাপ্য নেই। কিন্তু মানুষের উপর তাঁর আনুগত্য অবশ্য প্রাপ্য রয়েছে, যা তিনি তাঁর পয়গম্বরগণের বাচনিক ওয়াজেব করেছেন। কেবল বিবেকের দৃষ্টিতে ওয়াজেব করেননি; বরং তিনি রসূল প্রেরণ করেছেন এবং প্রকাশ্য মোজেযার মাধ্যমে তাঁদের সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তিবাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়েছেন। তাই রসূলগণকে সত্য জ্ঞান করা এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধান মেনে চলা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য।

এখন দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ অর্থাৎ, রেসালতের সাক্ষ্য দেয়ার কথা শুন। এটা বিশ্বাস করা উচিত, আল্লাহ তা'আলা নবীয়ে উম্মী কোরায়শী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আরব, আজম, জ্বিন ও মানবের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর শরীয়ত দ্বারা পূর্ববর্তী সকল শরীয়ত রহিত করেছেন। তবে যেগুলো তিনি বহাল রেখেছেন সেগুলো ভিন্ন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং সকল মানুষের নেতা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু তথা তওহীদের সাক্ষ্য দেয়াকেই পূর্ণ ঈমান সাব্যস্ত করেননি, বরং এর সাথে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ তথা রসূলের রেসালতের সাক্ষ্যও জুড়ে দিয়েছেন। তিনি ইহকাল ও পরকালের যেসব বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন, সেগুলো মানুষের জন্যে অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ সমুদয় বিষয়েই তাঁকে সত্যবাদী মনে করতে হবে। আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার ঈমান কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহের প্রতি বিশ্বাস করে, যার সংবাদ মুহাম্মদ (সাঃ) দিয়েছেন।

এসব অবস্থার মধ্যে প্রথম মুনকার ও নকীরের প্রশ্ন। মুনকার ও নকীর দু'জন ভয়ংকর আকৃতির ফেরেশতা। তাঁরা কবরে বান্দাকে আত্মা ও দেহ সহকারে সোজা বসিয়ে দেয় এবং তাকে তওহীদ ও রেসালত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁরা বলেন ঃ তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? তাঁরা উভয়েই কবরের পরীক্ষক। মৃত্যুর পর প্রথম পরীক্ষা হয় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ।

দ্বিতীয়, কবরের আযাব নিশ্চিত বিশ্বাস করতে হবে। এ আযাব প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার সহকারে আত্মা এবং দেহ উভয়ের উপর যেভাবে আল্লাহ চাইবেন হবে।

তৃতীয়, মীযান তথা মানদণ্ড সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এর দু'টি পাল্লা হবে এবং প্রত্যেক পাল্লা আকাশ ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমান বৃহদাকার হবে। তাতে আল্লাহ তাআলার কুদরতে আমলসমূহ ওজন করা হবে। সেদিন বাটখারা কণা ও সরিষা পরিমাণে হবে, যাতে ন্যায়বিচার যথার্থই পূর্ণ হয়। সৎ আমলনামা সুন্দর আকারে নূরের পাল্লায় রাখা হবে এবং এসব নেক আমলের মর্তবা আল্লাহর কাছে যত বেশী হবে, ততই আল্লাহর কৃপায় পাল্লা ভারী হবে। মন্দ আমলনামা বিশ্রী আকারে অন্ধকার পাল্লায় রাখা হবে এবং আল্লাহ তাআলার ন্যায়বিচারের দরুন পাল্লা হালকা হবে।

চতুর্থ, পুলসেরাতে বিশ্বাস রাখতে হবে। দোযখের পৃষ্ঠে তরবারির চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম একটি পুল নির্মিত রয়েছে, সবাইকে এ পুল অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে কাফেরদের পা এ পুল থেকে ফসকে যাবে এবং তারা দোযখে পতিত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কৃপায় মুমিনদের পা তাতে অটল থাকবে এবং তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

পঞ্চম, হাউজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। ঈমানদারগণ এ হাউজের কাছ দিয়ে যাবে। এটা রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাউজ। জান্নাতে প্রবেশ করার পূর্বে এবং পুলসেরাত থেকে নীচে অবতরণের পর মুমিনরা এর পানি পান করবে। যে এর এক চুমুক পানি পান করবে, সে পরে কখনও পিপাসার্ত হবে না। এর প্রস্থ এক মাসের পথ। এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্ট। আকাশের তারার সমপরিমাণ পাত্র এর চারপাশে রক্ষিত থাকবে। জান্নাতের হাউজে কাওসার থেকে এসে দুটি নালা এ হাউজে পতিত হয়।

ষষ্ঠ, হিসাব-নিকাশে ঈমান আনতে হবে। হিসাব-নিকাশ বিভিন্ন রূপ হবে। কারও কাছ থেকে চুলচেরা হিসাব নেয়া হবে, কাউকে ক্ষমা করা হবে এবং কেউ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তাঁরা হবেন আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দা। পয়গম্বরগণের মধ্যে আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করবেন রেসালতের বিষয়বস্তু পৌঁছানো হয়েছে কি না। রসূলগণকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে কাফেরদের মধ্যেও যাকে ইচ্ছা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। বেদআতীদেরকে সুন্নতের ব্যাপারে এবং

মুসলমানদেরকে আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন।

সপ্তম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, তওহীদে বিশ্বাসী গোনাহগাররা শাস্তিভোগের পর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। শেষ পর্যন্ত কোন তওহীদ বিশ্বাসী ব্যক্তিই জাহান্নামে থাকবে না। এ থেকে তওহীদ বিশ্বাসীর চিরকাল জাহান্নামে না থাকার কথা জানা গেল।

অষ্টম, শাফায়াতে বিশ্বাস করতে হবে। প্রথমে পয়গম্বরগণ শাফায়াত করবেন, এরপর আলেমগণ, এরপর শহীদগণ,এর পর সকল মুসলমান শাফায়াত করবেন। তাঁদের মধ্যে যাঁর যতটুকু সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তাআলার কাছে হবে, তাঁর শাফায়াত ততটুকু গৃহীত হবে। যে মুমিন এমন থেকে যাবে, তাঁর জন্যে কেউ শাফায়াত করেনি, তাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় দোযখ থেকে বের করবেন। সুতরাং কোন মুমিন অনন্তকাল দোযখে থাকবে না। যার অন্তরে কণা পরিমাণও ঈমান থাকবে, সেও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে।

নবম, এরূপ বিশ্বাস করতে হবে যে, সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম এরূপ ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), এরপর হযরত ওমর (রাঃ), এরপর হযরত ওসমান (রাঃ), এরপর হযরত আলী (রাঃ)।

দশম ঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে হবে এবং তাঁদের প্রশংসা করতে হবে, যেমন আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ) তাঁদের প্রশংসা করেছেন।

উপরোক্ত বিশ্বাস্য বিষয়সমূহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং মনীষীগণের উক্তি এগুলোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং যেব্যক্তি এসব বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী হবে, সে আহলে সুন্নত দলের মধ্যে গণ্য হবে এবং পথভ্রষ্ট ও বেদআতীদের দল থেকে আলাদা থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে পূর্ণ বিশ্বাস দান করুন এবং দ্বীনের উপর কায়েম রাখুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আকায়েদের বিবরণ

প্রকাশ থাকে যে, কলেমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ বলা আমাদের জন্যে একটি এবাদত। কিন্তু এ কলেমার যেসব মূলনীতি রয়েছে, সেগুলো না জানা পর্যন্ত কেবল মুখে এর সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যে কোন ফায়দা নেই। এসব মূলনীতির উপরই এ কলেমার বাক্য দু'টি ভিত্তিশীল।

জানা দরকার, এ বাক্য দুটি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও চারটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (১) আল্লাহ্ তাআলার সত্তা সপ্রমাণ করা এবং (২) তাঁর গুণাবলী সপ্রমাণ করা, (৩) তাঁর ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করা এবং (৪) তাঁর রসূলগণের সত্যতা সপ্রমাণ করা। এ থেকেই জানা গেল, ঈমান চারটি স্তম্ভের উপর এবং প্রত্যেকটি স্তম্ভ দশটি মূলনীতির উপর ভিত্তিশীল।

প্রথম স্তম্ভের প্রথম মূলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের প্রমাণ। এ সম্পর্কে কোরআন প্রদর্শিত পন্থাই সর্বোত্তম। কেননা, আল্লাহ তাআলার বর্ণনা অপেক্ষা উত্তম বর্ণনা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ـ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ـ

অর্থাৎ, আমি কি ভূমিকে বিছানা এবং পর্বতকে গজাল সদৃশ করিনি? আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি, তোমাদেরকে নিদ্রা দিয়েছি বিশ্রামের জন্যে, রাত্রিকে করেছি আবরণস্বরূপ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা উপার্জনের সময়। আমি তোমাদের উর্ধ্বদেশে মজবুত

সাত আকাশ নির্মাণ করেছি এবং সমুজ্জ্বল প্রদীপ তৈরী করেছি। আমি পানিবাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিপাত করি; তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্যে লাভজনক বস্তু নিয়ে সমুদ্রে চলমান নৌকায়, আকাশ থেকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ পানিতে, যদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সঞ্জীবিত করেন ও তাতে ছড়িয়ে দেন সবরকম জীব-জন্তু, আবহাওয়ার পরিবর্তনে এবং আল্লাহর আদেশাধীন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে বিচরণকারী মেঘমালার মধ্যে তাঁদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা বুঝে।"

অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে–

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَّاللّٰهُ اَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ـ

অর্থাৎ, "তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তাতে চন্দ্রকে রেখেছেন প্রদীপরূপে। আল্লাহ তোমাদেরকে উৎপন্ন করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবেন এবং পুনরুত্থিত করবেন।"

আর এক জায়গায় এরশাদ হয়েছে–

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ۔

অর্থাৎ, "তোমরা কি তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? তা কি তোমারা সৃষ্টি কর, না আমি সৃষ্টি করি?"

অবশেষে বলা হয়েছে–

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۔

অর্থাৎ, "আমি একে করেছি নিদর্শন এবং মরুচারীদের প্রয়োজনীয় বস্তু।"

বলাবাহুল্য, যদি সামান্য সচেতন ব্যক্তিও এসব আয়াত সম্পর্কে সামান্য চিন্তাভাবনা করে, আকাশ ও পৃথিবীতে অবস্থিত বিস্ময়কর বস্তুসমূহের প্রতি এবং জীবজন্তু ও উদ্ভিদের অদ্ভুত প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য করে, তবে সে অবশ্যই জানতে পারবে, এই অভূতপূর্ব কারখানা ও অটল ব্যবস্থাপনার একজন রচয়িতা অবশ্যই রয়েছেন। তিনি এগুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। বরং মানুষের মূল সৃষ্টিই এ বিষয়ের সাক্ষ্যদাতা। কারণ, মানুষ আল্লাহর কুদরতের অধীন। তাঁর কৌশল অনুযায়ী ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۔

অর্থাৎ, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ সম্পর্কেই সন্দেহ?"

এ জন্যেই মানুষকে তওহীদের প্রতি আহ্বান করার উদ্দেশে তিনি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন, যাতে মানুষ বলে উঠে– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। মানুষকে একথা বলার নির্দেশ করা হয়নি যে, তাঁদের এক মাবুদ এবং বিশ্বের অন্য মাবুদ । কেননা, জন্মলগ্ন থেকেই এটা মানুষের মজ্জাগত বিষয় ছিল। তাই আল্লাহ বলেন–

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۔

অর্থাৎ, "তাদেরকে যদি প্রশ্ন কর– আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে, তাঁরা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ । আরও বলা হয়েছে–

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ -

অর্থাৎ, "অতএব আপনি একাগ্রতার সাথে প্রতিষ্ঠিত দ্বীনের উপর অনড় থাকুন। এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বভাবধর্ম, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিরীতির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক দ্বীন।"

মোট কথা, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের বর্ণনায় মানুষের জন্মের এবং কোরআন পাকের প্রমাণ এত উঁচুর পরিমাণে বিদ্যমান যে, অন্য কোন প্রমাণ উল্লেখ্য করার প্রয়োজন নেই। তবুও আমরা বক্তব্য জোরদার করার উদ্দেশে কালাম শাস্ত্রের অনুসরণে এর একটি যুক্তিও লেখে দিচ্ছি। যে বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে না, তাকে পরিভাষায় 'হাদেস' তথা অনিত্য বলা হয়। এমন অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন কারণ অবশ্যই দরকার। এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এ বিশ্বও অনিত্য। কেননা, এক সময়ে এটা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও এমন সময় আসবে, যখন থাকবে না। সুতরাং এ বিশ্বের অস্তিত্ব লাভের পেছনেও কোন কারণ অবশ্যই রয়েছে। বলাবাহুল্য, এ কারণ হলেন আল্লাহ তাআলা। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলেই এ বিশ্বচরাচর অস্তিত্ব লাভ করেছে।

দ্বিতীয় মূলনীতি হল. আল্লাহ তাআলা নিত্য, অনাদি ও চিরন্তন। তাঁর অস্তিত্বের কোন আদি নেই; বরং প্রত্যেক বস্তুর তথা জীবিত ও মৃতের পূর্বে তিনিই আছেন। এর দলীল, আল্লাহ তাআলা 'কাদীম' তথা নিত্য না হয়ে 'হাদেস' তথা অনিত্য হলে তিনিও অস্তিত্ব লাভের জন্যে কোন নিত্য কারণের মুখাপেক্ষী হবেন। সেই কারণটিও অন্য একটি কারণের মুখাপেক্ষী হবে এবং সেটাও অন্য এক কারণের মুখাপেক্ষী হবে। এভাবে এ মুখাপেক্ষিতার কোন অন্ত থাকবে না। ফলে মূল কারণ অর্জিত হবে না। সুতরাং কোন না কোন পর্যায়ে গিয়ে একটি স্বয়ম্ভূ কারণ মানতে হবে, যেটি হবে নিত্য, চিরন্তন ও সর্বপ্রথম। এটাই আমাদের লক্ষ্য এবং এরই

নাম বিশ্বস্রষ্টা, অস্তিত্বদাতা, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক ইত্যাদি।

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা অনাদি হওয়ার সাথে সাথে অনন্তও বটে। তাঁর অস্তিত্বের কোন অন্ত নেই; বরং তিনি প্রথম এবং তিনিই শেষ, তিনিই জাহের, তিনিই বাতেন। কারণ, যাঁর চিরন্তনতা সপ্রমাণিত, তাঁর বিলুপ্তি অসম্ভব। কেননা, তিনি বিলুপ্ত হলে হয় আপনা আপনি বিলুপ্ত হবেন, না হয় কোন বিলুপ্তকারীর বিলুপ্ত করার কারণে বিলুপ্ত হবেন। প্রথমটি বাতিল। কেননা, যাকে চিরন্তন কল্পনা করা হয়েছে, তার আপনা আপনি বিলুপ্তি সম্ভব হলে কোন বস্তুর আপনা আপনি অস্তিত্ব লাভও সম্ভব হবে। বিলুপ্তকারী দ্বারা বিলুপ্ত হওয়াও বাতিল। কেননা, এই বিলুপ্তকারী নিত্য ও চিরন্তন হলে তার উপস্থিতিতে এ সত্তার অস্তিত্ব কিরূপে হল? প্রথমোক্ত দুটি মূলনীতির দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব ও চিরন্তনতা প্রমাণিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে বিলুপ্তকারী হাদেস তথা অনিত্য হলে সে নিজেই চিরন্তনের কারণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এমতাবস্থায় সে চিরন্তনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে পারে না।

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন আয়তনে পরিবেষ্টিত নন; বরং তিনি আয়তনের বেষ্টনী থেকে মুক্ত পবিত্র। এর প্রমাণ, প্রত্যেক বস্তু যে আয়তনে পরিবেষ্টিত রয়েছে, এর মূলে হয় সে বস্তু সে আয়তক্ষেত্রে অবস্থান করছে, না হয় সে ক্ষেত্র থেকে গতিশীল হচ্ছে। অবস্থান ও গতিশীলতা উভয়টি হাদেস তথা অনিত্য। এটা আল্লাহ তাআলার জন্যে নয়।

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা পদার্থ গঠিত শরীরী নন। কেননা, যা পদার্থ গঠিত, তাকেই শরীরী বলা হয়। আল্লাহ তাআলা পদার্থ হওয়া এবং বিশেষ স্থানে অবস্থানকারী হওয়া যখন বাতিল, তখন তাঁর শরীরী হওয়াও বাতিল। জগত স্রষ্টার শরীরী হওয়া সঠিক হলে সূর্য, চন্দ্র অথবা অন্য কোন শরীরীকে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করাও সম্ভবপর হবে।

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কোন গুণ নন। কেননা, সকল শরীরীই নিশ্চিতরূপে হাদেস বা অনিত্য। যে এসব শরীরীকে অস্তিত্ব দান করবে, সে এগুলোর পূর্বে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন শরীরীর মধ্যে কিরূপে অনুপ্রবেশ করতে পারেন? তিনি তো অনাদিকালে সকলের পূর্বে একাই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। নিজের পরে

তিনি শরীরী ও গুণসমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

এ ছয়টি মূলনীতি থেকে জানা গেল, আল্লাহ তাআলা বিদ্যমান, নিজে নিজেই প্রতিষ্ঠিত, তিনি পদার্থ নন, শরীরী নন এবং গুণও নন। সমগ্র বিশ্ব পদার্থ, গুণ ও শরীরী। এতে প্রমাণিত হল, তিনি কারও মত নন এবং কেউ তাঁর মত নয়।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার সত্তা দিকের বিশেষত্ব থেকেও পবিত্র। কেননা, দিক ছয়টি– ঊর্ধ্ব, অধঃ, ডান, বাম, অগ্র ও পশ্চাৎ। আল্লাহ তাআলাই এগুলো সব মানব সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। কেননা, তিনি মানুষের দুটি দিক সৃষ্টি করেছেন। একটি ভূমি সংলগ্ন, যাকে পা বলা হয় এবং অপরটি তার বিপরীত, যাকে মাথা বলা হয়। সুতরাং, ঊর্ধ্ব শব্দটি মাথার দিকের জন্য এবং অধঃ শব্দটি পায়ের দিকের জন্যে গঠিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি হাত সৃষ্টি করেছেন। প্রায়শঃ এর একটি অপরটি অপেক্ষা শক্তিশালী হয়। যে হাতটি অধিক শক্তিশালী, তার নাম রাখা হয়েছে ডান এবং এর বিপরীত হাতের নাম বাম। এর পর যে দিকটি ডান তরফে তার নাম ডান দিক এবং যে দিকটি বাম তরফে তার নাম বাম দিক রাখা হয়েছে। এছাড়া আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্যে দুটি তরফ সৃষ্টি করেছেন। এক তরফে দেখে এবং চলে, সেই তরফের নাম হয়েছে অগ্র দিক এবং এর বিপরীত তরফের নাম সাব্যস্ত হয়েছে পশ্চাদ্দিক।

সুতরাং উপরোক্ত ছয়টি দিক মানব সৃষ্টির ফলস্বরূপ সৃজিত হয়েছে। যদি মানুষকে এই আকারে সৃষ্টি করা না হত, বরং বলের মত গোলাকার সৃষ্টি করা হত, তবে এসব দিকেরও অস্তিত্ব থাকত না। সুতরাং এসব দিক হাদেস বা অনিত্য। যতদিন মানুষ থাকবে, ততদিন এসব দিক থাকবে। মানুষের বিলুপ্তির সাথে সাথে এসব দিকেরও বিলুপ্তি ঘটবে। অতএব আল্লাহ তাআলা এগুলোর দ্বারা অনাদিকালেও বিশেষত্ব লাভ করতে পারেন না এবং এখনও পারেন না। কেননা, মানব সৃষ্টির সময় তিনি কোন বিশেষ দিকে ছিলেন না।

আল্লাহ তাআলার জন্যে ঊর্ধ্ব হবে, এ বিষয় থেকে তিনি মুক্ত। কেননা, মাথা থেকে তিনি মুক্ত। মাথার দিককেই বলা হয় ঊর্ধ্ব।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলার জন্যে অধঃ হতে পারে না, কেননা, তাঁর পা নেই। এখন প্রশ্ন হয়, দোয়ার সময় হাত আকাশের দিকে উঠানো হয় কেন? জওয়াব, আকাশের দিকেই দোয়ার কেবলা। এতে আরও ইশারা আছে, যার কাছে দোয়া চাওয়া হয়, তিনি প্রতাপশালী ও মহান। উচ্চতার দিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব জ্ঞাপন করে। আল্লাহ তাআলা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রবলতার দিক দিয়ে প্রত্যেক বিদ্যমান বস্তুর উর্ধ্বে রয়েছেন।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা সেই অর্থে আরশের উপর সমাসীন, যে অর্থ তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, সমাসীন হওয়ার যে অর্থ তাঁর বিশালতার পরিপন্থী নয় এবং যাতে অনিত্যতা, ফানা বা বিনাশের কোন দখল নেই। নিম্নোক্ত আয়াতে সমাসীন হওয়ার অর্থই বুঝানো হয়েছে–

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ ـ

অর্থাৎ, "অতঃপর আল্লাহ্ আকাশে আরোহণ করলেন। তখন আকাশ ছিল ধোঁয়া।"

এ অর্থ কেবল প্রচণ্ডতা ও প্রবলতার দিক দিয়েই সম্ভব। অর্থাৎ, তিনি আকাশের উপর প্রবল হলেন। জনৈক কবি বলেন ঃ "এখন বাশার এরাফের উপর সমাসীন হল। সে তরবারি ও রক্তপাতের মুখাপেক্ষী হয়নি।" সত্যপন্থীদেরকে বাধ্য হয়ে এ ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন মিথ্যাপন্থীরা অপারগ হয়ে وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ অর্থাৎ "তোমরা যেখানেই থাক, আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন" আয়াতের ব্যাখ্যা করেছে, সঙ্গে থাকার উদ্দেশ্য বেষ্টন করা ও জানা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن ـ

অর্থাৎ, "মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দু'অঙ্গুলির মাঝখানে অবস্থিত।"

এখানে অঙ্গুলির ব্যাখ্যা কুদরত ও প্রবলতা করা হয়েছে। এমনিভাবে الاسود يمين الله فى ارضه অর্থাৎ, হাজারে আসওয়াদ তথা "কৃষ্ণ প্রস্তর পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাআলার দক্ষিণ হস্ত।" এর অর্থ নেয়া

হয়েছে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে রাখা হলে তা সম্ভব থাকে না। অনুরূপভাবে এক্ষেত্রে استوى শব্দের বাহ্যিক অর্থ অবস্থান করা ও স্থান নেয়া করা হলে আল্লাহ তাআলার শরীরী হওয়া এবং আরশের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ আরশের সমান হবেন অথবা ছোট হবেন অথবা বৃহৎ হবেন। এসবই অসম্ভব। কাজেই বাহ্যিক অর্থ নেয়াও অম্ভব।

নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা আকার, পরিমাণ, দিক ইত্যাদি থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আখেরাতে চর্মচোখে দৃষ্টিগোচর হবেন। কেননা, তিনি বলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ

অর্থাৎ, "অনেক মুখমণ্ডল সেদিন প্রফুল্ল হবে– তাদের পালনকর্তাকে অবলোকন করবে।"

তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হন না। কারণ, আল্লাহ বলেন–

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ـ

অর্থাৎ, "দৃষ্টি তাঁকে উপলব্ধি করতে পারে না। তিনি দৃষ্টিসমূহকে উপলব্ধি করেন।"

তদুপরি এ কারণে যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর জওয়াবে তিনি নিজে বলেন ঃ

لَنْ تَرَانِىْ ـ

অর্থাৎ, "তুমি কিছুতেই আমাকে দেখতে পারবে না।"

এখন কেউ বলুক, আল্লাহ তাআলার যে সিফাত হযরত মূসা (আঃ)-এর পক্ষে জানা সম্ভব হল না, তা মুতাযেলা সম্প্রদায় কেমন করে জেনে নিল এবং দীদার অসম্ভব হওয়া সত্ত্বেও মূসা (আঃ) দীদারের প্রার্থনা কিরূপে করলেন? পরকালে দীদারের আয়াতকে বাহ্যিক অর্থে নেয়ার কারণ, এতে কোন কিছু অসম্ভব হওয়া জরুরী হয় না। কেননা, দর্শনও এক প্রকার জ্ঞান ও কাশ্ফ। তবে তা জ্ঞান অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্ট। সুতরাং আল্লাহ তাআলা কোন দিকে না থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁর সাথে জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, তখন এমনি অবস্থায় দেখাও তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। আল্লাহকে জানা যেমন আকার ছাড়াই সম্ভব,

তেমনি তাঁকে দেখাও আকার আকৃতি ব্যতিরেকেই সম্ভবপর।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলার কোন শরীক নেই। তিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি একাই আবিষ্কার করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন সমতুল্য, সমকক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যে তাঁর সাথে কলহ ও বিরোধ করতে পারে। এর প্রমাণ এই আয়াত–

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا .

অর্থাৎ, যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত আরও উপাস্য থাকত, তবে আকাশ ও পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত।

এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি আল্লাহ্ দু'জন থাকে এবং তাঁদের মধ্যে কোন একজন কোন কাজ করতে চায়, তবে অন্যজন তার সাথে সায় দিতে বাধ্য হলে সে অক্ষম অপারগ বলে বিবেচিত হবে। সর্বশক্তিমান হবে না। আর যদি দ্বিতীয় জন প্রথম জনকে প্রতিহত করতে ও বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়, তবে দ্বিতীয় জন শক্তিশালী ও প্রবল হবে আর প্রথম জন দুর্বল ও অক্ষম প্রতিপন্ন হবে; সর্বশক্তিমান হবে না।

দ্বিতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী সপ্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বশক্তিমান এবং এ উক্তিতে সত্যবাদী–

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

অর্থাৎ, "তিনি সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান।"

এর কারণ, এ বিশ্ব কারিগরি দিক দিয়ে অত্যন্ত মজবুত এবং সৃষ্টিগতভাবে সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার অধীন। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি চমৎকার বয়নযুক্ত, কারুকার্যখচিত ও সুসজ্জিত রেশমী বস্ত্র দেখে ধারণা করে, এটা কোন মৃত ব্যক্তি বয়ন করে থাকবে, যে কিছু করতে পারে না, তাহলে সে কি নির্বোধ মূর্খ বলে গণ্য হবে না? তেমনিভাবে আল্লাহ্ তাআলা নির্মিত বিশ্বকে দেখেও তাঁর কুদরত অস্বীকার করা নিছক বোকামি বৈ নয়।

দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় জ্ঞান দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কোন অনুকণা নেই, যা তাঁর জ্ঞানে অনুপস্থিত। তিনি এ উক্তিতে সত্যবাদী–

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ, তিনি সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি আরও বলেন−

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ -

অর্থাৎ, "যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না, অথচ তিনি রহস্যজ্ঞানী সর্বজ্ঞ?" এতে নির্দেশ করেছেন, সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি করে নাও। কেননা, সামান্য বস্তুর মধ্যেও নিপুণ সৃষ্টি ও সাজানো গোছানো শিল্পকর্ম দেখে নিঃসন্দেহে শিল্পীর ব্যবস্থাপনা জ্ঞান উপলব্ধি করা যায়।

তৃতীয় মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা জীবিত। কেননা, যার জ্ঞান ও কুদরত প্রমাণিত, তার জীবনও অবশ্যই প্রমাণিত হবে। যার কুদরত চলমান এবং যার জ্ঞান ও কৌশল অব্যাহত, তাকে যদি জীবিত নয় বলে কল্পনা করা যায়, তবে গতিশীল ও স্থিতিশীল থাকা অবস্থায় জীবজন্তুর জীবন সম্পর্কেও সন্দেহ হতে পারে; বরং কারিগর, শিল্পী, শহরে ও বনে ঘুরাফেরাকারী এবং দেশ বিদেশের যত মুসাফির রয়েছে তাদের সকলের জীবন সম্পর্কেই সন্দেহ হতে পারে। এটা পথভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়।

চতুর্থ মূলনীতি, আল্লাহ তআলা স্বীয় কর্মের ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ, যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা তাঁর ইচ্ছায় অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তাই করেন। কারণ, যে কাজ তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পায়, তার বিপরীত কাজটিও প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কুদরত উভয় কাজের সাথে একই রূপ সম্পর্ক রাখে। সুতরাং উভয় কাজের মধ্য থেকে এক কাজের দিকে কুদরতকে ফিরিয়ে আনার জন্যে একটি ইচ্ছা থাকা একান্ত দরকার।

পঞ্চম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। অন্তরের কুমন্ত্রণা, চিন্তাভাবনা ও ধারণার মত গোপন বিষয়ও তাঁর দৃষ্টিতে অনুপস্থিত নয় এবং অন্ধকার রাতে শক্ত পাথরের উপর কাল পিঁপড়ার শব্দও তাঁর শ্রবণের বাইরে নয়। কেননা, শ্রবণ ও দর্শন পূর্ণতার গুণ, অপূর্ণতার গুণ নয়। সুতরাং আল্লাহ তাআলার জন্যে শ্রবণ ও দর্শন স্বীকার না করলে তাঁর সৃষ্টি হয়ে যাবে পূর্ণ এবং তিনি অপূর্ণ হয়ে যাবেন। এছাড়া

পিতার সামনে পেশকৃত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রমাণও বৈধ হবে না। তাঁর পিতা অজ্ঞতাবশতঃ প্রতিমা পূজা করত। তিনি পিতাকে বললেন

لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ـ

অর্থাৎ, "আপনি এমন প্রতিমার পূজা কেন করেন, যে শুনে না, দেখে না এবং আপনার কোন উপকার করে না।"

সুতরাং তুমিও যদি পিতার উপাস্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, তবে তোমার প্রমাণাদি বাতিল হয়ে যাবে এবং আল্লাহর উক্তির সত্যতাও প্রতিষ্ঠিত হবে না– تِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ

অর্থাৎ, "এটা আমার প্রমাণ, যা আমি ইব্রাহীমকে তার কওমের মোকাবিলায় দান করেছি।"

যেমন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াই আল্লাহ তাআলার কর্তা হওয়া এবং অন্তর ও মস্তিষ্ক ছাড়া জ্ঞানী হওয়া প্রতীয়মান হয়েছে, তেমনি চক্ষুকোটর ছাড়া তাঁর দর্শক হওয়া এবং কর্ণকুহর ছাড়া শ্রোতা হওয়াও বুঝে নেয়া উচিত। এতদুভয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই।

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা কথা বলেন এবং তাঁর কালাম (কথা) তাঁর সত্তার সাথে সম্পৃক্ত একটি সিফত। এ কালাম কণ্ঠস্বরও নয় এবং অক্ষরও নয়। তাঁর কালাম অন্যের কালামের অনুরূপ নয়, যেমন তাঁর সত্তা অন্যের সত্তার মত নয়। আসলে মনের কালামই সত্যিকার কালাম। অক্ষর ও কণ্ঠস্বর তো কেবল ব্যক্ত করার জন্য। যেমন, নড়াচড়া ও ইশারা দ্বারাও মাঝে মাঝে ব্যক্ত করা যায়। জানি না, কোন কোন লোকের কাছে এ বিষয়টি কেন দুর্বোধ্য হয়ে গেল। অথচ জাহেলিয়াত যুগের কবিদের কাছেও এটা দুর্বোধ্য ছিল না। তাই জনৈক কবি বলেন ঃ কালামের অস্তিত্ব কেবল অন্তরের মধ্যে। জিহ্বা এর প্রমাণ মাত্র। তবে কতক লোককে এসব বিষয় থেকে দূরে রাখার মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোন প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ হেদায়াত করতে পারে না। হযরত মূসা (আঃ) দুনিয়াতে কণ্ঠস্বর ও অক্ষরবিহীন কালাম শ্রবণ করেছেন– যেব্যক্তি একথা অসম্ভব মনে করে, তবে তার উচিত আখেরাতে

দেহ ও রংবিহীন বস্তু দেখার সম্ভাবনা অস্বীকার করা। কিন্তু এটা সে স্বীকার করে থাকে, যদিও এ পর্যন্ত এমন কোন বস্তু দেখেনি। সুতরাং দেখার ব্যাপারেও তাই স্বীকার করা উচিত, যা শ্রবণের ব্যাপারে বুঝে আসে।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত কালাম চিরন্তন। তার সকল সিফতও তেমনি। কেননা, অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র হওয়া আল্লাহ তাআলার শানের পরিপন্থী। কারণ, অনিত্য বস্তুসমূহ পরিবর্তিত হতে থাকে। অথচ আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলার এলেম চিরন্তন। অর্থাৎ, তিনি সর্বদা আপন সত্তা, সিফত এবং যা কিছু সৃষ্টি করেন, সকলকে অনাদিকাল থেকে জানেন। যখন কোন বস্তু সৃষ্টি করেন তখন তার এলেম নতুন অর্জিত হয় না; বরং অনাদি-অনন্তকালব্যাপী তা তাঁর রয়েছে।

নবম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা চিরন্তন। বিশেষ ও উপযুক্ত সময়ে সৃষ্টি কর্মের সাথে পূর্ব জ্ঞান অনুযায়ী অনাদিকালেই এ ইচ্ছার সম্পর্ক হয়ে আছে। কেননা, তাঁর ইচ্ছা অনিত্য হলে তিনি অনিত্য বস্তুসমূহের পাত্র সাব্যস্ত হবেন, যা তাঁর শানের পরিপন্থী।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা এলেম সহকারে আলেম, জীবন সহকারে জীবিত, শক্তি সামর্থ্য সহকারে শক্তিমান, ইচ্ছা সহকারে ইচ্ছাকারী, কালাম সহকারে মুতাকাল্লিম (বক্তা), শ্রবণ সহকারে শ্রোতা এবং দর্শক সহকারে দ্রষ্টা। এগুলো তাঁর চিরন্তন সিফত। অতএব যারা তাঁকে এলেম ব্যতিরেকে আলেম বলে, তারা যেন কাউকে ধন ব্যতিরেকে ধনী বলে, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

তৃতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার ক্রিয়াকর্ম সপ্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি, বিশ্বে যা কিছু অনিত্য ও সৃষ্ট, তা আল্লাহ তাআলারই কর্ম ও আবিষ্কার। তিনি ব্যতীত কোন স্রষ্টা বিশ্ব সৃষ্টি করেনি। সুতরাং বান্দার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার কুদরতের সাথে জড়িত।

নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এ মূলনীতির সমর্থন পাওয়া যায়–

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"অর্থাৎ, সবকিছুর স্রষ্টাই আল্লাহ।"

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং যা তোমরা কর, তাকে।"

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِجْهَرُوْا بِهٖ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থাৎ, "তোমরা গোপনে কথা বল অথবা প্রকাশ্যে, তিনি অন্তরের রহস্য জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেনই না বা কেন? তিনি রহস্যজ্ঞানী, সর্বজ্ঞাত।"

দ্বিতীয় মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজকর্মের স্রষ্টা– এটা এ বিষয়কে জরুরী করে না, কাজকর্ম 'ইকতিসাব' তথা উপার্জন হিসাবে বান্দার ক্ষমতাধীন থাকবে না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা ও ক্ষমতাশালী উভয়কেই সৃষ্টি করেছেন। কুদরত তথা ক্ষমতা বান্দার একটি আল্লাহ প্রদত্ত গুণ, যা বান্দার উপার্জিত নয়। অর্থাৎ বান্দার ক্রিয়াকর্ম একটা কুদরতী গুণের অধীনে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্রিয়াকর্ম সৃষ্টির দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার কুদরতের অধীন এবং ইকতিসাব ও উপার্জনের দিক দিয়ে বান্দার ক্ষমতার অধীন। কাজেই বান্দার ক্রিয়াকর্ম নিছক বাধ্যতামূলক নয়।

তৃতীয় মূলনীতি, বান্দার কর্ম বান্দার উপার্জন হলেও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বাইরে নয়। এ থেকে বুঝা গেল, পৃথিবীতে ভাল-মন্দ, সৎ অসৎ, লাভ-লোকসান, কুফর-ঈমান, গোমরাহী-হেদায়াত, আনুগত্য-নাফরমানী ইত্যাদি যা কিছু হয়, সব আল্লাহ তাআলারই ফয়সালা দ্বারা হয় এবং তাঁর ইচ্ছা ও বাসনায় প্রকাশ পায়। কেউ তাঁর ফয়সালা টলাতে পারে না এবং তাঁর আদেশ পেছনে হটাতে পারে না। তিনি যাকে ইচ্ছা গোমরাহ এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন। তিনি যা করেন তার জন্য কারও কাছে জওয়াবদিহি করেন না, তবে বান্দাকে জওয়াবদিহি করতে হবে। এর ইতিহাসগত প্রমাণ হচ্ছে, সমগ্র উম্মত এ বাক্যের সত্যতায় বিশ্বাস করে। ماشاء الله كان وما لم يشا لم يكن

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা চান তা হয় এবং যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

اَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا .

অর্থাৎ, "আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করতেন।"

لَوْشِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ

অর্থাৎ "আমি ইচ্ছা করলে সকলকে সৎপথ দান করতাম।"

এর যৌক্তিক প্রমাণ হল, যদি আল্লাহ তাআলা গোনাহ ও অন্যায়কে খারাপ মনে করে এগুলোর ইচ্ছা না করেন, তবে এগুলো তাঁর দুশমন অভিশপ্ত ইবলীসের ইচ্ছায় হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, মানুষের মধ্যে গোনাহ্ নাফরমানীই অধিক। তা হলে দেখা যায়, ইবলীস আল্লাহ্ তাআলার শত্রু হওয়া সত্ত্বেও তার ইচ্ছানুযায়ী মানুষ অধিক কাজ সম্পাদন করে এবং আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী কম কাজ সম্পাদন করা হয়। এখন বল, মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার মর্যাদা এমন স্তরে কিরূপে নামিয়ে দেবে, যে স্তরে গ্রামের কোন মাতাব্বরকে নামিয়ে দিলে সে-ও মাতাব্বরীকে ঘৃণা করতে শুরু করবে? অর্থাৎ, গ্রামে যদি মাতাব্বরের কোন শত্রু থাকে এবং তার ইচ্ছানুযায়ী অধিক কাজ সম্পাদিত হয় মাতাব্বরের ইচ্ছা কমই পালিত হয়, তবে মাতাব্বর ব্যক্তি এমন মাতাব্বরীকে কি অবমাননাকর মনে করবে না? বেদআতীদের মতে মানুষের নাফরমানী, যা সংখ্যায় অধিক– আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার খেলাফে হয়ে থাকে। এটা আল্লাহ্ তাআলা দুর্বল ও অক্ষম হওয়ার দলীল (নাউযু বিল্লাহ্)। সুতরাং যখন প্রমাণিত হল, বান্দার ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট, তখন এটাও প্রামাণিত হল যে, বান্দার ক্রিয়াকর্ম তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত হয়। এখন প্রশ্ন হয়, আল্লাহ তাআলা যে কাজের ইচ্ছা করেন তা করতে বান্দাকে নিষেধ করেন কিরূপে এবং যে কাজের ইচ্ছা তিনি করেন না, সে কাজের আদশ করেন কিরূপে? এর জওয়াব হচ্ছে, আদেশ ও ইচ্ছা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। আদেশ করলেই ইচ্ছা করা জরুরী হয় না।

চতুর্থ মূলনীতি, সৃষ্টি, আবিষ্কার, আদেশ– এগুলো আল্লাহ্ তাআলার

অনুগ্রহ, তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। মু'তাযেলা সম্প্রদায় বলে, এগুলো তাঁর উপর ওয়াজেব। কারণ, এর মধ্যে বান্দার কল্যাণ নিহিত। তাদের এ উক্তি ঠিক নয়। কেননা ওয়াজেবকারী তো তিনিই। অতএব তিনি নিজে কিরূপে ওয়াজেব হওয়ার লক্ষ্যস্থল হতে পারেন? ওয়াজেব এমন কাজকে বলা হয়, যা বর্জন করলে ভবিষ্যতে অথবা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতি হয়। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ওয়াজেব। এর অর্থ, এই আনুগত্য বর্জন করলে ভবিষ্যতে অর্থাৎ, আখেরাতে শাস্তিভোগ করতে হবে। অথবা পিপাসিত ব্যক্তির উপর পানি পান করা ওয়াজেব। অর্থাৎ, এটা বর্জন করলে পরিণামে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই অর্থে আল্লাহ্ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হতেই পারে না।

পঞ্চম মূলনীতি, যে কাজ করার শক্তি বান্দার মধ্যে নেই, সেই কাজের আদেশ করা আল্লাহ্ তাআলার জন্যে বৈধ, যদিও তিনি এরূপ আদেশ করেন না। কেননা, বৈধ না হলে এটা না করার প্রার্থনা অর্থহীন হবে। অথচ আল্লাহ্ তাআলার উক্তিতে এরূপ প্রার্থনা প্রমাণিত রয়েছে—

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ -

অর্থাৎ, "হে পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব আরোপ করো না, যার শক্তি আমাদের নেই।"

ষষ্ঠ মূলনীতি, আল্লাহ্ তাআলা কোন পূর্ব অপরাধ অথবা ভবিষ্যৎ সওয়াব ব্যতিরেকেই তাঁর সৃষ্টিকে কষ্ট ও শাস্তি দিতে পারেন। এটা তাঁর জন্যে বৈধ। কেননা, তিনি আপন মালিকানায় এ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন— অন্যের মালিকানায় নয়। অপরের মালিকানায় তার অনুমতি ছাড়া ক্ষমতা প্রয়োগ করাকে জুলুম বলা হয়। এটা আল্লাহ্‌র জন্যে অসম্ভব। কেননা, তাঁর সামনে অন্যের কোন মালিকানা নেই যে, তাতে ক্ষমতা প্রয়োগ করলে জুলুম হবে। এ বিষয়ের অস্তিত্বই এর বৈধ হওয়ার দলীল। আমরা জন্তু জানোয়ারকে যবেহ্ হতে দেখি। মানুষ তাদেরকে নানা রকম কষ্ট দিয়ে থাকে। অথচ পূর্বে তাদের তরফ থেকে কোন অপরাধ প্রকাশ পায় না। সুতরাং কেউ যদি বলে, আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামতে জন্তু-জানোয়ারকে জীবিত করবেন এবং তাদেরকে মানুষের কাছ থেকে নির্যাতনের বদলা দান করবেন, তবে তা শরীয়ত ও বিবেক উভয়ের গণ্ডির বাইরে।

সপ্তম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করেন। বান্দার জন্যে যা অধিক উপযুক্ত, তা করা তাঁর উপর ওয়াজেব নয়। কেননা, আমরা পূর্বেই লেখেছি যে, আল্লাহ তাআলার উপর কোন কিছু ওয়াজেব হওয়া বোধগম্য নয়। তিনি যা করেন তার জন্যে তাকে জওয়াবদিহি করতে হয় না। কিন্তু মানুষের কাজের জওয়াবদিহি রয়েছে।

অষ্টম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলার মারেফত ও এবাদত তাঁর ওয়াজেব করার দিক দিয়ে এবং শরীয়তের আইনের দিক দিয়ে ওয়াজেব।

নবম মূলনীতি, পয়গম্বর প্রেরণ নিষ্ফল নয়। ব্রাহ্মণ্যবাদী সম্প্রদায় এর বিপরীতে বলে, বিবেকের উপস্থিতিতে পয়গম্বর প্রেরণের মধ্যে কোন উপকারিতা নেই। এর জওয়াব হচ্ছে, আখেরাতে মুক্তির কারণ হয় এমন কাজ বিবেক দ্বারা জানা যায় না, যেমন বিবেক দ্বারা স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী ওষুধপত্র জানা যায় না। সুতরাং চিকিৎসকের যেমন প্রয়োজন তেমনি পয়গম্বরগণেরও প্রয়োজন। পার্থক্য হচ্ছে, চিকিৎসকের কথা অভিজ্ঞতা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হয়, আর পয়গম্বর মোজেযা দ্বারা সত্য প্রমাণিত হন।

দশম মূলনীতি, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-কে খাতামুন্নাবিয়্যীন (সর্বশেষ নবী)-রূপে এবং পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহের জন্যে রহিতকারীরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁকে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমর্থন দান করেছেন; যেমন চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, কংকরের তসবীহ্ পাঠ করা, চতুষ্পদ জন্তুর কথা বলা, অঙ্গুলি থেকে পানির ঝরণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। মুহাম্মদ (সাঃ) যে প্রকাশ্য মোজেযা দ্বারা সমগ্র আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন, তা হচ্ছে কোরআন মজীদ। ভাষাশৈলী ও অলঙ্কার নিয়ে আরববাসীদের গর্বের অন্ত ছিল না। এতদসত্ত্বেও তারা কোরআনের মোকাবিলা করতে সক্ষম হল না। কেননা, কোরআনে যে চমৎকার রচনাশৈলী, ভাবের গাম্ভীর্য ও বাক্যাবলীর বিশুদ্ধতা রয়েছে, তার সমাবেশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আরবরা তাঁকে গ্রেফতার করেছে, লুটেছে, হত্যার চেষ্টা করেছে এবং দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে; কিন্তু পারেনি কেবল কোরআনের মত রচনা পেশ করতে। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিরক্ষর ছিলেন, পড়ালেখার ধারে-কাছেও যাননি। এতদসত্ত্বেও

তিনি কোরআন পাকে পূর্ববর্তী লোকদের নির্ভুল খবর এবং অনেক বিষয়ে অদৃশ্যের সংবাদাদি বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর সত্যতা পরবর্তীকালে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় এর দৃষ্টান্ত ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاۤءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ -

অর্থাৎ, "আল্লাহর ইচ্ছায় তোমরা অবশ্যই মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে, কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে।"

الٓمٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ -

অর্থাৎ, রোম পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী ভূভাগে, কিন্তু তারা এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে।

মোজেযা রসূলের সত্যতার প্রমাণ। কেননা, যে কাজ করতে মানুষ অক্ষম তা আল্লাহর কাজ ছাড়া অন্য কারও কাজ হবে না। এ ধরনের কাজ নবীর সাথে জড়িত হয়ে প্রকাশ পেলে এর অর্থ হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর সত্যতা ঘোষণা করা।

চতুর্থ স্তম্ভ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক রসূলগণের সত্যায়ন প্রমাণ করার প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, হাশর ও নশর হবে। শরীয়তে এর খবর বর্ণিত হয়েছে। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। বিবেকের বিচারে এর অস্তিত্ব সম্ভবপর। এর অর্থ হচ্ছে, মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা যে কুদরতের বলে প্রথম সৃষ্টি করেছেন, সেই কুদরতের বলেই পুনরায় জীবিত করবেন। তিনি নিজেই বলেন ঃ

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ -

অর্থাৎ "কাফের বলল, অস্থিসমূহ পচে যাওয়ার পর ওগুলো কে জীবিত করবে? বলে দিন ঃ যিনি এগুলো প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তিনিই জীবিত করবেন।"

এতে প্রথমবার সৃষ্টিকে পুনরুজ্জীবনের প্রমাণরূপে পেশ করা হয়েছে। অন্যত্র বলেন ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ـ

অর্থাৎ, "তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একই সত্তার সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতই।"

বলাবাহুল্য, পুনরায় সৃষ্টি দ্বিতীয় সূচনা। সুতরাং এটা প্রথম সূচনার মতই সম্ভবপর।

দ্বিতীয় মূলনীতি, মুনকার নকীরের প্রশ্নকে সত্যায়ন করা ওয়াজেব। এটি বিবেকের দৃষ্টিতেও সম্ভবপর। কেননা, এতে জরুরী হয় যে, জীবন পুনরায় এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যেখানে সম্বোধন করা সম্ভবপর। এতে আপত্তি করা যায় না যে, মৃত ব্যক্তির অঙ্গসমূহ স্থির থাকে এবং মুনকার নকীরের প্রশ্ন শুনতে পায় না। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তিও বাহ্যতঃ স্থির থাকে, কিন্তু অভ্যন্তরে এমন কষ্ট ও স্বাদ অনুভব করে, যার প্রভাব জাগ্রত হওয়ার পরও অব্যাহত থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত জিব্রাঈলের কথাবার্তা শুনতেন এবং তাঁকে দেখতেন। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে থাকত তারা শুনত না এবং দেখত না। এমনকি কিছু জানতেও পারত না।

তৃতীয় মূলনীতি, কবরের আযাব শরীয়তে প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন–

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَّيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْآ اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ـ

অর্থাৎ, "তাদেরকে অগ্নিতে পেশ করা হয় সকাল-সন্ধ্যায়। যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে (বলা হবে), ফেরাউনের বংশধরকে কঠোরতম শাস্তিতে দাখিল কর।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল পূর্ববর্তী মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা কবর আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

কবরের আযাব সম্ভবপর। একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। মৃত ব্যক্তির খণ্ড-বিখণ্ড অংশ হিংস্র জন্তুদের পেটে এবং পক্ষীদের চঞ্চুতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া কবরের আযাব সত্য হওয়ার পরিপন্থী নয়। কেননা, আযাবের ব্যথা প্রাণীর বিশেষ অংশে অনুভূত হয়। প্রাণীর এসব বিক্ষিপ্ত অংশের মধ্যে অনুভব শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া আল্লাহ তাআলার কুদরতের অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ মূলনীতি মীযান তথা দাঁড়িপাল্লা। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, "আমি কেয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করব।"

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, "অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। তারা চিরকাল দোযখে থাকবে।'

আল্লাহ তাআলার কাছে আমলের মর্যাদা যত বেশী হবে, আমলনামার ওজন তত বেশী হবে। এতে বান্দা তার আমলের পরিমাণ জেনে যাবে এবং সে স্পষ্ট বুঝবে, আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার হবে এবং সওয়াব দিলে তা হবে অনুগ্রহ।

পঞ্চম মূলনীতি পুলসেরাত, যা জাহান্নামের উপর নির্মিত এবং চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম ও তরবারির চেয়ে অধিক ধারালো।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَاهْدُوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর এবং তাদেরকে দাঁড় করিয়ে দাও। নিশ্চয় তারা জিজ্ঞাসিত হবে।" এ পুল সম্ভবপর। তাই একে সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজেব। যে আল্লাহ পাখীকে শূন্যে উড়াতে সক্ষম, তিনি মানুষকে এ পুলের উপর দিয়ে চালাতেও সক্ষম হবেন।

ষষ্ঠ মূলনীতি, জান্নাত ও জাহান্নাম আল্লাহ তাআলার সৃজিত। আল্লাহ

তাআলা বলেন ঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার মাগফেরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী। এটা খোদাভীরুদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।"

"প্রস্তুত করা হয়েছে" শব্দ থেকে জানা যায়, জান্নাত সৃজিত। তাই একে আক্ষরিক অর্থে থাকতে দেয়া ওয়াজেব। যদি কেউ বলে, বিচার দিবসের পূর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করার মধ্যে কোন উপকারিতা নেই, তবে এর জওয়াব, আল্লাহ তাআলা যা কিছু করেন তজ্জন্য তার কোন জওয়াবদিহি নেই। বান্দার কৃতকর্মের জওয়াবদিহি আছে।

সপ্তম মূলনীতি, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে সত্যপন্থী ইমাম (শাসক) হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ), তাঁর পরে হযরত ওমর (রাঃ), তাঁর পরে হযরত ওসমান (রাঃ) এবং তাঁর পরে হযরত আলী (রাঃ)। তাঁর পরে ইমাম কে হবেন, সে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) অকাট্য কোন কথা বলেননি। যদি বলতেন, তবে তা অবশ্যই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেত; যেমন বিভিন্ন শহরে তিনি যাঁদেরকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের বিষয় অজানা থাকেনি। এর তুলনায় ইমামের বিষয়টি আরও অধিক প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। এটা কিরূপে গোপন রইল? আর যদি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তা হলে তা মিটে গেল কিরূপে? আমাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছল না কেন? সারকথা, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) জনগণের পছন্দের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বয়াতের তরীকায় খলীফা হয়েছেন। যদি বলা হয়, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এরশাদ অন্যের জন্যে ছিল, তবে সকল সাহাবায়ে কেরামকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয় যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। একমাত্র রাফেযী সম্প্রদায় ছাড়া কেউ এ ব্যাপারে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেনি। আহলে সুন্নতের আকীদা হচ্ছে, সকল সাহাবীকে ভাল বলতে হবে। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূল যেমন তাঁদের প্রশংসা করেছেন, তেমনি প্রশংসা করতে হবে। হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর মধ্যে যে মতপার্থক্য হয়েছে, তা সবই ছিল

ইজতিহাদ ভিত্তিক, হযরত মোয়াবিয়ার ক্ষমতালিপ্সার কারণে নয়। হযরত আলী (রাঃ) ধারণা করেছিলেন, হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ঘাতকদেরকে আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করার পরিণতিতে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। কারণ, তাদের গোত্রের লোক সংখ্যা অনেক বেশী এবং সেনাবাহিনীতে মিশে রয়েছে। তাই অপরাধীদেরকে সোপর্দ করার বিষয়টি তিনি বিলম্বিত করা উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। অপর দিকে হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মনে করেছেন, এত বড় অন্যায় সত্ত্বেও অপরাধীদের শাস্তির ব্যাপারটি বিলম্বিত করার অর্থ তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়া এবং এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করা। বড় বড় আলেমগণ বলেন, প্রত্যেক মুজতাহিদই সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকেন, তবে সত্যে উপনীত হন একজনই। হযরত আলী (রাঃ) ভুলের উপর ছিলেন– একথা কোন আলেম বলেন না।

অষ্টম মূলনীতি, সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব খেলাফতের ক্রমানুযায়ী। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে যা শ্রেষ্ঠত্ব, সেটাই বাস্তব শ্রেষ্ঠত্ব। আল্লাহ তাআলার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব কোন্‌টি এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়। সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় অনেক আয়াত ও হাদীস বর্ণিত আছে। শ্রেষ্ঠত্বের সূক্ষ্ম বিষয়াদি এবং ক্রম তাঁরাই জানেন। যাঁরা কোরআনের অবতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা শ্রেষ্ঠত্বের এ ধারাবাহিকতা না বুঝে থাকলে খেলাফতকে এভাবে সাজাতেন না। কেননা, তাঁরা আল্লাহ তাআলার কাজে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করতেন না এবং কোন বাধাই তাঁদেরকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারত না।

নবম মূলনীতি, মুসলমান, বালেগ, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন খলীফা হওয়ার জন্যে পাঁচটি শর্ত ঃ পুরুষ হওয়া, পরহেযগার হওয়া, আলেম হওয়া, স্বাবলম্বী হওয়া ও কোরায়শী হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ الائمة من قريش। অর্থাৎ, খলীফা কোরায়শদের মধ্য থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই পঞ্চগুণসম্পন্ন অনেক লোক বিদ্যমান থাকলে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তি খলীফা হবেন। যেব্যক্তি সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বিরোধিতা করে, সে বিদ্রোহী।

দশম মূলনীতি, খোদাভীরু এবং আলেম না হয়েও যেব্যক্তি

খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকে, তাকে পদচ্যুত করলে যদি জনগণের জন্যে অসহনীয় ফেতনা দেখা দেয়, তবে আমরা বলব, তার খেলাফত বৈধ। কেননা, তাকে পদচ্যুত করার পর অন্য কেউ খলীফা হবে কিংবা খেলাফতের পদ শূন্য থাকবে। অন্য কেউ খলীফা হলে ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মুসলমানদের যে ক্ষতি হবে তা বর্তমান খলীফার মধ্যে কিছু শর্তের অনুপস্থিতির ক্ষতির তুলনায় অনেক বেশী হবে। বলাবাহুল্য, অধিক উপযোগিতা লাভের খাতিরেই এসব শর্ত। এখন অধিক উপযোগিতা অর্জিত না হওয়ার ভয়ে মূল উপযোগিতা হাতছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পক্ষান্তরে খেলাফতের পদ শূন্য থাকলে শাসনকার্য অচল হয়ে পড়বে। তাই পূর্বাবস্থা বহাল থাকাই সঙ্গত।

মোট কথা, উপরোক্ত চারটি স্তম্ভে বর্ণিত চল্লিশটি মূলনীতিই হচ্ছে আকায়েদ। কেউ এগুলো বিশ্বাস করলে সে আহলে সুন্নতের অনুসারী এবং বেদআতী সম্প্রদায় থেকে আলাদা থাকবে। আমরা দোয়া করি– আল্লাহ স্বীয় তওফীক দ্বারা আমাদেরকে সত্যের উপর কায়েম রাখুন এবং স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করুন।

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم .

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য

ঈমান ও ইসলাম সম্পর্কে তিন প্রকার মত দেখা যায় ঃ (১) কেউ বলেন, উভয়টি এক ও অভিন্ন, (২) কেউ বলেন উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন, পরস্পর মিলে না এবং (২) কেউ বলেন, বিষয় দুটিই, কিন্তু একটি অপরটির সাথে জড়িত। এখন আমরা তিন প্রকার আলোচনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে যা প্রকাশ্য সত্য, তা বর্ণনা করছি।

প্রথম প্রকার আলোচনা উভয়ের আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে। সত্য হচ্ছে, ঈমানের অর্থ সত্যায়ন করা অর্থাৎ, সত্য বলে প্রকাশ করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا "তুমি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।" মুমিন অর্থ সত্যায়নকারী। ইসলামের অর্থ আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাধ্যতা, অস্বীকৃতি ও হটকারিতা বর্জন করা। সত্যায়ন এক বিশেষ স্থান অর্থাৎ, অন্তর দ্বারা হয়। মুখ তার ভাষ্যকার। স্বীকার করা অন্তর, মুখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবগুলো দ্বারা হয়। কেননা, যে সত্যায়ন অন্তর দ্বারা হয়, তাই মেনে নেয়া ও অস্বীকার বর্জন করা, অনুরূপভাবে মুখে স্বীকার করা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আনুগত্য পালন করা। সারকথা, অভিধানের দিক দিয়ে ইসলাম একটি ব্যাপক বিষয় এবং ঈমান বিশেষ বিষয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠ অঙ্গের নাম ঈমান। এ থেকে জানা গেল, প্রত্যেক সত্যায়নই মেনে নেয়া, কিন্তু প্রত্যেক মেনে নেয়া সত্যায়ন নয়।

দ্বিতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের অর্থ সম্পর্কে। সত্য এই যে, শরীয়তে উভয়ের ব্যবহার তিনভাবে হয়েছে– উভয়কে এক অর্থে ধরে, উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন ধরে এবং একটির অর্থে অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত ধরে।

প্রথমোক্ত ব্যবহার– যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ -

অর্থাৎ, অতঃপর সেখানে যারা ঈমানওয়ালা ছিল, আমি তাদেরকে

উদ্ধার করলাম, কিন্তু সেখানে মাত্র একজন মুসলমানের গৃহ পাওয়া গেল।

এ ঘটনায় সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে, গৃহ একটিই ছিল এবং এরই জন্যে মুমিনীন ও মুসলিমীন শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে।

يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক তবে তাঁর উপরই ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলমান হও।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। একবার তাঁকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জওয়াবে এ পাঁচটি স্তম্ভই উল্লেখ করেন। এ থেকে জানা যায়, ঈমান ও ইসলাম এক এবং অভিন্ন। এবং উভয়টি ভিন্ন হওয়ার দৃষ্টান্ত এই আয়াত–

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا ـ

অর্থাৎ, গেঁয়োরা বলে ঃ আমরা ঈমান এনেছি। বলুন ঃ তোমরা ঈমান আননি; বরং বল ঃ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক আনুগত্য কবুল করেছি। এখানে ঈমান অর্থ কেবল অন্তরের সত্যায়ন এবং ইসলাম অর্থ মৌখিক সত্যায়ন। হাদীসে জিব্রাঈলে আছে, যখন তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি বললেন ঃ বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রসূলগণের প্রতি, কেয়ামত দিবসের প্রতি এবং এ বিষয়ের প্রতি যে, ভাল ও মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। এরপর প্রশ্ন হল ঃ ইসলাম কি? জওয়াবে তিনি এ পাঁচটি বিষয়ই উল্লেখ করে বললেন, এগুলো কথায় ও কাজে স্বীকার করার নাম ইসলাম। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের হাদীসে আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন এবং অন্য এক ব্যক্তিকে তা দিলেন না। হযরত সা'দ (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তিকে দিলেন না, অথচ সে মুমিন? তিনি বললেন ঃ সে মুমিন নয়, মুসলিম। দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করা হলেও তিনি এক-ই জওয়াব দিলেন।

ঈমান ও ইসলাম একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল ঃ সর্বোত্তম আমল কোন্‌টি? তিনি বললেন ঃ ইসলাম। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ কোন্ ইসলাম উত্তম? তিনি বললেন ঃ ঈমান। এ থেকে জানা গেল, উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন এবং একটি অপরটির অন্তর্ভুক্তও বটে। এটা অভিধানের দিক দিয়ে ব্যবহারে সর্বোত্তম। কেননা, ঈমান হচ্ছে আমলসমূহের মধ্যে একটি সর্বোত্তম আমল। আর ইসলাম মেনে নেয়ার নাম, অন্তর দ্বারা হোক, মুখে হোক অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হোক। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে অন্তর দিয়ে মেনে নেয়া। অন্তরের এ মেনে নেয়াই তসদীক তথা সত্যায়ন, যাকে ঈমান বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার আলোচনা শরীয়তগত বিধান সম্পর্কে। ঈমান ও ইসলামের শরীয়তগত বিধান দু'টি– একটি ইহলৌকিক, অপরটি পারলৌকিক। পারলৌকিক বিধান হচ্ছে জাহান্নামের অগ্নি থেকে বের করা এবং তাতে চিরকাল থাকার পথে প্রতিবন্ধক হওয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الايمان ـ

অর্থাৎ, "যার অন্তরে কণা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হবে।"

এতে মতভেদ রয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে বের হওয়া কোন্ ঈমানের ফল? কেউ বলে, কেবল বিশ্বাস করলেই এ ফল অর্জিত হবে। কেউ বলে, এ ঈমান হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকারোক্তি করা। আবার কেউ এর সাথে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করাকেও যোগ করে। বাস্তব কথা, যার মধ্যে এ তিনটি গুণই পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। তার ঠিকানা নিশ্চিতই জান্নাত হবে। যার মধ্যে দু'টি গুণ পাওয়া যাবে এবং অল্প বিস্তর আমলও পাওয়া যাবে, একটি অথবা অধিক কবীরা গোনাহও সে করবে, তার সম্পর্কে মুতাযেলীরা বলে, সে ঈমানের বাইরে কিন্তু কুফরের মধ্যে দাখিল নয়, তার নাম ফাসেক। সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। মুতাযেলীদের এ উক্তি বাতিল। যার মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাস পাওয়া যায়, কিন্তু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও আমল করার পূর্বেই মারা যায়, সে নিজের কাছে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ঈমান সহকারে মৃত্যুবরণ করে। সে জাহান্নাম থেকে বের হবে। কেননা, তার অন্তর ঈমানে পূর্ণ।

তৃতীয় অধ্যায়

পবিত্রতার তাৎপর্য

প্রকাশ থাকে যে, পবিত্রতার শ্রেষ্ঠত্ব নিম্নোদ্ধৃত হাদীস ও আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ بنى الدين على النظافة ধর্ম পরিচ্ছন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। مفتاح الصلوة الطهور নামাযের চাবি পবিত্রতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "এ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ্ পবিত্র লোকদেরকে ভালবাসেন।"

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন الطهور نصف الايمان অর্থাৎ, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তোমাদের উপর কোন অসুবিধা রাখতে চান না, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।"

অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আলেমগণ এসব রেওয়ায়েত থেকে এ তথ্য উদঘাটন করেছেন যে, মানুষের অভ্যন্তরকে পবিত্র করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান।" এ বাক্যের উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া অবান্তর যে, মানুষ তার বাহ্যিক অঙ্গে পানি ঢেলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবে আর তার অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ময়লা অপবিত্রতা দ্বারা কলুষিত থাকবে। বরং উদ্দেশ্য, পবিত্রতা সম্পর্কিত কাজ। পবিত্রতার প্রকার চতুষ্টয় এই ঃ (১) বাহ্যিক দেহ ইত্যাদিকে বেওযুজনিত অপবিত্রতা ও আবর্জনা থেকে পাক করা, (২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ্ ও পাপ থেকে পাক করা, (৩) অন্তরকে অসচ্চরিত্রতা ও কুঅভ্যাস থেকে পাক করা এবং

(৪) বাতেন তথা অভ্যন্তরকে আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু থেকে পাক করা। এ শেষোক্ত প্রকারটি পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণের বৈশিষ্ট্য। এখন প্রত্যেক প্রকারের যে অর্ধেক কাজ পবিত্রতা, তা এভাবে যে, চতুর্থ প্রকারের চরম লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য মহিমা মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়ে যাওয়া। প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী মারেফত অন্তরে কখনও অনুপ্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সবকিছু অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে। এজন্যেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ -

অর্থাৎ, "বলুন, আল্লাহ্। এরপর তাদেরকে তাদের ধ্যান-ধারণায় খেলা করতে দিন।"

কেননা, এ উভয়টি এক অন্তরে একত্রিত হয় না। কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা দু'অন্তর সৃষ্টি করেননি যে, একটির মধ্যে খোদায়ী মারেফত থাকবে আর অপরটির মধ্যে গায়রুল্লাহ তথা অন্য কিছু থাকবে। সুতরাং অন্তর অন্য কিছু থেকে পাক করা এবং খোদায়ী মারেফত আসা দু'টি কাজ, যার অর্ধেক হল অন্তরকে পাক করা।

অনুরূপভাবে তৃতীয় প্রকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, অন্তরের প্রশংসনীয় চরিত্র ও শরীয়তী বিশ্বাস দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া। বলাবাহুল্য, অন্তর এগুলো দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ বিপরীত কুচরিত্র ও মন্দ বিশ্বাস থেকে পাক না হবে। সুতরাং এখানেও দু'টি বিষয় হল, যার অর্ধেক অন্তরকে পাক করা।

এমনিভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করা এক কথা এবং এবাদত ও আনুগত্য দ্বারা পূর্ণ করা অন্য কথা। সুতরাং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাক করা হল সেই আমলের অর্ধেক, যা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা হওয়া উচিত। বাহ্যিক পবিত্রতাকেও এর মতই মনে করা উচিত। এভাবেই পবিত্রতাকে অর্ধেক ঈমান বলা হয়েছে।

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে ঈমানের বিভিন্ন মকাম বা স্তর। প্রত্যেক মকামের একটি পর্যায় আছে। বান্দা নীচের পর্যায় অতিক্রম না করা পর্যন্ত উপরের পর্যায়ে কিছুতেই পৌছতে পারে না। উদাহরণতঃ অন্তরকে

নিন্দনীয় চরিত্র থেকে পাক করা এবং প্রশংসনীয় চরিত্র দ্বারা পূর্ণ করার পর্যায়ে পৌঁছা যাবে না, যে পর্যন্ত না নিন্দনীয় চরিত্র থেকে অন্তরকে পবিত্র করা হবে। আর যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে পাক করে এবাদতে ব্যাপৃত না করবে, সে অন্তরের পবিত্রতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না। উদ্দেশ্য যত প্রিয় ও শুভ হয়, তার পথ ততই কঠিন ও দীর্ঘ হয়, তাতে অনেক দুর্গম ঘাঁটি থাকে। তোমার এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, এসব বিষয় আকাঙ্ক্ষা দ্বারা অর্জিত হয় এবং অধ্যবসায় ছাড়াই লাভ করা যায়। যার অন্তর্দৃষ্টি এসব পর্যায় দেখার ব্যাপারে অন্ধ, সে কেবল বাহ্যিক পবিত্রতাকেই পবিত্রতা মনে করে। সে একেই লক্ষ্য ও উদ্দিষ্ট মনে করে, এ নিয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে এবং এর পদ্ধতিতে বাড়াবাড়ি করে। সে তার সমস্ত সময় এস্তেঞ্জা, কাপড় ধোয়া, বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত প্রবাহিত পানির সন্ধানে ব্যয় করে দেয়। সে জানে না, পূর্ববর্তী মনীষীগণ তাঁদের সমস্ত শক্তি ও চিন্তা অন্তর পবিত্র করার কাজে ব্যাপৃত রাখতেন এবং বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব প্রদর্শন করতেন না। কাজেই হযরত ওমর (রাঃ) বিশেষ উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও জনৈকা খৃষ্টান মহিলার কলসী থেকে পানি নিয়ে ওযু করেছিলেন। তাঁরা মসজিদে ফরাশ ছাড়া নামায পড়তেন এবং খালি পায়ে পথ চলতেন। যিনি কিছু না বিছিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়তেন, তিনি শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ বলে গণ্য হতেন। তাঁরা কেবল ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করতেন। হযরত আবু হোরায়রা ও অন্যান্য সুফ্‌ফাবাসী সাহাবী বলেন ঃ আমরা ভাজা করা গোশত খেতাম এবং নামাযের তকবীর হয়ে গেলে কংকরের মধ্যে অঙ্গুলি ঘষে নিয়ে নামাযে শরীক হয়ে যেতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে আমরা "উশনান" (সাবান জাতীয় ঘাস) কি জিনিস, জানতাম না। আমাদের পায়ের তলা হত আমাদের রুমাল। চর্বিযুক্ত কিছু খেলে পায়ের তালুতে হাত ঘষে নিতাম। কথিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলের পর প্রথমে চারটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়— চালনি, উশনান, দস্তরখান ও পেট ভরে আহার।

মোট কথা, পূর্ববর্তীদের মনোযোগ কেবল অন্তরের পরিচ্ছন্নতার দিকে ছিল। তাঁদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া উত্তম। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন জুতা খুলে নামায

পড়েছিলেন, যখন জিব্রাঈল (আঃ) এসে জুতার মধ্যে নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁকে জুতা খুলতে দেখে যখন মুসল্লীরাও জুতা খুলতে শুরু করে, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা জুতা খুললে কেন? এসব বাহ্যিক বিষয়সমূহের ব্যাপারে পূর্ববর্তীরাও কড়াকড়ির পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু আজকাল ঔদ্ধত্যের নাম রাখা হয়েছে পরিচ্ছন্নতা। এখন একেই ধর্মের ভিত্তি বলা হয়। অথচ অন্তর অহংকার, আত্মম্ভরিতা, রিয়া ও নেফাকের আবর্জনায় পরিপূর্ণ। এগুলোকে খারাপ মনে করা হয় না। যদি কোন ব্যক্তি কেবল ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করে অথবা খালি পায়ে পথ চলে অথবা মসজিদের মাটিতে জায়নামায ছাড়াই নামায পড়ে, তবে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় এবং তাকে অপবিত্র আখ্যা দেয়া হয়। সোবহানাল্লাহ, বিনয় ও আড়ম্বরহীনতা– যা ঈমানের অঙ্গ, তাকে বলা হয় নাপাকী আর গর্ব ও ঔদ্ধত্যকে বলা হয় পবিত্রতা।

এখানে আমরা কেবল বাহ্যিক পরিত্রতা বর্ণনা করব, যা তিন প্রকার ঃ (১) বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া, (২) হুকমী নাপাকী, যাকে "হদস" (বেওযু অবস্থা) বলা হয়, তা থেকে পাক হওয়া এবং (৩) দেহের উচ্ছিষ্ট থেকে পাক হওয়া।

প্রথম প্রকার– বাহ্যিক নাপাকী থেকে পাক হওয়া প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় দেখতে হবে ঃ (১) যে নাপাকী দূর করা হবে, (২) যে বস্তু দ্বারা দূর করা হবে এবং (৩) যে উপায়ে দূর করা হবে।

প্রথম বিষয়– যে নাপাকী দূর করা হবে তা তিন প্রকার– জড় পদার্থ, অর্থাৎ, নিষ্প্রাণ বস্তু, প্রাণী এবং প্রাণীর অংশ বিশেষ।

জড় পদার্থের মধ্যে শরাব ও নেশার বস্তু ছাড়া সবকিছু পাক। প্রাণীর মধ্যে কুকুর, শূকর ও এতদুভয় থেকে উৎপন্ন বস্তু ছাড়া সব পাক। প্রাণী মারা গেলে পাঁচটি প্রাণী ব্যতীত সব নাপাক। পাঁচটি প্রাণী এই ঃ মানুষ, মাছ, ঝিনুক, শামুকের পোকা (খাদ্যে যেসব পোকা পড়ে, সেগুলো এর মধ্যে দাখিল)। যে প্রাণীর মধ্যে প্রবাহিত রক্ত নেই; যেমন মাছি, এগুলো পানিতে পড়ে গেলে পানি নাপাক হবে না। প্রাণীর অংশ বিশেষ দু'প্রকার– এক, যা প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে গেছে। এর বিধান মৃতের মতই। কিন্তু কেশ আলাদা হলে নাপাক হয় না। অস্থি নাপাক হয়ে যায়। দুই, যে তরল পদার্থ প্রাণীর অভ্যন্তর থেকে বের হয়। এর মধ্যে যেগুলো পরিবর্তিত হয়

না এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে না, সেগুলো পাক; যেমন অশ্রু, ঘর্ম, থুথু। আর যেগুলোর ঠিকানা নির্দিষ্ট এবং পরিবর্তিত হয়, সেগুলো নাপাক; যেমন রক্ত, পুঁজ, পায়খানা, পেশাব সকল প্রাণীরই নাপাক। এসব নাপাকী অল্প হোক কিংবা বেশী, মাফ নেই। কিন্তু পাঁচটি বস্তু অল্প হলে মাফ– (১) ঢিলা দ্বারা এস্তেঞ্জা করার পর যদি নাপাকীর কিছু অংশ থেকে যায় এবং বের হওয়ার স্থান অতিক্রম না করে, তবে মাফ। (২) রাস্তায় চলতে যে কাদা স্বাভাবিকভাবে শরীরে লেগে যায় বা রাস্তার ধুলোবালি হলে মাফ। কিন্তু যতটুকু থেকে বেঁচে থাকা কঠিন, ততটুকু মাফ। (৩) চামড়ার মোজার তলায় যে নাপাকী লেগে যায়, তা ঘষে নেয়ার পর মাফ। (৪) মশা-মাছির রক্ত অল্প হোক কিংবা বেশী, কাপড়ে লেগে গেলে মাফ। (৫) গায়ের রক্ত, পুঁজ ও বদরক্ত মাফ। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) একবার ব্রন ঘষে দেন। তা থেকে রক্ত বের হয়। কিন্তু তিনি তা না ধুয়ে নামায পড়ে নেন। এই পাঁচ প্রকার নাপাকীর ব্যাপারে শরীয়তের শিথিল বিধান থেকে তোমার জানা উচিত যে, পবিত্রতার ব্যাপারটি সহজভিত্তিক। এ সম্পর্কে নতুন যা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা কেবল মনের ভিত্তিহীন কুমন্ত্রণা।

দ্বিতীয় বিষয়– যে বস্তু দ্বারা নাপাকী দূর করা হবে, তা দু'প্রকার ঃ জড় পদার্থ ও তরল পদার্থ। জড় পদার্থ হচ্ছে এস্তেঞ্জার ঢেলা, এটা শুষ্ক করে পাক করে দেয়। এ বস্তুটি শক্ত হওয়া, পবিত্র হওয়া, নাপাকী শুষে নেয়া এবং নিজে হারাম না হওয়া শর্ত। তরল পদার্থের মধ্যে পানি ছাড়া অন্য কোন বস্তু নাপাকী দূর করতে পারে না। সে-ই নাপাকী দূর করে, যে নিজে পাক এবং যা অনাবশ্যক বস্তু মিশ্রিত হওয়ার কারণে বেশী পরিমাণে পরিবর্তিত না হয়ে যায়। যদি পানিতে নাপাকী মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির স্বাদ অথবা রং অথবা গন্ধ বদলে যায়, তবে সেই পানি পাক থাকে না। যদি এই গুণত্রয়ের মধ্যে একটিও পরিবর্তিত না হয়, তবে সেই পানি নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে, পানির পরিমাণ নয় মশক অথবা সোয়া ছয় মণ হলে পানি নাপাক হবে না। কিন্তু প্রবাহিত পানি যদি নাপাকী পড়ার কারণে বদলে যায়, তবে যতটুকু বদলে যায়, ততটুকু নাপাক। এর উজান ও ভাটির পানি নাপাক নয়।

তৃতীয় বিষয়– নাপাকী দূর করার উপায়, যদি নাপাকী এমন হয় যা

দেখা যায় না, তা যেখানে পড়ে, সেখানে পানি ঢেলে দেয়া যথেষ্ট। নাপাকী শরীরবিশিষ্ট হলে তা দূর করা জরুরী। যতক্ষণ তার স্বাদ বাকী থাকবে, ততক্ষণ শরীর বাকী আছে বুঝতে হবে। রং বাকী থাকার অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু রং যদি চিমটে যায় এবং ঘষা দেয়ার পরও না উঠে, তবে মাফ। গন্ধ থাকা নাপাকী বাকী থাকার দলীল। এটা মাফ নয়। মনের কুমন্ত্রণা দূর করার জন্যে মনে করতে হবে যে, সকল বস্তু পবিত্র সৃজিত হয়েছে। অতএব যে কাপড়ের উপর নাপাকী দেখা যায় না এবং নাপাক বলে নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, তা নিয়ে নামায পড়ে নেবে। এখানে নাপাকীর পরিমাণ খোঁজাখুঁজি করার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় প্রকার- হদস থেকে পাক হওয়ার মধ্যে ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে এস্তেঞ্জা।

পায়খানা করার রীতি-নীতিতে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত সেগুলো এই ঃ মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে জঙ্গলে যেতে হবে। সম্ভব হলে কোন কিছুর আড়ালে বসতে হবে। বসার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত গুপ্তস্থান খুলবে না। সূর্য, চন্দ্র ও কেবলার দিকে মুখ করে এবং পিঠ ফিরে বসবে না। মানুষ যেখানে বসে কথাবার্তা বলে, সেখানে পায়খানা পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে। স্থির পানি, ফলন্ত বৃক্ষের নীচে এবং গর্তে প্রস্রাব করবে না। যেদিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে ফিরে প্রস্রাব করবে না। বসার মধ্যে বাম পায়ের উপর জোর দেবে। বাড়ীতে নির্মিত পায়খানায় গেলে ভেতরে যাওয়ার সময় বাম পা প্রথমে রাখবে এবং বাইরে আসার সময় ডান পা প্রথমে বের করবে। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতেন– একথা তোমাকে কেউ বললে তাকে সত্যবাদী মনে করবে না। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে দেখে বললেন ঃ হে ওমর! দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। ওজরবশতঃ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার অনুমতি আছে। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন। আমি তাঁর জন্যে ওযুর পানি আনলে তিনি ওযু করলেন ও মোজার উপর মসেহ করলেন। গোসলের জায়গায় প্রস্রাব করবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মনের অধিকাংশ কুমন্ত্রণা এ থেকেই হয়। ইবনে মোবারক বলেন ঃ প্রবাহিত পানি হলে

তাতে প্রসাব করতে দোষ নেই। পায়খানায় এমন কোন বস্তু সাথে নিয়ে যাবে না যাতে আল্লাহ অথবা তাঁর রসূলের নাম লেখা থাকে। উলঙ্গ মাথায় পায়খানায় যাবে না। পায়খানায় যাওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ الْخَبِيْثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করছি। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই হীন নাপাকী তথা বিতাড়িত শয়তান থেকে।

বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ مَا يُؤْذِيْنِىْ وَاَبْقٰى عَلَىَّ مَا يَنْفَعُنِىْ ـ

অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দিয়েছেন এবং উপকারী বস্তু আমার মধ্যে রেখেছেন। এ দোয়া পায়খানার বাইরে এসে বলতে হবে।

হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সবকিছু শিখিয়েছেন। এমনকি পায়খানা-প্রস্রাবের রীতিনীতি পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে এস্তেঞ্জায় হাড্ডি ও গোবর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং প্রস্রাব-পায়খানায় কেবলার দিকে মুখ করতে বারণ করেছেন।

জনৈক বেদুঈন এক সাহাবীর সাথে ঝগড়া করে বলল, আমি জানি তুমি ভালরূপে পায়খানাও করতে পার না। সাহাবী জওয়াবে বললেন ঃ কেন জানব না? আমি তো এ ব্যাপারে পারদর্শী। আমি পথ থেকে দূরে চলে যাই, ঢেলা ব্যবহার করি, ঝোঁপের দিকে মুখ করি, বাতাসের দিকে পিঠ করি, পায়ের গোড়ালির উপর জোর দেই এবং নিতম্ব উপরে রাখি।

অন্য কোন লোকের কাছে তাকে আড়াল করে প্রস্রাব করাও জায়েয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত লজ্জাশীল ছিলেন। তা সত্ত্বেও উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশে এরূপ করেছেন।

এস্তেঞ্জার নিয়ম হচ্ছে, পায়খানা শেষ হলে পর তিনটি ঢেলা দিয়ে নাপাকী পরিষ্কার করবে। সাফ হয়ে গেলে ভাল, নতুবা চতুর্থ ঢেলা ব্যবহার করবে। অনুরূপভাবে প্রয়োজন হলে পঞ্চম ঢেলা নিতে হবে। কেননা, পাক-সাফ করা ওয়াজেব। তবে বিজোড় সংখ্যক ঢেলা ব্যবহার করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, যে ঢেলা ব্যবহার করে, সে যেন বিজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে। প্রথম ঢেলা বাম হাতে নিয়ে পায়খানার রাস্তার সামনের দিকে রাখবে এবং ঘষে পেছনের দিকে নিয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় ঢেলা নিয়ে পেছনের দিকে রাখবে এবং ঘষে সামনের দিকে আনবে। তৃতীয় ঢেলাটি নিয়ে পায়খানার রাস্তার চারপাশে ঘুরাবে। এরপর একটি বড় ঢেলা ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পুরুষাঙ্গ ধরে মুছে দেবে এবং তিন বার তিন জায়গায় মুছবে। চার ঢেলায় সাফ হয়ে গেলে বিজোড় করার জন্যে পঞ্চম ঢেলা ব্যবহার করবে। এরপর সেই স্থান থেকে সরে অন্যত্র বসে পানি ব্যবহার করবে। ডান হাতে পানি নিয়ে নাপাকীর স্থানে ঢালবে এবং বাম হাতে মুছে দেবে। এস্তেঞ্জা শেষে এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَحَصِّنْ فَرْجِىْ مِنَ الْفَوَاحِشِ -

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে নেফাক থেকে পবিত্র করুন এবং আমার লজ্জাস্থানকে অশ্লীলতা থেকে হেফাযতে রাখুন।

এরপর গন্ধ থেকে গেলে হাত প্রাচীরে অথবা মাটিতে ঘষে ধুয়ে নেবে। এস্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করা মোস্তাহাব।

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ -

অর্থাৎ "ঐ মসজিদে এমন লোক রয়েছে, যারা অধিকতর পবিত্র থাকা পছন্দ করে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।"

বর্ণিত আছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোবা মসজিদের মুসল্লীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা এমন কি পবিত্রতা অর্জন কর, যার জন্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রশংসা করেছেন? তারা

আরজ করল ঃ আমরা এস্তেঞ্জায় ঢেলা ও পানি উভয়টি ব্যবহার করি।

এস্তেঞ্জা সমাপ্ত হলে পর ওযু করবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এরূপ কখনও দেখা যায়নি যে, তিনি প্রস্রাব-পায়খানা শেষে ওযু করেননি। মেসওয়াক দ্বারা ওযু শুরু করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের মুখ কোরআনের পথ। একে মেসওয়াক দ্বারা পরিচ্ছন্ন করে নাও। মেসওয়াক করার সময় নিয়ত করবে, নামায, কোরআন তেলাওয়াত ও যিক্‌রুল্লাহর জন্যে মুখকে পবিত্র করছ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মেসওয়াকের পরের নামায মেসওয়াক ছাড়া পচাত্তর রাকআত নামাযের চেয়ে উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ

لولا اشق على امتى لامرتهم بالسواك عند كل صلوة -

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের জন্যে কঠিন হবে, এরূপ আশংকা না থাকলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"

রসূলে করীম (সাঃ) রাত্রে কয়েক বার মেসওয়াক করতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে সব সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতেন। এমনকি, আমাদের ধারণা হল যে, এ সম্পর্কে বোধ হয় তাঁর প্রতি সত্বরই কোন আয়াত নাযিল হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ মেসওয়াক জরুরী করে নাও। এটা মুখ পরিষ্কার করে এবং এতে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মেসওয়াক স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে এবং শ্লেষ্মা দূর করে। দাঁতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে মেসওয়াক করবে। একদিকে করলে তা প্রস্থে করবে। প্রত্যেক নামায ও ওযুর সময় মেসওয়াক করবে, যদিও ওযুর পরে নামায পড়া না হয়। নিদ্রা অথবা অনেকক্ষণ ঠোঁট বন্ধ রাখা অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হলে মেসওয়াক করবে।

মেসওয়াক শেষ হলে পর ওযুর জন্যে কেবলামুখী হয়ে বসবে এবং "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে বিসমিল্লাহ বলে না, তার ওযু হয় না, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু হয় না। অতঃপর বলবে ঃ

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ "হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার কাছে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় চাই এবং হে পরওয়ারদেগার! আমার কাছে শয়তানদের আগমন থেকে আপনার আশ্রয় চাই।"

এর পর পানির পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বে কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করবে এবং বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْيُمْنَ وَالْبَرَكَةَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشُّؤْمِ وَالْهَيْبَةِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে বরকত চাই এবং অমঙ্গল ও ধ্বংস থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

এর পর হদস দূর করার এবং এই ওযু দ্বারা নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে। মুখ ধোয়া পর্যন্ত এই নিয়ত বাকী রাখবে। মুখ ধোয়ার সময় পর্যন্ত ওযুর কথা ভুলে গেলে ওযু পূর্ণ হয় না। এর পর মুখের জন্যে অঞ্জলিতে পানি নেবে এবং তিন বার কুলি ও গরগরা করবে। রোযাদার হলে গরগরা করবে না। এরপর এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আপনার কিতাব তেলাওয়াত এবং আপনার অধিক যিকির করার কাজে আমাকে সাহায্য করুন।"

এরপর নাকের জন্যে অঞ্জলি ভরবে এবং তিন বার নাকে পানি দিয়ে শ্বাস টেনে নাকের ছিদ্রের ভেতর নিয়ে যাবে। এরপর পানি বের করে দেবে। নাকে পানি দেয়ার সময় এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَرِحْنِىْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِّىْ رَاضٍ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ শুঁকতে দিন এমতাবস্থায় যে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট।

নাক ঝাড়ার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ وَمِنْ سُوْءِ الدَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দোযখের দুর্গন্ধ থেকে আশ্রয় চাই এবং মন্দ গৃহ থেকে।

এরপর মুখমণ্ডলের জন্যে পানি নেবে এবং কপালে চুল উঠার জায়গা থেকে চিবুক পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত প্রস্থে তিন বার ধৌত করবে। কপালের যে দুই প্রান্ত চুল উঠে ভেতরে চলে যায়, তা মুখমণ্ডলের সীমার মধ্যে দাখিল নয়; বরং তা মাথার অন্তর্ভুক্ত। কানের উভয় লতির উপরও পানি পৌছানো উচিত। ভ্রূ, গোঁফ, গুচ্ছ ও পলক এই চার প্রকার চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো উচিত। কেননা, এগুলো অধিকাংশ লোকের অল্পই হয়। দাড়ি পাতলা হলে গোড়ায় পানি পৌছাতে হবে। পাতলা হওয়ার আলামত হচ্ছে ত্বক দৃষ্টিগোচর হওয়া। পক্ষান্তরে ঘন দাড়ি হলে গোড়ায় পানি পৌছানো জরুরী নয়। চক্ষু অঙ্গুলি দ্বারা সাফ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। চক্ষু সাফ করার সময় নিয়ত করবে যেন, এতে চক্ষুর গোনাহ দূর হয়ে যাবে। এমনিভাবে সকল অঙ্গ ধোয়ার সময় প্রত্যাশা করবে। মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِىْ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ اَوْلِيَائِكَ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِىْ بِظُلُمَاتِكَ يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوْهُ اَعْدَائِكَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার নূর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময় করুন, যেদিন আপনার ওলীদের মুখ জ্যোতির্ময় হবে এবং অন্ধকার দ্বারা আমার মুখ কালো করবেন না যেদিন আপনার শত্রুদের মুখ কাল হবে।

মুখ ধৌত করার সময় ঘন দাড়িতে খেলাল করা মোস্তাহাব। এরপর দুই কনুই পর্যন্ত উভয় হাত তিন বার ধৌত করবে। আংটি থাকলে তা নাড়াচাড়া করবে। পানি কনুইর উপর পর্যন্ত পৌছাবে। কেননা,

কেয়ামতের দিন ওযুকারীদের হাত, পা, মুখমণ্ডল ওযুর চিহ্নস্বরূপ উজ্জ্বল হবে। অতএব যত দূরে পানি পৌঁছবে, ততদূর পর্যন্তই উজ্জ্বল হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من استطاع ان يطيل غرته فليفعل যে তার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম, সে যেন তা করে।

এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ـ

অর্থাৎ, "ঈমানদারের অলংকার সেই স্থান পর্যন্ত পৌঁছবে যে পর্যন্ত ওযু পৌঁছবে।" প্রথমে ডান হাত ধৌত করবে এবং বলবে–

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ وَحَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিন এবং আমার হিসাব সহজ করুন। বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تُعْطِيْنِىْ كِتَابِىْ بِشِمَالِىْ اَوْ مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِىْ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার বাম হাতে অথবা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই।

অতঃপর সমস্ত মাথা মাসেহ্ করবে। উভয় হাত ভিজিয়ে উভয় হাতের অঙ্গুলির মাথা মিলিয়ে নেবে, এরপর কপালের কাছে মাথায় রেখে ঘাড়ের দিকে নিয়ে যাবে এবং সেখান থেকে আবার সামনের দিকে টেনে আনবে। এটা হল এক মাসেহ। অনুরূপভাবে তিন বার মাসেহ্ করবে। অতঃপর বলবে–

اَللّٰهُمَّ غَشِّنِىْ بِرَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَىَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَاَظِلَّنِىْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ ـ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আবৃত করে নিন, আমার প্রতি বরকত নাযিল করুন এবং আমাকে আপনার আরশের

ছায়াতলে স্থান দিন। যেদিন আপনার ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না।”

এর পর উভয় কান ভিতরে ও বাইরে মাসেহ করবে। শাহাদতের উভয় অঙ্গুলি কানের ছিদ্রে ঢুকিয়ে উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের বাইরের দিকে ঘুরাবে। এ সময় বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اَللّٰهُمَّ اَسْمِعْنِىْ مُنَادِىَ الْجَنَّةِ مَعَ الْاَبْرَارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের একজন করুন যারা কথা শুনে, অতঃপর উত্তম কথার অনুসরণ করে। হে আল্লাহ, আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে জান্নাতের ঘোষকের আওয়াজ শুনান।

এর পর ঘাড় মাসেহ্ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ঘাড়ের মাসেহ কেয়ামতের দিন বেড়ি থেকে রক্ষা করে। এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে—

اَللّٰهُمَّ فُكَّ رَقَبَتِىْ مِنَ النَّارِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ ـ

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ! আমার ঘাড়কে দোযখ থেকে মুক্ত করুন। আমি আপনার কাছে শিকল ও বেড়ি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।”

এর পর ডান পা ধৌত করবে এবং বাম হাতে পায়ের অঙ্গুলির নীচের দিক থেকে খেলাল করবে। এ সময় এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ يَوْمَ تَزِلُّ الْاَقْدَامُ فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ, “হে আল্লাহ্! আমার পা সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখুন, যেদিন দোযখে মানুষের পদস্খলন ঘটবে।” বাম পা ধৌত করার সময় বলবে—

اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَزِلَّ قَدَمِىْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ اَقْدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই পুলসেরাতে আমার পদস্খলন থেকে, যেদিন জাহান্নামে মোনাফেকদের পদস্খলন ঘটবে।”

পা ধোয়া শেষ হলে আকাশের দিকে মুখ তুলবে এবং বলবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَمِلْتُ سُوْءً وَّظَلَمْتُ نَفْسِىْ اَسْتَغْفِرُكَ اَللّٰهُمَّ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ فَاغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ عَبْدًا شَكُوْرًا صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ اَذْكُرُكَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَاُسَبِّحُكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ـ

অর্থাৎ, “আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! সপ্রশংস পবিত্রতা। কোন মা'বুদ নেই আপনি ছাড়া। আমি মন্দ কাজ করেছি এবং নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে তওবা করি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী দয়ালু। হে আল্লাহ,! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত করুন, আমাকে সংকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীল বান্দায় পরিণত করুন এবং এমন করুন, যেন আমি আপনার অনেক যিকির করি এবং সকাল-সন্ধ্যায়

আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি।

কথিত আছে, যেব্যক্তি ওযুর পর এই দোয়া পড়ে, তার ওযুর উপর মোহর এঁটে আরশের নীচে পৌঁছে দেয়া হয়। সেখানে এই ওযু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে। তার সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত এ ব্যক্তির জন্যে লেখা হয়।

ওযুর মধ্যে কয়েকটি বিষয় মাকরূহ– (১) তিন বারের বেশী ধৌত করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার ধৌত করেছেন এবং বলেছেন ঃ যে বেশী বার ধৌত করে, সে জুলুম করে এবং মন্দ কাজ করে। তিনি আরও বলেন ঃ সত্বরই এ উম্মতের মধ্যে এমন লোকের উদ্ভব হবে, যারা দোয়া ও ওযুর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করবে। কথিত আছে, ওযুর মধ্যে বেশী পানির লোভ মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতার লক্ষণ। ইবরাহীম ইবনে আদহাম বলেন ঃ কুমন্ত্রণার সূচনা প্রথমে পবিত্রতা থেকেই হয়েছে। হযরত হাসান বলেন ঃ এক শয়তান ওযুর মধ্যে মানুষের প্রতি হাসে। এই শয়তানের নাম "ওয়ালহান।" (২) পানি দূর হয়ে যাওয়ার জন্যে হাত ঝাড়া দেয়া। (৩) ওযুর মধ্যে কথা বলা। (৪) মুখে চপেটাঘাতের মত করে পানি নিক্ষেপ করা। (৫) কেউ কেউ ওযুর পানি শরীর থেকে মুছে শুকানোকেও মাকরূহ বলেছেন। কেননা, এ পানি আমলনামার পাল্লায় ওজন করা হবে। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব এবং যুহরী একথা বলেন। কিন্তু হযরত মুয়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাপড়ের প্রান্ত দ্বারা মুখমণ্ডল থেকে ওযুর পানি মুছেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি পানি শুকানোর কাপড় থাকত। (৬) কাঁসার পাত্র থেকে ওযু করা। (৭) রৌদ্রে উত্তপ্ত পানি দ্বারা ওযু করা।

ওযু শেষে নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করবে, আমার বাহ্যিক অঙ্গ যা মানুষ দেখে, তা পাক হয়ে গেছে। এখন অন্তর পবিত্র না করে আল্লাহর সাথে কথা বলা বড়ই লজ্জার বিষয়। অন্তর আল্লাহ দেখেন। এর পর অন্তর পাক করা, কুচরিত্র থেকে পবিত্র হওয়া এবং সচ্চরিত্রে ভূষিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করবে। যেব্যক্তি কেবল বাহ্যিক অঙ্গ পবিত্র করাকেই যথেষ্ট মনে করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে বাদশাহকে গৃহে দাওয়াত করার পর গৃহাভ্যন্তর আবর্জনা ও ময়লাযুক্ত রেখে কেবল বাইরে চুনার লেপ দেয়। বলাবাহুল্য, এরূপ ব্যক্তি বাদশাহের বিরাগভাজনই হবে।

ওযুর ফযীলত

ওযুর ফযীলত সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হল–

من توضا فاحسن الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما بشئى من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه .

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ওযু করে এবং সুন্দরভাবে ওযু করে, অতঃপর দুনিয়ার কোন কথা অন্তরে চিন্তা না করে দু'রাকআত নামায পড়ে, সে তার গোনাহ থেকে এমন নিষ্কৃতি পায়, যেমন সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন নিষ্পাপ ছিল।

الا انبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء فى المكاره ونقل الاقدام الى المساجد وانتظار الصلوة بعد الصلوة فذالكم الرباط .

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে কি এমন বিষয় বলব না, যদ্দ্বারা আল্লাহ তাআলা গোনাহ মার্জনা এবং মর্যাদা উঁচু করেন? তা হল, মনে চায় না এমন সময়ে পূর্ণরূপে ওযু করা, মসজিদের দিকে পা বাড়ানো এবং এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। এটা যেন আল্লাহর পথে জেহাদ করার জন্যে ঘোড়া প্রস্তুত রাখা।" শেষ বাক্যটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন বার বললেন।

একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওযু করলেন এবং এক একবার অঙ্গসমূহ ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন ঃ এটি এমন ওযু, যা ছাড়া আল্লাহ তাআলা নামায কবুল করেন না। এর পর তিনি দু'দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করলেন এবং বললেন ঃ যেব্যক্তি দু'দু'বার অঙ্গ ধৌত করে ওযু করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দু'বার সওয়াব দেবেন। অতঃপর তিনি তিন তিন বার অঙ্গ ধৌত করলেন এবং বললেন ঃ এটা আমার ওযু, আমার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের ওযু এবং আল্লাহর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ওযু। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযুর মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ

তার সমস্ত দেহ পাক করে দেন। আর যে স্মরণ না করে, তার দেহ কেবল পানি পৌঁছা পরিমাণ পাক হবে।

من توضا على طهر كتب الله به عشر حسنات ـ

অর্থাৎ, "যেব্যক্তি ওযুর উপর ওযু করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে দশটি সওয়াব লেখেন।"

الوضوء على الوضوء نور على نور ـ

অর্থাৎ "ওযুর উপর ওযু যেন নূরের উপর নূর।"

এ রেওয়ায়েতদ্বয় থেকে নতুন ওযুর উৎসাহ পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা ওযু করে এবং কুলি করে তখন গোনাহ তার মুখ থেকে বের হয়ে যায়। যখন নাক সাফ করে, তখন নাক থেকে গোনাহ বের হয়; যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন মুখমণ্ডল থেকে গোনাহ দূর হয়; এমনকি চোখের পলকের নীচ থেকে গোনাহ বের হয়ে যায়। যখন হাত ধৌত করে, তখন হাত থেকে গোনাহ দূর হয়। এমনকি নখের নীচ থেকেও দূর হয়। যখন মাথা মাসেহ করে, তখন মাথা থেকে কান পর্যন্তের গোনাহ বের হয়ে যায়। এর পর যখন পা ধৌত করে, তখন উভয় পায়ের গোনাহ নখের নীচ থেকে পর্যন্ত দূর হয়ে যায়। এর পর তার মসজিদে গমন ও নামায পড়া উভয়টি অতিরিক্ত থাকে। বর্ণিত আছে– ওযুওয়ালা ব্যক্তি রোযাদারের মত। যেব্যক্তি ওযু করে এবং ভালরূপে করে, এর পর আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বলে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

তার জন্যে জান্নাতের দরজা খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ উত্তম ওযু তোমা থেকে শয়তানকে দূর করে দেবে। মুজাহিদ বলেন ঃ যে করতে পারে, সে এটা করুক– নিদ্রা যাওয়ার সময় ওযু অবস্থায় যিকির করে ও এস্তেগফার পাঠ করে নিদ্রা যাবে। কেননা, আত্মা সেই অবস্থায় উত্থিত হবে যে অবস্থায় তাকে কবজ করা হবে।

গোসল

গোসলের নিয়ম হল, পানির পাত্রটি ডান পাশে রাখবে। প্রথমে বিসমিল্লাহ বলে হাত তিন বার ধৌত করবে। এর পর শরীরে নাপাকী থাকলে তা ধুয়ে নেবে। অতঃপর নামাযের মত ওযু করবে। কিন্তু তখন পা না ধুয়ে গোসলের শেষে পা ধৌত করবে। ওযু শেষ হলে তিন বার ডান কাঁধের উপর নীচ পর্যন্ত পানি ঢালবে। এর পর বাম কাঁধে তিন বার, মাথায় তিন বার পানি ঢালবে। অতঃপর শরীর সামনে ও পশ্চাদ্দিকে ঘষে দেবে। চুল ও দাড়ি খেলাল করবে। চুল ঘন হোক কিংবা পাতলা— গোড়ায় পানি পৌছাবে। মহিলাদের কেশের গোড়ায় পানি পৌছবে না বলে আশংকা হলে বিনুনি খুলতে হবে, নতুবা নয়। দেহের ভাঁজের ভেতরে পানি পৌছল কিনা দেখতে হবে। এভাবে ওযু করে গোসল করলে গোসলের পর পুনরায় ওযু করতে হবে না। আধ্যাত্ম পথের পথিকদের জন্যে ওযু গোসল সম্পর্কে এতটুকু জানা ও করা জরুরী। মাঝে মাঝে অন্য যেসব বিষয় জানার প্রয়োজন হয়, সেগুলো ফেকাহ্র কিতাবসমূহে দেখে নেয়া উচিত। গোসলের এসব বিষয়ের মধ্যে দু'টি বিষয় ওয়াজেব— নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি পৌছানো।

গোসল চার কারণে ওয়াজেব হয়— বীর্যপাতের কারণে, স্ত্রী সহবাসের কারণে, হায়েযের পরে এবং নেফাসের পরে। এছাড়া অন্য সকল গোসল সুন্নত। যেমন, ঈদের দিনে গোসল, এহরামের জন্যে, আরাফাত অথবা মুযদালেফায় অবস্থানের জন্যে, মক্কায় প্রবেশ করার জন্যে এবং আইয়ামে তাশরীকের তিন দিনের গোসল। এক উক্তি অনুযায়ী বিদায়ী তওয়াফের জন্যে গোসল করা, কাফের নাপাক না হলেও মুসলমান হওয়ার সময় গোসল করা, পাগলের জ্ঞান ফিরে আসার সময় গোসল করা এবং মৃতকে গোসল দেয়ার পর গোসলদাতা গোসল করা মোস্তাহাব।

তায়াম্মুম

পানি পাওয়া না গেলে অথবা হিংস্র জন্তু কিংবা শত্রুর ভয়ে পানি পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম না হলে অথবা শরীরে কোন ক্ষত থাকলে কিংবা রোগাক্রান্ত হলে এবং পানির ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

তায়াম্মুমের নিয়ম হচ্ছে, পাক ও নরম মাটির উপর উভয় হাতের অঙ্গুলি মিলিয়ে থাবা মারবে। এর পর উভয় হাত মুখমণ্ডলের উপর মালিশ করবে। তখন নামায বৈধ হওয়ার নিয়ত করবে। মুখমণ্ডলের সকল অংশে ধুলা পৌঁছাতে হবে। এরপর মাটির উপর দ্বিতীয় থাবা মারবে। অতঃপর ডান হাতের চার অঙ্গুলি পরস্পর মিলিয়ে বাম হাতের চার অঙ্গুলির উপর এভাবে রাখবে যে, বাম অঙ্গুলির ভিতরের দিক এবং ডান অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশ পরস্পর সংযুক্ত হবে। এর পর বাম হাতের চার অঙ্গুলিকে ডান হাতের পিঠের দিক দিয়ে কনুই পর্যন্ত ঘষতে ঘষতে নিয়ে যাবে। এতে হাতের তালু সংযুক্ত হবে না। কনুই পর্যন্ত পৌঁছার পর বাম হাতের তালু ডান হাতের ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে কব্জি পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং বাম অঙ্গুলির ভেতরের দিক দিয়ে ডান বৃদ্ধাঙ্গুলির বাইরের দিকে মাসেহ্ করবে। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর অনুরূপ আমল করবে। দু'থাবা দ্বারা হাতের সমস্ত অংশে ধুলা পৌঁছানো সম্ভব না হলে অধিক থাবা দেয়ায় দোষ নেই।

তৃতীয় প্রকার শরীরের বাহ্যিক আবর্জনা ও ময়লা ঃ আবর্জনা দু'প্রকার– ময়লা ও অতিরিক্ত অংশবিশেষ।

মানুষের মধ্যকার ময়লা আটটি ঃ (১) মাথার কেশের ময়লা ও উকুন। এগুলো ধোয়া, চিরুনি করা ও তেল দেয়ার মাধ্যমে পরিষ্কার করা মোস্তাহাব, যাতে কেশের এলোমেলো অবস্থা ও চেহারার আতংকভাব দূর হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝে মাঝে চুলে তেল দিতেন ও চিরুনি করতেন। তিনি মাঝে মাঝে তেল দেয়ার আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার চুল আছে, তার উচিত চুলের পরিচর্যা করা। অর্থাৎ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার দাড়ি ছিল বিক্ষিপ্ত এলোমেলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ চুল পরিপাটি করার জন্যে তোমার কাছে কি তেল ছিল না? এরপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ শয়তানের রূপ ধরে আগমন করে।

(২) কানের প্যাঁচে জমা ময়লা। এর মধ্যে যা উপরে থাকে তা মাসেহ দ্বারা দূর হয়ে যায়।

(৩) নাকের ভিতর জমাট ও শুকিয়ে যাওয়া তরল পদার্থ। নাকে পানি দিয়ে হাঁচি দিলে এগুলো দূর হয়ে যায়।

(৪) দাঁত ও জিহ্বার কিনারার ময়লা। এটা কুলি ও মেসওয়াক করলে দূর হয়।

(৫) দাড়ি পরিপাটি না করলে তাতে ময়লা ও উকুন জমা হয়ে যায়। এগুলো ধৌত ও চিরুনি করে দূর করা মোস্তাহাব। হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা সফরে ও গৃহে চিরুনি, দাঁতের মাজন ও আয়না সঙ্গে রাখতেন। এটা আরবদের সাধারণ রীতি। অন্য এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিনে দু'বার দাড়িতে চিরুনি করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাড়ি ঘন ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দাড়িও তেমনি ছিল। হযরত ওসমান (রাঃ)-এর দাড়ি দীর্ঘ ও পাতলা ছিল এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর দাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল এবং উভয় কাঁধ আবৃত করে রাখত। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ কিছু লোক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরজায় এসে সমবেত হলে তিনি তাদের কাছে যেতে মনস্থ করলেন। আমি দেখলাম, তিনি পানির মটকায় উঁকি মেরে চুল ও দাড়ি পরিপাটি করে নিলেন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এ কাজ করলেন কেন? তিনি বললেন ঃ "হাঁ, আল্লাহ তাআলা এটা পছন্দ করেন যে, বান্দা যখন তার ভাইদের কাছে যাবে তখন সেজেগুজে যাবে।" মূর্খরা কখনও ধারণা করে, এটা লোক দেখানো সাজসজ্জার প্রতি মহব্বত, যা প্রশংসনীয় নয়। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্রকে অন্যের চরিত্রের মত মনে করে। অথচ এরূপ নয়। কেননা, তিনি দাওয়াতের কাজে আদিষ্ট ছিলেন। কাজেই মানুষের অন্তরে নিজেকে বড় করার চেষ্টা করা তাঁর জন্যে অপরিহার্য ছিল, যাতে তারা তাঁকে নিকৃষ্ট ও হেয় মনে না করে। তিনি যদি সেজেগুজে ও পরিপাটি হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত না হতেন, তবে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যেতেন এবং মানুষ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যেত; মোনাফেকেরা কুধারণা করার সুযোগ পেত। মানুষকে দাওয়াত দেয়ার কাজে নিয়োজিত প্রত্যেক আলেমের উচিত ওয়াজ করার সময় নিজের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং এমন কোন অবস্থা প্রকাশ না করা, যাতে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। মোট কথা, এ বিষয়টি নিয়তের উপর ভিত্তিশীল। উল্লিখিত বিষয়ের নিয়তে সাজসজ্জা করা ভাল। আর যদি এই উদ্দেশে চুল এলামেলো রাখে যে, মানুষ তাকে দরবেশ মনে করবে, তবে এটা নিষিদ্ধ। যদি চুল পরিপাটি করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান পালনে মশগুল হওয়ার কারণে চুল পরিপাটি না

করে, তবে তা মন্দ নয়। এগুলো বান্দা ও আল্লাহ তাআলার মধ্যবর্তী বাতেনী অবস্থা। কেয়ামতে যখন বাতেনের পরীক্ষা নেয়া হবে, তখন নিয়তের সত্য মিথ্যা ফুটে উঠবে। আমরা সেদিনের লজ্জা থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

(৬) অঙ্গুলির উপর ভাঁজের মধ্যে যে ময়লা জমা হয়, আরবরা তা খুব ধৌত করত। কেননা, তারা আহারের পর হাত ধৌত করত না। ফলে এসব ভাঁজের মধ্যে ময়লা থেকে যেত। তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসব স্থান ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন।

(৭) অঙ্গুলির অগ্রভাগে নখের ময়লা দূর করার আদেশ রসূলুল্লাহ (সাঃ) দিয়েছেন। কারণ, সব সময় নখ কাটা সম্ভবপর নয় বিধায় নখের নীচে ময়লা জমে যায়। এজন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটা, বগল ও নাভির নীচের লোম দূর করার জন্যে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার ওহী অবতরণে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। এর পর জিব্রাঈল (আঃ) এসে আরজ করলেন ঃ আপনি অঙ্গুলির মধ্যবর্তী ভাঁজ ধৌত করেন না, নখের ময়লা পরিষ্কার করেন না এবং দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্যে মেসওয়াক করেন না, এমতাবস্থায় আমি আপনার কাছে কিরূপে আসতে পারি? আপনি উম্মতকে এসব কাজ করতে বলে দিন! কতক আলেম فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ (পিতামাতাকে উফ্ বলো না) আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ 'উফ্' নখের ময়লাকে এবং তুফ কানের ময়লাকে বলা হয়। আয়াতের অর্থ, পিতামাতাকে নখের ময়লার সমান গণ্য করো না। কেউ কেউ বলেন ঃ তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দিও না যতটুকু কষ্ট নখের নীচে ময়লা জমে গেলে হয়।

(৮) সমস্ত শরীরে ঘর্ম ও পথের ধুলাবালি থেকে যে ময়লা জমে, এটা গরম পানি দ্বারা গোসল করে দূর করা যায়। হাম্মামে গোসল করায়ও কোন দোষ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণও সিরিয়ার হাম্মামসমূহে গোসল করেছেন। হযরত আবু দারদা ও আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ হাম্মাম ভাল জায়গা, শরীর পবিত্র করে এবং জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার কারও মতে হাম্মাম মন্দ জায়গা, উলঙ্গতা প্রকাশ করে এবং লজ্জা-শরম দূর করে। সত্য কথা,

হাম্মামের অশুভ ক্রিয়াকলাপ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এর উপকারিতা লাভ করার মধ্যে কোন দোষ নেই।

মানুষের শরীরের অতিরিক্ত অংশ আটটি । এগুলো দূর করা উচিত।

(১) মাথার চুল। যেব্যক্তি পরিচ্ছন্নতা কামনা করে, তার উচিত মাথার চুল মুণ্ডন করা। আর যেব্যক্তি তেল দেয় ও চিরুনি করে, সে তা রেখে দিতে পারে। কিন্তু মাথার কোথাও চুল রাখা এবং কোথাও না রাখা, যেমন টিকি রাখা– এটা জায়েয নয়। এটা দুশ্চরিত্রদের রীতি।

(২) গোঁফের চুল। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

قصوا الشوارب واعفوا اللحى .

গোঁফ কাট এবং দাড়ি ছেড়ে দাও। এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

جزوا الشوارب حفوا الشوارب .

এর অর্থ, গোঁফ ঠোঁটের উপর পর্যন্ত কেটে নাও। গোঁফ মুণ্ডন করার কথা কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। তবে মুণ্ডনের কাছাকাছি করে কাটা সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত আছে। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গোঁফ লম্বা দেখে বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি আমার ঠোঁটের উপর মেসওয়াক রেখে গোঁফ কেটে দিলেন। গোঁফের দুই প্রান্তের চুল রেখে দেয়ায় দোষ নেই। হযরত ওমর প্রমুখ সাহাবী এরূপ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এর চুল মুখ ঢেকে রাখে না এবং পানীয় বস্তুও তাকে স্পর্শ করে না।

দাড়ি ছেড়ে দেয়ার মানে লম্বা হতে দেয়া। হাদীসে বলা হয়েছে– ইহুদীরা গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি কাটে। তোমরা তাদের বিপরীত কর। কোন কোন আলেম দাড়ি মুণ্ডন মাকরূহ ও বেদআত বলেছেন।

(৩) বগলের চুল। এটা চল্লিশ দিনে একবার উপড়ে ফেলা মোস্তাহাব। যেব্যক্তি শুরুতে উপড়ানোর অভ্যাস করে, তার জন্যে এটা সহজ। কিন্তু মুণ্ডন করার অভ্যাস হলে মুণ্ডনও যথেষ্ট। উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা এবং ময়লা জমতে না দেয়া।

(৪) নাভির নীচের চুল। এগুলো লোমনাশক ব্যবহার করে অথবা উপড়ে দূর করা মোস্তাহাব। এ কাজে চল্লিশ দিনের বেশী অতিবাহিত হতে না দেয়া উচিত।

(৫) নখ কাটা। নখ বেড়ে গেলে দেখতে খারাপ দেখায় এবং তার নীচে ময়লা জমে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আবু হোরায়রা, নখ কেটে ফেল। যে নখ বেড়ে যায় তাতে শয়তান বসে। নখের নীচে যে যৎসামান্য ময়লা থাকে। তা ওযুর বিশুদ্ধতায় প্রতিবন্ধক হয় না। কেননা, এ ময়লা পানি পৌঁছার পথে বাধা হয় না। অথবা প্রয়োজনের কারণে এ বিষয়টি সহজ করে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নখ কাটার আদেশ দিতেন এবং ময়লাকে খারাপ বলতেন, কিন্তু কখনও নামায পুনর্বার পড়ার আদেশ দিতেন না। নখ কাটার ক্রম সম্পর্কে কোন হাদীস পাইনি। কিন্তু শুনেছি, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি থেকে শুরু করতেন, এর পর তার ডান দিকের তিন অঙ্গুলির নখ কেটে বাঁ হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলি থেকে শুরু করে বৃদ্ধাঙ্গুলি পর্যন্ত পৌঁছতেন। এর পর সকলের শেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ কাটতেন। এ সম্পর্কে চিন্তা করার পর আমার কাছে এ রেওয়ায়েতটি সহীহ মনে হল। কেননা, এমন যুক্তিপূর্ণ বিষয় নবুওতের নূর ছাড়া জানা যায় না।

(৭) নাভি কাটা ও খতনা (লিঙ্গাগ্রের চর্মচ্ছেদন) করা। জন্মের সময় নাভি কাটা হয়। খতনা সম্পর্কে ইহুদীদের অভ্যাস হচ্ছে জন্মের সপ্তম দিনে করা। এ ব্যাপারে তাদের বিরোধিতা করা এবং সামনের দাঁত গজানো পর্যন্ত বিলম্বিত করা মোস্তাহাব। এটা বিপদাশংকা থেকেও মুক্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ খতনা করা পুরুষের জন্যে সুন্নত এবং নারীদের জন্যে ইজ্জত।

(৮) দাড়ি লম্বা হয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কিত সুন্নত ও বেদআতসমূহ উল্লেখ করার জন্যে আমরা এটা সব শেষে বর্ণনা করছি। দাড়ি লম্বা হয়ে গেলে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, এক মুষ্টি পরিমাণ রেখে বাকীটা কেটে ফেলায় কোন দোষ নেই। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ও অনেক তাবেয়ী এরূপ করেছেন। শা'বী ও ইবনে সিরীন (রহঃ) এটা উত্তম মনে করেছেন। কিন্তু হাসান ও কাতাদা মাকরূহ বলেছেন। তাঁরা বলেন, দাড়ি লম্বা থাকতে দেয়া মোস্তাহাব। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাড়ি লম্বা করতে বলেছেন। নখয়ী বলেন ঃ বুদ্ধিমান ব্যক্তি লম্বা দাড়ি রাখলে তা ছাঁটে না কেন? এটা আমার কাছে বিস্ময়কর। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মধ্যবর্তী স্তর ভাল। এজন্যই বলা হয়, দাড়ি লম্বা হলে বুদ্ধি লোপ পায়।

দাড়ির মধ্যে দশটি বিষয় মাকরূহ। তন্মধ্যে কয়েকটি অন্যগুলো অপেক্ষা অধিক মাকরূহ।

প্রথম, কাল রং দ্বারা দাড়ি খেজাব করা। এটা নিষিদ্ধ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের যুবকদের মধ্যে তারা উত্তম যারা বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করে এবং তোমাদের বৃদ্ধদের মধ্যে তারা অধম, যারা যুবকদের বেশ ধারণ করে। বৃদ্ধদের বেশ ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, গাম্ভীর্য ও ভদ্রতায় বৃদ্ধের মত হবে– তাদের মত চুল সাদা করা নয়। আর যুবকদের বেশ ধারণ করার উদ্দেশ্য কাল রংয়ের খেজাব করা। হাদীসে একে দোযখীদের খেজাব বলা হয়েছে। অন্য এক রেওয়ায়েতে কাফেরদের খেজাব বলা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এক ব্যক্তি বিয়ে করল। সে কাল খেজাব করত। চুলের গোড়া সাদা হয়ে গেলে তার বার্ধক্য বেরিয়ে পড়ে। স্ত্রীর আত্মীয়রা এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ)-এর কাছে এ মোকদ্দমা পেশ করলে তিনি তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দিলেন এবং স্বামীকে খুব প্রহার করে বললেন ঃ তুই বার্ধক্য গোপন করে তাদেরকে প্রতারিত করেছিস। কথিত আছে, অভিশপ্ত ফেরআউন সর্বপ্রথম কাল খেজাব করেছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক কবুতরের পুচ্ছের মত কাল খেজাব করবে। তারা জান্নাতের গন্ধও পাবে না।

দ্বিতীয়, হলুদ ও লাল রং দ্বারা খেজাব করা। এটা যুদ্ধে কাফেরদের কাছে বার্ধক্য গোপন করার উদ্দেশে জায়েয। আর যদি দ্বীনদারদের বেশ ধারণ করার নিয়তে হয়, অথচ দ্বীনদার না হয় তবে নাজায়েয। এ খেজাব সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ হলদে রং মুসলমানদের খেজাব এবং লাল রং ঈমানদারদের খেজাব। আগেকার লোকেরা মেহদী দ্বারা লাল রংয়ের খেজাব করত এবং খলুক ও কতম দ্বারা হলুদ রংয়ের খেজাব করত। কোন কোন আলেম জেহাদের জন্যে কাল খেজাবও করেছেন। নিয়ত ঠিক হলে এবং খেয়াল-খুশী ও কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা উদ্দেশ্য না হলে কাল খেজাবেও কোন দোষ নেই।

তৃতীয়, গন্ধক দ্বারা চুল সাদা করা, যাতে বয়স বেশী মনে হয় এবং মানুষ সম্মান করে। বয়স বেশী হওয়া মাহাত্ম্যের পরিচায়ক বলে গণ্য হয়। অথচ আসলে এরূপ নয়। মূর্খের বয়োবৃদ্ধিতে মূর্খতাই বৃদ্ধি পায়। এলেম বৃদ্ধির ফল, যা জন্মগত, এতে বার্ধক্য কোন প্রভাব বিস্তার করে না। হযরত ওমর (রাঃ) কম বয়সী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বড় বড়

সাহাবীগণের উপর অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখতেন, যা অন্যদের কাছে রাখতেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ তাআলা বান্দাকে যৌবনেই এলেম দান করেন এবং যৌবনের মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। অতঃপর তিনি এই আয়াতসমূহ পাঠ করেন–

قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ -

অর্থাৎ, "কাফেররা বলল ঃ আমরা এক যুবককে এই উপাস্যদের সমালোচনা করতে শুনেছি। তার নাম ইব্রাহীম।"

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى -

অর্থাৎ, তারা কতিপয় যুবক, যারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দিয়েছি।

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا -

অর্থাৎ, "আমি তাকে শৈশবে শাসনক্ষমতা দিয়েছি।"

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন ওফাত পান, তখন তাঁর দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা ছিল না। লোকেরা বয়স বেশী হওয়া সত্ত্বেও এরূপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বার্ধক্যের দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। আবার প্রশ্ন করা হল ঃ বার্ধক্য কি সত্যই একটি দোষ? তিনি বললেন ঃ তোমরা তো দোষই মনে কর। কথিত আছে, ইয়াহ্ইয়া ইবনে আকসাম একুশ বছর বয়সে কাযী তথা বিচারক নিযুক্ত হয়ে যান। এত কম বয়সের কারণে এক ব্যক্তি আদালত কক্ষেই তাঁকে কটাক্ষ করে বলল ঃ আল্লাহ কাযী সাহেবকে সাহায্য করুন, বয়স কত? ইয়াহইয়া বললেন ঃ আমি এতাব ইবনে ওসায়দের সমবয়সী, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে মক্কা মোয়াযযমার প্রশাসক ও কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। লোকটি এ জওয়াব শুনে নিরুত্তর হয়ে গেল। ইমাম মালেক বলেন ঃ আমি কোন এক কিতাবে পাঠ করেছি– দাড়ি যেন তোমাকে ধোঁকা না দেয়। কেননা, দাড়ি পাঁঠারও থাকে। আবু আমর ইবনে আ'লা বলেন ঃ যখন তুমি কাউকে দীর্ঘদেহী, ক্ষুদ্র মাথা ও প্রশস্ত দাড়িবিশিষ্ট দেখ, তখন বুঝে নেবে সে বেওকুফ, যদিও সে উমাইয়া ইবনে আবদে শামসই হয়। আইউব

সুখতিয়ানী বলেন ঃ আমি এক বৃদ্ধকে জনৈক বালকের সামনে এলেম শিক্ষা করার জন্যে যেতে দেখেছি। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে তোমার পূর্বে এলেম আসে, সে সেই এলেমে তোমার ইমাম, যদিও সে বয়সে তোমার বেশ ছোট হয়। আবু আমর ইবনে আ'লাকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ বৃদ্ধ কি এটা ভাল মনে করে যে, সে বালকের কাছে এলেম শিখবে? তিনি বললেন ঃ যদি সে মূর্খতাকে খারাপ মনে করে, তবে বালকের কাছে এলেম শিক্ষা করা ভাল মনে করবে।

চতুর্থ, বার্ধক্যকে খারাপ মনে করে দাড়ির সাদা চুল উপড়ে ফেলা। হাদীসে এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শুভ্রতা মুমিনের নূর।

পঞ্চম, সমস্ত দাড়ি অথবা কিছু পরিমাণ উপড়ে ফেলা। এটা আকৃতির বিকৃতি সাধনের নামান্তর বিধায় মাকরূহ। এরূপ এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের আদালতে এলে তিনি তার সাক্ষ্য কবুল করেননি। বালক হয়ে থাকার উদ্দেশে শুরুতে দাড়ি উপড়ে ফেলা খুবই খারাপ কথা। কেননা, দাড়ি পুরুষের অলংকার। ফেরেশতারা এভাবে কসম খায়– সেই সত্তার কসম, যিনি পুরুষকে দাড়ি দ্বারা সজ্জিত করেছেন। দাড়ি সৃষ্টির পূর্ণতা, যদ্দ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। আহনাফ ইবনে কায়েসের দাড়ি ছিল না। তাঁর শিষ্যরা বলত ঃ যদি বিশ হাজার দেরহামেও দাড়ি বিক্রয় হত, তবে আমরা অবশ্যই তাঁর জন্যে ক্রয় করতাম। দাড়ি মন্দ কিরূপে হতে পারে? এ কারণেই তো মানুষ সম্মান পায়, সম্ভ্রম লাভ করে এবং মজলিসে উচ্চ আসনে স্থান পায়। মানুষ দাড়িওয়ালাকে নামাযের জামাআতে ইমাম বানায়।

ষষ্ঠ, মহিলাদের দৃষ্টিতে সুন্দর দেখানোর জন্যে দাড়ি গোল করে কাটা। কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ শেষ যমানায় কিছু লোক তাদের দাড়ি কবুতরের পুচ্ছের মত গোল করে কাটবে এবং জুতা থেকে কাস্তের মত আওয়াজ বের করবে। ধর্মের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না।

সপ্তম, দাড়ির অংশ কিছু বাড়িয়ে নেয়া; অর্থাৎ, উভয় গণ্ডের উপর কান পাট্টির যে চুল থাকে এবং যা বাস্তবে মাথার চুল, তা লম্বা করে দাড়ির সাথে মিলিয়ে নেয়া এবং অর্ধেক গণ্ডদেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এটা সজ্জনদের আকৃতি ও স্বভাবের খেলাফ বিধায় মাকরূহ।

অষ্টম, লোক দেখানোর জন্যে দাড়িতে চিরুনি করা। বিশর বলেন ঃ দাড়িতে দু'টি জঞ্জাল আছে– লোক দেখানোর খাতিরে চিরুনি করা এবং দরবেশী ফুটানোর জন্যে এলোমেলো রাখা।

নবম ও দশম, কাল অথবা সাদা দাড়িকে আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে দেখা। এ অনিষ্ট দেহের সকল অঙ্গেই হতে পারে; বরং প্রত্যেক কর্ম ও চরিত্রে আত্মম্ভরিতা নিন্দনীয়।

তিনটি হাদীস দ্বারা জানা গেছে, শরীরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুন্নত ঃ মাথার চুলে সিঁথি করা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, গোঁফ কাটা, মেসওয়াক করা, নখ কাটা, অঙ্গুলির উপর ও নীচের ভাঁজগুলো পরিষ্কার করা, বগলের চুল উপড়ানো, নাভির নীচের চুল মুণ্ডানো, খতনা করা এবং পানি দ্বারা এস্তেঞ্জা করা। এসব বিষয় হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো খুব স্মরণ রাখা উচিত।

অন্তরের যে সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা ওয়াজেব, সেগুলো গণনাতীত। ইনশাআল্লাহ চতুর্থ খণ্ডে সেগুলো সবিস্তারে বর্ণিত হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

নামাযের রহস্য

জানা উচিত, নামায দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ, বিশ্বাসের দলীল, পুণ্য কাজের মূল এবং সর্বোত্তম এবাদত। এখানে আমরা নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম ও আভ্যন্তরীণ রহস্য তথা খুশু-খুযু, এখলাস ও নিয়তের অর্থ লিপিবদ্ধ করছি, যা আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের জন্যে জরুরী এবং যা ফেকাহ্ শাস্ত্রে সাধারণতঃ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আযানের ফযীলত

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তি মেশকের টিলায় অবস্থান করবে। তাদের হিসাব-নিকাশের কোন ভয় থাকবে না এবং কোনরূপ আতংক তাদেরকে স্পর্শ করবে না। হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত

হওয়া পর্যন্ত তাদের এ অবস্থা অব্যাহত থাকবে। তাদের মধ্যে একজন সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্যে কোরআন তেলাওয়াত করে, নামাযে ইমামতি করে এমতাবস্থায় যে, মুসল্লীরা মসজিদে আযান দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে। তৃতীয় সে ব্যক্তি, যে দুনিয়াতে দাসত্বে লিপ্ত; কিন্তু এই দাসত্ব তার আখেরাতের কাজকর্মে প্রতিবন্ধক হয় না। এক হাদীসে আছে–

لايسمع صوت المؤذن جن ولا انس ولا شئ الا شهد له يوم القيامة ـ

অর্থাৎ, মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর যেকোন জিন, মানব ও বস্তু শোনে, তারা কেয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

আরও বলা হয়েছে ঃ মুয়াযযিন যে পর্যন্ত আযান দিতে থাকে, আল্লাহ তাআলার হাত তার উপর থাকে।

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ـ

অর্থাৎ, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার?

এ আয়াত সম্পর্কে কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এটি মুয়াযযিন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ـ

অর্থাৎ, "তোমরা যখন আযান শোন, তখন মুয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল।"

মুয়াযযিন যা বলে তা বলা মোস্তাহাব। কিন্তু যখন সে حى على الصلوة ও حى على الفلاح (তোমরা নামাযের দিকে এস, তোমরা কল্যাণের দিকে এস) বলে, তখন শ্রোতা বলবে– لاحول ولا قوة الا بالله আর যখন সে قد قامت الصلوة (নামায শুরু হয়েছে) বলে, তখন বলবে اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

(আল্লাহ একে কায়েম ও স্থায়ী রাখুন যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী স্থায়ী থাকে)। ফজরের আযানে যখন মুয়াযযিন বলে ঃ الصلوة خير من النوم (নামায নিদ্রা অপেক্ষা উত্তম), তখন শ্রোতা বলবে ঃ قد صدقت وبررت (তুমি সত্য বলেছ ও ভাল কাজ করেছ)। আযান শেষে এই দোয়া বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু, আপনি মুহাম্মদকে ওসিলা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁকে বেহেশতের প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি করেছেন। নিশ্চয় আপনি ওয়াদার খেলাফ করেন না।

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জঙ্গলে নামায পড়ে, তার ডান দিকে একজন ফেরেশতা এবং বাম দিকে একজন ফেরেশতা নামায পড়ে। যদি সে আযান ও তকবীর বলে, তবে তার পেছনে পাহাড়ের মত ফেরেশতা নামায পড়ে।

নামাযের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় নামায মুমিনদের প্রতি নির্ধারিত সময়ে ফরয করা হয়েছে।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

خمس صلوة كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له

عند الله عهد ان يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة -

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর পাঁচটি নামায ফরয করেছেন। যেব্যক্তি এগুলো পালন করে এবং এগুলোর হককে হালকা মনে করে কিছু নষ্ট না করে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার রয়েছে। তিনি তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আর যে এগুলো আদায় করে না, তার জন্যে কোন অঙ্গীকার নেই। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তাকে আযাব দেবেন এবং ইচ্ছা করলে জান্নাতে দাখিল করবেন।"

তিনি আরও বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায সুমিষ্ট পানির নদীর মত, যা তোমাদের গৃহের দরজায় অবস্থিত। যে প্রত্যহ তাতে পাঁচ বার গোসল করে, তোমরা কি মনে কর যে, পাঁচ বার গোসলের পরও তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? সকলেই আরজ করল ঃ কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বলেন ঃ পাঞ্জেগানা নামায গোনাহসমূহ এমনিভাবে দূর করে দেয়, যেমন পানি ময়লা দূর করে দেয়। এক হাদীসে বলা হয়েছে–

ان الصلوة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر -

অর্থাৎ, "কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে পাঞ্জেগানা নামায মধ্যবর্তী সকল গোনাহ মাফ করিয়ে দেয়।"

আরও বলা হয়েছে ঃ আমাদের মধ্যে ও মোনাফেকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, এশা ও ফজরের নামাযে হাযির হওয়া। এ দুটি নামাযে মোনাফেকরা আসতে পারে না। অন্য হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নামায নষ্ট করে আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্যান্য সৎকর্মের কোন মূল্য দেবেন না। আরও বলা হয়েছে ঃ নামায দ্বীনের স্তম্ভ। যে নামায বর্জন করে সে দ্বীনকে ভূমিসাৎ করে। কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল ঃ কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি বললেন ঃ সময়মত নামায পড়া। তিনি বললেন ঃ যেব্যক্তি পাঞ্জেগানা নামাযের হেফাযত করে, অর্থাৎ পূর্ণ ওযু দ্বারা যথাসময়ে নামায আদায় করে, নামায তার জন্যে কেয়ামতে নূর ও প্রমাণ হবে। আর যে নামায নষ্ট করে, তার

হাশর ফেরআউন ও হামানের সাথে হবে। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন ঃ নামায জান্নাতের চাবি। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা তওহীদের পর নামাযের চেয়ে প্রিয় কোন কিছু মানুষের উপর ফরয করেননি। আল্লাহ তাআলার কাছে নামাযের চেয়ে প্রিয় অন্য কিছু থাকলে ফেরেশতাদের জন্যে সেটিই এবাদতরূপে নির্দিষ্ট করতেন। অথচ তিনি তাদের কাছে থেকে নামাযের ক্রিয়াকর্মই গ্রহণ করেন। সেমতে কেউ রুকুকারী, কেউ সেজদাকারী, কেউ দণ্ডায়মান এবং কেউ উপবিষ্ট। তিনি বলেন ঃ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়। উদ্দেশ্য এই, সে কুফরের কাছাকাছি চলে যায়। কারণ এতে তার তাওয়াক্কুল ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন, কেউ শহরের কাছে পৌঁছে গেলে বলা হয়, সে শহরে পৌঁছেছে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নামায ছেড়ে দেয়, মুহাম্মদ (সাঃ) তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি ওযু করে এবং উত্তমরূপে ওযু করে, এর পর নামাযের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, সে নামাযের নিয়ত করা পর্যন্ত নামাযেই থাকে। তার এক পদক্ষেপে পুণ্য লেখা হয় এবং অপর পদক্ষেপে একটি গোনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। অতএব তকবীর শুনেই তোমাদের নামাযের জন্য দৌড়ানো উচিত নয়। কেননা, বড় সওয়াব সেই পাবে, যার গৃহ দূরে থাকে। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ঃ পদক্ষেপ বেশী হওয়ার কারণে সওয়াব বেশী হবে। বর্ণিত আছে, কেয়ামতে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। এটা পূর্ণ পাওয়া গেলে অন্য সকল আমল গৃহীত হবে। পক্ষান্তরে এটি অসম্পূর্ণ হলে অন্য সকল আমল নামঞ্জুর হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আবু হোরায়রা, তোমার গৃহের লোকজনকে নামায পড়ার আদেশ কর। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রুজি দেবেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ নামাযী সওদাগরের মত। পুঁজি না থাকলে সওদাগর মুনাফা পায় না। তেমনি নফল নামায কবুল হয় না, যে পর্যন্ত ফরয পূর্ণরূপে আদায় না করে। নামাযের সময় হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলতেন ঃ দাঁড়াও, যে আগুন তুমি জ্বালিয়েছ তা নির্বাপিত কর। অর্থাৎ, নামাযকে তোমার গোনাহের কাফফারা কর।

নামাযের রোকনসমূহ পূর্ণরূপে আদায় করার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ফরয নামায নিক্তির মত। যে পুরোপুরি মেপে

দেবে. সে পুরোপুরি মেপে নেবে। ইয়াযীদ রাকাশী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায মাপে সমান ছিল। অর্থাৎ, সবগুলো রোকন তিনি একই মাপে আদায় করতেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আমার উম্মতের দু'ব্যক্তি নামাযের জন্যে দাঁড়ায়। তাদের রুকু-সেজদা একই; কিন্তু নামাযে আকাশ-পাতাল পার্থক্য হয়। এ হাদীসে তিনি খুশু অর্থাৎ, বিনয় ও একাগ্রতার প্রতি ইশারা করেছেন। আরও বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন সেই বান্দার প্রতি নজর দেবেন না, যে রুকু ও সেজদার মধ্যে পিঠ সোজা করে না। এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি নামাযে মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে দেয়, সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তাআলা তার মুখকে গাধার মুখে পরিণত করে দেবেন? আরও বলা হয়েছে ঃ যেব্যক্তি নামায যথাসময়ে পড়ে, তার জন্যে উত্তমরূপে ওযু করে এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে, তার নামায উজ্জ্বল হয়ে উপরে আরোহণ করে বলে ঃ আল্লাহ তোমার হেফাযত করুন যেমন তুমি আমার হেফাযত করেছ। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি নামায অসময়ে পড়ে, ওযু পূর্ণরূপে করে না এবং রুকু, সেজদা ও খুশু পূর্ণরূপে আদায় করে না, তার নামায কাল হয়ে উপরে গমন করে বলে ঃ আল্লাহ তাআলা তোমার বিনাশ করুন, যেমন তুমি আমার বিনাশ করেছ। এর পর যখন এই নামায আল্লাহ তাআলার অভিপ্রেত স্থানে পৌঁছে যায়, তখন তাকে কাপড়ের মত পুঁটলি তৈরী করে সেই ব্যক্তির মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ সে ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট চোর, যে নামাযে চুরি করে। হযরত ইবনে মসউদ ও সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন ঃ নামায একটি ওজনের নিক্তি। যে পূর্ণ দেবে সে পূর্ণ পাবে। আর যে কম দেবে সে তো জানেই, আল্লাহ তাআলা ওজনে কমদাতাদের সম্পর্কে কি বলেছেন।

জামাআতের ফযীলত সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

صلوة الجمع تفضل صلوة الفذ بسبع وعشرين درجة -

জামাআতের নামায একা নামায অপেক্ষা সাতাশ গুণ বেশী মর্তবা রাখে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু লোককে কোন এক নামাযে উপস্থিত না পেয়ে বললেন ঃ আমি চাই যে, কাউকে নামায পড়ানোর আদেশ করি, এরপর নিজে সেই লোকদেরকে তালাশ করি, যারা নামাযে আসে না, এর পর তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, যারা নামাযে না এসে বসে থাকে, আমি

তাদের কাছে যেতে চাই, এর পর লাকড়ি একত্রিত করে তাদের গৃহে অগ্নিসংযোগের আদেশ দিতে চাই। তাদের কেউ যদি জানে, সে মাংসল হাড্ডি অথবা ছাগলের রান পাবে, তবে অবশ্যই এশার নামাযে আসবে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে আছে, যেব্যক্তি এশার নামাযে হাযির হয়, সে যেন অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত নফল এবাদত করল। আর যে ফজরের নামাযে উপস্থিত হয় সে যেন পূর্ণ এক রাত্রি নফল এবাদত করল। এরশাদ হয়েছে ঃ যেব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ে, তার বক্ষ এবাদত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়েব (রঃ) বলেন ঃ বিশ বছর যাবত আমার অবস্থা এই যে, যখন মুয়াযযিন আযান দেয় তখন আমি সেজদার মধ্যেই থাকি। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে' বলেন ঃ আমি দুনিয়াতে কেবল তিনটি বস্তু কামনা করি ঃ এক– ভাই, আমি বক্র হলে সে আমাকে সোজা করবে। দুই– হালাল ও অন্যের হক থেকে মুক্ত খাদ্য এবং তিন– জামাআতের নামায। বর্ণিত আছে, হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) একবার কিছু লোকের ইমাম হয়ে নামায পড়লেন। তিনি সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ এ সময় শয়তান আমার পেছনে লেগেছিল। ফলে আমি মনে করলাম, আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আজ থেকে আমি আর কখনও ইমামত করব না। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আলেমদের কাছে আসা-যাওয়া করে না, তার পেছনে নামায পড়ো না। নখয়ী বলেন ঃ যেব্যক্তি এলেম ছাড়াই ইমামত করে, সে যেন সমুদ্রের পানি পরিমাপ করে, যা কম কিংবা বেশী এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। হাতেম আসাম্ম বলেন ঃ আমি একবার জামাআতের নামায পাইনি। এজন্য কেবল আবু ইসহাক বোখারী এসে আমার কাছে শোক প্রকাশ করলেন। যদি আমার ছেলে মারা যেত, তবে দশ হাজার লোক এসে শোক প্রকাশ করত। আসলে ধর্মীয় বিপদ মানুষের কাছে দুনিয়ার বিপদের তুলনায় সহজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি আযান শুনে নামাযে হাযির হয় না, সে কল্যাণ কামনা করে না এবং তার কাছ থেকেও কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেনঃ কেউ আযান শুনে নামাযে না আসলে সেই ব্যক্তির কানে গালা ঢেলে দেয়া উত্তম। বর্ণিত আছে, মায়মূন ইবনে মাহরান মসজিদে এলে কেউ বলল ঃ লোকেরা নামায পড়ে চলে গেছে। তিনি বললেন ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ জামাআতের ফযীলত আমার কাছে ইরাকের রাজত্ব লাভের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من صلى اربعين يوما الصلوات فى جماعة لاتفوته فيها تكبيرة الاحرام كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি চল্লিশ দিন সবগুলো নামায জামাআতের সাথে এমনভাবে পড়ে, তাতে তকবীরে তাহরীমা ফওত হয় না, তার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি মুক্তি লেখে দেন– একটি কপটতা থেকে মুক্তি ও অপরটি জাহান্নাম থেকে মুক্তি।

কথিত আছে, কেয়ামতের দিন কিছু লোক উত্থিত হবে, যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল তারকার ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। ফেরেশতারা বলবে ঃ তোমরা দুনিয়াতে কি কি আমল করতে ? তারা বলবে ঃ আমরা যখন আযান শুনতাম তখন ওযুর জন্যে তৎপর হতাম। এতে অন্য কোন কাজ আমাদের প্রতিবন্ধক হত না। এর পর অন্য একটি দল উত্থিত হবে, যাদের মুখমন্ডল চন্দ্রের মত উজ্জ্বল হবে। ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার জওয়াবে তারা বলবে ঃ আমরা সময়ের পূর্বে ওযু করতাম । এর পর কিছু লোক উত্থিত হবে, যাদের চেহারা সূর্যের মত দীপ্তিমান হবে। তারা বলবে ঃ আমরা মসজিদে বসেই আযান শুনতাম । বর্ণিত আছে, আগেকার বুযুর্গগণের প্রথম তকবীর ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত এবং জামাআত ফওত হয়ে গেলে সাত দিন পর্যন্ত নিজেদেরকে ধিক্কার দিতেন। সেজদার ফযীলত সম্পর্কে রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

ما تقرب العبد الى الله بشيئ افضل من سجود خفى ـ

অর্থাৎ, বান্দা নীরব সেজদার চেয়ে আল্লাহ্ তা'আলার উত্তম নৈকট্য অন্য কোন কিছুতে অর্জন করে না।

ما من مسلم يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها سيئة ـ

অর্থাৎ, যে মুসলমান আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে সেজদা করে,

আল্লাহ্ তা'আলা বিনিময়ে তার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দেন এবং একটি গোনাহ্ মাফ করে দেন।

এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করল ঃ আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দোয়া করুন, যাতে আমাকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং জান্নাতে আপনার সাহচর্য দান করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি অধিক সেজদা করে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। বর্ণিত আছে, সেজদার অবস্থায় বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার অধিকতর নিকটবর্তী হয়। আল্লাহ্ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য তাই, وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ –সেজদা কর এবং নিকটবর্তী হও।

আল্লাহ্ বলেন–

سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

অর্থাৎ তাদের মুখমন্ডলে সেজদার চিহ্নই তাদের পরিচয়।

কারও কারও মতে এখানে 'সেজদার চিহ্ন' বলে সেই ধুলাবালি বুঝানো হয়েছে, যা সেজদা করার সময় মুখমন্ডলে লেগে যায়। কেউ কেউ বলেন ঃ সেজদার চিহ্ন হচ্ছে খুশুর নূর, যা অন্তর থেকে বাহ্যিক অঙ্গে ফুটে উঠে। এ উক্তি বিশুদ্ধতম। কেউ বলেন ঃ এর অর্থ সেই নূর, যা ওযুর চিহ্নস্বরূপ কেয়ামতে চেহারায় উদ্ভাসিত হবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যখন মানুষ সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করে এবং সেজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, হায় বিপদ, সে সেজদার আদেশ পেয়ে সেজদা করেছে, ফলে জান্নাত পেয়েছে; আর আমি সেজদার আদেশ অমান্য করে জাহান্নাম পেয়েছি। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস প্রত্যহ এক হাজার সেজদা করতেন। এ কারণেই মানুষ তাঁকে সাজ্জাদ নামে অভিহিত করে। বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ মাটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর সেজদা করতেন না। ইউসুফ ইবনে আসবাত (রঃ) বলতেন ঃ যুবক সকল, অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতার কদর কর। আমি কেবল সেই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করি, যে তার রুকূ সেজদা পূর্ণরূপে আদায় করে। আমি এখন অসুস্থতার কারণে রুকূ সেজদা করতে পারি না। সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন ঃ আমি সেজদা ছাড়া দুনিয়ার কোন বস্তুর জন্যে দুঃখ করি না। ওকবা ইবনে মুসলিম (রঃ)

Contents

বলেন ঃ বান্দা আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত পছন্দ করবে– এ ছাড়া বান্দার কোন অভ্যাস আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিকতর পছন্দনীয় নয়। সেজদার সময় ছাড়া এমন কোন সময় নেই, যাতে বান্দা আল্লাহ তা'আলার অধিক নিকটবর্তী হতে পারে। অতএব সেজদার মধ্যে অধিক দোয়া কর। নামাযের অন্যতম প্রধান বিষয় খুশুর ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ـ

অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ـ

অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, মাতাল অবস্থায় নামাযের কাছে যেয়ো না, যে পর্যন্ত যা বল তা না বুঝ।

এতে কেউ কেউ মাতালের অর্থ করেছেন, দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হওয়া। কেউ বলেছেন, দুনিয়ার মহব্বতে মত্ত হওয়া। ওয়াহাব বলেছেন ঃ বাহ্যিক অর্থই উদ্দেশ্য! অর্থাৎ, মদ্যপান করে মাতাল হওয়া। মোট কথা, এতে দুনিয়ার নেশা সম্পর্কে হুশিয়ার করা হয়েছে। কেননা, বলা হয়েছে– যে পর্যন্ত তোমরা যা বল, তা না বুঝ। অনেক নামাযী এমন রয়েছে, যারা নেশার বস্তু পান করে না, কিন্তু নামাযে কি বলছে তার খবরও রাখে না। রসূলে পাক (সাঃ) বলেন ঃ

من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشئ من الدنيا غفرله ما تقدم من ذنبه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি দু'রাকআত নামায পড়ে এবং তাতে দুনিয়ার কোন কথা মনে মনে না বলে, তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ মাফ করা হবে।

انما الصلوة تمسكن وتواضع وتضرع وتباؤس وتنادم

وترفع يديك فتقول اللهم فمن لم يفعل فهى خداج ـ

অর্থাৎ, নামায তো অসহায়ত্বতা, বিনয়, অনুনয়, দুঃখ ও অনুতাপ বৈ কিছু নয়। তুমি তোমার হাত উত্তোলন কর, এর পর বল– হে আল্লাহ, হে আল্লাহ! যে এভাবে নামায পড়ে না, তার নামায অসম্পূর্ণ।

পূর্ববর্তী কোন এক আসমানী কিতাবে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– আমি সকল নামাযীর নামায কবুল করি না ; বরং যে আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় করে, আমার বান্দাদের সাথে অহংকার না করে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্যে অন্নহীনকে অন্ন দেয়, তার নামায কবুল করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামায, হজ্জ, তওয়াফ ও ধর্মের অন্যান্য রোকন ফরয হওয়া কেবল আল্লাহর যিকিরের জন্যে। অতএব তোমার অন্তরে যদি এই উদ্দেশ্য জাগরূক না থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার মাহাত্ম্য ও ভয়ভীতি থেকে তোমার অন্তর শূন্য থাকে, তবে তোমার যিকিরের কোন মূল্য নেই। জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

اذا صليت فصل صلوة مودع ـ

অর্থাৎ মনের খাহেশ, বয়স ইত্যাদিকে বিদায় করে মাওলার দিকে চল। আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَ يُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ـ

অর্থাৎ, "হে মানুষ, তোমাকে আত্মরক্ষা করের তোমার পালনকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।"

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, তোমরা তাঁর সাথে মিলিত হবে।"

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তিকে নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না, সে আল্লাহর কাছ থেকে দূরেই সরে যাবে। নামায তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে বাক্যালাপ করার নাম। অতএব এটা গাফিলতির সাথে কিরূপে হবে? বকর ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ হে

মানুষ, যদি তোমার প্রভুর কাছে বিনানুমতিতে যেতে চাও এবং কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর সাথে কথা বলতে চাও, তবে এটা সম্ভবপর। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ এটা কিরূপে সম্ভবপর? তিনি বললেন ঃ পূর্ণ ওযু সহকারে নামাযে দাঁড়াও। এতেই বিনানুমতিতে তোমার প্রভুর সামনে চলে যাবে। এর পর মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁর সাথে কথা বল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম, কিন্তু যখন নামাযের সময় হত, তখন তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরা তাঁকে চিনতাম না। তিনি আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্যে এমনিভাবে মশগুল হতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا ينظر الله الى صلوة لايحضر فيها قلبه مع بدنه -

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তাআলা এমন নামাযের দিকে তাকাবেন না, যে নামাযে মানুষ তার অন্তরকে দেহসহ উপস্থিত না রাখে।"

হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর অন্তরের অস্থির স্পন্দন দু'মাইল দূরত্বে শোনা যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাঁড়িয়ে অঙ্গুলি বুলাতে দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তরে খুশু থাকত তবে অঙ্গের মধ্যেও তা প্রকাশ পেত। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কংকর নিয়ে খেলা করছে এবং বলছে ঃ ইলাহী, বেহেশতী হুরের সাথে আমার বিবাহ করিয়ে দিন। তিনি বললেন, তোমার তো উপযুক্ত পাথেয় নেই। তুমি বেহেশতী হুরের সাথে বিবাহ চাও আর কংকর নিয়ে খেলা কর। খলফ ইবনে আইউবকে কেউ বলল ঃ মাছির যে দাপট! নামাযে মাছি আপনাকে বিরক্ত করে নাকি? আপনি মাছি সরিয়ে দেন না? তিনি বললেন ঃ আমি নিজেকে নামায নষ্ট করে দেয়ার মত কোন কাজে অভ্যস্ত করি না। প্রশ্নকারী বলল ঃ আপনি ধৈর্য ধরেন কিরূপে? উত্তর হল ঃ আমি শুনেছি, অপরাধী শাহী বেত্রের নীচে ধৈর্য ধরে, যাতে মানুষ তাকে ধৈর্যশীল বলে। তারা এ নিয়ে পরস্পর গর্ব করে। আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তাঁর মাছির কারণে নড়াচড়া করতে পারি কি? মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রঃ) যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন গৃহের লোকজনকে বলতেন ঃ এখন তোমরা পরস্পর যত ইচ্ছা কথাবার্তা

বল। আমি তোমাদের কথাবার্তা শুনব না। একদিন তিনি বসরার জামে মসজিদে নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে মসজিদের একটি অংশ ভূমিসাৎ হয়ে গেল। এজন্যে চতুর্দিক থেকে লোকজন এসে সেখানে জড়ো হল। কিন্তু তিনি নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই টের পেলেন না। হযরত আলী (রাঃ) নামাযের সময় হলে কাঁপতে থাকতেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত। লোকেরা জিজ্ঞেস করত ঃ আমিরুল মুমিনীন, আপনার একি অবস্থা! তিনি বলতেন ঃ সেই আমানতের সময় এসেছে, যা আল্লাহ তাআলা আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতসমূহের সামনে পেশ করেছিলেন, কিন্তু সকলেই তা বহন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। মানুষ তা বহন করেছে। হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন (রঃ) যখন ওযু করতেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল ফেকাশে হয়ে যেত। তাঁর পত্নী জিজ্ঞেস করলেন ঃ ওযু করার সময় আপনার একি অভ্যাস ? তিনি বললেন ঃ তুমি জান না, আমি কার সামনে দাঁড়াতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত দাউদ (আঃ) তাঁর মোনাজাতে বললেন ঃ ইলাহী, আপনার গৃহে (অর্থাৎ জান্নাতে) কে থাকবে? আপনি কার নামায কবুল করেন? জওয়াবে আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন– হে দাউদ! যেব্যক্তি আমার মাহাত্ম্যের সামনে অনুনয় বিনয় করে, আমার স্মরণে দিন অতিবাহিত করে, আমার কারণে নিজেকে কামপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে, নিরন্নকে অন্ন দেয়, মুসাফিরকে আশ্রয় দেয় এবং বিপদগ্রস্তের প্রতি দয়াপরবশ হয়, সে-ই আমার গৃহে থাকবে। আমি তারই নামায কবুল করি। তারই নূর আকাশমণ্ডলীতে সূর্যের মত ঝলমল করে। সে আমাকে ডাকলে আমি সাড়া দেই। সে যা চায় আমি তাকে তা দেই। মূর্খতাকে আমি তার জন্যে জ্ঞান করে দেই, গাফিলতিকে যিকির এবং অন্ধকারকে উজালা করে দেই। সে সর্বোপরি বেহেশত জান্নাতুল ফেরদাউসের মত, যার নদ-নদী কখনও শুষ্ক হয় না এবং ফলমূল বিস্বাদ হয় না। হাতেম আসাম্মকে কেউ তাঁর নামাযের অবস্থা জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ নামাযের সময় হয়ে গেলে আমি পূর্ণরূপে ওযু করে নামাযের জায়গায় এসে বসি। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির হয়ে গেলে আমি নামাযের জন্যে দাঁড়াই। কা'বা গৃহকে সম্মুখে রাখি, পুলসেরাতকে পদতলে, জান্নাতকে ডান দিকে, জাহান্নামকে বাম দিকে এবং মালাকুল মওতকে পিঠের পশ্চাতে কল্পনা করি। এর পর এ নামাযকেই সর্বশেষ নামায বলে মনে করি। অতঃপর ভয় ও আশা সহকারে দাঁড়িয়ে সশব্দে আল্লাহু আকবার বলি। উত্তমরূপে কেরাআত পড়ি। রুকু বিনয় সহকারে এবং সেজদা খুশু সহকারে আদায়

করি। বাম পা বিছিয়ে বাম নিতম্বের উপর বসি। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রাখি। আমি সমগ্র নামাযে এখলাস তথা আন্তরিকতা অবলম্বন করি। এর পরও এ নামায কবুল হল কিনা, তা আমি জানি না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চিন্তা ভাবনা সহকারে মাঝারি ধরনের দু'রাকআত নামায গাফিলতি সহকারে সারা রাত জেগে নফল পড়ার চেয়ে উত্তম।

নামাযের স্থান 'মসজিদে'র ফযীলত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

অর্থাৎ, "যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস করে, তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহকে আবাদ করে।"

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له قصرا فى الجنة -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করে, যদিও তা কাতাত পক্ষীর বাসার সমান হয়, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

من الف المسجد الفه الله تعالى -

অর্থাৎ, "যেব্যক্তি মসজিদকে ভালবাসে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসেন।"

اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس -

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন বসার পূর্বে সে যেন দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়।

আরও আছে– মসজিদের পড়শীদের নামায মসজিদে ছাড়া হয় না। আরও এরশাদ হয়েছে– যতক্ষণ নামাযী মসজিদে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। তারা বলে ইলাহী, এ ব্যক্তির প্রতি রহম করুন; ইলাহী, তার প্রতি মেহেরবানী করুন; ইলাহী তাকে ক্ষমা করে দিন। এর জন্যে শর্ত হল, ওযুহীন না হওয়া এবং মসজিদের বাইরে না যাওয়া। এক হাদীসে আছে– শেষ যমানায় আমার উম্মতের

কিছু লোক মসজিদে বৃত্তাকারে বসবে। তাদের যিকির হবে দুনিয়া ও দুনিয়ার মহব্বত। তুমি তাদের কাছে উপবেশন করো না। কেননা, এদের সাথে আল্লাহ তাআলার কোন সম্পর্ক নেই। এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা এক আসমানী কিতাবে বলেছেন ঃ পৃথিবীতে আমার গৃহ হচ্ছে মসজিসমূহ। যারা এগুলো আবাদ রাখে, তারা আমার যিয়ারত করে। সুতরাং মোবারক সেই বান্দা, যে তার গৃহ থেকে পাক সাফ হয়ে আমার গৃহে আমার যিয়ারতের জন্যে আসে। গৃহস্বামীর কর্তব্য হচ্ছে তার কাছে আগমনকারীদের সম্মান করা। আরও এরশাদ হয়েছে– তোমরা যদি কাউকে মসজিদে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে দেখ, তবে তার ঈমান সম্পর্কে সাক্ষ্য দাও। হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে বসে সে পরওয়ারদেগারের সাথে উঠাবসা করে। অতএব তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া অন্য কিছু বলা সঙ্গত নয়। কোন তাবেয়ীর উক্তি অথবা হাদীসে বর্ণিত আছে, মসজিদে কথাবার্তা বলা সৎকর্মকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে, যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে সাবাড় করে দেয়। নখয়ী বলেন ঃ আগেকার মনীষীগণ বিশ্বাস করতেন, অন্ধকার রাতে মসজিদে যাওয়া জান্নাত লাভের কারণ। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে বাতি জ্বালায়, বাতির আলো মসজিদে থাকা পর্যন্ত তার জন্যে আরশ বহনকারী ফেরেশতারা মাগফেরাত কামনা করে। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ মানুষ মরে গেলে পৃথিবীতে তার নামায পড়ার জায়গা এবং আকাশে তার আমল উঠার জায়গা তার জন্যে ক্রন্দন করে। এর সমর্থনে তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "অতঃপর কাফেরদের জন্যে আকাশ ও পৃথিবী ক্রন্দন করল না এবং তারা অবকাশপ্রাপ্ত ছিল না।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাটি তার জন্যে চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। আতা খোরাসানী (রঃ) বলেন ঃ মানুষ যে ভূখণ্ডে সেজদা করে, কেয়ামতের দিন সেই ভূখণ্ড সেজদার সাক্ষ্য দেবে এবং সে মারা গেলে তার জন্যে ক্রন্দন করবে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন ঃ যে ভূখন্ডের উপর নামায অথবা মনোনিবেশ সহকারে আল্লাহ তাআলার যিকির হয়, সে ভূখণ্ড তার পার্শ্ববর্তী ভূখন্ডের উপর গর্ব করে। সে যিকিরের সুসংবাদ সপ্ত স্তর যমীনের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। যে বান্দা দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তার জন্যে যমীন সজ্জিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামাযের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম

নামাযী যখন ওযু করে, শরীর, স্থান ও বস্ত্র নাপাকী থেকে পাক করে নেয় এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্রাবৃত করে, তখন কেবলামুখী হয়ে উভয় পায়ের মাঝখানে কিছুটা দূরত্ব রেখে দণ্ডায়মান হবে। উভয় পা পরস্পর মেলাবে না। এভাবে দণ্ডায়মান হওয়া মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে 'সকদ' ও 'সকন' করতে নিষেধ করেছেন। সকদ মানে উভয় পা মিলিয়ে দণ্ডায়মান হওয়া এবং সকন অর্থ এক পায়ে জোর রেখে অপর পা বাঁকা করে রাখা। দণ্ডায়মান অবস্থায় উভয় হাঁটু ও কোমর সোজা রাখতে হবে। মাথা সোজাও রাখা যায় এবং নতও রাখা যায়। নত রাখা বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী। দৃষ্টি জায়নামাযের উপর রাখা উচিত। যদি জায়নামায না থাকে, তবে প্রাচীরের কাছে দাঁড়াবে অথবা নিজের চারপাশে রেখা টেনে নেবে। এতে দৃষ্টির দূরত্ব কমে যায় এবং চিন্তা বিক্ষিপ্ত হয় না। যদি জায়নামাযের কিনার থেকে অথবা রেখার সীমার বাইরে দৃষ্টি চলে যায়, তবে বাধা দিতে হবে। দণ্ডায়মান হওয়ার এ অবস্থা রুকু পর্যন্ত অব্যাহত রাখা উচিত। এভাবে কেবলামুখী হয়ে দণ্ডায়মান হয়ে গেলে শয়তান থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে সূরা নাস পাঠ করবে। এর পর তকবীর বলবে।

যদি কোন মুক্তাদীর আগমন প্রত্যাশা করা হয়, তবে প্রথমে আযান দেবে। এরপর নিয়ত করবে। উদাহরণতঃ মনে মনে যোহরের নামাযের নিয়ত করে বলবে, আমি যোহরের ফরয আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করছি। এ নিয়ত তকবীরের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখবে। মনে একথা উপস্থিত করে উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত এমনভাবে উঠাবে যে, উভয় হাতের তালু উভয় কাঁধের বিপরীতে এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের লতির বিপরীতে থাকবে। অঙ্গুলিসমূহের মাথা উভয় কানের বিপরীতে থাকবে। হাত এখানে স্থির হওয়ার পর অন্তরে নিয়ত উপস্থিত করে আল্লাহু আকবার বলবে এবং উভয় হাত নামাতে শুরু করবে। এর পর আল্লাহ আকবার পূর্ণ করে উভয় হাত নাভির উপরে এবং বুকের নীচে বাঁধবে। (এটা ইমাম

শাফেয়ী [রঃ]-এর মাযহাব)। ডান হাত উপরে ও বাম হাত নীচে থাকবে এবং ডান হাতের শাহাদত ও মধ্যের অঙ্গুলিগুলো বাম হাতের কব্জির উপর ছড়িয়ে দেবে। বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের বাহু ধরে রাখবে। রেওয়ায়েতসমূহে আল্লাহু আকবার বলা হাত উঠানোর সাথেও, হাত থেমে যাওয়ার সময়ও এবং বাঁধার জন্যে নামানোর সাথেও বর্ণিত আছে। কাজেই এই তিন সময়ের যে কোন সময় আল্লাহু আকবার বলা যায়। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহু আকবার বলার পর হাত ঝুলিয়ে দিতেন। এর পর কেরাআত পড়ার ইচ্ছা করলে ডান হাত বাম হাতের উপর বেঁধে নিতেন। এ হাদীস বিশুদ্ধ হলে এ পদ্ধতি উত্তম।

এর পর শুরুর দোয়া পড়বে। আল্লাহু আকবারের সাথে এ দোয়া মিলিয়ে পড়া উত্তম–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَّسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلٰوتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি একনিষ্ঠ হয়ে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকে করলাম, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর নিমিত্তে। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি এ বিষয়েই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (হানাফী মযহাব অনুযায়ী উক্ত দোয়াটি নিয়তের আগে পড়া হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বী লেখক এখানে স্বীয় মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। –অনুবাদক) এরপর বলবে–

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى

جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আপনার নাম বরকতময়, আপনার স্থান উচ্চ এবং আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই।"

ইমাম এত দীর্ঘ বিরতি না দিলে মুক্তাদী এ অবস্থায় কেবল শেষোক্ত দোয়াটিই পড়ে নেবে। এর পর আঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে সূরা ফাতেহার কেরাআত শুরু করবে। সূরা ফাতেহা শেষ করে 'আমীন' শব্দটি একটু টেনে উচ্চারণ করবে। ফজর, মাগরিব ও এশার নামাযে কেরাআত সরবে পড়বে। মুক্তাদী হলে পড়বে না। এর পর একটি সূরা অথবা কমপক্ষে তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করবে। কেরাআতের শেষ ভাগকে রুকুর আল্লাহু আকবারের সাথে মেলাবে না। বরং সোবহানাল্লাহ্ বলার সময় পরিমাণ বিরতি দেবে। ফজরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ও মাগরিবে কিসারে মুফাসসালের কেরাআত পড়বে। যোহর, আছর ও এশার নামাযে وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ও তার মত অন্যান্য সূরা পাঠ করবে। সফর অবস্থায় ফজরের নামাযে সূরা কাফিরূন ও সূরা এখলাস পড়বে। ফজরের সুন্নতেও তাই পড়বে। কেরাআত শেষে রুকু করবে, এর জন্যে আল্লাহু আকবার বলবে। তকবীর এতটুকু টেনে পড়বে যেন রুকুতে পৌঁছার পর শেষ হয়। রকুতে উভয় হাতের তালু হাঁটুর উপর রাখবে এবং অঙ্গুলিসমূহ ছড়িয়ে গোছার দিকে কেবলামুখী রাখবে। এ সময় মাথা, ঘাড় ও পিঠ সমতল থাকবে। উভয় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা থাকবে। স্ত্রীলোক কনুই পার্শ্বের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

রুকুতে তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আযীম বলবে। ইমাম না হলে তিনের অধিক সাত ও দশ বার পর্যন্ত বলা উত্তম। এর পর রুকু থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলতে বলতে সোজা হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়াবে এবং বলবে–

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْاَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ وَمِلْاَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ -

এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদার জন্যে নত হবে। প্রথমে

হাঁটু মাটিতে রাখবে, এর পর খোলা অবস্থায় হাতের তালু ও কপাল মাটিতে রাখবে এবং সকলের শেষে নাকের ডগা রাখবে। এ সময় কনুই পার্শ্ব থেকে আলাদা রাখবে এবং স্ত্রীলোক হলে মিলিয়ে রাখবে। সেজদায় পেট উরু থেকে আলাদা রাখবে এবং উভয় উরু পৃথক রাখবে। স্ত্রীলোক পেট উরুর সাথে এবং উভয় উরু পরস্পরে মিলিয়ে রাখবে। হাত মাটিতে কুকুরের ন্যায় বিছিয়ে রাখবে না; বরং কনুই উপর রাখবে। কনুই মাটিতে লাগানো নিষিদ্ধ। সেজদায় তিন বার সোবহানা রাব্বিয়াল আ'লা বলবে। আরও বেশী বার বলা উত্তম। ইমাম হলে তিন বারের বেশী বলা অনুচিত। এর পর তকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে মাথা তুলে স্থিরভাবে বসে যাবে। বাম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া রাখবে এবং উরুর উপর উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখবে। এরপর প্রথম সেজদার ন্যায় দ্বিতীয় সেজদা করবে এবং আল্লাহু আকবার বলতে বলতে উঠে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় রাকআতও প্রথম রাকআতের মতই পড়বে। দ্বিতীয় রাকআত সেজদাসহ শেষ করার পর বসা অবস্থায় তাশাহ্হুদ পড়বে। তাশাহ্হুদ পড়ার সময় দু'সেজদার মাঝখানে যেভাবে বসেছিলে, সেভাবে বসবে। অর্থাৎ, ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান হাত ডান উরুর উপর ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখবে। তাশাহ্হুদের মধ্যে 'ইল্লাল্লাহু' বলার সময় ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করবে এবং অন্য অঙ্গুলিগুলো বন্ধ করে নেবে। শেষ তাশাহহুদের মধ্যে দরূদের পর দোয়া মাসূরা পাঠ করবে। এরপর ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ। মুখ এতটুকু ফেরাবে যেন পেছনের মুসল্লী তার ডান গাল দেখতে পায়। এর পর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে একইভাবে সালাম বলবে। প্রথম সালামে ডান দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। তেমনি দ্বিতীয় সালামে বাম দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লীদের নিয়ত করবে। ইমাম হলে নামাযের সকল তকবীর সরবে বলবে। ইমাম ইমামতির নিয়ত করবে। এতে সওয়াব হবে। যদি ইমামতির নিয়ত না করে নামায পড়ে নেয়, মুক্তাদীর নামায দুরস্ত হবে এবং জামাআতের সওয়াব সকলেই পাবে। ইমাম নামাযের দোয়া, আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়বে। ফজরের দু'রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে ইমাম

আলহামদু ও অন্য সূরা সরবে পাঠ করবে। পরবর্তী রাকআতসমূহে কেবল আলহামদু পড়বে এবং নীরবে পড়বে। সালামের পর ইমাম বুকের বিপরীতে দুই হাত তুলে দোয়া করবে এবং দোয়ার পর মুখমণ্ডলের উপর হাত বুলিয়ে নেবে।

নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামাযে যেসব বিষয় নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলো এই ঃ নামাযে করজোড়ে দণ্ডায়মান হওয়া এক পায়ে জোর দিয়ে অপর পা ঘোড়ার মত বাঁকা করে রাখা। কুকুরের মত বসা; অর্থাৎ, নিতম্বে বসে উভয় হাঁটু খাড়া করে উভয় হাত মাটিতে রেখে দেয়া। এমনভাবে চাদর ইত্যাদি জড়িয়ে নামায পড়া যেন হাত ভেতরেই থাকে এবং রুকু সেজদায়ও হাত বাইরে না আনা। ইহুদীরা এরূপ করত, তাই তাদের মত করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকু সেজদা করার সময় হাত কোর্তা ইত্যাদিতেও হাত ভেতরে রাখা উচিত নয়। সেজদা করার সময় পরিধেয় বস্ত্র পেছনে অথবা সামনে দিয়ে তুলে নেয়া। ইমাম আহমদ কোর্তার উপর লুঙ্গি বেঁধে নামায পড়া মাকরূহ বলেছেন। কোমরে হাত রাখা, দাঁড়ানো অবস্থায় বাহু শরীর থেকে আলাদা রেখে কোমরে হাত রাখা, ইমামের জন্যে আল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথেই কেরাআত শুরু করে দেয়া এবং কেরাআত খতম হতেই রুকুর তকবীর বলা, মুক্তাদীর জন্যে নিজের শুরুর তকবীরকে ইমামের তকবীরের সাথে এবং সালামকে ইমামের সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া, এছাড়া প্রথম সালামকে দ্বিতীয় সালামের সাথে মিলিয়ে দেয়া ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যে নিষিদ্ধ। উভয় সালাম আলাদাভাবে বলতে হবে। প্রস্রাব অথবা পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে পড়া, মোজা পরিধান করে নামায পড়া– এগুলো খুশুর পরিপন্থী। তেমনি ক্ষুধা-পিপাসা নিয়ে নামায পড়াও মাকরূহ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রাতের খানা এসে গেলে এবং নামাযের তকবীর হলে আগে খানা খেয়ে নাও; কিন্তু নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে অথবা মন স্থির থাকলে আগেই নামায পড়বে। অন্য এক হদীসে ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ যে নামাযে মন উপস্থিত না থাকে, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। এক হাদীসে আছে– নামাযের মধ্যে সাতটি কাজ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়–

নাক দিয়ে রক্ত আসা, নিন্দা, কুমন্ত্রণা, হাই তোলা, চুলকানো, এদিক ওদিক দেখা এবং কোন কিছু নিয়ে খেলা করা। কেউ কেউ ভুল সন্দেহকেও এর সাথে যোগ করেছেন। জনৈক মনীষী বলেন ঃ নামাযের মধ্যে চারটি কাজ অন্যায়– এদিক ওদিক তাকানো, মুখ মোছা, কংকর সমান করা এবং মানুষের চলার পথ সামনে রেখে নামায পড়া।

অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের ফাঁকে ঢুকানো এবং অঙ্গুলি ফুটানো, মুখ আবৃত করা, রুকুতে হাতের এক তালু অপর তালুর সাথে মিলিয়ে উভয় হাঁটুর মাঝখানে রাখাও এর অন্তর্ভুক্ত। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ আমরা প্রথমে এরূপ করতাম; এরপর এটা নিষিদ্ধ হয়েছে। সেজদা করার সময় মাটিতে ফুঁক দেয়া অথবা হাতে কংকর সমান করা। কেননা, নামাযে এসব কর্মের প্রয়োজন নেই। দাঁড়ানো অবস্থায় প্রাচীরে হেলান দেয়া, যদি এমনভাবে হেলান দেয় যে, হেলানের বস্তু সরিয়ে নিলে সে নির্ঘাত পড়ে যাবে, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

নামাযের ফরয ও সুন্নত

উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে ফরয, সুন্নত, মোস্তাহাব ও উত্তম সবই রয়েছে। আধ্যাত্ম পথের পথিক যাতে সবগুলো পালন করে, এজন্যে সবগুলো একত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন আমরা সবগুলো আলাদা আলাদা বলে দিচ্ছি। উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্যে বারটি বিষয় ফরয ঃ (১) নিয়ত করা, (২) তকবীর বলা, (৩) দণ্ডায়মান হওয়া, (৪) সূরা ফাতেহা পাঠ করা, (৫) হাতের তালু হাঁটুতে স্থিরভাবে রেখে রুকু করা, (৬) রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, (৭) স্থিরভাবে সেজদা করা, এতে হাত মাটিতে রাখা ওয়াজেব নয়, (৮) সেজদা থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসা, (৯) দ্বিতীয় বৈঠক করা, (১০) শেষ তাশাহ্হুদ পড়া, (১১) শেষ তাশাহ্হুদে দুরূদ পাঠ করা এবং (১২) প্রথম সালাম ফেরানো। এই বারটি ছাড়া অবশিষ্টগুলো ওয়াজেব নয়; বরং সুন্নত ও মোস্তাহাব।

ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য হল, যে কাজ না করলে নামায দুরস্ত হয় না তা ফরয এবং যে কাজ না করলেও নামায শুদ্ধ হয়, তা সুন্নত। অথবা ফরয কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় এবং সুন্নত কাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি হয় না। এভাবে ফরয ও সুন্নতের পার্থক্য বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হয়, সুন্নত ও

মোস্তাহাব তরক করলে শাস্তি হয় না এবং পালন করলে সওয়াব হয়, এমতাবস্থায় পার্থক্য কি হল? এর জওয়াব এই, সওয়াব, শাস্তি ও হওয়ার ব্যাপারে সকল সুন্নতই অভিন্ন। এতে করে সুন্নত মোস্তাহাবের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। এগুলোর পার্থক্যের বিষয়টি আমরা একটি উদাহরণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছি। উদাহরণ এই ঃ মানুষকে দু'টি কারণেই বিদ্যমান ও পূর্ণাঙ্গ বলা হয়– আভ্যন্তরীণ বিষয় ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কারণে। আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে জীবন ও আত্মা। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো সকলেরই জানা। এসব অঙ্গের কতক এমন, এগুলো না হলে মানুষ মানুষ থাকে না; যেমন অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্ক ইত্যাদি। এগুলো না থাকলে মানুষের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হয়ে যায়। কতক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবন তো বিনষ্ট হয় না; কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায়। যেমন– চক্ষু, হাত, পা, জিহ্বা। কতক অঙ্গ এমন, এগুলো না থাকলে জীবনও বিনষ্ট হয় না এবং জীবনের উদ্দেশ্যও ফওত হয় না; কিন্তু সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকে না। যেমন– ভ্রূ, দাড়ি, চোখের পলক এবং সুন্দর বর্ণ। কতক অঙ্গ এমন, যেগুলো না থাকলে আসল সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় না; যেমন ভ্রূ বক্র হওয়া, দাড়ি ও পলক কৃষ্ণ বর্ণ হওয়া, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুডৌল হওয়া এবং গৌরবর্ণ হওয়া। এমনিভাবে নামায এবাদত ও শরীয়ত নির্মিত একটি আকৃতি। এ আকৃতি অর্জন করা আমাদের জন্যে এবাদত নির্ধারিত হয়েছে। এ আকৃতির আত্মা ও জীবন তথা আভ্যন্তরীণ বিষয় হচ্ছে খুশু, নিয়ত, মনের উপস্থিতি ও এখলাস। এর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে রুকু, সেজদা, দাঁড়ানো ও অন্যান্য ফরয কর্ম। এগুলো মানুষের অন্তর, কলিজা ও মস্তিষ্কের অনুরূপ। এগুলো না হলে নামায হয় না। আর যে যে কাজ সুন্নত; যেমন শুরুর দোয়া ও প্রথম তাশাহ্হুদ, সেগুলো হাত, পা ও চক্ষুর অনুরূপ। এগুলো না হলে নামাযের বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় না; যেমন– হাত, পা ও চক্ষু না থাকলে জীবন বিনষ্ট হয় না, বরং মানুষ কুশ্রী হয়ে যায় এবং সকলেই তাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। অনুরূপভাবে যেব্যক্তি নামাযে কেবল ততটুকু কাজ করে, যতটুকু দ্বারা নামায দুরস্ত হয়ে যায় এবং সুন্নত পালন করে না, সে সেই ব্যক্তির মত, যে কোন বাদশাহের কাছে এমন এক গোলাম উপঢৌকন পাঠায়, যে জীবিত; কিন্তু হাত পা কর্তিত। নামাযে যেসব কাজ মোস্তাহাব, সেগুলোর

মর্তবা সুন্নতের চেয়ে কম। এগুলো সৌন্দর্যের জরুরী বিষয়রূপে পরিগণিত; যেমন যিকির ইত্যাদি- এগুলো সৌন্দর্যের পরিপূরক বিষয়বস্তু; যেমন ভ্রূ বক্র হওয়া, দাড়ি গোলাকার হওয়া ইত্যাদি।

সারকথা, নামায মানুষের কাছে একটি নৈকট্যের উপায় ও উপঢৌকন, যদ্দারা সে সত্যিকার শাহানশাহের দরবারে নৈকট্য কামনা করে; যেমন কোন ব্যক্তি দুনিয়ার বাদশাহের নৈকট্য লাভের জন্যে তার দরবারে উপঢৌকন প্রেরণ করে। মানুষের এই উপঢৌকন প্রতাপশালী আল্লাহর দরবারে পেশ হয়ে বিচারের দিন আবার তার কাছে ফিরে আসবে। এখন মানুষ ইচ্ছা করলে এ উপঢৌকনের আকার আকৃতি সর্বাঙ্গ সুন্দর করুক এবং ইচ্ছা করলে বিশ্রী করুক। সর্বাঙ্গ সুন্দর করলে তারই উপকার এবং বিশ্রী করলে তারই অপকার হবে। মানুষ যদি ফেকাহ্শাস্ত্রে পারদর্শিতার সুবাদে ফরয ও সুন্নতের এই পার্থক্য বুঝে নেয়, সুন্নত তাকে বলে যা না করা জায়েয এবং এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সুন্নত ছেড়ে দেয়, তবে সে সেই চিকিৎসকের মত হবে যে বলে, চক্ষু বিনষ্ট করে দিলেও মানুষের অস্তিত্ব টিকে থাকে। বলাবাহুল্য, চক্ষুবিহীন গোলাম বাদশাহের কাছে উপঢৌকন পেশ করে তার নৈকট্য প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং যেব্যক্তি নামাযের রুকু সেজদা পূর্ণ করে না, এ নামাযই হবে তার প্রথম দুশমন। নামায বলবে, পরওয়ারদেগার তোমাকে বরবাদ করুন, যেমন তুমি আমাকে বরবাদ করেছিলে।

Contents
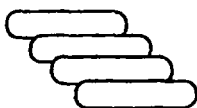
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত নামাযের আভ্যন্তরীণ শর্ত

নামাযে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। এর প্রমাণ অনেক। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۔

অর্থাৎ, আমার স্মরণের জন্যে নামায কায়েম কর।

এ থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায়, নামাযে অন্তরের উপস্থিতি ওয়াজেব। নামাযে গাফেল থাকা স্মরণের বিপরীত। অতএব যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, সে আল্লাহর স্মরণের জন্যে নামায কায়েমকারী কিরূপে হবে?

وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ ۔

অর্থাৎ, গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

এখানে নিষেধ পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে, যদ্দ্বারা বুঝা যায়, গাফেল হওয়া হারাম।

حَتّٰى تَعْلَمُوْنَ مَا تَقُوْلُوْنَ ۔

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত যা বল, তা না বুঝ।

এতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিকেও নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে। এ কারণ সেই ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে, যে গাফেল, কুমন্ত্রণায় মগ্ন এবং পার্থিব চিন্তা-ভাবনার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

নামায তো অসহায়ত্ব ও অনুনয় বৈ কিছুই নয়। হাদীসের শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, সেটাই নামায, যার মধ্যে অসহায়ত্ব ও অনুনয়-বিনয় থাকে। এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তির নামায তাকে মন্দ ও অশ্লীল কর্ম থেকে বিরত রাখে না, সেই নামায তার মধ্যে ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে দূরত্বই বৃদ্ধি করে। বলাবাহুল্য, গাফেল ব্যক্তির নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজের পথে অন্তরায় নয়। এরশাদ হয়েছে– অনেক নামাযী

এমন, তাদের নামায থেকে তারা কেবল কষ্ট ও শ্রমের অংশই পায়। এতে গাফেল ছাড়া অন্য কোন নামাযী উদ্দেশ্য নয়। আরও বলা হয়েছে- বান্দা তার নামাযের ততটুকুই পাবে, যতটুকু সে বুঝে।

এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত বক্তব্য, নামাযী তার পরওয়ারদেগারের সাথে মোনাজাত (কানাকানি) করে। হাদীসে এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গাফিলতি সহকারে যে কথা বলা হয়, তা নিশ্চিতই মোনাজাত হবে না। যাকাত, রোযা ও হজ্জ এমন ফরয কর্ম, যেগুলো গাফিলতি সহকারে আদায় করলেও আসল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়। যাকাত প্রদান স্বয়ং মানুষের ধনলিপ্সার বিপরীত এবং মনের জন্যে কঠিন কাজ। এমনিভাবে রোযা মানুষের পাশবিক শক্তিকে দাবিয়ে রাখে এবং যে খাহেশ দুশমন ইবলীসের হাতিয়ার, সেই খাহেশ ভেঙ্গে চুরমার করে। হজ্জও তেমনি কষ্টকর ও কঠিন কাজ। এতে এত পরিশ্রম আছে যদ্দ্বারা পরীক্ষা অর্জিত হয়ে যায়- সম্পাদনের সময় অন্তর উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু নামাযে যিকির, কেরাআত, রুকু, সেজদা, দণ্ডায়মান হওয়া ও বসা ছাড়া কিছুই নেই। এখন দেখতে হবে, যিকিরের উদ্দেশ্য সম্বোধন ও বাক্যালাপ করা, না কেবল মুখে অক্ষর ও স্বর উচ্চারণ করা, শেষোক্ত বিষয়টি যিকিরের উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা, গাফেল ব্যক্তির জন্যে প্রলাপ বকার সময় জিহ্বা নাড়াচাড়া করা মোটেই কঠিন নয়। এরূপ যিকির পরীক্ষা হতে পারে না। বরং যিকিরের উদ্দেশ্য হবে মনের ভাব প্রকাশ করে বাক্যালাপ করা। এটা অন্তর উপস্থিত না করে অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ মনকে গাফেল রেখে মুখে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ উচ্চারণ করলে একে কেউ প্রার্থনা বলবে না। সুতরাং যিকির দ্বারা অনুনয়-বিনয় ও দোয়া উদ্দেশ্য না হলে গাফিলতির সাথে জিহ্বা নাড়াচাড়া করা কঠিন হবে কি? অভ্যাস হয়ে যাওয়ার পর এটা মোটেই কঠিন কাজ নয়। এরূপ ব্যক্তি নামাযের আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ অন্তর স্বচ্ছ হওয়া ও ঈমানের বন্ধন সুদৃঢ় হওয়া থেকে অনেক দূরে থাকবে। এটা হল কেরাআত ও যিকির সম্পর্কে কথা। এখন রুকু ও সেজদার উদ্দেশ্য তাযীম তথা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন। মানুষ যদি তার কাজ দ্বারা আল্লাহ থেকে গাফিল হয়ে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারে, তবে সে তার কাজ দ্বারা গাফেল অবস্থায় সম্মুখে রক্ষিত কোন

মূর্তির প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারবে এবং এটা বিশুদ্ধ হবে। রুকু ও সেজদা যখন ভক্তি প্রদর্শন থেকে শূন্য হবে, তখন থেকে যাবে কেবল পিঠ ও মাথার নাড়াচাড়া। এটা এতটুকু কঠিন কাজ নয়, এর দ্বারা বান্দার পরীক্ষা উদ্দেশ্য হতে পারে অথবা একে ধর্মের স্তম্ভ করা যেতে পারে, কুফুর ও ইসলামের পার্থক্য সাব্যস্ত করা যেতে পারে এবং হজ্জ ও অন্যান্য সকল এবাদতের অগ্রে স্থান দেয়া যেতে পারে। নামাযের এই মাহাত্ম্য কেবল তার বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের কারণে, এটা আমাদের বোধগম্য নয়। হাঁ, মোনাজাত তথা আল্লাহর সাথে সংগোপনে কথা বলার উদ্দেশ্য যোগ হলে নামায রোযা, হজ্জ এবং যাকাত অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবাদত হয়ে যায়; বরং কোরবানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবাদত হচ্ছে নামায। আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের মাধ্যমে নফসের মোজাহাদা করার জন্যে আল্লাহ তাআলা কোরবানীর বিধান দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে বলেছেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ -

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে এসব জন্তুর মাংস ও রক্ত পৌঁছে না; কিন্তু তোমাদের তাক্ওয়া তাঁর কাছে পৌঁছে।

এখানে তাকওয়া অর্থ এমন গুণ, যা অন্তরের উপর প্রবল হয়ে আদেশ পালনের কারণ হয়। কোরবানীতে এটাই উদ্দেশ্য। সুতরাং এটা নামাযের উদ্দেশ্য হবে না কিরূপে?

মোট কথা, উপরোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ একথা জ্ঞাপন করে যে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্যে অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন, কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। অতএব আমার উপস্থাপিত বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাঁদের বিপরীত। এর জওয়াব এই, ফেকাহবিদগণ মানুষের বাতেন তথা অন্তর সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন না এবং তাঁরা অন্তর চিরে আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার চেষ্টাও করেন না; বরং তাঁরা ধর্মের বাহ্যিক বিধানাবলীকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক কর্মের উপর ভিত্তিশীল করেন। তাঁদের মতে, বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মই জাগতিক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যথেষ্ট। এখন এই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম আখেরাতে গ্রহণযোগ্য ও উপকারী হবে কি-না, এ আলোচনা ফেকাহর গণ্ডির বাইরে।

এছাড়া অন্তরের উপস্থিতি ছাড়া আমল পূর্ণ হওয়ার উপর কোন ইজমা দাবী করা যায় না। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি খুশু সহকারে নামায পড়ে না, তার নামায ফাসেদ। এক রেওয়ায়েতে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর উক্তি বর্ণিত আছে, যে নামাযে অন্তর উপস্থিত নয়, সেই নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, যেব্যক্তি নামাযে থেকে ইচ্ছাপূর্বক ডান ও বামের ব্যক্তিকে চিনতে পারে, তার নামায হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা নামায পড়ে অথচ তা থেকে তার জন্যে ছয় ভাগের এক ও দশ ভাগের এক অংশও লিখিত হয় না। কেবল ততটুকুই লেখা হয়, যতটুকু সে বুঝে শুনে পড়ে। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন ঃ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, বান্দা তার নামাযের ততটুকু অংশই পায় যতটুকু সে অন্তরে উপস্থিত রেখে পড়ে। তিনি তো অন্তরের উপস্থিতির উপর ইজমাই দাবী করলেন। পরহেযগার ফেকাহবিদ ও আখেরাতের আলেমগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের অসংখ্য উক্তি বর্ণিত আছে। সত্য এই, শরীয়তের প্রমাণাদি দেখা উচিত। হাদীস ও মনীষীবর্গের উক্তি থেকে বাহ্যতঃ এটাই বুঝা যায় যে, অন্তরের উপস্থিতি শর্ত। কিন্তু বাহ্যিক বিধানাবলীতে ফতোয়ার স্থান মানুষের ধারণা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। এদিক দিয়ে মানুষের জন্যে সমগ্র নামাযে অন্তর উপস্থিত রাখা শর্ত করে দেয়া সম্ভবপর নয়। কেননা, এটা করতে স্বল্প সংখ্যক লোক ছাড়া সকলেই অক্ষম। সমগ্র নামাযে শর্ত করা যখন সম্ভবপর হল না, তখন বাধ্য হয়েই এমনভাবে শর্ত করতে হল যে, একটি মুহূর্তে যেন অন্তর উপস্থিত থাকে। নামাযের অন্য সব মুহূর্তের তুলনায় আল্লাহু আকবার বলার মুহূর্তটি এ শর্তের জন্যে অধিক উপযুক্ত। তাই ফতোয়ায় কেবল এ মুহূর্তটিই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও আমরা আশাবাদী, যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থাকে, তার অবস্থা সেই ব্যক্তির মত খারাপ হবে না, যে নামাযই পড়ে না। কেননা, গাফেল তো বাহ্যতঃ কিছু কর্মের উদ্যোগ নিয়েছে এবং অন্তরকে এক মুহূর্ত হলেও উপস্থিত করেছে। যেব্যক্তি ভুলবশতঃ ওযু ছাড়া নামায পড়ে নেয়, তার নামায আল্লাহ তাআলার কাছে বাতিল। কিন্তু তার কাজ ও ওযর অনুযায়ী কিছু সওয়াব সে পাবে। এতদসত্ত্বেও ফেকাহবিদগণ গাফিলতি সহকারে নামায দুরস্ত হওয়ার যে ফতোয়া দেন, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কোন ফতোয়া দিতে পারি না। কেননা, এ ফতোয়া মুফতীকে

বাধ্য হয়েই দিতে হয়; যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন নামাযের রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ব্যক্তির জানা উচিত, গাফিলতি নামাযের জন্যে ক্ষতিকর।

সারকথা, অন্তরের উপস্থিতি নামাযের প্রাণ। এ প্রাণ অবশিষ্ট থাকার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত থাকা। এর যতবেশী অন্তর উপস্থিত থাকবে, ততই নামাযের অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হবে। যে জীবিত ব্যক্তির নড়াচাড়া নেই, সে মৃতের কাছাকাছি। সুতরাং যেব্যক্তি সমগ্র নামাযে গাফেল থেকে কেবল আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর উপস্থিত রাখে, তার নামায ঐ জীবিত ব্যক্তির মত, যার নড়াচাড়া নেই। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি- তিনি যেন গাফিলতি দূর করা এবং অন্তরের উপস্থিতি অর্জনের ব্যাপারে আমাদেরকে উত্তমরূপে সাহায্য করেন।

যেসব আভ্যন্তরীণ বিষয় দ্বারা নামাযের জীবন পূর্ণাঙ্গ হয়

প্রকাশ থাকে যে, এসব বিষয় বুঝানোর জন্যে অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ছয়টি শব্দ সবগুলো বিষয় একত্রে সন্নিবেশিত করে। এখন কারণ ও প্রতিকারসহ এসব শব্দের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম শব্দ হচ্ছে হুযুরে দিল (অন্তরের উপস্থিতি)। এর উদ্দেশ্য, মানুষ যে কাজ করছে এবং যে কথা বলছে, সেটি ছাড়া অন্যান্য কাজ ও কথা থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখা। অর্থাৎ, অন্তর কাজ ও কথা উভয়টি জানবে এবং এ দুটি ছাড়া অন্য কিছুতে তার চিন্তা ঘুরাফেরা করবে না। মানুষ যে কাজে লিপ্ত, তার চিন্তা যখন সেই কাজ ছাড়া অন্য দিকে না যায় এবং স্মৃতিতে সেই কাজই জাগরূক থাকে, তখন তার অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হয়।

দ্বিতীয় শব্দ ফাহম অর্থাৎ কালামের অর্থ বুঝা। এটা অন্তরের উপস্থিতি থেকে ভিন্ন। কেননা, প্রায়ই অন্তর শব্দের সাথে উপস্থিত থাকে এবং অর্থের সাথে উপস্থিত থাকে না। ফাহমের উদ্দেশ্য অন্তরে শব্দের অর্থ জানা। এক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কোরআনের অর্থ ও তসবীহ্ বুঝার ব্যাপারে সকলেই একরূপ নয়। অনেক সূক্ষ্ম অর্থ নামাযী ঠিক নামাযের মধ্যেই বুঝে নেয়, অথচ পূর্বে তার অন্তরে এ অর্থ কখনও ছিল না। এ কারণেই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ করতে বারণ করে।

অর্থাৎ এমন বিষয় হৃদয়ঙ্গম করায়, যা মন্দ কাজে প্রতিবন্ধক হয়।

তৃতীয় শব্দ তাযীম (ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন)। এটা অন্তরের উপস্থিতি ও ফাহম থেকে ভিন্ন। কেননা, মানুষ তার গোলামের সাথে কথা বলে, অন্তরও হাযির থাকে এবং নিজের কথার অর্থও বুঝে; কিন্তু গোলামের তাযীম করে না। এ থেকে জানা গেল, তাযীম হুযুরে দিল ও ফাহমের উর্ধ্বে।

চতুর্থ শব্দ 'হয়বত' অর্থাৎ ভয়। এটা তাযীমেরও উর্ধ্বে। বরং হয়বত সেই ভয়কে বলে, যা তাযীম থেকে উদ্ভূত হয়। বিচ্ছু, গোলামের অসচ্চরিত্রতা ইত্যাকার সামান্য জিনিসের ভয়কে হয়বত বলে না; বরং প্রতাপশালী বাদশাহকে ভয় করার নাম হয়বত।

পঞ্চম শব্দ রাজা অর্থাৎ আশা। এটাও পূর্ববর্তী সবগুলো থেকে ভিন্ন। অনেক মানুষ কোন বাদশাহের তাযীম করে। তার প্রতাপকে ভয় করে; কিন্তু তার কাছে কোন কিছু আশা করে না। বান্দার উচিত নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার সওয়াব আশা করা।

ষষ্ঠ শব্দ হায়া অর্থাৎ লজ্জা-শরম। এটা পূর্ববর্তী পাঁচটি থেকে আলাদা। কেননা, এর উৎপত্তি নিজের ভুল ত্রুটি উপলব্ধি করা থেকে। অতএব তাযীম, ভয় ও আশা এমন হতে পারে, যাতে হায়া নেই। অর্থাৎ, ত্রুটির ধারণা ও গোনাহের কল্পনা না থাকলে হায়া হবে না।

মোট কথা, উপরোক্ত ছয়টি বিষয় দ্বারা নামাযের প্রাণ পূর্ণাঙ্গ হয়। এখন এগুলোর কারণ আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে।

মনের উপস্থিতির কারণ হিম্মত তথা চিন্তা-ফিকির। মানুষের মন তার হিম্মতের অনুকরণ করে। যে বিষয় মানুষকে চিন্তান্বিত করে দেয় তাতেই তার অন্তর উপস্থিত থাকে। চিন্তার কাজে অন্তর উপস্থিত থাকাই মানুষের মজ্জা। নামাযে অন্তর উপস্থিত না হলে অন্তর বেকার থাকবে না; বরং যে পার্থিব বিষয়ে চিন্তা ব্যাপৃত থাকবে তাতেই অন্তর উপস্থিত থাকবে। কাজেই নামাযে অন্তর উপস্থিত করার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে, চিন্তাকে নামাযের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। চিন্তা নামাযের দিকে ঘুরবে না, যে পর্যন্ত প্রকাশ না পায় যে, প্রার্থিত লক্ষ্য নামাযের সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এ বিষয়ের পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, আখেরাত উত্তম, চিরস্থায়ী ও প্রার্থিত লক্ষ্য। নামায এ লক্ষ্য অর্জনের উপায়। এ বিষয়কে দুনিয়ার

নিকৃষ্টতার সাথে যোগ করলে উভয়ের সমষ্টি দ্বারা নামাযে অন্তরের উপস্থিতি অর্জিত হবে। তুমি যখন কোন শাসনকর্তার কাছে যাও, যে তোমার উপকার ও ক্ষতি করতে পারে না, তখন এ ধরনের বিষয় চিন্তা করলে অন্তর হাযির হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সকল প্রকার লাভ লোকসান এবং পৃথিবীর ও আকাশের রাজত্বের অধিকারী আল্লাহর সাথে মোনাজাতের সময় যদি তোমার অন্তর উপস্থিত না হয়, তবে এর কারণ তোমার ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া অন্য কিছুকে মনে করো না। এ অবস্থায় তোমার উচিত ঈমান শক্তিশালী করার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া। এর উপায় পূর্ণরূপে অন্যত্র বর্ণনা করা হবে।

অন্তরের উপস্থিতির পর ফাহমের কারণ হচ্ছে চিন্তাকে সদা ব্যাপৃত রাখা এবং অর্থোপলব্ধির দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। এর উপায় তাই, যা অন্তর উপস্থিত করার উপায়। এর সাথেই চিন্তার প্রতিও মনোযোগ দিতে হবে এবং যেসব কুমন্ত্রণা অন্তরকে বিমুখ করে দেয়, সেগুলো দূর করতে সচেষ্ট হতে হবে। এ ধরনের কুমন্ত্রণা দূর করার প্রতিকার হচ্ছে এগুলোর উপকরণ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া, অর্থাৎ যেসব উপকরণের দিকে কুমন্ত্রণা ধাবিত হয়, সেগুলো নিজের কাছে না রাখা। কেননা, মানুষ যে বস্তুকে প্রিয় মনে করে, তার আলোচনা বেশী করে। এ আলোচনা নিশ্চিতই অন্তরে ভীড় সৃষ্টি করে। এ কারণেই যারা গায়রুল্লাহকে ভালবাসে, তাদের নামায কুমন্ত্রণা মুক্ত হয় না।

দু'টি বিষয় জানার কারণে অন্তরে তাযীম সৃষ্টি হয়– (১) আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের পরিচয় লাভ করা, যা মূল ঈমান। কেননা, যেব্যক্তি আল্লাহর মাহাত্ম্যের বিশ্বাসী হবে না, তার মন আল্লাহর সামনে নত হবে না। (২) নিজের হেয়তা ও নীচতা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। এ দু'টি বিষয় জানা থেকে অনুনয়, বিনম্র ভাব ও খুশু জন্ম লাভ করে, যাকে তাযীম বলা হয়। যে পর্যন্ত নিজের নীচতা জ্ঞান আল্লাহ তাআলার প্রতাপ জ্ঞানের সাথে যুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত তাযীম ও খুশুর অবস্থা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না।

হয়বত ও ভয় আল্লাহ তাআলার কুদরত, প্রাবল্য ও তাঁর ইচ্ছা প্রযোজ্য হওয়ার জ্ঞান থেকে জন্ম লাভ করে। অর্থাৎ, একথা হৃদয়ঙ্গম করবে, যদি আল্লাহ্ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে ধ্বংস করে দেন, তবে তাঁর রাজত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাবে না। এর সাথে পয়গম্বর ও

ওলীগণের উপর আগত বিপদাপদ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করবে। মোট কথা, আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় মানুষ যত বেশী লাভ করবে, হয়বত বা ভয়ও ততই বেশী হবে।

'রাজা' তথা আশার কারণ এই, মানুষ আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ, কৃপা ও নেয়ামতকে চিনবে এবং নামাযের কারণে তিনি যে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন তা সত্য মনে করবে। যখন ওয়াদার প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর কৃপার জ্ঞান অর্জিত হবে, তখন উভয়ের সমষ্টি মানুষের অন্তরে নিশ্চিতই আশার সৃষ্টি করবে।

'হায়া' তথা লজ্জা-শরম সৃষ্টি হওয়ার উপায় হচ্ছে, মানুষ এবাদতে নিজেকে ত্রুটিকারী মনে করবে এবং বিশ্বাস করবে, আল্লাহ্ তাআলার যথার্থ হক আদায় করতে সক্ষম হচ্ছে না। সাথে সাথে একথাও জানবে, অন্তরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। এসব জ্ঞান থেকে নিশ্চিতরূপে যে অবস্থা উৎপন্ন হবে, তাকেই হায়া বলা হয়।

অতএব উপরোক্ত ছয়টি বিষয়ের মধ্য থেকে কোন একটি অর্জন করতে হলে তার কারণ জানতে হবে। কেননা, কারণ জানা হয়ে গেলে তার প্রতিকার আপনা আপনি জানা যায়। উপরে বর্ণিত জ্ঞানসমূহ একীনের স্তরে পৌঁছে যেতে হবে। তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারবে না। এগুলো অন্তরে প্রবলও হতে হবে। একীনের অর্থ যে সন্দেহ না থাকা এবং অন্তরে প্রবল হওয়া, একথা আমরা এলেম অধ্যায়ে লেখে এসেছি। যে পরিমাণে একীন হয়, সেই পরিমাণে অন্তর খুশু করে। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে কথা বলতেন এবং আমরা তাঁর সাথে কথা বলতাম, কিন্তু নামাযের সময় এসে গেলে তিনি যেন আমাদেরকে চিনতেন না এবং আমরাও তাঁকে চিনতাম না। বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ হে মূসা! তুমি যখন আমাকে স্মরণ কর, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঝেড়ে নাও এবং খুশু ও স্থিরতা সহকারে থাক। যখন আমার যিকির কর তখন জিহ্বাকে অন্তরের পেছনে রাখ। যখন আমার সামনে দাঁড়াও, তখন লাঞ্ছিত দাসের মত দাঁড়াও। সাচ্চা মুখে ও ভীত অন্তরের সাথে আমার কাছে মোনাজাত কর। আল্লাহ তাআলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি আরও ওহী প্রেরণ করেন- হে মূসা! তোমার উম্মতকে বলে দাও,

তারা যেন আমাকে স্মরণ না করে। কেননা, আমি নিজেকে কসম দিয়েছি, যে কেউ আমাকে স্মরণ করবে, আমি তাকে স্মরণ করব। সুতরাং তোমার উম্মত আমাকে স্মরণ করলে আমি তাদেরকে লানত সহকারে স্মরণ করব। এ হচ্ছে গাফেল নয়– এমন গোনাহগারের অবস্থা। যদি গাফিলতি ও গোনাহ উভয়টি একত্রিত হয়, তবে অবস্থা কি হবে?

আমরা উপরে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি, এগুলোতে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ। কতক মানুষ এমন গাফেল যে, নামায সবগুলো পড়ে, কিন্তু এক মুহূর্তও অন্তর উপস্থিত হয় না। আবার কেউ কেউ এমন, নামায পূর্ণরূপে পড়ে এবং এক মুহূর্তও অন্তর অনুপস্থিত থাকে না; বরং মাঝে মাঝে চিন্তাকে এমনভাবে নামাযে নিয়োজিত রাখে, তাদের কাছে কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলেও তারা তার খবর রাখেন না। এ কারণেই মুসলিম ইবনে ইয়াসার নামাযে দাঁড়িয়ে মসজিদের একাংশের পতন ও এ কারণে লোকজনের জড়ো হওয়ার বিষয় জানতে পারেননি। কোন কোন মনীষী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নামাযের জামাআতে উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু কোন সময় চিনতে পারলেন না, ডান দিকে কে এবং বাম দিকে কে দাঁড়িয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরের স্ফুটন দু'মাইল দূর থেকে শুনা যেত। কিছু লোকের মুখমন্ডল নামাযের সময় ফ্যাকাসে হয়ে যেত এবং স্কন্ধ কাঁপতে থাকত। এসব ব্যাপার মোটেই অবাস্তব নয়। কেননা, দুনিয়াদারদের ধমক এবং দুনিয়ার বাদশাহদের ভয়ে এর চেয়েও অনেক বেশী ভীতকম্পিত হতে দেখা যায়। অথচ তারা অক্ষম ও দুর্বল। তাদের কাছ থেকে যা পাওয়া যায়, তাও নগণ্য ও তুচ্ছ। এমনকি, কোন ব্যক্তি বাদশাহ অথবা মন্ত্রীর কাছে গিয়ে কোন নালিশ সম্পর্কে কথা বলার পর যখন চলে আসে, তখন যদি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়– বাদশাহের আশেপাশে কারা ছিল এবং বাদশাহের পোশাক কি ছিল, তবে সব কিছুতেই বলবে, জানি না। কেননা, নিজের কাজে মগ্ন থাকার কারণে বাদশাহের পোশাক অথবা আশেপাশের লোকজনকে দেখার কোন ফুরসতই তার ছিল না। যেহেতু প্রত্যেকেই তার আমলের বিভিন্ন অংশ পাবে, তাই নামাযে প্রত্যেকের অংশ ততটুকুই হবে, যতটুকু সে ভয়, খুশু ও তাযীম করবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা দেখেন অন্তর– বাহ্যিক নড়াচড়া নয়। এজন্যেই কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ কেয়ামতে মানুষ সেই অবস্থায় উত্থিত হবে, যা তার নামাযে হবে। অর্থাৎ নামাযে যে

পরিমাণ প্রশান্তি, স্থিরতা ও আনন্দ হবে, কেয়ামতে সে সেই পরিমাণে প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ করবে। সাহাবায়ে কেরাম ঠিকই বলেছেন। কেননা, মানুষের হাশর সেই অবস্থায় হবে, যে অবস্থায় সে মরবে। আর মানুষ মরবে সেই অবস্থায়, যে অবস্থায় সে জীবন যাপন করেছে। এতে তার অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে– বাহ্যিক শারীরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হবে না। কেননা, অন্তরের গুণাবলী দ্বারাই পরকালে আকার আকৃতি তৈরী করা হবে এবং নাজাত সে-ই পাবে, যে সুস্থ অন্তর নিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যাবে। আল্লাহ স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও তওফীক দিন।

অন্তরের উপস্থিতির সহায়ক ব্যবস্থা

প্রকাশ থাকে যে, মুমিনের জন্য জরুরী আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভক্তি রাখা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর কাছে প্রত্যাশা রাখা এবং আপন ত্রুটির জন্য অনুতপ্ত হওয়া । অর্থাৎ, ঈমানের পর এসব অবস্থা থেকে মুমিন পৃথক হবে না, যদিও এগুলোর শক্তি তার বিশ্বাসের শক্তি অনুযায়ী হবে। সুতরাং নামাযের মধ্যে এসব অবস্থার অনুপস্থিতি এ কারণেই হবে যে, নামাযীর চিন্তা বিক্ষিপ্ত, ধ্যান বিভক্ত, অন্তর মোনাজাতে অনুপস্থিত এবং মন নামায থেকে গাফেল। নামায থেকে গাফিলতি কুমন্ত্রণার কারণে হয়, যা মনের উপর নেমে এসে মনকে ব্যাপৃত করে দেয়। এমতাবস্থায় কুমন্ত্রণা দূর করাই অন্তরের উপস্থিতি লাভের উপায়। কোন বস্তু তখনই দূর হয়, যখন তার কারণ দূর হয়। তাই এখন কুমন্ত্রণার কারণ জানা দরকার। কুমন্ত্রণার কারণ হয় কানে ও চোখে পড়ে এমন কোন বিষয় হবে, না হয় কোন গোপন বিষয় হবে। কানেও চোখে পড়ে এমন বস্তুও মাঝে মাঝে চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। চিন্তা এসব বস্তুর পেছনে পড়ে সেগুলো থেকে অন্য বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হয়। উচ্চ মর্যাদাশীল ও উচ্চ সাহসী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়ের সামনে কোন বস্তু থাকলে তা তাকে গাফেল করে না, কিন্তু দুর্বল ব্যক্তির চিন্তা বিক্ষিপ্ত না হয়ে পারে না। এর প্রতিকার হচ্ছে এ ধরনের বস্তুর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা– চোখ বন্ধ করে অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নামায পড়া। এর জন্যে প্রাচীরের কাছে নামায পড়াও উত্তম, যাতে দৃষ্টির দূরত্ব দূরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। রাস্তায়, চিত্র ও কারুকার্যের স্থানে এবং রঙ্গিন বিছানায় নামায পড়া উচিত নয়। এ কারণেই আবেদগণ ক্ষুদ্র অন্ধকার

প্রকোষ্ঠে নামায পড়তেন, যাতে কেবল সেজদা করার স্থান সংকুলান হত। শক্তিশালী আবেদগণ মসজিদে উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি নত করে নিতেন এবং দৃষ্টিকে সেজদার জায়গার বাইরে যেতে দিতেন না। ডান ও বামের মুসল্লীকে না চেনাই ছিল তাদের মতে নামাযের পূর্ণতা। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) সেজদার জায়গায় না তরবারি রাখতেন, না কালামে মজীদ। কিছু লেখা পেলে তা মিটিয়ে দিতেন।

কুমন্ত্রণার কারণ কোন গোপন বিষয় হলে সেটা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, যেব্যক্তির চিন্তা জাগতিক ব্যাপারাদিতে ছড়িয়ে পড়ে, তার চিন্তা এক বিষয়ে সীমিত থাকে না; বরং সর্বদাই এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের দিকে ধাবমান থাকে। দৃষ্টি নত করা তার জন্যে যথেষ্ট হয় না। এরূপ কুমন্ত্রণা দূর করার উপায় হচ্ছে মনকে জোর করে নামাযে পঠিত বিষয় বুঝার মধ্যে লাগিয়ে রাখা এর জন্য সহায়ক বিষয়। নিয়ত বাঁধার পূর্বে মনকে নতুন করে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেবে, আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার বিপদ এবং মৃত্যু পরবর্তী ভয়ংকর অবস্থা মনের সামনে পেশ করবে। মনকে সকল চিন্তার বিষয় থেকে মুক্ত করবে এবং এমন কোন ব্যস্ততা রাখবে না, যার দিকে মন আকৃষ্ট হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান ইবনে আবী শায়বাকে বলেছিলেন–

انی نسیت ان اقول لك ان تخمر القدر الذی فی البیت فانه لاینبغی ان یکون فی البیت شیٔ یشغل الناس عن صلواتهم -

অর্থাৎ, আমি তোমাকে গৃহের হাঁড়ির মুখ বন্ধ করার কথা বলতে ভুলে গেছি। কেননা, গৃহে এমন বস্তু না থাকা উচিত, যা মানুষকে নামাযে বাধা দেয়।

মোট কথা, এগুলো হচ্ছে চিন্তা স্থির রাখার উপায়। যদি এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করার পর চিন্তা স্থির না হয়, তবে রোগের মূলোৎপাটনকারী জোলাব ছাড়া নাজাতের কোন পথ নেই। জোলাব এই যে, যেসব বিষয় মনকে অন্যত্র ব্যাপৃত করে দেয় এবং অন্তরের উপস্থিতি বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং সেগুলোর খাহেশ সম্পূর্ণ ছিন্ন করে দেবে। কেননা, যে বিষয় মানুষকে নামাযে বাধা দেয়, সে বিষয় তার ধর্মের বিপরীত এবং দুশমন ইবলীসের বাহিনী। কাজেই একে

সম্পূর্ণ দূর না করে বাধা দিতে থাকা অধিক ক্ষতিকর। একে আলাদা করে দেয়ার মধ্যেই এর কুপ্রভাব থেকে মুক্তি নিহিত। বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সঃ)-এর কাছে আবু জহম দু'পাড়বিশিষ্ট একটি কাল চাদর প্রেরণ করলে তিনি তা পরিধান করে নামায পড়লেন। নামাযের পর চাদরটি খুলে বললেন ঃ এটি আবু জহমের কাছে নিয়ে যাও। সে আমাকে নামায থেকে গাফেল করে দিয়েছে। আমাকে আমার সাদা চাদর এনে দাও। একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জুতায় নতুন চামড়ার টুকরা সংযোজনের আদেশ দেন। এর পর নামাযে তার দিকে তাকান। নামায শেষে তিনি টুকরাটি খুলে পুরাতন টুকরা সংযোজন করতে বলেন। একবার তিনি এক জোড়া জুতা পরিধান করলেন, যা তাঁর কাছে ভাল মনে হল। তিনি সেজদা করলেন এবং বললেন ঃ আমি আমার পরওয়ারদেগারের সামনে অনুনয় বিনয় করেছি, যাতে তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ না হন। এর পর জুতা জোড়াটি বাইরে নিয়ে প্রথমে যে প্রার্থী পেলেন, তাকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে আদেশ করলেন ঃ আমার জন্যে নরম চামড়ার পুরাতন জুতা জোড়া ক্রয় কর। অতঃপর সে জোড়াই তিনি পরিধান করলেন। হারাম হওয়ার পূর্বে একবার রসূলুল্লাহ (সাঃ) সোনার আংটি পরে মিম্বরে উঠলেন, এরপর সেটি নিক্ষেপ করে বললেন ঃ এটি আমাকে ব্যাপৃত রেখেছে। কখনও এটি দেখি এবং কখনও তোমাদেরকে দেখি। বর্ণিত আছে, হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর বাগানে নামায পড়লেন। একটি বেগুনী রংয়ের পাখী বৃক্ষের উপর যাওয়ার জন্যে উড়ল। পাখীটি তাঁর কাছে খুবই সুন্দর মনে হল। তিনি এক মুহূর্ত সেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফলে কত রাকআত নামায পড়লেন তা মনে রইল না। এর পর রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে এ ফেতনার কথা উল্লেখ করলেন এবং আরজ করলেন ঃ আমি বাগানটি সদকা করে দিলাম। যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করুন। অন্য এক ব্যক্তির কথা বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। বাগানের বৃক্ষসমূহ ফলভারে নুয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্য নামাযের মধ্যেই তার কাছে খুব ভাল লাগল। ফলে তিনি নামাযের রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলেন। বিষয়টি তিনি হযরত ওসমান গনী (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করে আরজ করলেন ঃ বাগানটি সদকা করে দিলাম। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করুন। হযরত ওসমান (রাঃ) বাগানটি পঞ্চাশ হাজার দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেন।

মোট কথা, পূর্ববর্তী মনীষীগণ চিন্তার মূল কর্তন করার জন্যে এসব উপায় অবলম্বন করতেন। বাস্তবে চিন্তার কারণের মূলোৎপাটন করার পদ্ধতি এটাই। এছাড়া অন্য কোন কৌশল উপকারী হবে না। কেননা, মনকে নরমভাবে স্থির করার যে কথা আমরা লেখেছি, তা দুর্বল চিন্তার ক্ষেত্রে উপকারী। কিন্তু খাহেশ ও চিন্তা জোরদার হলে তাতে তা উপকারী নয়; বরং খাহেশ তোমাকে টানবে এবং তুমি খাহেশকে টানবে। শেষ পর্যন্ত খাহেশই প্রবল হবে এবং সমগ্র নামায এই দ্বন্দ্বের মাঝে অতিবাহিত হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত এই, এক ব্যক্তি বৃক্ষের নীচে বসে তার চিন্তা সাফ রাখতে চায়। কিন্তু বৃক্ষের উপর পাখীরা বসে চেঁচামেচি করে তার চিন্তা বিক্ষিপ্ত করে দেয়। লোকটি একটি লাঠি হাতে নিয়ে পাখীদেরকে উড়িয়ে দেয় এবং পুনরায় আপন চিন্তায় মশগুল হয়। পাখীরা আবার এসে চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় কেউ এসে লোকটিকে বলল ঃ যে কৌশল তুমি অবলম্বন করেছ তা কখনও সফল হবে না। যদি তুমি এ থেকে নিষ্কৃতি চাও, তবে বৃক্ষটি উৎপাটিত করে দাও। খাহেশরূপী বৃক্ষের অবস্থাও তদ্রূপ। এর শাখা-প্রশাখা যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন এর উপর চিন্তা পাখীদের ন্যায় দাপাদাপি করে অথবা আবর্জনার উপর মাছির ন্যায় ভন্‌ভন্‌ করে। মাছিকে তাড়িয়ে দিলে আবার আসে। মনের কুমন্ত্রণাও তেমনি। খাহেশ অনেক। মানুষ এ থেকে খুব কম মুক্ত। সবগুলোর মূল শিকড় এক, অর্থাৎ দুনিয়ার মহব্বত। যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত রয়েছে এবং যে দুনিয়ার কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহান্বিত, তার নামাযে নিবিষ্টতার স্বচ্ছ আনন্দ অর্জিত হওয়ার আশা করা উচিত নয়। তবুও তার মোজাহাদা তথা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যেভাবেই হোক মনকে নামাযের দিকে ফেরানো এবং চিন্তার কারণসমূহ হ্রাস করা উচিত। এ ওষুধ তিক্ত এবং মনের কাছে বিস্বাদ। কিন্তু রোগ পুরাতন ও দুরারোগ্য হয়ে গেছে। এমনকি, বুযুর্গগণ এমন দু'রাকআত নামায পড়ার ইচ্ছা করেছেন, যাতে দুনিয়ার বিষয়সমূহ মনে না আসে। কিন্তু এটা সম্ভবপর হয়নি। তাঁরাই যখন এরূপ দু'রাকআত নামায পড়তে সক্ষম হলেন না, তখন আমাদের মত লোক এটা আশা করতে পারে কি? আমরা যদি কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত অর্ধেক কিংবা তিন ভাগের একা ভাগ নামাযও পাই, তবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি, যারা সৎকর্মের সাথে কুকর্মও মিশ্রিত করে দিয়েছে। মোট কথা, দুনিয়ার চিন্তা ও পরকালের সাহস এমন, যেমন তেলপূর্ণ পেয়ালায়

পানি ঢাললে যে পরিমাণ পানি পেয়ালায় যাবে, সেই পরিমাণ তেল নিশ্চিতই বের হয়ে পড়বে। উভয়ের একত্র মিলন সম্ভবপর হবে না।

নামাযের প্রত্যেক রোকন ও শর্তের জরুরী বিষয়

আখেরাত কাম্য হলে নামাযের শর্ত ও রোকনসমূহে আমরা যেসকল বিষয় লেখছি, সেগুলো থেকে গাফেল না হওয়া অত্যাবশ্যক। নামাযের শর্ত অর্থাৎ যেসকল কাজ নামাযের পূর্বে হয়, সেগুলো এই ঃ ওয়াক্ত, পবিত্রতা অর্জন, উলঙ্গতা দূরীকরণ, কেবলামুখী হওয়া, সোজা দাঁড়ানো এবং নিয়ত করা। সুতরাং যখন মুয়াযযিনের আযান শুন, তখন অন্তরে কেয়ামতের ডাকের ভয়াবহতা উপস্থিত কর। আযান শুনামাত্রই বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে তাতে সাড়া দেয়ার জন্যে তৎপর হয়ে যাও এবং তাড়াতাড়ি কর। কেননা, যারা মুযাযযিনের আযান শুনে তাড়াতড়ি করবে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে সোহাগ ভরে ডাকা হবে। আযান শুনার পর তুমি তোমার অবস্থা পর্যবেক্ষণ কর। যদি তা আনন্দ উল্লাসে পূর্ণ পাও, তবে জেনে রাখ, বিচার দিবসে তুমি সুসংবাদ ও সাফল্যের আওয়াজ শুনতে পাবে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন ঃ ارحنا يا بلال

অর্থাৎ, হে বেলাল! নামায ও আযান দ্বারা আমাকে সুখ ও স্বস্তি দান কর। কেননা, নামাযের মধ্যেই ছিল রসূলে করীম (সাঃ)-এর চোখের শীতলতা।

পবিত্রতা সম্পর্কে কথা এই, তুমি যখন নামাযের জায়গা পাক করে নাও, এর পর কাপড় ও বাহ্যিক দেহ পবিত্র করে নাও, তখন অন্তরের পবিত্রতা থেকে গাফেল হয়ো না। এ পবিত্রতার জন্যে তওবা ও গোনাহের জন্যে অনুতপ্ত হওয়ার চেষ্টা কর। ভবিষ্যতে এসব গোনাহ না করার জন্যে কৃতসংকল্প হও। এসব বিষয় দ্বারা অন্তরকে অবশ্যই পাক করে নাও।। কেননা, অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দেখার স্থান।

উলঙ্গতা দূরীকরণের অর্থ এরূপ মনে কর, বাহ্যিক দেহের যে অংশের উপর মানুষের দৃষ্টি পড়ে সেটা যখন আবৃত করবে, তখন অন্তরের যেসকল দোষত্রুটি পরওয়ারদেগার ব্যতীত কেউ জানে না, সেগুলো আবৃত করবে না কেন? সুতরাং সেসব দোষ অন্তরে উপস্থিত কর, সেগুলো আবৃত

করার জন্যে নফসকে অনুরোধ কর। এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস কর, আল্লাহ তাআলার দৃষ্টি থেকে এসব দোষ গোপন থাকতে পারে না। কিন্তু অনুতাপ, লজ্জা ও ভয় এগুলোর জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। এসব দোষ অন্তরে উপস্থিত করার ফলস্বরূপ তোমার অন্তরে লক্কায়িত ভয় ও লজ্জা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। তখন নফস নত হবে এবং অনুতাপে অন্তর আচ্ছন্ন হবে। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সামনে এমনভাবে দণ্ডায়মান হবে, যেমন পাপী, দুশ্চরিত্র ও পলাতক গোলাম তার কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে প্রভুর সামনে নতমস্তকে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দণ্ডায়মান হয়।

কেবলামুখী হওয়ার অর্থ তো তোমার বাহ্যিক মুখমণ্ডল সব দিক থেকে ফিরিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কাবা গৃহের দিকে করে নেবে। এখন তুমি কি মনে কর, সকল কাজ কারবার থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে আল্লাহ্র আদেশের দিকে করা কাম্য নয়? কখনও এরূপ মনে করো না; বরং মনে কর, এটা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়। বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম সবগুলো অন্তরকে আন্দোলিত করার জন্যে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত ও একদিকে স্থির রাখার জন্যে। ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্তরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না। সুতরাং দেহের প্রতি মনোযোগ দেয়ার সাথে সাথে অন্তরের প্রতিও মনোযোগ দরকার। অর্থাৎ, মুখমণ্ডল যেমন কাবা গৃহের দিকে থাকবে, যা মুখমণ্ডলকে অন্য সকল দিক থেকে না ফিরিয়ে হতে পারে না, তেমনি অন্তরও আল্লাহ তাআলার দিকে থাকবে, যা অন্তরকে সবকিছু থেকে মুক্ত না করে হতে পারে না। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় এবং তার খাহেশ, মুখমণ্ডল ও অন্তর আল্লাহ তাআলার দিকে থাকে, তখন সে জন্মদিনের মতই নিষ্পাপ অবস্থায় নামায খতম করে। সোজা হয়ে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্য এই, দেহ ও মন দিয়ে আল্লাহ তা'আলার সামনে নির্দেশ পালনের জন্য দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় যে মাথা সমস্ত অঙ্গের মধ্যে সর্বাধিক উচ্চ, তা নত ও বিনম্র হওয়া উচিত । মাথার উচ্চতা দূর করার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত, অন্তরে অনুনয় ও বিনয়ভাব অবশ্যই থাকবে। নামাযে দাঁড়ানো দ্বারা কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ার কথা স্মরণ করবে । মনে করবে, যেন তুমি আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়িয়ে আছ এবং তিনি তোমাকে দেখছেন। যদি তুমি এর যথার্থ প্রতাপ উপলব্ধি করতে না পার, তবে এমনভাবে দাঁড়াও, যেমন দুনিয়ার কোন বাদশাহের সামনে দাঁড়িয়ে থাক; বরং

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক ততক্ষণ এটা মনে কর, তোমাকে তোমার পরিবারের একজন খুব সাধু ব্যক্তি দেখে যাচ্ছে কিংবা যাকে তুমি তোমার সৎকর্মপরায়ণতা দেখাতে চাও, সে তোমাকে দেখছে। কেননা, এরূপ কোন ব্যক্তি দেখলে তোমার হাত পা স্থির ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢিলে থাকে, যাতে সে বলে, তুমি নামাযে বিনয় ও নম্রতা কর। অথচ সে প্রকৃতপক্ষে অক্ষম। সুতরাং একজন অক্ষম ব্যক্তির সামনে যখন তোমার মনের এই অবস্থা হয়, তখন মনকে এই বলে শাসাও, তুই আল্লাহ তা'আলার মারেফত ও মহব্বত দাবী করিস। তাঁর সামনে এরূপ করতে তোর লজ্জা হয় না ? তুই একজন সামান্য বান্দার প্রতি সম্মান দেখাস এবং তাকে ভয় করিস, কিন্তু আল্লাহকে ভয় করিস না। এ কারণেই হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন, লজ্জা কিভাবে হয়, তখন তিনি বললেন ঃ এমনভাবে লজ্জা কর, যেমন তোমার পরিবারের কোন সাধু ব্যক্তির সামনে লজ্জা করে থাক।

নিয়তের মধ্যে অন্তরে একথা পাকাপোক্ত করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নামাযের যে আদেশ করেছেন তা আমি মেনে নিয়েছি। এর পর আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ, তাঁর আযাবের ভয় এবং সওয়াবের প্রত্যাশা সহকারে নামায পূর্ণরূপে পড়া, নামাযের পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত থাকা এবং একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে সব কাজ করার সংকল্প করা উচিত। এক্ষেত্রে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে। বেআদব ও গোনাহগার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে মোনাজাত করার অনুমতি দিয়েছেন। কার সাথে এবং কিভাবে মোনাজাত করছ, তা লক্ষ্য করবে। এমতাবস্থায় তোমার ঘর্মাক্ত কলেবর কম্পমান এবং ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া উচিত।

মুখে আল্লাহু আকবার বলার সময় অন্তর যেন এ উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে। অর্থাৎ, অন্তরে যদি অন্য কোন বস্তুকে আল্লাহ অপেক্ষা বড় মনে কর, তবে আল্লাহ তা'আলা তোমার মিথ্যাবাদী হওয়ার সাক্ষ্য দেবেন, যদিও তোমার মৌখিক উক্তিটি সত্য হয়। যেমন, সূরা মুনাফিকুনে মোনাফেকদের মৌখিক সত্য উক্তি সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ সাক্ষ্য দেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী। অর্থাৎ, তারা অন্তরে রেসালত স্বীকার করে না। কেবল মুখে বলে, আপনি আল্লাহর রসূল।

শুরুর দোয়ায় তুমি বল–

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ـ

অর্থাৎ, আমি আমার মুখ তাঁর দিকে করলাম, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

এখানে শরীরের মুখ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শরীরের মুখ তো তুমি কেবলার দিকে করেই রেখেছ। আল্লাহ কেবলার মধ্যে বেষ্টিত নন। হাঁ, অন্তরের মুখকে তুমি আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টার দিকে করতে পার। এখন চিন্তা কর, তোমার অন্তরের মুখ বাড়ী-ঘর, বাজার ও যাবতীয় কাজ-কারবারে রয়েছে, না আল্লাহ তা'আলার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে ? খবরদার, নামাযের শুরুতেই মিথ্যা ও বানোয়াটকে প্রশ্রয় দিয়ো না। অতএব চেষ্টা করা উচিত যেন অন্তরের মনোযোগ আল্লাহ তা'আলার দিকেই থাকে। এটা সমগ্র নামাযে না পারলে যখন এ কলেমা মুখে বল, তখন তো কথাটা সত্য হওয়া উচিত। আর যখন মুখে বল حَنِيْفًا مُّسْلِمًا একাগ্রভাবে মুসলমান হয়ে– তখন মনে মনে চিন্তা কর, মুসলমান সে ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। তুমি বাস্তবে এরূপ না হলে একথায় মিথ্যাবাদী হবে। সুতরাং এরূপ হওয়ার জন্যে এখনই চেষ্টা কর। আর যখন বল وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আমি মুশরিকদের মধ্য হতে নই, তখন অন্তরে গোপন শেরকের কথা চিন্তা কর। কেননা–

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ আশা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং পালনকর্তার এবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।

এ আয়াতখানি সে ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে তার এবাদত দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ও মানুষের প্রশংসা কামনা করে। সুতরাং এ শেরক থেকে যত্ন সহকারে বেঁচে থাকা উচিত। আর যখন তুমি মুখে

বল, তুমি মুশরিক নও আর এ শেরক থেকে মুক্ত হলে না, তখন তোমার খুব লজ্জিত হওয়া উচিত। কেননা অল্প হোক বেশী হোক – সবই শেরক। যখন বল – مَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যে, তখন জানবে, তোমার অবস্থা গোলামের মত, যে নিজের পক্ষে নিরুদ্দেশ এবং মালিকের পক্ষে উপস্থিত। এ কলেমা যদি এমন ব্যক্তির মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়, যার হাসি, উঠাবসা, জীবনের আনন্দ ও মৃত্যু আতঙ্ক দুনিয়ার কাজের জন্যে হয়, তবে এ কলেমা তার অবস্থার সাথে সমাঞ্জস্যশীল নয়। যখন বল, اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ। আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, তখন জানবে, শয়তান তোমার দুশমন। সে তোমার অন্তরকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ওঁৎ পেতে বসে আছে। কেননা, তুমি আল্লাহর জন্যে সেজদা কর– এটা তার জন্যে হিংসার কারণ। সে এক সেজদা বর্জন করার কারণে গলায় লানতের বেড়ি পড়েছে এবং অনন্তকালের জন্যে অভিশপ্ত হয়েছে। তুমি যে শয়তান থেকে আশ্রয় চাও, এটা তখনই ঠিক হবে যখন শয়তানের পছন্দনীয় বিষয়াদি বর্জন কর এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় কাজকর্ম অবলম্বন কর। কেবল মুখে আশ্রয় চাওয়া যথেষ্ট নয়। উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্যে যদি কোন হিংস্র জন্তু অথবা দুশমন আসতে থাকে এবং সে ব্যক্তি নিজের স্থান ত্যাগ না করে মুখে বলে, আমি তোমা থেকে এই অজেয় দুর্গের আশ্রয় প্রার্থনা করি, তবে এতে তার কোন উপকার হবে না। আশ্রয় তখনই হবে, যখন সে স্থান ত্যাগ করে দুর্গের মধ্যে চলে যাবে। এমনিভাবে যেব্যক্তি তার প্রবৃত্তির অনুসারী, যা শয়তানের প্রিয় ও আল্লাহর অপ্রিয়, তার জন্যে মুখে আউযু বিল্লাহ্ বলা উপকারী হবে না। বরং তাকে এই মৌখিক উক্তির সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার দুর্গে আশ্রয় নেয়ার ইচ্ছা করতে হবে। তাঁর দুর্গ হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ আমার দুর্গ। যেব্যক্তি আমার দুর্গে প্রবেশ করে, সে আযাব থেকে নিরাপদ থাকে। এ দুর্গে সে ব্যক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে, যার মাবুদ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ নয়। যে তার খাহেশকে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে, সে শয়তানের ক্ষেত্রে বিচরণ করে– আল্লাহ তা'আলার দুর্গে নয়। শয়তান মানুষকে নামাযের মধ্যে

পরকাল চিন্তায় এবং সৎকর্মের ভাবনায় নিয়োজিত করে দেয় । এটাও শয়তানের একটা ধোঁকা, যাতে নামাযে যা পড়া হয়, নামাযী তা না বুঝে। মনে রেখ, কেরাআতের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক হয়, তাই শয়তানী কুমন্ত্রণা। কেননা, জিহবা নাড়াচাড়া করা উদ্দেশ্য নয়; বরং অর্থ বুঝা উদ্দেশ্য ।

কেরাআতের ক্ষেত্রে মানুষ তিন প্রকার হয়ে থাকে – (১) যার জিহবা গতিশীল ; কিন্তু অন্তর গাফেল। (২) যার জিহ্বা নড়াচাড়া করে এবং অন্তর জিহবার অনুসরণ করে। সে ভাষা এমনভাবে বুঝে ও শুনে, যেন অন্যের কাছ থেকে শুনেছে। এটা আসহাবে ইয়ামীন তথা দক্ষিণপন্থীদের স্তর। (৩) যার অন্তর প্রথমে অর্থের দিকে দৌড়ে, এর পর জিহবা তার অনুসারী হয়ে সেসব অর্থ ব্যক্ত করে । নৈকট্যশীলদের জিহবা অন্তরের ভাষ্যকার ও অনুগামী হয়ে থাকে – অন্তর জিহবার অনুগামী হয় না। যখন বল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করছি। তখন নিয়ত কর, আল্লাহ তা'আলার পাক কালাম শুরু করার জন্যে তাঁর কাছে বরকত চাই। এর অর্থ এই মনে কর, সব বিষয় আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। অতএব اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ও ঠিক হয়। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব পালনকর্তা আল্লাহর । কারণ, সকল নেয়ামতই আল্লাহর পক্ষ থেকে। যেব্যক্তি কোন নেয়ামতকে গায়রুল্লাহর পক্ষ থেকে জানে অথবা গায়রুল্লাহর প্রশংসা করতে চায় এবং তাকে আল্লাহর আদেশের অধীন মনে করে না, তার জন্য বিসমিল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা ক্ষতিকর হবে। যখন বল, اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পরম দয়ালু ও মেহেরবান, তখন অন্তরে তাঁর সকল প্রকার দয়া-দাক্ষিণ্য উপস্থিত কর, যাতে তাঁর রহমত তোমার কাছে প্রস্ফুটিত হয় এবং তুমি আশান্বিত হও। এরপর مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ বিচার দিবসের মালিক বলে অন্তরে তাঁর তা'যীম ও ভয় জাগ্রত কর । কেননা, তিনি প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশের মালিক। সুতরাং সেদিনের ভয়াবহতাকে ভয় করা উচিত । এরপর اِيَّاكَ نَعْبُدُ আমরা তোমারই এবাদত করি বলে এখলাস নতুন করে নাও এবং শক্তি সামর্থ্য থেকে অক্ষমতা একথা দ্বারা নতুন করে নাও, وَاِيَّاكَ

نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ আমরা আপনার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। তখন অন্তরে এটা নিশ্চিত করে নাও, আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত তাঁর এবাদতের তওফীক প্রাপ্ত হওনি। তোমাকে এবাদতের তওফীক দিয়ে এবং মোনাজাতের যোগ্য করে তিনি তোমার প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। যদি তিনি তোমাকে এবাদতের তওফীক থেকে বঞ্চিত করতেন, তবে তুমিও অভিশপ্ত শয়তানের সাথে দরবারে এলাহী থেকে বিতাড়িত হতে।

এসবের পর এখন তুমি তোমার সওয়াল নির্দিষ্ট কর এবং তাঁর কাছে তোমার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রার্থনা করে বল ঃ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর। এর ব্যাখ্যা ও বিবরণের জন্যে বল صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি হেদায়েতের নেয়ামত বর্ষণ করেছ। বলাবাহুল্য, তাঁরা হলেন পয়গম্বরগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মপরায়ণগণ। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ এবং পথভ্রষ্টদের পথও নয়। এরা হল কাফের ইহুদী, খৃস্টান ও সাবেয়ী সম্প্রদায়। এর পর এই আবেদনের মঞ্জুরী চেয়ে বল اٰمِيْنَ অর্থাৎ এরূপই কর। এভাবে আলহামদু সূরা পাঠ করলে আশ্চর্য নয়, তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এক হাদীসে কুদসীতে বলেন ঃ আমি নামাযকে আমার মধ্যে ও বান্দাদের মধ্যে আধাআধি করে নিয়েছি। অর্ধেক আমার ও অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দা তা পাবে যা সে চেয়েছে। سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার উদ্দেশ্য তাই। এর অর্থ এই, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন যে তাঁর প্রশংসা করেছে। আল্লাহ তা'আলা মহান ও প্রতাপান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে স্মরণ করেছেন– এ ছাড়া নামাযে আর কিছু না থাকলে এটাই যথেষ্ট হত । কিন্তু যেখানে সওয়াবেরও আশা আছে, সেখানে তো সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। অনুরূপভাবে যে সূরা তুমি পাঠ কর, তার অর্থ বুঝার চেষ্টা কর। কেরাআত পাঠে আল্লাহ তাআলার আদেশ, নিষেধ, ওয়াদা, শাস্তিবাণী, উপদেশ, পয়গম্বরগণের খবর ও অনুগ্রহরাজি উল্লেখের ব্যাপারে তোমার গাফেল হওয়া উচিত নয়। এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির

একটি হক আছে। উদাহরণতঃ ওয়াদার হক আশা করা, শাস্তিবাণীর হক ভয় করা, আদেশ ও নিষেধের হক তা পালন করার সংকল্প করা, উপদেশের হক উপদেশ গ্রহণ করা, অনুগ্রহ উল্লেখ করার হক তাঁর শোকর করা এবং পয়গম্বরগণের খবর বর্ণনার হক শিক্ষা গ্রহণ করা। নৈকট্যশীলরা এসব হক চেনেন এবং আদায় করেন। সেমতে যারারাহ্ ইবনে আবী আওফা নামাযে যখন এই আয়াতে পৌঁছেন, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ – (যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে) তখন তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ইবরাহীম নখয়ী যখন إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে) শুনতেন, তখন ব্যাকুল হয়ে পড়তেন এবং সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকত। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকেদ বলেন ঃ আমি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি বিষণ্ন অবস্থায় নামায পড়তেন। আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা ও শাস্তিবাণী দ্বারা অন্তর দগ্ধীভূত হওয়াই মানুষের জন্য উপযুক্ত। কেননা, গোনাহগার ও লাঞ্ছিত বান্দা প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর সম্মুখে থাকে। এর পর কেরাআতে অক্ষরের উচ্চারণ ভালরূপে কর। দ্রুত পাঠ করো না। কেননা, আস্তে পাঠ করলে বুঝতে সহজ হয়। রহমত ও আযাবের আয়াতগুলো আলাদা আলাদা স্বরে পাঠ কর। ইবরাহীম নখয়ী এ ধরনের আয়াত অত্যন্ত নীচ স্বরে পাঠ করতেন–

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلٰهٍ -

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে কোন উপাস্য নেই।

বর্ণিত আছে, কোরআন পাঠককে কেয়ামতের দিন বলা হবে ঃ পাঠ কর এবং উচ্চস্তরে উন্নীত হও। ভালরূপে পাঠ কর; যেমন দুনিয়াতে পাঠ করতে। সমগ্র কেরাআতে দণ্ডায়মান থাকার ইশারা হচ্ছে অন্তর আল্লাহ তাআলার সাথে একই অবস্থায় উপস্থিত থাকুক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা নামাযীর প্রতি মনোযোগী হন যে পর্যন্ত নামাযী অন্য দিকে ধ্যান না করে। অন্য দিকে দেখা থেকে মাথা ও চক্ষুর হেফাযত করা যেমন ওয়াজেব, তেমনি নামায ছাড়া অন্য দিকে ধ্যান করা থেকেও অন্তরের হেফাযত করা জরুরী। সুতরাং অন্তর অন্য দিকে সন্নিবেশিত

হলে তাকে স্মরণ করাও যে, আল্লাহ তাআলা তোমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। অন্তরে খুশু জরুরী করে নাও। কেননা, অন্য দিকে ধ্যান করা থেকে মুক্তি খুশুরই ফল। অন্তর খুশু করলে বাহ্যিক অঙ্গও খুশু করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নামাযে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন ঃ যদি তার অন্তর খুশু করত, তবে তার অঙ্গও খুশু করত। রাজা ও প্রজার অবস্থা একই রূপ হয়ে থাকে। তাই দোয়ায় বলা হয়েছে– এলাহী, রাজা ও প্রজা উভয়কে ঠিক কর। বলাবাহুল্য, রাজা হচ্ছে অন্তর এবং প্রজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নামাযে পেরেকের মত এবং ইবনে যুবায়র (রাঃ) কাঠের মত থাকতেন। কোন কোন বুজুর্গ রুকুতে এমনভাবে থাকতেন যে, পাখীরা পাথর মনে করে উপরে এসে বসত। এসব বিষয় দুনিয়াতে বাদশাহদের সামনে মনের চাহিদায় হয়ে যায়। অতএব, রাজাধিরাজ আল্লাহর অবস্থা যারা জানে, আল্লাহর সামনে তাদের এরূপ অবস্থা কেন হবে না? যেব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র সামনে খুশু করে এবং আল্লাহর সামনে তার হাত পা খেলাধুলায় মত্ত হয়, সে আল্লাহ্ তাআলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত নয়। সে জানে না, আল্লাহ্ তার অন্তর ও কুমন্ত্রণা সম্পর্কে জ্ঞাত।

اَلَّذِیْ یَرَاكَ حِیْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِی السّٰجِدِیْنَ ـ

অর্থাৎ, যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দাঁড়াও এবং নামাযীদের মধ্যে তোমার নড়াচাড়া দেখেন।

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইকরিমা বলেন ঃ তিনি দাঁড়ানো, রুকু, সেজদা ও বসার সময় দেখেন। রুকু ও সেজদা আদায় করার সময় নতুন নিয়ত ও সুন্নত অনুসরণের সাথে তাঁর আযাব থেকে ক্ষমার আশ্রয় প্রার্থনা করে উভয় হাত উত্তোলন কর এবং নতুন নম্রতা সহকারে রুকু কর। মনকে নরম করার চেষ্টা কর এবং নিজের হেয়তা ও আল্লাহ্র ইযযত কল্পনা কর। অন্তরে এর উপস্থিতির জন্যে জিহ্বা দ্বারা সাহায্য লও; অর্থাৎ মুখে سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیْمِ (আমার মহান প্রভু পবিত্র)–এ বাক্যটি বার বার বল, যাতে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য জোরদার হয়। এর পর রুকু থেকে মাথা তুলে তাঁর রহমত আশা কর। অন্তরের এই আশাকে মুখে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে জোরদার কর। অর্থাৎ যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে, আল্লাহ তার কথা শুনেন। এর পর

শোকর বয়ান কর। এতে নেয়ামত বৃদ্ধি পায় এবং رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের রব, প্রশংসা আপনারই) বল। প্রশংসা বৃদ্ধির জন্যে এ শব্দগুলোও বল مِلْاَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْاَ الْاَرْضِ অর্থাৎ, পূর্ণ পৃথিবী ও পূর্ণ আকাশমণ্ডলী পরিমাণে আপনার প্রশংসা। এর পর সেজদার জন্যে নত হও। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের হেয়তা। নিজের মুখমণ্ডল, যা সকল অঙ্গের মধ্যে অধিকতর প্রিয়, তাকে সর্বনিকৃষ্ট বস্তু অর্থাৎ মাটির উপর স্থাপন কর। মাটিতে সরাসরি সেজদা সম্ভব হলে মাটিতেই সেজদা কর। কেননা, এতে অনেক অনুনয় বিনয় অর্জিত হয়। নিজেকে নীচতম জায়গায় রাখার পর জানবে, তুমি তোমার নফসকে যেখানকার ছিল সেখানেই রেখে দিয়েছ। তুমি মূলতঃ মাটি থেকেই সৃজিত হয়েছ এবং মাটিতেই পুনরায় ফিরে যাবে। তখন অন্তরে আল্লাহর মাহাত্ম্য নতুনভাবে জাগ্রত কর এবং বল سُبْحٰنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی (আমার মহান প্রভু পবিত্র)– এ বাক্যটি বার বার বলে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য জোরদার কর। যখন তুমি তোমার অন্তর নরম হওয়ার কথা জানতে পার, তখন আল্লাহ্ তাআলার রহমত আশা কর। কেননা, তাঁর রহমত দুর্বল ও লাঞ্ছিতের দিকেই ধাবিত হয়– আস্ফালনকারীর দিকে নয়। এখন আল্লাহু আকবার বলতে বলতে মাথা উত্তোলন কর এবং একথা বলে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত কর رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ হে রব! ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং যে গোনাহ আপনি জানেন, তা মার্জনা করুন। অথবা যে দোয়া তোমার পছন্দ হয় বল। এর পর বিনয় পাকাপোক্ত করার জন্যে এমনিভাবে দ্বিতীয় সেজদা কর। যখন তাশাহহুদের জন্যে বস, তখন আদবের সাথে বস এবং পরিষ্কার বল, নৈকট্যের যত কিছু রয়েছে– দরূদ হোক অথবা তাইয়্যেবাত তথা পবিত্র চরিত্র হোক, সকলই আল্লাহ্ তাআলার জন্যে। আত্তাহিয়্যাতুর অর্থ তাই। এর পর নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র সত্তা অন্তরে উপস্থিত করে বল اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (হে নবী, আপনার প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত ও বরকত হোক)। মনে মনে সত্যিকারভাবে কামনা কর, এই সালাম তাঁর কাছে পৌঁছবে এবং তিনি এর জওয়াব অধিকতর পূর্ণতা সহকারে তোমাকে দান করবেন। এর পর তুমি নিজের প্রতি এবং আল্লাহ্ তাআলার সকল নেক বান্দার প্রতি

সালাম বল এবং আশা কর, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এর জওয়াবে নেক বান্দাদের সংখ্যা পরিমাণে পূর্ণ সালাম দান করবেন। এর পর আল্লাহ্ তাআলার একত্ব ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য দাও এবং শাহাদতের উভয় বাক্য পাঠ করে আল্লাহর অঙ্গীকারকে নতুন কর। নামায শেষে হাদীসে বর্ণিত কোন দোয়া খুশু, নম্রতা, অসহায়তা, অক্ষমতা ও কবুল হওয়ার সত্যিকার প্রত্যাশা সহকারে পাঠ কর। দোয়ায় পিতামাতা ও সকল ঈমানদারকে শরীক কর। সালাম বলার সময় ফেরেশতা ও উপস্থিত মুসল্লীদের নিয়ত কর। সালাম দ্বারা নামায পূর্ণ করার নিয়ত কর এবং মনে মনে আল্লাহর শোকর কর, তিনি তোমাকে এই এবাদতটি পূর্ণ করার তওফীক দিয়েছেন। এটাকেই তোমার জীবনের শেষ নামায মনে কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে উপদেশ ছলে বলেছিলেন। নামায বিদায়ী নামাযের মত করে পড়। এর পর মনে মনে নামাযে ত্রুটি করার ভয় ও শরম কর এবং আশংকা কর, নামায কোথাও নামঞ্জুর না হয়ে যায়। এর সাথে সাথে এ আশাও কর, আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় এ নামায কবুল করে নেবেন। ইয়াহইয়া ইবনে ওহাব নামায শেষে কিছুক্ষণ থেমে যেতেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার ছাপ দৃষ্টিগোচর হত। ইব্রাহীম নখয়ী নামাযের পর এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতেন যেন তিনি রুগ্ন। এ অবস্থা সেসব নামাযীর, যারা নামাযে খুশু করেন, সর্বক্ষণ নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখেন এবং সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর সাথে মোনাজাতে ব্যাপৃত হন। সুতরাং নামাযে এসকল বিষয়ের অনুবর্তী হওয়া মানুষের উচিত। এগুলোর মধ্য থেকে যতটুকু অর্জিত হয়, তার জন্যে আনন্দিত হওয়া এবং যতটুকু অর্জিত না হয়, তার জন্যে দুঃখ করা উচিত। গাফেলদের নামায তো সুখকর নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা রহমত করলে ভিন্ন কথা। তাঁর রহমত বিস্তৃত ও ব্যাপক। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের প্রার্থনা, তিনি যেন স্বীয় রহমত দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নেন এবং মাগফেরাত দ্বারা আমাদের দোষত্রুটি গোপন করে নেন। অক্ষমতা স্বীকার করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

জেনে রাখ নামাযকে আপদ থেকে পাক করা, একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করা এবং উল্লিখিত খুশু, তাযীম, শরম ইত্যাদি শর্ত সহকারে পড়া অন্তরে নূর হাসিল হওয়ার প্রধান উপায়। এ নূর কাশ্ফ তথা দিব্যদৃষ্টিতে দেখার চাবি। আল্লাহর ওলীগণ কাশফের মাধ্যমে যে আকাশ

ও পৃথিবীর রাজত্ব এবং প্রভুত্বের রহস্য জেনে নেন, তাও নামাযের মধ্যেই বিশেষতঃ সেজদাবস্থায় জেনে নেন। কেননা, সেজদার মাধ্যমে বান্দা তার পরওয়ারদেগারের নিকটবর্তী হয়। এজন্যেই আল্লাহ বলেন ঃ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ সেজদা কর এবং নৈকট্য হাসিল কর। প্রত্যেক নামাযীর নামাযে ততটুকু কাশফ হয়, যতটুকু সে দুনিয়ার জঞ্জাল থেকে পাক পবিত্র থাকে। এটা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। কারও কাশ্ফ শক্তিশালী, কারও দুর্বল, কারও কম, কারও বেশী কারও সুস্পষ্ট এবং কারও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। কারও সামনে হুবহু বিষয় উন্মোচিত হয় এবং কেউ বিষয়ের দৃষ্টান্ত জানতে পারেন। যেমন কেউ দুনিয়াকে মৃতের আকারে দেখতে পেয়েছেন এবং শয়তানকে কুকুরের আকারে তার উপর বুক লাগিয়ে থাকতে দেখেছেন। কাশফের বিষয়ও বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে। উদাহরণতঃ কারও সামনে তার ক্রিয়াকর্ম। কিন্তু মানুষ এসব কাশফের বিষয় অস্বীকার করতে খুবই তৎপর। কারণ, যে বিষয় প্রত্যক্ষ নয়, তা অস্বীকার করা মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। মাতৃগর্ভে শিশুর যদি বুদ্ধি জ্ঞান থাকত, তবে সে শূন্যে মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা অস্বীকার করত। অল্প বয়স্ক শিশুর যদি পার্থক্য জ্ঞান থাকত, তবে সে সেসব বিষয় অস্বীকার করত, যা বড়রা আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য সম্পর্কে জানে। মানুষের অবস্থা তাই। যে অবস্থায় সে থাকে তার পরবর্তী অবস্থা সে অস্বীকার করে। যেব্যক্তি ওলীত্বের অবস্থা স্বীকার করে না, তার জন্যে নবুওয়তের অবস্থা অস্বীকার করাও জরুরী। অথচ মানুষ অনেক অবস্থার মধ্যে সৃজিত হয়েছে। সুতরাং নিজের স্তরের পরবর্তী স্তর অস্বীকার করা মানুষের উচিত নয়। যেব্যক্তি কাশফওয়ালা নয়, তার কমপক্ষে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিত, যে পর্যন্ত না অভিজ্ঞতা দ্বারা নিজেই প্রত্যক্ষ করে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আছে– বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ্ তাআলা নিজের ও তার মধ্যকার সকল পর্দা দূর করে দেন এবং তাকে নিজের সামনে নিয়ে আসেন। ফেরেশতারা তার কাঁধ থেকে নিয়ে শূন্য পর্যন্ত দণ্ডায়মান হয়ে তার নামাযের সাথে নামায পড়ে এবং তার দোয়ায় আমীন বলে। নামাযীর উপর আকাশের শূন্য থেকে তার মাথার সিঁথি পর্যন্ত পুণ্য বর্ষিত হয়। একজন ঘোষক ঘোষণা করে– যদি এই মোনাজাতকারী জানত, কার সাথে সে মোনাজাত করছে, তবে এদিক ওদিক তাকাত না।

নামাযীদের জন্যে আকাশের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সাথে নামাযীর সততা নিয়ে গর্ব করেন। সুতরাং আকাশের দরজা উন্মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহ তাআলা নামাযীর মুখোমুখি হওয়া আমাদের বর্ণিত কাশফেরই ইঙ্গিত বহন করে। তওরাতে লিখিত আছে– আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি আমার সামনে ক্রন্দনরত অবস্থায় নামাযে দণ্ডায়মান হতে অক্ষম হয়ো না। কেননা, আমি তোমার অন্তরের নিকটবর্তী এবং তুমি গায়েব থেকে আমার নূর প্রত্যক্ষ করেছ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা জানতাম, নামাযী অন্তরের যে নম্রতা ও ক্রন্দন অনুভব করে, তা এ কারণেই যে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের নিকটবর্তী হন, এ নৈকট্য স্থানের দিক দিয়ে নয় বিধায় হেদায়াত, রহমত ও পর্দা দূর করাই উদ্দেশ্য হবে। কথিত আছে, বান্দা যখন নামায পড়ে, তখন ফেরেশতাদের দশটি সারি তার জন্যে বিস্ময় প্রকাশ করে। প্রত্যেক সারিতে দশ হাজার ফেরেশতা থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এই বান্দাকে নিয়ে এক লক্ষ্য ফেরেশতার সামনে গর্ব করে থাকেন। এর এক কারণ, মানুষ নামাযে একই সঙ্গে দণ্ডায়মান হয়, বসে, রুকু করে এবং সেজদা করে। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব কাজ চল্লিশ হাজার ফেরেশতার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের মধ্যে যারা দণ্ডায়মান, তারা কেয়ামত পর্যন্ত রুকু করবে না; যারা রুকুকারী তারা সেজদা করবে না; আর যারা সেজদাকারী, তারা কেয়ামত পর্যন্ত মাথা তুলবে না। উপবিষ্টদের অবস্থাও তদ্রূপ। দ্বিতীয় কারণ, ফেরেশতাদেরকে যে নৈকট্য ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, তা সর্বদা অপরিবর্তনীয়। এতে হ্রাসবৃদ্ধি নেই। সেমতে কোরআন পাকে স্বয়ং ফেরেশতাদের উক্তি বর্ণিত আছে– وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (আমাদের প্রত্যেকের জন্যে এক নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে)। এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থা ফেরেশতাদের মত নয়। মানুষ এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি করতে থাকে। সে সর্বক্ষণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে এবং এতে উন্নতি করতে থাকে। এ উন্নতির দ্বার ফেরেশতাদের জন্যে রুদ্ধ। তাদের প্রত্যেকের সেই মর্যাদা যার উপর সে দণ্ডায়মান এবং সে এবাদত নির্দিষ্ট, যাতে সে মশগুল। তার না মর্যাদা পরিবর্তিত হয়, না সে এবাদতে ত্রুটি করে। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বলেন ঃ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ

اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর এবাদতে অহংকার এবং অলসতা করে না। তারা দিবারাত্র পবিত্রতা বর্ণনা করে– ক্লান্ত হয় না।

উন্নতির চাবিকাঠি নামাযে নিহিত। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ

অর্থাৎ, যারা নামাযে খুশু করে, সেই মুমিনরাই সফল।

এখানে ঈমানের পর এক বিশেষ নামাযের গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে নামাযে খুশু থাকে। এর পর এই সফলকামদের গুণাবলী নামাযী দ্বারা খতম করে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ –অর্থাৎ, এবং যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে খবরদার। এরপর এসব গুণের ফল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, তারাই অধিকারী জান্নাতুল ফেরদাউসের, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

আমি জানি না, যারা মনকে গাফেল রেখে কেবল জিহ্বা নাড়াচাড়া করে, তারা এই মহান মর্যাদার অধিকারী হবে কিভাবে? এজন্যেই তাদের বিপরীত লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرٍ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ـ

অর্থাৎ, তোমাদেরকে কিসে জাহান্নামে নিয়ে এল? তারা বলবে ঃ আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।

মোট কথা, নামাযীরাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী, আল্লাহ তাআলার নূর প্রত্যক্ষ্যকারী এবং তাঁর নৈকট্য দ্বারা লাভাবান হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং এমন লোকদের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন, যাদের কথা ভাল এবং কাজ মন্দ।

এখন আমরা খুশুকারীদের কয়েকটি প্রাণোদ্দীপক কাহিনী লিপিবদ্ধ করছি।

প্রকাশ থাকে যে, খুশু ঈমান ও বিশ্বাসের ফল। এটা আল্লাহ তাআলার প্রতাপ ও মাহাত্ম্যের উপলব্ধি থেকে অর্জিত হয়। যে খুশু অর্জন করে, সে নামাযে এবং নামাযের বাইরে খুশু করে। এমনকি, নির্জনে এবং পায়খানায়ও খুশু করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অবগত– এ জ্ঞানই খুশুর কারণ। এছাড়া আল্লাহর মাহাত্ম্য ও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জ্ঞান থেকেও খুশু সৃষ্টি হয়। এ তিনটি জ্ঞান কেবল নামাযের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণেই জনৈক মনীষী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে লজ্জাবোধ ও খুশুর কারণে চল্লিশ বছর পর্যন্ত মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করেননি। রবী ইবনে খায়সাম দৃষ্টি ও মস্তক এতটা নত রাখতেন যে, কিছু লোক তাঁকে অন্ধ মনে করত। তিনি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর গৃহে কুড়ি বছর পর্যন্ত যাতায়াত করেন। তাঁর বাঁদী খায়সামাকে দেখে বলত ঃ আপনার অন্ধ বন্ধু আগমন করেছেন। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) একথা শুনে মুচকি হাসতেন। তিনি যখন দরজার কড়া নাড়া দিতেন, তখন বাঁদী বের হয়ে তাঁকে নতমস্তক ও চক্ষু মুদিত অবস্থায় দেখতে পেত।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) তাঁকে দেখে বলতেন ঃ

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ

অর্থাৎ, অনুনয়কারীদেরকে সুসংবাদ শুনাও।

তিনি আরও বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে দেখলে খুবই প্রীত হতেন । একদিন তিনি হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর সাথে কর্মকারদের মধ্যে গেলেন। যখন আগুনের শিখা প্রজ্বলিত দেখলেন, তখন সজোরে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন । হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) নামাযের সময় পর্যন্ত তাঁর শিয়রে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ফিরে এল না। অবশেষে তাঁকে পিঠে তুলে আপন গৃহে নিয়ে গেলেন। পরের দিন প্রায় সেই সময়ে তাঁর হুশ হল, যে সময়ে বেহুশ হয়েছিলেন । ফলে পাঁচটি নামায তাঁর কাযা হয়ে গেল। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) তাঁর শিয়রে বসে বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, ভয় একেই বলে। এই রবী ইবনে খায়সম বলতেন ঃ আমি এমন কোন নামায পড়িনি, যাতে এ ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করেছি, আমি কি বলি এবং আমাকে কি বলা হবে। আমের ইবনে আবদুল্লাহ নামাযে খুশুকারীদের অন্যতম

ছিলেন। তিনি যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর কন্যা দফ্ (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাত এবং মহিলারা পরস্পর ইচ্ছামত কথাবার্তা বলত । কিন্তু তিনি কিছুই শুনতেন না এবং বুঝতেন না। একদিন কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন কোন কথা বলে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমার দন্ডায়মান হওয়া এবং সেখান থেকে দু'গৃহের মধ্যে থেকে একটির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা মনে উদয় হয়। কেউ বলল ঃ আমাদের মনে দুনিয়ার যেসব কথাবার্তা আসে, সেগুলো আপনি অন্তরে পান ? তিনি বললেন ঃ যদি আমার দেহে বর্শা বিদ্ধ হয়ে এপার ওপার চলে যায়, তবে এটা আমার কাছে নামাযে দুনিয়ার কথা চিন্তা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। মুসলিম ইবনে ইয়াসারও এমনি বুযুর্গ ছিলেন । নামায পড়ার সময় মসজিদের একাংশ ভূমিসাৎ হয়েছিল; কিন্তু তিনি তা টের পারননি। জনৈক বুযুর্গের একটি অঙ্গ পচে যাওয়ার কারণে তা কেটে ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি তাতে সম্মত হলেন না। এক ব্যক্তি বলল ঃ নামাযের মধ্যে তিনি কোন কষ্ট টের পান না। সেমতে নামাযে থাকা অবস্থায় তাঁর অঙ্গ কর্তন করা হল । জনৈক বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ নামাযের মধ্যে আপনার মন দুনিয়ার কোন কথা চিন্তা করে কি? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ নামাযের মধ্যেও করে না এবং নামাযের বাইরেও করে না। কোন কোন বুযুর্গ কুমন্ত্রণার ভয়ে সংক্ষেপে নামায পড়তেন। বর্ণিত আছে, আম্মার ইবনে ইয়াসির সংক্ষেপে একটি নামায আদায় করলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সংক্ষেপে পড়লেন কেন? তিনি বললেন ঃ তুমি দেখেছ, আমি নামাযের সীমা একটুও হ্রাস করিনি। আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে পড়েছি। বর্ণিত আছে, হযরত তালহা ও যুবায়র (রাঃ) সর্বাধিক সংক্ষিপ্ত নামায পড়তেন । তাঁরা বলতেন ঃ এতটুকু দ্বারা আমরা শয়তানের কুমন্ত্রণা পশ্চাতে ফেলে দেই। আবুল আলিয়াকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ (যারা তাদের নামাযে উদাসীন)– এ আয়াতে কাদের কথা বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন ঃ যারা জানে না, কত রাকআতের পর নামায শেষ হবে। হাসান বসরী বলেন ঃ আয়াতে তাদের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের সময় নামায পড়তে ভুলে যায়; এমনকি সময় অতিবাহিত হয়ে যায় । কেউ

কেউ বলেন ঃ যারা প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়া সওয়াব এবং বিলম্বে পড়া গোনাহ মনে করে না। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এক নামায পড়লেন এবং তাঁর কেরাআতে একটি আয়াত ছেড়ে দিলেন। নামায শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কেরাআতে কি পাঠ করেছি ? সকলেই চুপ করে রইল। হযরত উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আপনি অমুক সূরা পাঠ করেছেন এবং তার মধ্য থেকে অমুক আয়াতটি ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা জানি না, আয়াতটি মনসূখ হয়ে গেছে কি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) উবাইকে বাহবা দিয়ে অন্যদেরকে লক্ষ্যে করে বললেন ঃ তোমাদের কি হল, তোমরা নামাযে উপস্থিত হও এবং কাতার পূর্ণ কর। তোমাদের নবী তোমাদের সামনে থাকেন। কিন্তু তোমরা টের পাও না, তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে কি পাঠ করেন? শুন, বনী ইসরাঈলও এমন করেছিল । আল্লাহ তাআলা তাদের নবীর কাছে ওহী পাঠালেন –তোমার সম্প্রদায়কে বলে দাও, তোমরা আপন দেহ আমার সামনে রাখ এবং আপন কথা আমাকে দাও; কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে অনুপস্থিত থাক। তোমরা যা করছ, তা বাতিল। এ থেকে বুঝা যায়, ইমামের কেরাআত শ্রবণ করা ও বুঝা নিজে সূরা পাঠ করার স্থলাভিষিক্ত। মোট কথা, এসব কাহিনী একথা জ্ঞাপন করে যে, নামাযের মূল বিষয় হচ্ছে খুশু ও অন্তরের উপস্থিতি । গাফেল অবস্থায় কেবল নড়াচড়া করা আখেরাতে কম ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় আমাদেরকেও খুশুর তওফীক দান করুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইমামের করণীয়

প্রকাশ থাকে যে, নামাযের পূর্বে কেরাআত ও আরকানের মধ্যে এবং সালামের পরে ইমামের কিছু কিছু করণীয় রয়েছে। নামাযের পূর্বে ইমামের করণীয় ছয়টি ঃ

(১) যারা তাঁকে পছন্দ করে না, সে তাদের ইমামতি করবে না। যদি কতক লোক নাপছন্দ করে এবং কতক পছন্দ করে, তবে সংখ্যাধিক্যের অভিমত কার্যকর হবে। কিন্তু সংখ্যালঘু লোক সৎ ও দ্বীনদার হলে তাদের কথাই ধর্তব্য হওয়া উত্তম । হাদীসে আছে, তিন ব্যক্তির নামায তাদের মাথার উপরে উঠে না। এক, পলাতক গোলাম; দুই, যে মহিলার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তিন, এমন লোকদের ইমাম, যারা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। মুসল্লীদের অসন্তুষ্টির সাথে ইমামতি করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি তখনও নিষিদ্ধ যখন মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ বেশী আলেম ও কারী হয়। হাঁ, যদি সে ইমামতি না করে, তবে অন্য লোক আগে যেতে পারে। এসব ব্যাপার না থাকলে মুসল্লীরা আগে যেতে বললে আগে চলে যাবে। একে অপরকে ইমামতি করতে বলা মাকরূহ। কথিত আছে, তকবীর হয়ে যাওয়ার পর কিছু লোক ইমামতি করার জন্যে একে অপরকে বলার কারণে তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেয়া হয়। সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন । এর কারণ ছিল এই, তাঁরা ইমামতির জন্যে যোগ্যতম ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতেন অথবা নিজের জন্যে ভুলের আশংকা এবং মানুষের নামাযের ক্ষতিপূরণ দানের ভয় করতেন। কেননা, ইমাম মুক্তাদীদের নামাযের জন্যে দায়ী হয়ে থাকে। আরেক কারণ ছিল, তাঁদের মধ্যে যেব্যক্তি ইমামতিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁর অন্তর মুক্তাদীদের কাছে শরমের কারণে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ে যেত; বিশেষতঃ সরবে কেরাআত পড়ার অবস্থায়। ফলে নামাযে এখলাস থাকত না।

(২) কাউকে আযান ও ইমামতির মধ্যে কোন একটি গ্রহণ করার

স্বাধীনতা দেয়া হলে তার উচিত ইমামতি গ্রহণ করা। কেননা, উভয়টি ফযীলতের কাজ হলেও একই ব্যক্তির জন্য উভয় কাজ করা মাকরূহ । ইমাম ও মুয়াযযিন ভিন্ন ভিন্ন লোক হওয়া উচত। উভয়টি যখন একত্রিত করা যায় না, তখন ইমামতিই উত্তম। কেউ কেউ আযান উত্তম বলেছেন। আমরা এর ফযীলত ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আযান উত্তম হওয়ার আরেক কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন–

الامام ضامن والمؤذن مؤتمن

অর্থাৎ, ইমাম জামানতদার এবং মুয়াযযিন আমানতদার।

এতে জানা গেল, ইমামতির মধ্যে জামানতের আশংকা আছে। আরও এরশাদ হয়েছে–

الامام امير فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا

অর্থাৎ, ইমাম শাসক, যখন সে রুকু করে তোমরা রুকু কর এবং যখন সে সেজদা করে তখন তোমরা সেজদা কর।

হাদীসে আরও আছে– যদি ইমাম নামায পুর্ণ করে, তবে সওয়াব সে এবং মুক্তাদী সকলেই পাবে। আর যদি অপূর্ণ নামায পড়ে, তবে শাস্তি তারই হবে– মুক্তাদীদের নয়। এজন্যই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ইমামদেরকে সৎপথ দেখান এবং মুয়াযিনদেরকে ক্ষমা করুন।

অতএব মাগফেরাত তলব কারা উচিত। কেননা, সৎপথ প্রার্থনাও মাগফেরাতের জন্যেই হয়।

এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি এক মসজিদে সাত বছর ইমামতি করে তাঁর জন্যে জান্নাত ওয়াজিব। আর যে চল্লিশ বছর আযান দেয়, সে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বর্ণিত আছে, এতদসত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম ইমামতি একে অপরের উপর ন্যস্ত করতেন। বিশুদ্ধ উক্তি হচ্ছে, ইমামতি উত্তম। কেননা, রসূলে করীম (সাঃ), হযরত আবু বকর ও

হযরত ওমর (রাঃ) স্থায়ীভাবে ইমামতি করেছেন। এটা ঠিক, এতে জামানতের আশংকা আছে; কিন্তু ফযীলতও আশংকার সাথেই হয়ে থাকে। যেমন শাসক ও খলীফা হওয়া উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ ন্যায়পরায়ণ শাসকের একদিন সত্তর বছরের এবাদত থেকে উত্তম। বলাবাহুল্য, এটাও আশংকামুক্ত নয়। ইমামতি উত্তম বিধায় ইমামের অধিক আলেম হওয়া ওয়াজিব। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ ইমাম তোমাদের শাফায়াতকারী হবে। সুতরাং তোমরা নামায সাফ করতে চাইলে তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে ইমাম বানাও ।

জনৈক মনীষী বলেন ঃ পয়গম্বরগণের পর আলেমদের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। আলেমগণের পর ইমামগণের চেয়ে উত্তম কেউ নেই। কেননা, এ তিনটি পক্ষই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মখলুকের মধ্যে মাধ্যম। পয়গম্বরগণ নবুওয়তের কারণে; আলেমগণ এলেমের কারণে এবং ইমামগণ দ্বীনের প্রধান স্তম্ভ নামাযের কারণে এবং সাহাবায়ে কেরাম হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর খেলাফতকে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্যে একেই প্রমাণস্বরূপ উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেছিলেন ঃ নামায ধর্মের স্তম্ভ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যাঁকে আমাদের দ্বীনের জন্যে পছন্দ করেছিলেন, তাঁকেই আমরা আমাদের দুনিয়ার জন্যে পছন্দ করলাম। সাহাবায়ে কেরাম হযরত বেলালকে খেলাফতের জন্যে পছন্দ করেননি এবং এই যুক্তি দেননি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে আযানের জন্যে পছন্দ করেছিলেন। আযান উত্তম। তাই তাঁকেই খেলাফতের জন্যে পছন্দ করে নেই।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলঃ আমাকে এমন আমল বলে দিন, যদ্দারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তিনি বললেন ঃ তুমি মুয়াযযিন হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটা আমা দ্বারা হবে না। তিনি বললেন ঃ তবে ইমাম হয়ে যাও। সে বলল ঃ এটাও সম্ভব নয়। তিনি বললেন ঃ তবে ইমামের পেছনে নামায পড়। এ হাদীসে অগ্রে আযানের কথা বলার কারণে আযানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্ভবতঃ মনে করেছিলেন, লোকটি ইমামতি করতে রাজি হবে না। কেননা, আযান তার ইচ্ছাধীন কাজ। ইমামতি অন্যরা নিযুক্ত করলে এবং আগে বাড়িয়ে দিলে হয়। তাই প্রথমে মুয়াযযিন হতে বলেছেন।

(৩) ইমাম নামাযের সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়বে। কেননা, আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত শেষ ওয়াক্তের উপর এমন, যেমন পরকালের ফযীলত ইহকালের উপর। হাদীসে আছে, বান্দা শেষ ওয়াক্তে নামায পড়ে, এতে তার নামায ফউত হয় না; কিন্তু আউয়াল ওয়াক্ত তার জন্যে পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সবকিছু থেকে উত্তম ছিল। জামাআত বড় হবে– এই আশায় নামায দেরীতে আদায় করা উচিত নয়; বরং আউয়াল ওয়াক্তের ফযীলত হাসিলে তৎপর হওয়া উচিত। নামাযে লম্বা সূরা পাঠ করবে। এটা জামাআত বড় হওয়ার তুলনায় উত্তম। মনীষীগণ দুব্যক্তি এসে গেলে জামাআতের জন্যে তৃতীয় জনের অপেক্ষা করতেন না এবং জানাযায় চার জন এসে গেলে পঞ্চম জনের অপেক্ষা করতেন না। একবার সফরে ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওযুর কারণে বিলম্ব হয়ে গেলে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করা হয়নি। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমাম করে দেয়া হলে তিনি নামায পড়লেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জামাআতের সাথে এক রাকআত ফউত হয়ে যায়। তিনি তা পড়ার জন্যে দণ্ডায়মান হলেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এ ঘটনার জন্যে আমরা মনে মনে ভীত ছিলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা ঠিকই করেছ এবং ভবিষ্যতেও তাই করবে। একবার যোহরের নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেরী হয়ে গেলে মুসল্লীরা হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সামনে বাড়িয়ে দিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আগমন করলেন, তখন সকলেই নামাযে ছিল, তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুয়াযযিন ইমামের জন্যে অপেক্ষা করবে– ইমাম মুয়াযযিনের জন্যে নয়। ইমাম এসে গেলে অন্য কারও জন্যে অপেক্ষা করা যাবে না।

(৪) ইমাম এখলাসের সাথে ইমামতি করবে এবং নামাযের সকল শর্তে আল্লাহ তাআলার আমানত আদায় করবে। এখলাস এই, ইমামতির জন্যে কোন পারিশ্রমিক নেবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসমান ইবনে আবুল আছ সকফীকে আমীর নিযুক্ত করে বললেন ঃ এমন ব্যক্তিকে মুয়াযযিন করবে, যে আযানের জন্যে পারিশ্রমিক না নেয়। আযান নামাযের সহায়ক উপায়। এর জন্য যখন পারিশ্রমিক না নিতে বলেছেন, তখন নামাযের জন্যে আরও উত্তমরূপে না নেয়া উচিত। ইমাম যদি মসজিদের জন্যে ওয়াকফকৃত আমদানী থেকে নিজের ভরণ-পোষণ নিয়ে

নেয় অথবা বাদশাহের কাছ থেকে অথবা জনগণের কাছ থেকে কিছু পায়, তবে এটা নেয়া হারাম নয়, কিন্তু মাকরূহ। তারাবীহর ইমামতির জন্যে পারিশ্রমিক নেয়া ফরয নামাযের ইমামতির জন্যে নেয়া অপেক্ষা অধিক মাকরূহ। এ পারিশ্রমিক ইমাম নিজের নিয়মিত উপস্থিতি এবং মসজিদের সাজসরঞ্জাম দেখাশোনা করার বিনিময়ে মনে করে নেবে– নামাযের বিনিময় নয়। আমানত হল, অন্তরে পাপাচার, কবীরা গোনাহ ও সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র থাকা। ইমামতির দায়িত্ব পালনকারীকে এসব বিষয় থেকে যথাসাধ্য বেঁচে থাকা উচিত। কেননা, সে মানুষের শাফায়াতকারী ও তাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশকারী হয়ে থাকে। কাজেই তাদের মধ্যে তাঁর উত্তম ব্যক্তি হওয়া উচিত। এমনিভাবে বেওযু হওয়া থেকে এবং নাপাকী থেকে পাক হতে হবে। কেননা, এসব বিষয় সম্পর্কে অন্য কেউ অবগত হয় না। সুতরাং নামাযের মধ্যে বেওযু হওয়ার কথা স্মরণ হলে অথবা ওযু নষ্ট হয়ে গেলে লজ্জা করবে না; বরং নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তির হাত ধরে তাকে খলীফা করে দেবে। নামায চলাকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাপাকীর কথা স্মরণ হলে তিনি খলীফা নিযুক্ত করে দেন এবং গোসল করে পুনরায় নামাযে শরীক হন। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ প্রত্যেক সৎ অসৎ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ে নাও; কিন্তু পাঁচ ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ো না–

(১) যে সর্বদা মদ্যপান করে, (২) প্রকাশ্য পাপাচারী, (৩) পিতামাতার নাফরমান, (৪) বেদআতী এবং (৫) পলাতক গোলাম।

(৫) কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত এবং ডানে-বামে না দেখা পর্যন্ত ইমাম নিয়ত বাঁধবে না। কাতারসমুহে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ইমাম তা ঠিক করে নিতে বলবে। আগেকার মনীষীগণ কাঁধে কাঁধ মিলাতেন এবং পরস্পরের হাঁটু মিলিয়ে নিতেন। মুয়াযযিন একামতের জন্যে এতটুকু অপেক্ষা করবে, যেন আহারকারী আহার শেষ করে নেয় এবং কেউ প্রস্রাব-পায়খানায় থেকে থাকলে তা থেকে ফারেগ হয়ে যায় । কারণ, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্রাব-পায়খানার চাপের মুখে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

(৬) ইমাম তকবীরে তাহরীমা ও সকল তকবীর সজোরে বলবে এবং মুক্তাদী এমনভাবে বলবে যেন নিজে শুনে। ইমাম তকবীর বলার পরে মুক্তাদী তকবীর বলবে; অর্থাৎ, ইমামের তকবীর শেষ হলে মুক্তাদী তকবীর শুরু করবে। একাকী নামায পড়ার সময় ইমামতির নিয়ত করে

দাঁড়াবে, যাতে সওয়াব পাওয়া যায়। যদি ইমামতির নিয়ত না করে এবং লোকেরা এসে তাঁর এক্তেদার নিয়ত করে, তবে সকলের নামায হয়ে যাবে এবং মুক্তাদীরা জামাআতের সওয়াবও পাবে; কিন্তু ইমাম ইমামতির সওয়াব পাবে না।

কেরাআতের মধ্যে ইমামকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন– (১) শুরুর দোয়া, আঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হবে। আলহামদু ও অন্য সূরা ফজরের উভয় রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু'রাকআতে সজোরে পড়বে। একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তিও এমনিভাবে পড়বে।

(২) সূরা পাঠ করার পর রুকুর পূর্বে ইমাম সামান্য বিরতি দেবে, যাতে কেরাআত রুকুর তকবীর থেকে আলাদা হয়ে যায়। কেরাআত তকবীরের সাথে মিলিয়ে দিতে হাদীসে নিষেধ আছে।

ফজরের নামাযে মাসানী থেকে দুটি সূরা পড়বে– যাতে একশ' আয়াতের কম থাকে। ফজরের নামাযে দীর্ঘ কেরাআত পড়া সুন্নত । কোন কোন আলেম সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা মাকরূহ লেখেছেন। এটা তখন যখন কোন সূরার প্রথমাংশ পড়ে ছেড়ে দেয়। অথচ হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সূরা ইউনুসের কিছু অংশ পাঠ করেছেন। যখন মূসা (আঃ) ও ফেরআউনের আলোচনা এসেছে, তখন রুকুতে চলে গেছেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, তিনি ফজরের নামাযে সূরা বাকারার এক আয়াত– قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا কে এক রাকআতে এবং দ্বিতীয় রাকআতে– رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ পাঠ করেছেন। তিনি শুনলেন, বেলাল বিভিন্ন সূরা থেকে পাঠ করেন। তাঁকে এর কারণে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি উৎকৃষ্টকে উৎকৃষ্টের সাথে মিলিয়ে পড়ি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, বেশ তাই কর। যোহরের নামাযে তিওয়ালে মুফাসসাল ত্রিশ আয়াত পর্যন্ত, আছরে এর অর্ধেক এবং মাগরিবে মুফাসসালের শেষ আয়াতসমূহ অথবা শেষ সূরাসমূহ পাঠ করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সর্বশেষ যে মাগরিবের নামায পড়েছিলেন, তাতে সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। এর পর ওফাত পর্যন্ত তিনি নামায পড়েননি। সারকথা, সংক্ষিপ্ত কেরাআত পাঠ করা উত্তম; বিশেষতঃ যখন জামাআত খুব বড় হয়। এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ লোকজনকে নামায পড়ায়, তখন সংক্ষিপ্ত কেরাআত

পড়বে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কাজের লোক থাকে। একাকী পড়লে যত ইচ্ছা লম্বা কেরাআত পড়বে। হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) এক জনগোষ্ঠীকে এশার নামায পড়াতেন। একদিন তিনি তাতে সূরা বাকারা পাঠ করলেন। এক ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিয়ে আলাদা পড়ে নিল। লোকেরা বলাবলি করল, লোকটি মোনাফেক হয়ে গেছে। লোকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি মুয়ায ইবনে জাবালকে শাসিয়ে বললেন ঃ তুমি কি মানুষকে বিপদে ফেলতে এবং ধর্মচ্যুত করতে চাও? তুমি সূরা আ'লা, সূরা তারেক ও সূরা যুহা পাঠ কর।

নামাযের রোকনসমূহের মধ্যে ইমাম রুকু ও সেজদা হালকা করবে এবং তিন বারের বেশী তসবীহ পড়বে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের চেয়ে পূর্ণাঙ্গ নামায আর কারও দেখিনি। এ নামায হালকাও হত এবং পূর্ণরূপে আদায় হত। বর্ণিত আছে, হযরত আনাস (রাঃ) হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে নামায পড়লেন যখন তিনি মদীনার গভর্নর ছিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি এই যুবকের নামাযকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাযের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছি। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমরা ওমর ইবনে আবদুল আজীজের পেছনে দশ দশ বার তসবীহ বলতাম। এটা ভাল; কিন্তু জামাআত বড় হলে তিন বার বলা উত্তম। জামাআতে কেবল দ্বীনদার সাধক শ্রেণীর লোক থাকলে দশ বার বলায় ক্ষতি নেই। মুক্তাদীরা ইমামের আগে কোন কিছু করবে না; বরং রুকু ও সেজদায় তাঁর পশ্চাতে যাবে। ইমামের মাথা মাটিতে না পৌঁছা পর্যন্ত মুক্তাদী সেজদার জন্যে নত হবে না। সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এক্তেদা এভাবেই করতেন। ইমাম রুকুতে ভালরূপে না যাওয়া পর্যন্ত মুক্তাদী রুকুর জন্যে নত হবে না। সালাম ফেরানোর সময় ইমাম উভয় সালামে মুসল্লী ও ফেরেশতাদের নিয়ত করবে। ফরয নামায পড়ার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র নফল নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এরূপই করেছেন। হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের পর নিম্নোক্ত দোয়া বলা পর্যন্ত বসে থাকতেন–

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইমামতির এসব নিয়ম-নীতি পালন করার তওফীক দিন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুমআর ফযীলত

জানা উচিত, জুমআর দিন একটি মহান দিন। আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে ইসলামকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং একে মুসলমানের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, যখন জুমআর দিন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর যিকিরের দিকে ত্বরা করবে এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ রাখবে।

এ আয়াতে দুনিয়ার কাজকর্মে মশগুল হওয়া এবং জুমআয় যাওয়ার পরিপন্থী সকল কাজ-কারবার হারাম করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ان الله عزوجل فرض عليكم الجمعة فى يومى هذا فى مقامى هذا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর জুমআ ফরয করেছেন আমার এদিনে ও এ স্থানে। এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে ঃ

من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر طبع الله على قلبه ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি বিনা ওযরে তিন বার জুমআ তরক করে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বলল ঃ অমুক ব্যক্তি মারা গেছে। সে জুমআ ও জামাআতে উপস্থিত হত

না। এখন তার অবস্থা কি হবে? তিনি বললেন ঃ সে দোযখী । লোকটি একমাস পর্যন্ত তাঁর কাছে এসে এ প্রশ্নই করল এবং তিনি উত্তর দিলেন, সে দোযখী। হাদীসে আছে, ইহুদী ও খ্রীস্টানদেরকে জুমআর দিন দেয়া হলে তারা এতে বিরোধ করল। তাই তাদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। এ উম্মতের জন্যে একে ঈদ করা হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমার কাছে হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তাঁর হাতে একটি উজ্জ্বল আয়না ছিল। তিনি বললেন ঃ এটা জুমআ । যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন, যাতে আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্যে এটা ঈদ হয় । আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ জুমআ দিয়ে আমাদের কি উপকার হবে? তিনি বললেন ঃ এতে একটি সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত আছে। যেব্যক্তি এ মুহূর্তে নিজের কল্যাণের জন্যে দোয়া করবে, যদি সেই কল্যাণ তার নসীবে না থাকে, তবে তার তুলনায় অনেক বেশী তার জন্য সঞ্চিত রাখবেন। অথবা কেউ এ মুহূর্তে কোন বালা মসিবত থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলে যদি সেই বালা মসিবত তার নসীবে লেখা থাকে, তবে আল্লাহ তাআলা বালা-মুসিবত অপেক্ষা বড় বালা-মসিবত থেকেও তাকে রক্ষা করবেন। আমাদের কাছে এদিন সকল দিনের সর্দার। আমরা একে আখেরাতে يوم المزيد বৃদ্ধির দিন বলব। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আপনার পরওয়ারদেগার জান্নাতে একটি শুভ্র ও মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত উপত্যকা নির্দিষ্ট করেছেন। জুমআর দিন হলে তিনি ইল্লিয়্যীন থেকে তথায় তাঁর সিংহাসনে অবতরণ করবেন এবং মানুষের জন্যে দ্যুতি বিকিরণ করবেন, যাতে তারা তাঁকে দেখতে পায়। এক হাদীসে আছে, যে সর্বোত্তম দিনের উপর সূর্য উদিত হয়েছে, তা হচ্ছে জুমআর দিন। এদিনে হযরত আদম (আঃ) সৃজিত হয়েছেন। এদিনেই তাঁকে জান্নাতে দাখিল করা হয়েছে। এদিনেই তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয়েছে। এদিনেই তাঁর তওবা কবুল হয়েছে। এদিনেই তাঁর ওফাত হয়েছে। এদিনেই কেয়ামত সংঘটিত হবে। এদিন আল্লাহর কাছে বৃদ্ধির দিন। আকাশে ফেরেশতারা একে তা-ই বলে। এদিনেই জান্নাতে খোদায়ী দীদার হবে।

হাদীসে আছে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জুমআর দিনে ছয় লক্ষ

বান্দাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যখন জুমআর দিন সহি-সালামত থাকে, তখন অন্য দিনও সহি-সালামত থাকে। তিনি আরও বলেছেন ঃ প্রত্যহ সূর্য যখন আকাশের মাঝখানে থাকে, তখন দোযখ উত্তপ্ত করা হয়। তখন নামায পড়ো না; কিন্তু জুমআর দিন সবটুকুই নামাযের সময়। এদিনে দোযখ উত্তপ্ত করা হয় না। হযরত কা'ব বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা শহরসমূহের মধ্যে মক্কা মোয়াযযমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, মাসসমূহের মধ্যে রমযানকে, দিনসমূহের মধ্যে জুমআকে এবং রাত্রিসমূহের মধ্যে শবে কদরকে ফযীলত দিয়েছেন। কথিত আছে, পক্ষীসমূহ এবং ইতর কীট-পতঙ্গ জুমআর দিনে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং বলে ঃ সালাম, সালাম, এটা ভাল দিন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে শহীদের সওয়াব লেখেন এবং কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দেন।

জুমআর শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য নামাযে যেসব শর্ত রয়েছে, সেগুলো জুমআর মধ্যেও শর্ত। কিন্তু কয়েকটি অতিরিক্ত শর্ত জুমআর মধ্যে রয়েছে, যা অন্যান্য নামাযে নেই। প্রথমতঃ যোহরের সময় হওয়া। সুতরাং যদি জুমআর নামাযে ইমামের সালাম আসরের সময়ে পড়ে যায়, তবে জুমআ বাতিল হবে। তখন ইমামের জন্যে জরুরী হবে, দু'রাকআত আরও বাড়িয়ে যোহর পূর্ণ করা। দ্বিতীয়তঃ জুমআর জন্যে উপযুক্ত স্থান শর্ত। সুতরাং জঙ্গলে, বিজন স্থানে ও তাঁবুতে জুমআর নামায হয় না। এর জন্যে অস্থাবর দালান বিশিষ্ট স্থান জরুরী। তৃতীয়তঃ জামাআত হওয়া শর্ত। শাফেয়ী মাযহাবে কমপক্ষে চল্লিশ জন এবং হানাফী মাযহাবে ইমামসহ তিন জন হওয়া জরুরী। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহরের কয়েক জায়গায় জুমআ হলে যে ইমাম শ্রেষ্ঠ, তাঁর পেছনে জুমআ পড়া উত্তম। এক্ষেত্রে মুসল্লীদের সংখ্যাধিক্যও লক্ষণীয় ব্যাপার। চতুর্থতঃ দু'খোতবা দেয়া এবং উভয় খোতবার মাঝখানে বসা। প্রথম খোতবায় চারটি বিষয় থাকা ওয়াজিব– (১) আল্লাহর প্রশংসা করা এবং কমপক্ষে আলহামদু লিল্লাহ বলা, (২) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা,

(৩) তাকওয়ার উপদেশ দেয়া এবং (৪) কোরআন পাক থেকে একটি আয়াত পাঠ করা। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় খোতবায়ও এ চারটি বিষয় ওয়াজিব। কিন্তু আয়াত পাঠের জায়গায় দোয়া পাঠ করা ওয়াজিব। উভয় খোতবা শ্রবণ করাও ওয়াজিব।

প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান মুসলমান ব্যক্তির উপর জুমআ ফরয। যাদের উপর জুমআ ফরয তাদের জন্যে বৃষ্টি, কর্দমাক্ততা, ভয়, অসুস্থতা ও অসুস্থ ব্যক্তির দেখাশুনা করার ওযরে জুমআ তরক করার অনুমতি আছে। তাদের জন্যে জুমআর নামায শেষ হওয়ার পর যোহর পড়া মোস্তাহাব। যদি জুমআর নামাযে গোলাম, মুসাফির ও মগ্ন ব্যক্তি হাযির হয় তবে তাদের জুমআ দুরস্ত হবে। যোহরের নামায পড়তে হবে না।

জুমআর আদব

জুমআর ফযীলত লাভের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার থেকে তৎপর হওয়া উচিত। সেমতে আসরের পর দোয়া, এস্তেগফার ও তসবীহ পাঠে মশগুল হবে। কেননা, এ সময়টি জুমআর মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তের সমান ফযীলত রাখে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের জীবিকা ছাড়া আরও একটি অনুগ্রহ আছে, যা থেকে তিনি তাকে দেন, যে তাঁর কাছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এবং জুমআর দিন তা তলব করে। বৃহস্পতিবার দিন কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার করবে। সুগন্ধিও যোগাড় করবে। এ রাত্রে জুমআর দিনে রোযা রাখার নিয়ত করবে। এর অনেক সওয়াব। কিন্তু এর সাথে বৃহস্পতিবার অথবা শনিবারের রোযা মিলিয়ে নেবে। কেননা, শুধু জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ। এ রাত্রিটি নামায ও খতমে কোরআনে অতিবাহিত করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কেউ কেউ এ রাতে স্ত্রীসহবাস মোস্তাহাব বলেছেন। তাঁরা এ হাদীসের উদ্দেশ্য তাই বলেছেন ঃ رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغتسل

আল্লাহ রহম করুন সেই ব্যক্তির প্রতি, যে প্রথম ওয়াক্তে জুমআয় আসে, শুরু থেকে খোতবা শুনে এবং গোসল করায় ও গোসল করে। এখানে গোসল করায় অর্থ স্ত্রীকে গোসল করায়। এসব কাজ করলে পূর্ণরূপে জুমআকে স্বাগত জানানো হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি গাফেলদের

শ্রেণী থেকে বের হয়ে যাবে, যারা সকাল বেলায় জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্ দিন? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ জুমআর পূর্ণ অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে একদিন পূর্ব থেকে এর অপেক্ষা করে। আর ক্ষুদ্র অংশ সেই ব্যক্তি পায়, যে সকালে জিজ্ঞেস করে, আজ কোন্ দিন? কোন কোন বুযুর্গ জুমআর পূর্ব রাতে জামে মসজিদেই থাকতেন।

জুমআর দিন ফজর হতেই গোসল করা উচিত, যদিও তখন জামে মসজিদে না যায়। কিন্তু এর কাছাকাছি সময়েই মসজিদে যাওয়া উচিত, যাতে গোসল ও মসজিদে যাওয়া কাছাকাছি সময়ে হয়। জুমআর দিন গোসল করা তাকিদসহ মোস্তাহাব। কোন কোন আলেম একে ওয়াজিব বলেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم -

অর্থাৎ, জুমআর গোসল প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব।

এক মশহুর হাদীসে আছে–

من اتى الجمعة فليغتسل -

অর্থাৎ, যে জুমআয় উপস্থিত হয়, তার গোসল করা উচিত।

মদীনার মুসলমানরা কাউকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে এরূপ বলত ঃ তুমি তার চেয়েও খারাপ, যে জুমআর দিন গোসল করে না।

একবার হযরত ওমর (রাঃ) জুমআর খোতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত ওসমান (রাঃ) মসজিদে আগমন করলেন। এ সময়ে আগমন খারাপ মনে করে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এটা কোন্ সময়? অর্থাৎ, আগে এলেন না কেন? হযরত ওসমান (রাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ আমি আযান শুনার পর দেরী করিনি। ওযু করেই চলে এসেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ একটি নয়, দুটি হল। আপনি তো জানেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকিদ সহকারে জুমআর দিন গোসল করার জন্যে বলতেন। আপনি কেবল ওযু করলেন। এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন ওযু করে, সে ভাল করে। আর যে গোসল করে সে সর্বোত্তম কাজ করে। এ থেকে জানা গেল, গোসল তরক করাও জায়েয।

জুমআর দিন সাজসজ্জা করা মোস্তাহাব। তিনটি বিষয় সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত– পোশাক, পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা। পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রয়েছে মেসওয়াক করা, চুল কাটা, নখ কাটা ও গোঁফ কাটা। এছাড়া পবিত্রতা অধ্যায়ে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও করা উচিত। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন নখ কাটে, আল্লাহ তাআলা তার নখ থেকে রোগ দূর করে দেন। নিজের কাছে যে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি থাকে, তা জুমআর দিন ব্যবহার করবে, যাতে দুর্গন্ধ দূর হয় এবং উপস্থিত মুসল্লীরা আরাম বোধ করে। পুরুষদের জন্যে উত্তম সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকট এবং রং অস্পষ্ট। পক্ষান্তরে নারীদের জন্যে সেই সুগন্ধি উত্তম, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ গোপন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখে, তার মনোকষ্ট কম হয় এবং যার সুগন্ধি উৎকৃষ্ট, তার বুদ্ধি বাড়ে। সাদা পোশাক সর্বোত্তম। আল্লাহ তা'আলার কাছে সাদা পোশাক অধিক পছন্দনীয়। কাল পোশাকে কোন সওয়াব নেই। কেউ কেউ কাল পোশাকের দিকে তাকানো মাকরূহ বলেছেন। জুমআর দিনে পাগড়ী পরিধান করা মোস্তাহাব। ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ জুমআর দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। সুতরাং গরমে কষ্ট হলে নামাযের পূর্বে ও পরে পাগড়ী খুলে ফেলায় দোষ নেই।

জামে মসজিদে সকালেই রওয়ানা হওয়া উচিত। এর সওয়াব অনেক। যাওয়ার সময় খুশু সহকারে থাকবে। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত মসজিদে এতেকাফের নিয়ত করবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে আউয়াল ওয়াক্তে যায় সে যেন একটি উট কোরবানী করে; যে দ্বিতীয় প্রহরে যায়, সে যেন একটি গরু কোরবানী করে; যে তৃতীয় প্রহরে যায়, সে যেন শিংবিশিষ্ট ভেড়া কোরবানী করে; যে চতুর্থ প্রহরে যায়, সে যেন খোদার পথে মুরগী যবেহ করে এবং যে পঞ্চম প্রহরে যায়, সে যেন একটি ডিম আল্লাহর জন্যে উৎসর্গ করে। ইমাম যখন খোতবার জন্যে বের হয়ে আসেন, তখন আমলনামা বন্ধ করে দেয়া হয়, কলম তুলে নেয়া হয় এবং ফেরেশতারা মিম্বরের কাছে সমবেত হয়ে যিকির শ্রবণ করে। এ সময় যারা আসে তারা কোন সওয়াব পায় না। সূর্যোদয় পর্যন্ত প্রথম

ওয়াক্ত, এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রহর, রৌদ্র প্রখর থাকা পর্যন্ত তৃতীয় প্রহর এবং এ সময় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত চতুর্থ ও পঞ্চম প্রহর। এ দু'প্রহরে সওয়াব কম । সূর্য ঢলে পড়ার পর নামাযের সময়। এতে কোন সওয়াব নেই। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষ জানত, তবে সেগুলোর জন্যে মানুষ সওয়ারীতে বসে রওয়ানা হয়ে যেত– (১) আযান, (২) জামাআতের প্রথম সারি এবং (৩) ভোরে জুমআর নামাযের জন্যে মসজিদে যাওয়া ।

এক হাদীসে আছে, জুমআর দিন ফেরেশতারা হাতে রূপার কাগজ ও স্বর্ণের কলম নিয়ে জামে মসজিদের দরজাসমূহে বসে যায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরে আগমনকরীদের নাম লিপিবদ্ধ করে। এক হাদীসে আছে, যখন কোন বান্দা জুমআর দিনে দেরী করে, তখন ফেরেশতারা তাকে তালাশ করে এবং তার অবস্থা একে অপরের কাছে জিজ্ঞেস করে। তারা বলে ঃ ইলাহী, যদি দারিদ্র্যের কারণে তার দেরী হয়ে থাকে, তবে তাকে ধনাঢ্য কর। রোগের কারণে দেরী হয়ে থাকলে তাকে সুস্থতা দান কর। কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দেরী হলে তাকে অবসর দান কার। কোন খেলার কারণে দেরী হয়ে থাকলে তার অন্তর এবাদতের দিকে ফিরিয়ে দাও। প্রথম শতাব্দীতে সেহরীর সময় এবং সোবহে সাদেকের পরে রাস্তা জনাকীর্ণ থাকত। লোকজন প্রদীপ হাতে জামে মসজিদে ঈদের দিনের মত দলে দলে গমন করত। আস্তে আস্তে এটা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইসলামে এটাই প্রথম বেদআত ছিল, লোকজন জুমআর দিন ভোরে মসজিদে যাওয়া ত্যাগ করল। ইহুদী খৃস্টানদের দেখেও মুসলমানের লজ্জা হয় না। তারা তাদের এবাদত গৃহে শনিবার ও রবিবার প্রত্যূষে যায়। দুনিয়াপ্রার্থীরাও ক্রয়-বিক্রয় মুনাফা উপার্জনের জন্যে খুব ভোরে বাজারে যায়। আখেরাতের প্রার্থীদের কি হল, তারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী হয় না? কথিত আছে, মানুষ যখন আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভ করবে, তখন তারা ততটুকু নৈকট্য পাবে, যতটুকু প্রত্যূষে জুমআয় গমন করবে। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) জামে মসজিদে খুব ভোরে গিয়ে দেখেন, তিন ব্যক্তি তাঁরও আগে মসজিদে বিদ্যমান রয়েছে। এতে তিনি দুঃখিত হলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বললেন ঃ চার জনের মধ্যে আমি চতুর্থ হলাম ।

জামে মসজিদে প্রবেশ করার পর মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে এবং সামনে দিয়ে যাবে না। অনেক আগে গেলে এরূপ করার প্রয়োজনই হবে না। মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তিকে পুল করে মানুষকে তার উপর দিয়ে যেতে বলা হবে। ইবনে জুরায়েজ থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর খোতবা দেয়ার সময় দেখলেন, এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে এসে বসে গেছে। নামাযের পর তিনি সেই লোকটির সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি আজ আমাদের সাথে জুমআয় শরীক হলে না? লোকটি বলল ঃ হুযুর, আমি তো জুমআয় উপস্থিত হয়েছি। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে দেখেছিলাম। এতে ইঙ্গিত আছে, লোকটির আমল বেকার হয়েছে। এক রেওয়ায়েতে আছে, লোকটি আরজ করল ঃ হুযুর আমাকে দেখেননি? তিনি বললেন ঃ আমি দেখেছি, তুমি দেরীতে এসেছ এবং মানুষকে কষ্ট দিয়েছ। হাঁ, প্রথম কাতার খালি পড়ে থাকলে মানুষের উপর দিয়ে যাওয়া দূষণীয় নয়। কারণ, তখন মানুষ নিজেরাই নিজেদের হক নষ্ট করে এবং ফযীলতের স্থান ছেড়ে দেয়। হযরত হাসান বলেন ঃ যারা জুমআর দিনে জামে মসজিদের দরজায়ই বসে যায়, তাদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাও। তাদের কোন ইযযত নেই।

নামায পড়ার সময় নামাযীর সামনে দিয়ে যাবে না। নামাযী নিজে স্তম্ভ অথবা প্রাচীরের কাছে বসবে, যাতে কেউ সামনে দিয়ে না যায়। নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে নামায ফাসেদ হয় না ঠিক; কিন্তু এটা নিষিদ্ধ । রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ মুসলমানের জন্যে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম। তিনি আরও বলেন ঃ মানুষের জন্যে ছাই ও ধুলা হয়ে বাতাসে উড়ে যাওয়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া অপেক্ষা ভাল। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কেউ জানত নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া কত বড় গোনাহ্, তবে চল্লিশ বছর দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্যে উত্তম হত। যদি স্তম্ভ, প্রাচীর অথবা বিছানো জায়নামাযের ভিতরের ভাগ দিয়ে কেউ গমন করে, তবে নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ নামাযীর উচিত তাকে হটিয়ে দেয়া। যদি না মানে তবে আবার হটিয়ে দেবে। যদি

এর পরও না মানে, তবে তার সাথে লড়াই করবে। কেননা, সে শয়তান। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ)-এর সামনে দিয়ে কেউ গেলে তিনি সজোরে ধাক্কা দিতেন। ফলে সে মাটিতে পড়ে যেত। প্রায়ই তিনি তাঁকে জড়িয়ে ধরতেন। মারওয়ানের কাছে এ অভিযোগ গেলে মারওয়ান বলতেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছেন । নামাযীর উচিত সামনে এক হাত দীর্ঘ কোন খুঁটি পুঁতে নেয়া, যাতে সীমা চিহ্নিত হয়ে যায়।

জুমআর নামাযে প্রথম কাতারে বসার চেষ্টা করবে। এর সওয়াব অনেক। রেওয়ায়েত আছে– যেব্যক্তি পরিবারের লোকজনকে গোসল করায়, নিজে গোসল করে, সকালে মসজিদে যায়, প্রথম খোতবা পায় এবং ইমামের কাছে থেকে খোতবা ও কেরাআত শ্রবণ করে, এটা তার জন্যে দু'জুমআর মধ্যবর্তী দিন এবং আরও তিন দিনের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়। অন্য এক রেওয়ায়েতে প্রথম কাতার অন্বেষণ করার কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি ইমামের কাছে এমন কোন বিষয় থাকে, যা পরিবর্তন করতে তুমি অক্ষম; যেমন ইমাম রেশমী বস্ত্র পরিহিত হলে অথবা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নামাযে এলে প্রথম কাতার থেকে পেছনে থাকা তোমার জন্যে উত্তম । কেননা, এমতাবস্থায় প্রথম কাতারে থাকলে তোমার ধ্যান বিক্ষিপ্ত হবে। কোন কোন আলেম এহেন অবস্থায় নিরাপত্তার খাতিরে প্রথম কাতার বর্জন করেছেন। বিশর ইবনে হারেসকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আমরা আপনাকে ভোর বেলায় মসজিদে আসতে দেখি। কিন্তু আপনি শেষ কাতারসমূহে নামায পড়েন। এটা কেন? তিনি বললেন ঃ অন্তরের নৈকট্য উদ্দেশ্য– দেহের নয়। এতে তিনি ইঙ্গিত করেছেন, পেছনের কাতারে থাকা অন্তরের জন্যে ভাল । সুফিয়ান সওরী শোয়ায়েব ইবনে হরবকে মিম্বরের কাছে আবু জাফর মনসুরের খোতবা শুনতে দেখলেন। নামাযান্তে সুফিয়ান শোয়ায়েবকে বললেন ঃ মনসুরের কাছে আপনাকে বসা দেখে আমি বিচলিত হয়েছি। যদি আপনি তার মুখে এমন কোন কথা শুনেন, যার প্রতিবাদ করা জরুরী হয়, তবে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন কি? এরা কাল পোশাকের বেদআত আবিষ্কার

করেছে। শোয়ায়েব বললেন ঃ হাদীসে কি ইমামের কাছে থাকতে এবং খোতবা শুনতে বলা হয়নি? সুফিয়ান বললেন ঃ এটা খোলাফায়ে রাশেদীনের বেলায় প্রযোজ্য। এদের কাছ থেকে তো যত দূরে থাকা যায়, ততই আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জিত হবে। হযরত সাঈদ ইবনে আমের বলেন ঃ আমি হযরত আবু দারদার সাথে নামায পড়ি। তিনি নামাযে পেছনের কাতারে যেতে লাগলেন। অবশেষে আমরা সর্বশেষ কাতারে চলে গেলাম । নামাযান্তে আমি তাঁকে বললাম ঃ প্রথম কাতার কি সব কাতার অপেক্ষা উত্তম নয়? তিনি বললেন ঃ হাঁ, কিন্তু এটা রহমতপ্রাপ্ত উম্মত। এ উম্মতের প্রতি রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নামাযে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন, তখন তার পেছনে যত মানুষ থাকে, সকলকে ক্ষমা করে দেন। অতএব আমি এই আশা নিয়ে সকলের পেছনে দাঁড়িয়েছি, সম্মুখের কাতারের যার প্রতি আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টি দেবেন, তাঁর ওসিলায় আমার মাগফেরাত হয়ে যাবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আবু দারদা এ বিষয়বস্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন। সুতরাং যেব্যক্তি এরূপ নিয়ত সহকারে পেছনের কাতারে থাকে, অন্যকে অগ্রগণ্য মনে করে এবং সচ্চরিত্রতা প্রদর্শন করে, তার জন্যে এতে কোন দোষ নেই। প্রকাশ থাকে যে, মিম্বরের সাথে সংলগ্ন পূর্ণ কাতারকে প্রথম কাতার ধরা হবে। সুতরাং মিম্বর যদি কোন কাতারকে কেটে দেয়, তবে মিম্বরের দু'পাশে যে কাতার, তা পূর্ণ কাতার নয়। তাই একে প্রথম কাতার ধরা হয় না। হযরত সুফিয়ান সওরী বলতেন ঃ মিম্বরের সম্মুখস্থ কাতার প্রথম কাতার। কেননা. এটাই মিম্বর সংলগ্ন কাতার । এতে উপবিষ্ট ব্যক্তি ইমামের সম্মুখে থাকে এবং তাঁর খোতবা শুনে। কিন্তু মিম্বরের প্রতি লক্ষ্য না করে যে কাতার কেবলার অধিক নিকটবর্তী, তাকে প্রথম কাতার বলা সম্ভবপর।

ইমাম যখন মিম্বর যান, তখন নামায বন্ধ করতে হবে এবং কথাবার্তাও মওকুফ করতে হবে। এ সময় খোতবা শ্রবণ করতে হবে। কোন কোন সাধারণ লোকের অভ্যাস এই, মুয়াযযিন আযান দিতে উঠলে তারা সেজদা করে। হাদীসে ও গুণীজন বাক্যে এর কোন ভিত্তি নেই। হযরত আলী ও হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি

চুপচাপ খোতবা শুনে তার জন্যে দুটি সওয়াব, যে খোতবা শুনে না এবং চুপ থাকে, তার জন্যে এক সওয়াব এবং যে শুনে বাজে কথা বলে, তার জন্যে দু'গোনাহ্ লেখা হয়। আর যেব্যক্তি শুনে না এবং বাজে কথা বলে, তার জন্যে এক গোনাহ্ লেখা হয়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من قال لصاحبه والامام يخطب انصت اوصه فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমাম খোতবা পাঠ করার সময় সঙ্গীকে বলে ঃ চুপ থাক, সে বাজে কথা বলে। আর যে বাজে কথা বলে তার জুমআ হয় না।

এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল, ইশারা করে অথবা কংকর নিক্ষেপ করে চুপ করাতে হবে– কথা বলে নয়। হযরত আবু যর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খোতবা পাঠ করছিলেন, তখন আমি উবাই ইবনে কাবকে প্রশ্ন করলাম, এ সূরা কবে নাযিল হয়েছিল। হযরত উবাই আমাকে চুপ থাকতে ইশারা করলেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বর থেকে নামার পর উবাই আমাকে বললেন ঃ যাও, তোমার জুমআ নেই। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেনঃ উবাই ঠিক বলেছে। যেব্যক্তি দূরে বসার কারণে খোতবা শুনতে অক্ষম, তার চুপ থাকা উচিত। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চার সময়ে নফল নামায মাকরূহ – ফজরের পরে, আসরের পরে, ঠিক দ্বিপ্রহরে এবং ইমাম যখন খোতবা দেন।

জুমআর নামায শেষ হলে কথা বলার পূর্বে সাত বার আলহামদু লিল্লাহ, সাত বার কুল হুয়াল্লাহু এবং সাত বার কুল আউযু সূরাদ্বয় পাঠ করবে। বর্ণিত আছে, যে এরূপ করবে সে এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় পাবে। জুমআর পরে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব ঃ

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا رَحِيْمُ يَا وَدُوْدُ اَغْنِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, হে অমুখাপেক্ষী, হে প্রশংসিত, হে প্রথমে সৃষ্টিকারী, হে পুনর্বার সৃষ্টিকারী, হে দয়ালু, হে প্রিয়, আমাকে আপনার হালাল রিযিক দ্বারা হারাম থেকে রক্ষা করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ব্যতীত সব কিছুর প্রতি অমুখাপেক্ষী করুন।

বর্ণিত আছে, কেউ যথারীতি এ দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাকে সৃষ্ট জীব থেকে বেপরওয়া করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌছান। এর পর জুমআর পরবর্তী ছয় রাকআত নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে দু'রাকআত, চার রাকআত এবং ছয় রাকআত পড়ার বিভিন্ন রূপ রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। এগুলো বিভিন্ন অবস্থায় দুরস্ত । অতএব ছয় রাকআত পড়লে সবগুলো রেওয়ায়েত পালিত হয়ে যাবে। জুমআ শেষে আসরের নামায পর্যন্ত মসজিদে থাকা উচিত । মাগরিব পর্যন্ত থাকলে আরও ভাল । বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জামে সমজিদে আসরের নামায পড়ে, সে হজ্জের সওয়াব পায় এবং যে মাগরিবের নামাযও পড়ে, সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পায় । যদি রিয়ার আশংকা থাকে অথবা মসজিদে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুল হওয়ার ভয় হয়, তবে আল্লাহর যিকির করতে করতে এবং তাঁর নেয়ামতের কথা ভাবতে ভাবতে গৃহে ফিরে আসাই উত্তম। এর পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্তর ও মুখের হেফাযত করবে, যাতে জুমআর দিনের উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি বিনষ্ট না হয়। জামে মসজিদে ও অন্যান্য মসজিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা উচিত নয় । রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এমন সময় আসবে, যখন মানুষ মসজিদসমূহে দুনিয়ার কথাবার্তা বলবে। তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার কোন সম্পর্কই নেই। তুমি তাদের কাছে বসো না ।

জুমআর দিনের অন্যান্য আদব

সকালে অথবা জুমআর নামাযের পরে অথবা আসরের পরে এলেমের মজলিসে উপস্থিত হবে। কিন্তু কিস্সাকথক ওয়ায়েযদের মজলিসে যাবে না। তাদের কথাবার্তায় কোন কল্যাণ নেই। আখেরাতের পথিক জুমআর সমস্ত দিন দান খয়রাত ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করবে, যাতে উৎকৃষ্ট মুহূর্তটি হাতছাড়া না হয়। নামাযের পূর্বে কোন মজলিস

হলে তাতে যাওয়া উচিত নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুমআর নামাযের পূর্বে হাল্কা তথা মজলিস করতে নিষেধ করেছেন। তবে কোন হক্কানী আলেম সকালে জামে মসজিদে আল্লাহ্ তাআলার নেয়ামত ও শাস্তি বর্ণনা করে ওয়ায করলে তাঁর কাছে বসবে। এরূপ ওয়াজ শ্রবণ করা নফল এবাদত অপেক্ষা উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ এলেমের মজলিসে হাজির হওয়া হাজার রাকআত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম।

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ـ

নামাযান্তে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, এতে দুনিয়া অন্বেষণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং রোগীকে দেখা, জানাযায় শরীক হওয়া এবং এলেম শিক্ষা করা উদ্দেশ্য । আল্লাহ্ তাআলা কোরআন মজীদে কয়েক জায়গায় এলেমকে 'ফযল' তথা অনুগ্রহ বলেছেন। এক জায়গায় বলেছেন–

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ـ

অর্থাৎ, আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট। আরও বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ـ

অর্থাৎ, আমি দাউদকে এলেম দান করেছি।

সুতরাং জুমআর দিনে এলেম শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া উত্তম এবাদত। কিসসাকথকদের মজলিসে যাওয়া অপেক্ষা নামায উত্তম। কেননা, পূর্ববর্তীরা কিসসাকথন বেদআত মনে করতেন। তাঁরা কিসসা কথকদেরকে জামে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) জামে মসজিদে নিজের জায়গায় এসে দেখেন, জনৈক কিসসাকথক

সেস্থানে কিছু বর্ণনা করছে। তিনি বললেন ঃ আমার জায়গা থেকে উঠে যাও। সে বলল ঃ আমি উঠব না। আমি অগ্রে এখানে বসেছি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) কোতোয়ালকে ডেকে তাকে সেখান থেকে বহিষ্কার করলেন। নিছক বয়ান করাই সুন্নত হলে তাকে বহিষ্কার করা কিরূপে জায়েয হত? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا يضمن احدكم اخاه من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا توسعوا .

তোমাদের কেউ যেন তার মুসলমান ভাইকে তার স্থান থেকে তুলে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে; বরং তোমরা সরে যাও এবং তাকে জায়গা দাও।

হযরত ইবনে ওমরের জন্যে কেউ নিজের স্থান ছেড়ে দিলে তিনি তাতে বসতেন না, যে পর্যন্ত সেই ব্যক্তি সেখানে না বসত। বর্ণিত আছে, জনৈক কিসসাকথক হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষের আঙ্গিনায় বসত। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বললেন ঃ লোকটি তার কিসসা দ্বারা আমাকে জ্বালাতন করছে। আমি যিকির ও তসবীহ করতে পারছি না। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে এমন পিটুনি দিলেন যে, তার কোমরে একটি ছড়ি ভেঙ্গে ফেললেন।

জুমআর মধ্যে যে মুহূর্তটি উৎকৃষ্ট ও বরকতময়, তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে। হাদীসে আছে, জুমআয় একটি মুহূর্ত আছে, যাতে কোন মুসলমান আল্লাহ তাআলার কাছে যা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। এ মুহূর্ত কোনটি, তাতে মতভেদ আছে। যেমন, সূর্যোদয়ের সময়, নামাযে দাঁড়ানোর সময়, আসরের শেষ সময় এবং সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেকার সময় ইত্যাদি। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন এবং খাদেমাকে বলতেন ঃ সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাক। যখন দেখ সূর্য অস্ত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে, তখন আমাকে খবর দাও। খাদেমা তাই করত। হযরত ফাতেমা এ সময় দোয়া ও এস্তেগফারে মশগুল হতেন। তিনি বলতেন ঃ এ মুহূর্তের অপেক্ষায় থাকা উচিত। তিনি এটি তাঁর পিতার কাছ থেকে অবলম্বন করেছিলেন। কোন কোন

আলেম বলেন ঃ এ মুহূর্তটি সারা দিনের মধ্যে অনির্ধারিত। যেমন শবে কদর অনির্ধারিত, যাতে বশী পরিমাণে এর অপেক্ষা করা হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ এ মুহূর্তটি জুমআর দিনের মধ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন শবে কদর পরিবর্তিত হতে থাকে। এ উক্তি অধিক সঙ্গত। হযরত কা'ব আহবার (রঃ) বলেন ঃ এটি জুমআর দিনের শেষ মুহূর্ত; অর্থাৎ, সূর্যাস্তের সময়। একথা শুনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ শেষ মুহূর্ত কিরূপে হতে পারে? আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, বান্দা এ মুহূর্তটি নামায পড়া অবস্থায় পায়। দিনের শেষ মুহূর্ত তো নামাযের সময় নয়। কা'ব (রঃ) বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কি একথা বলেননি, যেব্যক্তি বসে নামাযের অপেক্ষা করে সে নামাযেই থাকে? আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, বলেছেন। কা'ব বললেন ঃ কাজেই এটাও নামাযের সময়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব আরও বলতেন, এ মুহূর্তটি আল্লাহ তাআলার রহমত তাদের জন্যে, যারা এদিনের হকসমূহ আদায় করে। সুতরাং এ রহমত তখন হওয়া উচিত, যখন হক আদায় সমাপ্ত হয়। মোট কথা, এ সময় এবং ইমামের মিম্বরে আরোহণের সময় উভয়টি উৎকৃষ্ট। উভয় সময়ে দোয়া করা উচিত।

জুমআর দিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ পাঠ করবে। তিনি বলেন ঃ যে কেউ জুমআর দিনে আমার প্রতি আশি বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার আশি বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমরা কিরূপে দরূদ প্রেরণ করব? তিনি বললেন ঃ এভাবে বল–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ـ

হে আল্লাহ, রহমত প্রেরণ কর তোমার বান্দা, নবী, রসূল ও উম্মী নবী মুহাম্মদের প্রতি।

এটা একবার হল। এমনিভাবে আশি বার পূর্ণ কর। এ ছাড়া অন্য যেকোন দরূদ পাঠ করলে এমনকি তাশাহ্হুদের দরূদ পাঠ করলেও তাকে দরূদ পাঠকারী বলা হবে। দরূদের সাথে এস্তেগফারও করা উচিত। জুমআর দিন এস্তেগফার করাও মোস্তাহাব।

জুমআর দিন অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। বিশেষ করে সূরা কাহফ পাঠ করবে। হযরত ইবনে আব্বাস ও আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর দিন অথবা তার রাতে সূরা কাহফ পাঠ করে, তাকে তার পড়ার স্থান থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত নূর দান করা হয় এবং দ্বিতীয় জুমআ ও আরও তিন দিনের মাগফেরাত করা হয়। সত্তর হাজার ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত তার প্রতি রহমত প্রেরণ করে। সে ব্যথা, পেটের ফোড়া, বাত, কুষ্ঠ এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকে। সম্ভব হলে জুমআর দিনে অথবা রাত্রে কোরআন খতম করা মোস্তাহাব। এতে অনেক সওয়াব রয়েছে।

জামে মসজিদে প্রবেশ করে চার রাকআত না পড়া পর্যন্ত বসবে না। এর প্রত্যেক রাকআতে পঞ্চাশ বার করে সূরা এখলাস পাঠ করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি এ আমল করবে, সে মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে। তাহিয়্যাতের দু'রাকআতও পড়তে ভুল করবে না, যদিও ইমাম খোতবা দিতে থাকে। এমতাবস্থায় দ্রুত পড়ে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ ব্যক্তিকে তাই করতে আদেশ করেছেন। মোট কথা, জুমআর দিন সময় এভাবে বন্টন করা উচিত– সকাল থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত নামাযের জন্যে, জুমআর পর থেকে আসর পর্যন্ত এলেম শোনার জন্যে এবং আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তসবীহ ও এস্তেগফারের জন্যে।

জুমআর দিনে দান-খয়রাত করলে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। তবে শর্ত, এমন ব্যক্তিকে দেবে না যে ইমামের খোতবার সময় দানের আবেদন করে এবং ইমামের কথা বলার সঙ্গে কথা বলে। এরূপ ব্যক্তিকে দান করা মাকরূহ। ইমাম আহমদের পুত্র সালেহ বলেন ঃ জুমআর দিন জনৈক মিসকীন ইমামের খোতবা পাঠের সময় দানের আবেদন করল। সে আমার পিতার বরাবর ছিল। জনৈক ব্যক্তি আমার পিতাকে এক খন্ড রৌপ্য দিল মিসকীনকে দেয়ার জন্যে। আমার পিতা তা গ্রহণ করলেন না। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, তাকে ভিক্ষা দেয়া কতক আলেমের মতে মাকরূহ; কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অথবা বসে চাইলে দেয়ায় দোষ নেই।

কা'ব আহবার (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর জন্যে আসে, এর পর ফিরে গিয়ে দু'প্রকার বস্তু খয়রাত করে, পুনরায় মসজিদে এসে পূর্ণ রুকু সেজদা সহকারে দু'রাকআত নফল নামায পড়ে এই দোয়া করে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَبِاسْمِكَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ -

অর্থাৎ, এরপর সে যেকোন দোয়া করবে, আল্লাহ্ তাআলা তা কবুল করবেন। জুমআর দিনকে আখেরাতের জন্যে নির্দিষ্ট করবে। এতে দুনিয়ার কোন কাজ করবে না। বেশী পরিমাণে ওযিফা পাঠ করবে এবং এদিন সফর শুরু করবে না। বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি জুমআর রাত্রে সফর করে, তার উভয় ফেরেশতা তার জন্যে বদ দোয়া করে। জুমআর ফজরের পরে তো সফর নিষিদ্ধই, যদি কাফেলা চলে না যায়।

সারকথা, জুমআর দিনে ওযিফা পাঠ ও দান-খয়রাত বেশী করে করবে। আল্লাহ্ তাআলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে ভাল কাজ নেন। আর যখন কোন বান্দাকে অপছন্দ করেন, তখন তার কাছ থেকে ভাল সময়ে খারাপ কাজ নেন, যাতে এ খারাপ কাজ তাঁর আযাব আরও বাড়িয়ে দেয়।

নামাযের বিবিধ মাসআলা

০ অল্প কর্ম দ্বারা নামায বাতিল হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে অল্প কর্মও মাকরূহ। প্রয়োজন এই ঃ সম্মুখ দিয়ে গমনকারী ব্যক্তিকে সরিয়ে দেয়া, বিচ্ছু দংশন করবে বলে আশংকা হলে সেটিকে এক অথবা দুই আঘাতে মেরে ফেলা এবং অপরিহার্য হলে শরীর চুলকানো। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ) উকুন ও মাছি নামাযের মধ্যে ধরে ফেলতেন এবং হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) উকুন মেরে ফেলতেন। হাই তোলার সময় মুখে হাত রাখা উত্তম। নামাযে অল্প কর্ম থেকেও বিরত থাকা পূর্ণতার স্তর। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ নামাযে শরীর থেকে মাছি সরাতেন না এবং বলতেন ঃ আমি নিজেকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করি না।

০ নামাযে থুথু নিক্ষেপ করলে নামায বাতিল হবে না। কারণ, এটা

অল্প কর্ম। থুথুর কারণে আওয়াজ সৃষ্টি না হলে তাকে কালাম গণ্য করা হবে না। এতদসত্ত্বেও নামাযে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে থুথু নিক্ষেপ করার অনুমতি দিয়েছেন, সেভাবে থুথু নিক্ষেপ করা মাকরূহ নয়। সেমতে জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার মসজিদে থুথু দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। এর পর তিনি খেজুরের একটি ডাল দ্বারা থুথু ঘষে দিলেন এবং সামান্য জাফরান এনে সেখানে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, তার মুখে থুথু নিক্ষেপ করা হোক? সকলেই বলল ঃ এটা কেউ পছন্দ করে না। তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন নামাযে প্রবেশ কর, তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ও কেবলার মাঝখানে থাকেন। কতক রেওয়ায়েতে আছে- তোমাদের সামনে থাকেন। অতএব সামনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করা উচিত নয়; ডান দিকেও উচিত নয়; বরং বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু নিক্ষেপ করবে। (এটা মসজিদের বাইরে নামায পড়লে।) বেগতিক হলে নিজের কাপড়ে থুথু নিক্ষেপ করবে এবং কাপড়টি ঘষে দেবে।

০ মুক্তাদীর দন্ডায়মান হওয়ার সুন্নত তরীকা এই, মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান দিকে সামান্য পেছনে সরে দাঁড়াবে। একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাঁড়াবে না; বরং হয় কাতারের মধ্যে ঢুকে পড়বে; না হয় কাতার থেকে কাউকে নিজের সাথে টেনে নেবে। যদি একাই দাঁড়িয়ে যায়, তবে তার নামায মাকরূহ হবে।

০ যেব্যক্তি পরবর্তী রাকআতসমূহে ইমামের সাথে শরীক হয়, তাকে মসবুক বলা হয়। মসকবুক যে রাকআতে শরীক হয়, সে রাকআতই তার নামাযের শুরু। ইমাম নামায শেষ করলে এর উপর ভিত্তি করে সে অবশিষ্ট নামায পড়ে নেবে। তকবীরে তাহরীমার পর রুকুর তকবীর বলে যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং তার সাথে স্থিরভাবে রুকু করা যায়, তবে সেই রাকআত পাওয়া গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামের সাথে সস্থিরে রুকু করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে উঠে পড়ে, তবে সেই রাকআত ফওত হয়ে গেল বলে ধরতে হবে। যদি ইমামকে সেজদায় অথবা তাশাহহুদে পাওয়া যায়, তবে মসবুক ব্যক্তি কেবল তকবীরে

তাহরীমা বলে ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে– পরবর্তী তকবীর বলবে না।

০ যেব্যক্তি নামায পড়ার পর নিজের কাপড়ে নাপাকী দেখে, তার জন্য পুনরায় নামায পড়া মোস্তাহাব। নামাযের অভ্যন্তরে নাপাকী দেখলে নাপাক কাপড় পৃথক করে ফেলবে এবং নামায পূর্ণ করে নেবে। তবে নতুন করে নামায পড়া মোস্তাহাব। একবার জিবরাঈল এসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে নামাযের মধ্যে খবর দিলেন, আপনার জুতায় নাপাকী লেগে আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ জুতা খুলে ফেললেন, কিন্তু নতুনভাবে নামায পড়েননি।

০ রুকু, সেজদা ও অন্যান্য আমলে ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া মুক্তাদীর পক্ষে জায়েয নয়। এমনিভাবে এসব কাজ ইমামের সাথে সাথে করাও উচিত নয়; বরং এসব কাজে মুক্তাদী ইমামের অনুসরণ করবে এবং পরে আদায় করবে। এক্তেদার অর্থ এটাই। যদি ইচ্ছাপূর্বক ইমামের সাথে সাথে এসব কাজ করে, তবে নামায বাতিল হবে না। যেমন, ইমামের সমান সমান দাঁড়ালে নামায বাতিল হয় না। সুতরাং কেউ ইমামের আগে রোকন আদায় করলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

ما يخشى الذى يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি ইমামের পূর্ব (সেজদা থেকে) মাথা উত্তোলন করে, সে কি ভয় করে না, আল্লাহ্ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করে দেবেন?

ইমাম থেকে এক রোকন পেছনে থাকা নামায বাতিল করে না। উদাহরণতঃ ইমাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু মুক্তাদী এখনও রুকু করল না। তবে এতটুকু পেছনে থাকা মাকরূহ । যদি ইমাম সেজদায় মাথা রেখে দেয় এবং মুক্তাদী তখনও রুকুতে না যায়, তবে মুক্তাদীর নামায বাতিল হয়ে যাবে।

যেব্যক্তি নামাযে উপস্থিত হয়, সে অন্য ব্যক্তিকে নামাযে খারাপ কিছু করতে দেখলে তা থেকে বারণ করার অধিকার রাখে। কোন মূর্খ ব্যক্তি

এরূপ করলে তাকে নম্রভাবে শিখিয়ে দেবে, যেমন কাতার সোজা করা, একা ব্যক্তি কাতারের পেছনে দাঁড়ালে তাকে নিষেধ করা, ইমামের পূর্বে মাথা উত্তোলন করলে তাকে মানা করা। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কাউকে খারাপভাবে নামায পড়তে দেখে নিষেধ করে না, সে গোনাহে তার সাথে শরীক হবে। বেলাল ইবনে সাদ বলেন ঃ গোপনে ত্রুটি করলে যে করে সে-ই দায়ী হবে; কিন্তু প্রকাশ্য ত্রুটির সংশোধন কেউ না করলে তার ক্ষতি ব্যাপক হয়ে যায়। হাদীসে আছে, হযরত বেলাল (রাঃ) নামাযের কাতার সোজা করতেন এবং মুসল্লীদের পায়ের ঘিঁটে দোররা মারতেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ নামাযে তোমার ভাইদের খোঁজ কর। যদি তাদেরকে না দেখ, তবে রুগ্ন হলে দেখতে যাও এবং সুস্থ হলে জামাআত তরক করার কারণে তিরস্কার কর। মসজিদে প্রবেশ করে কাতারের ডান দিকে যাওয়া উচিত। রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে ডান দিকে এত বেশী লোক থাকত যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বাম দিক উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ পেশ করা হল। ফলে তাকে বলতে হল ঃ যেব্যক্তি মসজিদের বাম দিক আবাদ করবে, তার দুটি সওয়াব হবে। কাতারে কোন নাবালেগ ছেলেকে দেখলে তাকে সরিয়ে বয়স্ক ব্যক্তি তার স্থলে দাঁড়াতে পারে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নফল নামায

প্রকাশ থাকে যে, ফরয ছাড়া আরও তিন প্রকার নামায রয়েছে– সুন্নত, মোস্তাহাব ও তাতাব্বু (تطوع)। সুন্নত নামায বলতে আমাদের উদ্দেশ্য সেসব নামায, যেগুলো রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিয়মিতভাবে পাঠ করেছেন; যেমন ফরয নামাযসমূহের পরবর্তী সুন্নত নামাযসমূহ, চাশতের নামায ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি । যে পথে চলা হয়েছে, তাকে বলা হয় সুন্নত । অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে পথে নিয়মিত চলেছেন, তাই হবে সুন্নত। মোস্তাহাব বলে আমাদের উদ্দেশ্য সেই নামায, যার মাহাত্ম্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে তা নিয়মিত পড়া বর্ণিত নেই। যেমন, গৃহ থেকে বের হওয়া ও গৃহে আগমনের সময়কার নামায। তাতাব্বু বলে আমরা সেই নামায বুঝিয়েছি, যা সুন্নত ও মোস্তাহাবের আওতায় পড়ে না; অর্থাৎ এ নামাযের পক্ষে বিশেষ কোন হাদীস নেই। কিন্তু বান্দা আল্লাহর সাথে মোনাজাতে উৎসাহী হয়ে এ নামায পড়ে। এই তিন প্রকার নামাযকেই নফল নামায বলা হয় । কেননা, নফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত । বলাবাহুল্য, এই তিন প্রকার নামায ফরযের অতিরিক্ত । এসব উদ্দেশ্য প্রকাশ করার জন্য আমরা উপরোক্ত তিনটি পরিভাষা নির্দিষ্ট করেছি। কেউ এই পরিভাষা বদলে দিতে চাইলে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কেননা, উদ্দেশ্য বুঝে নেয়ার পরে শব্দের কোন গুরুত্ব থাকে না।

উপরোক্ত প্রকারত্রয়ের মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এসব স্তরের মর্যাদায়ও পার্থক্য রয়েছে। যেমন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়মিত পড়ার মধ্যে এবং এগুলোর হাদীসের মধ্যেও সহীহ্ ও মশহুরের পার্থক্য রয়েছে। এর ভিত্তিতেই আমরা বলি, জামাআতের সুন্নতসমূহ একান্তের সুন্নত অপেক্ষা উত্তম। জামাআতের সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ঈদের নামায, এর পর সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায, এর পর বৃষ্টির জন্য নামায। একান্তের সুন্নতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে বেতেরের নামায, এর পর ফজরের সুন্নত, এর পর অন্যান্য নামাযের সুন্নত।

প্রকাশ থাকে যে, নফল নামাযসমূহ দু'প্রকার- (১) কারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন, সূর্যগ্রহণ ও বৃষ্টির নামায এবং (২) সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত । সময়ের পুনরাবৃত্তির সাথে সাথে এসব নফল নামাযেরও পুনরাবৃত্তি হয়। এই প্রকার নফল আটটি- পাঞ্জেগানা নামাযসমূহের নফল নামায পাঁচটি এবং তিনটি হচ্ছে চাশতের নামায, মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামায এবং তাহাজ্জুদের নামায।

(১) পাঞ্জেগানা নামাযের মধ্যে ফজরের সুন্নত দু'রাকআত। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ –

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ـ

ফজরের দু'রাকআত দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। এর সময় সোবহে সাদেক থেকে শুরু হয়ে যায়। আকাশের কিনারায় ফজরের পূর্বে বিস্তৃত শুভ্র রেখাকে সোবহে সাদেক বলা হয়। শুরুতে এটা চেনা খুবই কঠিন। এর জন্যে চন্দ্রের উদয় অস্তের সময় জানতে হবে। প্রতি মাসে দু'বার চন্দ্র দ্বারা সোবহে সাদেক চেনা যায়। ছাব্বিশতম রাতে চাঁদ সোবহে সাদেকের সাথে উদিত হয় এবং দ্বাদশতম রাতে চাদের অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে প্রায় সোবহে সাদেক হয়ে যায়। যে আখেরাত তলব করে, তার জন্যে চাঁদের এসব মনযিল চেনা জরুরী। এতে রাত্রিকালীন সময়ের পরিমাণ ও সোবহে সাদেক চেনা যায়। যখন ফজরের ফরয সময় শেষ হয়, তখন সুন্নতের সময়ও শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের সময় এসব নামায পড়া যায় না। ফরযের পূর্বে এ দু'রাকআত পড়া সুন্নত। মসজিদে আসার পর যদি ফরযের তকবীর হয়ে যায়, তবে ফরয নামাযেই শামিল হয়ে যাবে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اذا قضيت الصلوة فلا صلوا المكتوبة ـ

'নামাযের তকবীর হয়ে গেলে ফরয ছাড়া কোন নামায পড়া যাবে না।' ফরয নামায শেষ হলে সুন্নত পড়ে নেবে। সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়লে তাও আদায় হবে। কেননা, সময়ের মধ্যে সুন্নত ফরযের অনুগামী। তবে জামাআত ফওত না হলে এ সুন্নত ফরযের পূর্বে পড়া সুন্নত। মোস্তাহাব এই, এ সুন্নত গৃহে সংক্ষেপে পড়ে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত

তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে বসে যাবে। ফরয পড়া পর্যন্ত কোন নামায পড়বে না। এর পর সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকবে।

(২) যোহরের সুন্নত ছয় রাকআত। ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দু'রাকআত। এ দু'রাকআত সুন্নতে মোআক্কাদা। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যেব্যক্তি সূর্য ঢলে পড়ার পর চার রাকআত নামায পড়ে এবং তার কেরাআত, রুকু ও সেজদা ভালরূপে করে, তার সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে এবং রাত্রি পর্যন্ত তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে।

(৩) আসরের পূর্বে চার রাকআত নফল নামায। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন যে আসরের পূর্বে চার রাকআত পড়ে।

সুতরাং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় দাখিল হওয়ার আশা নিয়ে এই চার রাকআত পড়া মোস্তাহাব। তিনি যোহরের দু'রাকআতের অনুরূপ নিয়মিতভাবে আসরের এই চার রাকআত পড়েননি।

(৪) মাগরিবের ফরযের পর দু'রাকআত সুন্নত। এক্ষেত্রে একটি ভিন্ন রেওয়ায়েত উবাই ইবনে কাব, ওবাদা ইবনে সামেত, আবু যর, যায়দ ইবনে সাবেত প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, মাগরিবের ফরযের পূর্বে আযান ও একামতের মাঝখানে দু'রাকআত দ্রুত পড়ে নেয়া উচিত। কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ আমরা মাগরিবের পূর্বে দু'রাকআত পড়তাম। ফলে নতুন আগন্তুক মনে করত, আমরা মাগরিব পড়ে নিয়েছি। এটা আসলে এই হাদীসের ব্যাপকতার মধ্যে দাখিল– بين كل اذانين صلوة لمن شاء প্রত্যেক দু'আযান অর্থাৎ, আযান ও একামতের মধ্যে নামায রয়েছে। যে চায় সে পড়ুক। হযরত ইমাম আহমদ (রহঃ) এই দু'রাকআত পড়তেন। কিন্তু লোকেরা এজন্যে তাঁর সমালোচনা শুরু করলে তিনি তা পরিত্যাগ করেন।

(৫) এশার ফরযের পর চার রাকআত সুন্নত। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পর চার রাকআত পড়ে শুয়ে পড়তেন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নামায একটি সুরক্ষিত কল্যাণ। যার ইচ্ছা কম নিক এবং যার ইচ্ছা বেশী নিক। এ থেকে জানা গেল, প্রত্যেকেই নফল নামায ততটুকু অবলম্বন করবে, যতটুকু তার কল্যাণের প্রতি আগ্রহ থাকে। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে একথা প্রকাশ পেয়েছে, নফলসমূহের মধ্যে কতক অধিক মোআক্কাদ (জোরদার) এবং কতক কম মোআক্কাদ। সুতরাং অধিক মোআক্কাদ নফল ছেড়ে দেয়া মোটেই সমীচীন নয়। কেননা, নফল নামায ফরযের জন্যে পরিপূরক হয়ে থাকে। কাজেই নফল বেশী না পড়লে ফরয ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়।

(৬) বেতেরের নামায। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এশার পরে তিন রাকআত বেতের পড়তেন। প্রথম রাকআতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى দ্বিতীয় রাকআতে কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন। এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেতেরের পর দু'রাকআত বসে বসে পড়তেন এবং নিদ্রার পূর্বে দু'রাকআত পড়তেন। প্রথম রাকআতে সূরা যিলযাল এবং দ্বিতীয় রাকআতে তাকাসুর পাঠ করতেন। রাত্রিকালীন নফল নামাযের শেষে বেতের পড়া উত্তম। সুতরাং তাহাজ্জুদের পরে বেতের পড়া ভাল।

(৭) চাশতের নামায নিয়মিত পড়া একটি উত্তম আমল। এর সংখ্যা সর্বোচ্চ আট রাকআত বর্ণিত আছে। হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) চাশতের নামায আট রাকআত পড়েছেন এবং খুব দীর্ঘ করে ও উত্তমরূপে পড়েছেন। এ সংখ্যা অন্য কোন রাবী বর্ণনা করেননি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) চাশতের নামায নিয়মিতভাবে চার রাকআত পড়েছেন এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বেশীর সীমা উল্লেখ করেননি। এ থেকে জানা যায়, তিনি চার রাকআত নিয়মিত পড়তেন– এর কম পড়তেন না এবং মাঝে মাঝে বেশীও পড়তেন। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাশতের নামায ছয় রাকআত দু'ওয়াক্তে পড়তেন।

উদয়ের পর সূর্য যখন সামান্য উপরে উঠতো, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত পড়তেন। এরপর যখন সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়তো এবং সূর্য আকাশের পূর্ব প্রান্তে থাকত, তখন চার রাকআত পড়তেন। মোট কথা, সূর্য যখন অর্ধ বর্শা পরিমাণ উপরে উঠত, তখন দু'রাকআত পড়তেন এবং সূর্য যথেষ্ট উপরে উঠার পর চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং চাশতের সময় এভাবে নির্ণীত হবে, সূর্যোদয় থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধেক হলে চাশত পড়া উচিত; যেমন সূর্য ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট সময়ের অর্ধাংশের সময় আসরের নামায পড়া হয়। অতএব আসরের সময়ের বিপরীত সময় হচ্ছে চাশতের সময়। এ সময়টি চাশতের উত্তম সময়। নতুবা সূর্য উপরে উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময় চাশত পড়া যায়।

(৮) মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী নফল নামাযও সুন্নতে মোআক্কাদা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম দ্বারা এর রাকআত সংখ্যাদ্বয় বর্ণিত আছে। এ নামাযের সওয়াব অনেক। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (তাদের পার্শ্ব নিদ্রার স্থান থেকে আলাদা থাকে।) আয়াতে ঐ নামাযই বুঝানো হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যে মাগরিব ও এশার মাঝখানে নামায পড়ে, তার এ নামায আল্লাহর দিকে রুজুকারীদের নামায। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি মাগরিব ও এশার মাঝখানে নিজেকে মসজিদে আবদ্ধ রাখে এবং নামায ও কোরআন পাঠ ছাড়া অন্য কোন আলাপ-আলোচনা না করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে জান্নাতে দুটি প্রাসাদ তৈরী করেন, যা পরস্পরের একশ' বছরের দূরত্বে অবস্থিত। তার জন্যে উভয় প্রাসাদের মধ্যস্থলে এত বৃক্ষ রোপণ করেন, দুনিয়ার সকল বাসিন্দা তাতে ঘুরাফেরা করতে চাইলে তাদের জন্যে স্থান সংকুলান হবে।

এর পর আসে সপ্তাহের দিন ও রাত্রির নফল নামায। দিনের মধ্যে আমরা প্রথমে রবিবার থেকে শুরু করছি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রবিবার দিন চার রাকআত পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আমানার রাসূলু একবার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে খৃস্টান পুরুষ ও খৃস্টান

নারীর সমসংখ্যক সওয়াব লেখবেন। তাকে একজন নবীর সওয়াব দেবেন এবং এক হজ্জ ও ওমরা তার জন্যে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রত্যেক রাকআতের বদলে হাজার নামাযের সওয়াব লেখবেন। প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে জান্নাতে একটি মেশকের শহর দেবেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ রবিবার দিন অধিক নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার একত্ব ঘোষণা কর। তিনি এক, তার কোন শরীক নেই। অতএব যেব্যক্তি রবিবার দিন যোহরের ফরয ও সুন্নতের পর চার রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও আলিফ লাম সেজদা এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা মুলক পড়ে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতঃ সালাম ফেরায়, এর পর দাঁড়িয়ে আরও দু'রাকআত পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকআতেও এ সূরাই পড়ে, এর পর আল্লাহর কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, আল্লাহ তাআলার জন্যে তার প্রয়োজন মেটানো অপরিহার্য হয়ে যাবে।

সোমবার– হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন সূর্য উপরে উঠার পর দু'রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, এখলাস, ফালাক ও নাস একবার পাঠ করে এবং সালামের পর দশ বার এস্তেগফার ও দশ বার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার সকল গোনাহ মাফ করে দেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার দিন বার রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং নামায শেষে সূরা এখলাস ও এস্তেগফার বার বার পড়ে, তাকে কেয়ামতের দিন অমুকের পুত্র অমুক কোথায়, উঠ এবং তোমার সওয়াব নাও, বলে আহ্বান করা হবে। অতঃপর প্রথম সওয়াবস্বরূপ তাকে এক হাজার বেহেশতী পোশাক দেয়া হবে। তার মাথায় মুকুট রাখা হবে। তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তখন এক হাজার ফেরেশতা তার অভ্যর্থনার জন্যে পৃথক পৃথক উপঢৌকন নিয়ে আগমন করবে এবং তার সাথে সাথে থাকবে।

মঙ্গলবার– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার দিন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে দশ

রাকআত পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী এক একবার এবং সূরা এখলাস তিন বার পাঠ করে, তার সত্তর দিনের গোনাহ লেখা হবে না। সত্তর দিনের মধ্যে সে মারা গেলে শহীদের মর্তবা নিয়ে মারা যাবে এবং তার সত্তর বছরের গোনাহ মার্জনা করা হবে।

বুধবার– হযরত মুআ'য ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবারে দ্বিপ্রহরের পূর্বে বার রাকআত নামায পড়ে এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও আয়াতুল কুরসী এক একবার, সূরা এখলাস তিন বার এবং সূরা ফালাক ও নাস তিন বার পাঠ করে, তাকে আরশের কাছ থেকে ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলে ঃ হে আল্লাহর বান্দা আবার আমল কর। তোমার পূর্ব গোনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। এ ছাড়া আল্লাহ তাআলা তার কবরের অন্ধকার ও সংকীর্ণতা। কেয়ামতের কঠোরতা দূরীভূত করে দেবেন। সেদিন থেকেই তার জন্যে একজন পয়গম্বরের আমল উপরে উঠতে থাকবে।

বৃহস্পতিবার– হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বৃহস্পতিবার দিন যোহর ও আসরের মধ্যে দু'রাকআত নামায পড়ে, প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, আয়াতুল কুরসী একশ' বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা এখলাস একশ' বার এবং দরূদ একশ' বার পাঠ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তির সওয়াব দান করবেন, যে রজব, শাবান ও রমযানের রোযা রাখে। তাকে হজ্জের সমান সওয়াব দান করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে মুমিন ও তাওয়াক্কুলকারীদের সংখ্যা পরিমাণে সওয়াব লেখবেন।

শুক্রবার– হযরত আলী (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ জুমআর দিন একটি নামায আছে। যে মুমিন বান্দা সূর্য পূর্ণরূপে উদিত হওয়ার পর পূর্ণরূপে ওযু করে ঈমান ও সওয়াবের আশায় চাশতের দু'রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে আল্লাহ তাআলা দুশ' নেকী লেখেন এবং দুশ' গোনাহ মার্জনা করেন। যে চার রাকআত পড়ে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার চারশ' মর্তবা উঁচু করে দেন। যে আট রাকআত পড়ে, তার আটশ' মর্তবা উঁচু করেন এবং সকল গোনাহ মাফ করে দেন। আর যে বার রাকআত পড়ে, তার জন্যে বারশ' নেকী লিপিবদ্ধ করেন, বারশ'

কুকর্ম তার আমলনামা থেকে দূর করে দেন এবং জান্নাতে বারশ' মর্তবা উঁচু করেন। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি জুমআর দিন জামে মসজিদে প্রবেশ করে এবং জুমআর পূর্বে চার রাকআত নামাযে প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা এখলাস পঞ্চাশ বার পাঠ করে, সে মৃত্যুর সময় জান্নাতে তার ঠিকানা দেখে নেবে অথবা তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে।

শনিবার– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি শনিবার দিন চার রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার ও সূরা কাফিরূন তিন বার এবং নামাযান্তে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্যে প্রত্যেক অক্ষরের বদলে এক হজ্জ ও এক ওমরার সওয়াব লেখেন, এক বছরের দিনের রোযা ও রাতের এবাদতের সওয়াব দান করেন, এক শহীদের সওয়াব দেন এবং কেয়ামতে পয়গম্বর ও শহীদগণের সাথে আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।

এখন রাত্রিসমূহের অবস্থা শুনা উচিত।

রবিবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যেব্যক্তি রবিবার রাতে কুড়ি রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পর সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার পাঠ করে নিজের পিতামাতার জন্যে একশ' বার মাগফেরাতের দোয়া করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি একশ' বার দরূদ প্রেরণ করে, নিজের শক্তি থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর শক্তির আশ্রয় প্রার্থনা করে, অতঃপর বলে–

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ اٰدَمَ صَفْوَةُ اللّٰهِ وَفِطْرَتُهُ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيْبُ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই, আদম আল্লাহর মনোনীত ও তাঁর ফিতরত, ইবরাহীম আল্লাহর খলীল, মূসা আল্লাহর সাথে বাক্যালাপকারী, ঈসা

আল্লাহর রূহ এবং মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর হাবীব। সে তাদের সংখ্যা পরিমাণে সওয়াব পাবে, যারা আল্লাহ তাআলার সন্তান আছে বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তা বিশ্বাস করে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে শান্তিপ্রাপ্তদের সাথে উত্থিত করবেন এবং জান্নাতে পয়গম্বরগণের দলভুক্ত করবেন।

সোমবার রাত্রি– হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সোমবার রাতে চার রাকআত নামায পড়ে– প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস দশ বার, দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস কুড়ি বার, তৃতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস ত্রিশ বার এবং চতুর্থ রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস চল্লিশ বার পাঠ করে, এর পর সালাম ফিরিয়ে পঁচাত্তর বার সূরা এখলাস পড়ে নিজের ও পিতামাতার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা আল্লাহ তাআলা নিজের উপর জরুরী করে নেন। এ নামাযকে সালাতে হাজত বলা হয়।

মঙ্গলবার রাত্রি– এ রাতে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস প্রতিটি পনর বার, সালামের পর আয়াতুল কুরসী পনর বার এবং এস্তেগফার পনর বার পাঠ করবে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি মঙ্গলবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে একবার আলহামদু, সূরা কদর এবং এখলাস সাত সাত বার পাঠ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন এবং কেয়ামতের দিন এ নামায তাকে জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করবে।

বুধবার রাত্রি– হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি বুধবার রাতে তিন সালাম সহকারে ছয় রাকআত নামায পড়ে– প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু লিল্লাহির পর قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ থেকে দু'আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে এবং নামাযান্তে বলে جَزَى اللّٰهُ مُحَمَّدًا عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ (আল্লাহ মুহাম্মদকে আমাদের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রতিদান দিন।) –আল্লাহ তার

সত্তর বছরের গোনাহ ক্ষমা করবেন এবং তার জন্যে দোযখ থেকে পরিত্রাণপত্র লেখে দেবেন। আরও বর্ণিত আছে, যেব্যক্তি বুধবার রাতে দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রথম রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা ফালাক দশ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদুর পর সূরা নাস দশ বার, সালামের পর দশ বার এস্তেগফার এবং দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার সওয়াব লেখার জন্যে প্রত্যেক আকাশ থেকে সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার সওয়াব লেখতে থাকে।

বৃহস্পতিবার রাত্রি- হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে বৃহস্পতিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে দু'রাকআত নামায পড়ে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু পাঁচ বার, আয়াতুল কুরসী পাঁচ বার, এখলাস পাঁচ বার, পাঁচ পাঁচ বার ফালাক ও নাস এবং নামাযান্তে পনর বার এস্তেগফার পাঠ করে, তার সওয়াব পিতামাতাকে বখশে দেয়, পিতামাতার হক তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, যদিও সে পিতামাতার অবাধ্যতা করে। আল্লাহ তাআলা তাকে এমন বস্তু দেবেন, যা সিদ্দীক ও শহীদগণকে দেবেন।

শুক্রবার রাত্রি- হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত নামায আদায় করে- প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার এবং এখলাস এগার বার পাঠ করে, সে যেন আল্লাহ তাআলার এবাদত বার বছর পর্যন্ত এভাবে করল, দিনের বেলায় রোযা রাখল এবং রাতে নফল নামায পড়ল। হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে শুক্রবার রাতে জামাআতের সাথে এশার নামায পড়ে, উভয় সুন্নত পড়ে এবং ফরয ও সুন্নতের পর দশ রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, এখলাস, ফালাক ও নাস এক এক বার পাঠ করতঃ বেতেরের তিন রাকআত পড়ে এবং ডান পার্শ্বে কেবলামুখী হয়ে শুয়ে থাকে, সে যেন সমগ্র রাত্রি নফল নামায পড়ল। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ উজ্জ্বল দিনে আমার প্রতি অধিক দরূদ পাঠ কর অর্থাৎ শুক্রবার রাত্রি ও দিনে।

শনিবার রাত্রি- হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলেন ঃ যে শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মাঝখানে বার রাকআত নামায পড়ে, তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরী করা হবে। সে যেন প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও নারীকে খয়রাত বন্টন করল। তাকে ক্ষমা করা আল্লাহ্ নিজের জন্যে জরুরী করে নেন।

চার প্রকার নফল নামায প্রতিবছর একবার করে আদায় করতে হয়- (১) দু'ঈদের নামায, (২) তারাবীহ্, (৩) রজবের নামায ও (৪) শা'বানের নামায। দু'ঈদের নামায -এই নামায সুন্নতে মোআক্কাদা তথা ওয়াজিব। এটি ধর্মের একটি নিদর্শন। এতে সাতটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম, তিন বার তকবীর অর্থাৎ নিম্নোক্ত বাক্যাবলী বলা ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যে অনেক প্রশংসা। সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর; যদিও কাফেররা অপছন্দ করে।

ঈদুল ফেতরের রাত্রি থেকে ঈদের নামায পর্যন্ত এ তকবীরের সময়। ঈদুল আযহায় এ তকবীর ৯ তারিখের ফজর থেকে শুরু করবে এবং ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত চলবে। এতে মতভেদও আছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উক্তি এটাই। নামাযসমূহের পরে এ তকবীর বলতে হবে; কিন্তু ফরয নামাযের পরে পড়ার উপর জোর বেশী।

দ্বিতীয়, ঈদের দিনের সকালে গোসল করবে, সাজগোজ করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। পুরুষদের জন্যে চাদর ও পাগড়ী উত্তম।

তৃতীয়, এক পথে ঈদগাহে যাবে এবং অন্য পথে ফিরে আসবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। তিনি যুবতী নারী ও পর্দানশীনদেরকেও ঈদে যেতে অনুমতি দিতেন।

চতুর্থ, ঈদের নামাযের জন্যে শহরের বাইরে যাওয়া মোস্তাহাব। কিন্তু মক্কা মোয়াযযমা ও বায়তুল মোকাদ্দাসে মসজিদে নামায পড়া

উচিত। বৃষ্টি বর্ষিত হলে মসজিদে ঈদের নামায পড়াতে দোষ নেই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না হলে ইমাম দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নামায পড়িয়ে দেয়ার অনুমতি কোন ব্যক্তিকে দেবেন এবং নিজে সমর্থ লোকদেরকে নিয়ে বাইরে যাবেন। সকলেই তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যাবে।

পঞ্চম, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ঈদের নামাযের সময় সূর্যোদয়ের পর থেকে সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত। কোরবানী করার সময় ১০ তারিখে সূর্যোদয়ের এতটুকু পরে শুরু হয়, যতটুকু সময়ের মধ্যে দু'রাকআত নামায ও দু'খোতবা হয়ে যায়। এর পর এই সময় ১৩ তারিখের শেষ পর্যন্ত থাকে। ঈদুল আযহার নামায সকালে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, নামাযের পরে কোরবানী করতে হয়। ঈদুল ফেতরের নামায দেরীতে পড়া মোস্তাহাব। কেননা, এ নামাযের আগে সদকায়ে ফেতর বন্টন করতে হয়। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা।

ষষ্ঠ, ঈদের নামাযের ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মানুষ তকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে যায়। ইমাম সেখানে পৌঁছে বসবে না এবং নফল পড়বে না। অন্যেরা নফল পড়তে পারে। এর পর একজন ঘোষক الصلوة جامعة (নামায শুরু হচ্ছে) বলে উচ্চ স্বরে ঘোষণা করবে। অতঃপর ইমাম দু'রাকআত পড়বে। প্রথম রাকআতে তকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তকবীর ছাড়া তিন বার আল্লাহু আকবার বলবে। এর পর আলহামদুর পরে সূরা ক্বাফ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকআতে اقتربت الساعة পড়বে। দ্বিতীয় রাকআতে কেরাআত শেষে অতিরিক্ত তিন তকবীর বলবে। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবে এবং মাঝখানে বসবে।

সপ্তম, ভেড়া কোরবানী করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) স্বহস্তে একটি ভেড়া যবেহ করেন এবং বলেন ঃ

بسم الله والله اكبر هذا عني وعن من لم يضح من امتي -

—শুরু আল্লাহর নামে। আল্লাহ মহান। এটা আমার পক্ষ থেকে এবং

আমার উম্মতের সেই ব্যক্তির পক্ষ থেকে, যে কোরবানী করেনি।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– যেব্যক্তি যিলহজ্জের চাঁদ দেখে এবং তার কোরবানী করার ইচ্ছা থাকে, সে যেন চুল ও নখ না কাটে। হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে একজন তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কোরবানী করত এবং তারা সকলেই খেত ও খাওয়াত। তিন দিন অথবা আরও বেশী দিন কোরবানীর গোশত খাওয়া জায়েয। প্রথমে এটা নিষিদ্ধ ছিল। পরে অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ ঈদুল ফেতরের পর বার রাকআত ও ঈদুল আযহার পর ছয় রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। এটা মসনূন আমল।

তারাবীহ– তারাবীহ কুড়ি রাকআত। এটা সুন্নতে মোআক্কাদা। তবে দুই ঈদের নামাযের তুলনায় এর উপর জোর কম। তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম, না একা পড়া– এ বিষয়ে আলেমগণের মতভেদ আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ নামায দুই অথবা তিন রাতে জামাআত সহকারে পড়েছিলেন। এর পর জামাআতে পড়েননি এবং বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, এটা তোমাদের উপর ওয়াজিব না হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) মুসলমানদেরকে তারাবীহের জামাআতে একত্রিত করে দেন। কেননা, ওহী বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তা ওয়াজিব হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল না। সুতরাং কতক আলেম হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কাজের কারণে বলেন, তারাবীহ জামাআতে পড়া উত্তম। এ ছাড়া সকলের সমবেত হওয়ার মধ্যে বরকত আছে। একাকিত্বে মাঝে মাঝে আলস্যও স্পর্শ করে। সমাবেশ দেখলে মন প্রফুল্ল হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ তারাবীহ একা পড়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ আমার এ মসজিদে এক নামায অন্য মসজিদে একশ' নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এসব নামাযের চেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তির নামায, যে তার গৃহের কোণে দু'রাকআত পড়ে এবং তার খবর আল্লাহ ব্যতীত কেউ রাখে না। এর কারণ; রিয়া ও বানোয়াট অধিকতর সমাবেশের মধ্যেই হয়ে থাকে। একান্তে মানুষ এগুলো থেকে নিরাপদ থাকে। কিন্তু পছন্দনীয় উক্তি ইচ্ছে, তারাবীহ জামাআতে পড়াই ভাল। কেননা, কতক নফল নামায জামাআত সিদ্ধ। তারাবীহর প্রকাশও কর্তব্য।

রজবের নামায– রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রজব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে রোযা রাখে, অতঃপর মাগরিব ও এশার মাঝখানে দু' দু'রাকআত করে বারো রাকআত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু একবার, সূরা কদর তিন বার, সূরা এখলাস বারো বার এবং নামাযান্তে পঁচাত্তর বার এই দরূদ পড়ে– اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ এর পর সেজদায় সত্তর বার বলে– سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ অতঃপর মাথা তুলে সত্তর বার বলে رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيُّ الْاَعْظَمُ –এর পর দ্বিতীয় সেজদা করে এবং প্রথম সেজদায় যা বলেছিল তাই বলে, এর পর সেজদার মধ্যেই নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করে, তার সকল প্রয়োজন পূর্ণ করা হবে। তার সব গোনাহ্ মার্জনা করা হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা, বালুকার সংখ্যা, পাহাড়ের ওজন এবং বৃক্ষের পত্রসম হয়। কেয়ামতের দিন সে তার পরিবারের সাতশ' মানুষের শাফায়াত করবে, যারা দোযখের যোগ্য হবে।

শাবানের নামায– শাবানের ১৫ তারিখ রাতে দু'দু'রাকআত করে একশ' রাকআত পড়বে। প্রতি রাকআতে আলহামদুর পরে এগার বার সূরা এখলাস পড়বে। এক'শ' রাকআত সম্ভবপর না হলে দশ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে আলহামদুর পরে একশ' বার সূরা এখলাস পড়বে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ নামায পড়তেন এবং একে 'সালাতে খায়র' বলতেন। মাঝে মাঝে তারা এ নামায জামাআতেও পড়তেন। হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ ত্রিশ জন সাহাবী আমার কাছে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, যেব্যক্তি রাতে এ নামায পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার দিকে সত্তর বার রহমতের দৃষ্টি দেবেন এবং প্রত্যেক বারের দৃষ্টিতে তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবেন। তার মধ্যে সর্বনিম্ন প্রয়োজন হচ্ছে মাগফেরাত।

আর এক প্রকার নফল নামায রয়েছে যা ফরযের সাথে সম্পৃক্ত এবং কোন বিশেষ সময়ের সাথে জড়িত নয়। যেমন সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের নামায, বৃষ্টির নামায, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে এখানে কয়েকটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

গ্রহণের নামায

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لايخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذالك فافزعوا الى ذكر الله والصلوة -

“নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ তাআলার দু'টি নিদর্শন। কারও মৃত্যু ও জন্মের কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না। যখন এই গ্রহণ দেখ, তখন দ্রুত যিকির ও নামাযের দিকে ধাবিত হও।” তিনি একথা তখন বলেছিলেন, যখন তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু হয়েছিল এবং সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এতে লোকেরা বলাবলি করছিল, ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। এ নামায পড়ার নিয়ম এই– যখন সূর্যগ্রহণ হয় তখন মাকরূহ সময়ে হলেও মানুষকে নামাযের জন্যে الصلوة جامعة বলে আহ্বান করবে। এর পর ইমাম তাদেরকে নিয়ে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে দু'টি রুকু করবে। প্রথম রুকু বড় হবে এবং দ্বিতীয় রুকু ছোট। কেরাআত সরবে পড়বে না। প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা বাকারা পাঠ করবে। প্রথম রুকুর পরে দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামুদ ও আলে এমরান পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকআতে কেয়ামে আলহামদু ও সূরা নেসা এবং প্রথম রুকুর পর দ্বিতীয় কেয়ামে আলহামদু ও সূরা মায়েদা পড়বে, আথবা কোরআনের যেখান থেকে ইচ্ছা পড়বে। যদি প্রত্যেক কেয়ামে কেবল আলহামদুই পাঠ করে তবুও যথেষ্ট হবে। ছোট ছোট সূরা পড়লেও কোন দোষ নেই। নামায দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য গ্রহণ শেষ হয়ে যাওয়া। প্রথম রুকুতে একশ' আয়াত পরিমাণে, দ্বিতীয় রুকুতে আশি আয়াত পরিমাণে, তৃতীয় রুকুতে সত্তর আয়াত পরিমাণে এবং চতুর্থ রুকুতে পঞ্চাশ আয়াত পরিমাণে তসবীহ্ পাঠ করবে। সেজদা ও রুকুর অনুরূপ হওয়া উচিত। এর পর নামায শেষে দু'টি খোতবা পাঠ করবে। মাঝখানে বসবে। উভয় খোতবার মানুষকে সদকা দেয়ার ও তওবা করার

আদেশ দেবে। চন্দ্রগ্রহণেও তাই করবে। কিন্তু তাতে কোরআন সরবে পাঠ করবে না। কেননা, এ নামায রাতের বেলায় হবে। যতক্ষণ সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ এই নামায পড়ার সময়। নামাযের মধ্যেই গ্রহণ শেষ হয়ে গেলে নামায সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ করে নেবে।

বৃষ্টির নামায– যখন নদীর পানি শুকিয়ে যায় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, তখন মানুষকে তিন দিন রোযা রাখতে বলা ইমামের জন্য মোস্তাহাব। এ সময় ইমাম সাধ্যানুয়ায়ী খয়রাত করা, কারও পাওনা থাকলে তা আদায় করা এবং গোনাহ থেকে তওবা করারও উপদেশ দেবে। এর পর চতুর্থ দিন আবাল বৃদ্ধবনিতাসহ গোসল করে বের হবে। অনুনয় বিনয় প্রকাশ পায় এমন ছেঁড়া বস্ত্র পরিধান করবে এবং বিনয়ের ভঙ্গিমায় গমন করবে। কেউ কেউ বলেন ঃ চতুষ্পদ জীব-জন্তুসমূহ সাথে নিয়ে যাওয়া মোস্তাহাব। হাদীসে বলা হয়েছে–

لو لاصبيان رضيع ومشائخ راكع وبهائم راتع اصب عليكم العذاب صبا -

অর্থাৎ, "যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু, এবাদতে লিপ্ত মাশায়েখ ও চারণকারী চতুষ্পদ জন্তু না থাকত, তবে তোমাদের উপর আযাব নাযিল করা হত।"

বিস্তীর্ণ মাঠে একত্রিত হওয়ার পর ইমাম তাদেরকে ঈদের নামাযের ন্যায় দু'রাকআত নামায পড়াবেন; কিন্তু তাতে অতিরিক্ত তকবীর থাকবে না। এর পর দুটি খোতবা পাঠ করবেন। উভয় খোতবার অধিকাংশ বিষয়বস্তু এস্তেগফার অর্থাৎ কৃত গোনাহখাতা থেকে ক্ষমা চাওয়া উচিত। দ্বিতীয় খোতবার মাঝখানে ইমাম মুসল্লীদের প্রতি পিঠ ফিরিয়ে কেবলামুখী হয়ে যাবে এবং নিজের চাদর এমনভাবে ওলটপালট করবে, যেন নীচের অংশ উপরে এবং ডানের অংশ বামে চলে যায়। মুসল্লীরাও তাদের চাদরের দিক এমনিভাবে পাল্টে নেবে। তখন আস্তে আস্তে দোয়া করবে। চাদর পাল্টানোর মধ্যে এই শুভ ইঙ্গিত রয়েছে, দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির স্থিতি এমনিভাবে পাল্টে যাক। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করেছেন। এর পর ইমাম মুসল্লীদের দিকে মুখ করে খোতবা শেষ করবে এবং চাদর

পাল্টানো অবস্থায়ই থাকতে দেবে। দোয়া এভাবে করবে; ইলাহী, আপনি আমাদেরকে দোয়া করার আদেশ এবং তা কবুল করার ওয়াদা দিয়েছেন। অতএব আমরা আপনার আদেশ অনুযায়ী দোয়া করছি। এখন আপনার ওয়াদা অনুযায়ী তা কবুল করুন। ইলাহী, আমরা যেসব গোনাহ্ করেছি, সেগুলো মার্জনা করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আমাদের রিযিক বৃদ্ধি ও বৃষ্টির জন্যে আমাদের দোয়া কবুল করুন।

জানাযার নামায– এ নামাযের নিয়ম সুবিদিত। এক সহীহ্ রেওয়ায়েতে আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত দোয়াটি এ নামাযে অধিক ব্যাপক। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এক জানাযার নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি যে দোয়া করেন তা দোয়া মুখস্থ করে নিয়েছি। তিনি বলছিলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهٖ وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, তাঁর মাগফেরাত করুন, তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর প্রবেশ পথ (কবর) বিস্তৃত করুন, তাঁকে বরফ ও শিলার পানি দিয়ে গোসল দিন, তাঁকে গোনাহ থেকে পবিত্র করুন, যেমন আপনি সাদা বস্ত্রকে ময়লা থেকে পবিত্র করেছেন, তাঁকে তাঁর গৃহের বদলে উত্তম গৃহ দিন, তাঁর পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার দিন, তাঁর স্ত্রীর বদলে উত্তম স্ত্রী দিন, তাঁকে জান্নাতে দাখিল করুন এবং কবর ও জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় দিন।"

হযরত আওফ বলেন ঃ এ দোয়া শুনে আমার বাসনা হল, হায়, এ মৃত ব্যক্তি যদি আমি হতাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ দোয়া যদি আমার

জন্যে হত! যেব্যক্তি দ্বিতীয় তকবীরে শরীক হয়, সে ইমামের সাথে অবশিষ্ট তকবীরগুলো বলবে এবং সালামের পর ছুটে যাওয়া তকবীরটি আদায় করে নেবে, যেমন মসবুক ব্যক্তি সালামের পর ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করে। তকবীরসমূহই জানাযার নামাযের বাহ্যিক আরকান। সেমতে অন্যান্য নামাযের রাকআতসমূহের স্থলাভিষিক্ত এ নামাযের তকবীরগুলো হওয়া উচিত। এটা আমার মতে অধিক যুক্তিসঙ্গত, যদিও আরও সম্ভাবনা আছে। জানাযার নামাযের সওয়াব এবং এর সাথে গমনের ফযীলত সম্পর্কে অনেক মশহুর হাদীস বর্ণিত আছে। সেগুলো উল্লেখ করে আমরা বিষয়বস্তু দীর্ঘ করতে চাই না। এর সওয়াব অনেক বেশী । কেননা, এটা ফরযে কেফায়া। নফল তার জন্যেই, যার উপর অন্য ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে নির্দিষ্ট হয়ে যায় না । নির্দিষ্ট না হলেও সে ফরযে কেফায়ারই সওয়াব পায়। জানাযার নামাযে অধিক লোকের উপস্থিতি মোস্তাহাব । বেশী লোক হলে দোয়া বেশী হবে এবং তাদের মধ্যে কেউ হয়তো এমনও থাকবে, যার দোয়া কবুল হয়। কুরায়ব বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এক ছেলের ইন্তেকাল হয়ে গেলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তার জানাযায় কত লোক উপস্থিত হয়েছে দেখ । আমি দেখার পর বললাম ঃ অনেক লোক হয়েছে। তিনি বললেন ঃ চল্লিশ জন হয়েছে ? আমি বললাম ঃ হাঁ । তিনি বললেন ঃ এখন জানাযা বের কর । আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- যদি কোন মুসলমান মারা যায় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশ ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়, যারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সুপারিশ মৃত ব্যক্তির জন্য কবুল করেন। লোকজন যখন জানাযার সাথে কবরস্থানে পৌছে অথবা এমনিতেও কবরস্থানে যায়, তখন এই দোয়া করবে-

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ـ

অর্থাৎ, গৃহবাসী মুমিন ও মুসলমানদের প্রতি সালাম । আমাদের

অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ্ রহম করুন। আমরাও ইনশাআল্লাহ্ তোমাদের সাথে মিলিত হব। দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে প্রস্থান না করা উত্তম । দাফন সম্পন্ন হয়ে গেলে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বলবে- ইলাহী, আপনার বান্দা আপনার কাছে সমর্পিত হয়েছে। আপনি তার প্রতি রহম করুন। ইলাহী, তার উভয় পার্শ্ব থেকে মাটি সরিয়ে দিন। তার আত্মার জন্যে আকাশের দরজা খুলে দিন, তার আমল কবুল করুন। ইলাহী, সে সৎ হলে সওয়াব দ্বিগুণ করুন এবং গোনাহগার হলে তার গোনাহ্ ক্ষমা করুন।

তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায- এ দু'রাকআত নামায সুন্নত। জুমআর দিনে ইমাম খোতবা পাঠ করলেও এ নামায পড়া উচিত। যদি কেউ মসজিদে গিয়ে ফরয অথবা কাযা নামাযে ব্যাপৃত হয়, তবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় এবং সওয়াব অর্জিত হয়ে যায়। কেননা, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মসজিদে যাওয়ার প্রারম্ভ এমন এবাদত থেকে শূন্য না হওয়া, যা মসজিদের জন্যে নির্দিষ্ট, যাতে মসজিদের হক আদায় হয়। এজন্যেই ওযুবিহীন অবস্থায় মসজিদে যাওয়া মাকরূহ। যদি মসজিদ হয়ে অন্য দিকে যাওয়ার জন্যে অথবা মসজিদে বসার জন্যে প্রবেশ করে, তবে চার বার সোবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলে নেবে। কথিত আছে, এর সওয়াব দু'রাকআত নামাযের সমান। ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে মাকরূহ সময়গুলোতে অর্থাৎ, আসর ও ফজর নামাযের পর সূর্য ঢলে পড়ার সময় এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় তাহিয়্যাতুল মসজিদের দুই রাকআত পড়া মাকরূহ নয়। কেননা, বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আসরের পর দু'রাকআত পড়লে কেউ আরজ করল ঃ আপনি তো আমাদেরকে এ নামায পড়তে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন ঃ এ দু'রাকআত নামায আমি যোহরের পরে পড়তাম, কিন্তু বাইরের লোক নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে আজ পড়তে পারিনি। এ হাদীস থেকে দুটি বিষয় জানা গেল- (১) এমন নামায পড়া এ সময়ে মাকরূহ, যার কোন কারণ নেই। নফল নামাযের কাযা একটি দুর্বল কারণ। কেননা, আলেমগণ এ সম্পর্কে একমত নন, নফলের কাযা পড়া উচিত কিনা এবং যে নফল কাযা হয়ে যায়, তার মত নামায পড়ে দিলে নফলের কাযা হয়ে যাবে কিনা। সুতরাং এই দুর্বল কারণের জন্যে যখন আসরের

পর নফল মাকরূহ রইল না, তখন মসজিদে আসা, যা একটি পূর্ণাঙ্গ কারণ, তার জন্য আরও উত্তমরূপে মাকরূহ থাকবে না। এ কারণেই জানাযা এসে গেলে জানাযার নামায, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায কোন সময়ই মাকরূহ নয়। কেননা, এসব নামাযের কারণ আছে। মাকরূহ সেই নামায হয়, যার কারণ নেই। (২) আরও জানা গেল, নফলের কাযা পড়া দুরস্ত। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নফলের কাযা পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিদ্রার আধিক্য অথবা রোগের কারণে রাত্রি বেলায় উঠতে না পারলে দিনের বেলায় বার রাকআত পড়ে নিতেন। জনৈক আলেম বলেন ঃ যেব্যক্তি নামাযে থাকার কারণে মুয়াযযিনের আযানের জওয়াব দিতে পারে না, তার উচিত সালামের পর তা কাযা করে নেয়া, যদিও তখন মুয়াযযিন চুপ হয়ে যায়। যদি কারও কোন নির্দিষ্ট ওযিফা থাকে এবং ওযরবশতঃ তা আদায় করতে না পারে, তবে অন্য সময়ে তা আদায় করে নেবে, যাতে তার নফ্স আরামপ্রবণ না হয়ে উঠে। সুতরাং এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া একে তো নফসের মোজাহাদার জন্যে ভাল, দ্বিতীয়তঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

احب الاعمال الى الله تعالى ادومها وان قل -

আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক পছন্দনীয় আমল তাই, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা কম।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে আল্লাহর এবাদত করে, এরপর ক্লান্ত হয়ে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন।

ওযুর নামায– ওযু করার পর দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। কারণ, ওযু একটি সওয়াবের কাজ। এর উদ্দেশ্য নামায পড়া। বে-ওযু হওয়ার আশংকা সব সময় লেগে থাকে। তাই নামাযের পূর্বেই ওযু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার এবং প্রথম ওযুর শ্রম নিষ্ফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেমতে ওযু করার সাথে সাথে দু'রাকআত পড়ে নেয়া মোস্তাহাব, যাতে উদ্দেশ্য ফওত না হয়ে যায়। হযরত বেলাল (রাঃ)-এর হাদীস থেকে এটা জানা গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আমি জান্নাতে প্রবেশ করে বেলালকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি আমার আগে এখানে পৌঁছে গেলে

কিরূপে। বেলাল বললেন ঃ আমি কিছু জানি না। কেবল এতটুকু জানি, যখন আমি নতুন ওযু করি তখনই দু'রাকআত নামায পড়ে নেই।

গৃহে গমন ও নির্গমনের নামায– হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তুমি যখন গৃহ থেকে বের হও, তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমার অশুভ নির্গমনের জন্যে বাধা হবে। আর যখন তুমি গৃহে গমন কর, তখন দু'রাকআত নামায পড়ে নাও। এটা তোমাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরুতে দু'রাকআত নামায পড়ে নেয়া উচিত। এ কারণে এহরাম বাঁধার সময় দু'রাকআত, সফরের শুরুতে দু'রাকআত এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর গৃহে যাওয়ার পূর্বে মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। এগুলো রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কর্ম থেকে বর্ণিত। জনৈক সালেহ ব্যক্তি যখন কোন খাদ্য খেতেন অথবা পানি পান করতেন, তখন, দু'রাকআত নামায পড়ে নিতেন।

মানুষের কাজকর্ম তিন প্রকার– (১) কতক কাজ বার বার হয়ে থাকে, যেমন পানাহার। এ ধরনের কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

كل امر ذى بال لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر -

অর্থাৎ, যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে শুরু না করলে অসম্পূর্ণ থাকে।

(২) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু তাতে গুরুত্ব থাকে। যেমন– বিবাহ, উপদেশ, পরামর্শ ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা সহকারে শুরু করা মোস্তাহাব। উদাহরণতঃ যে বিবাহ দেয় সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ– আমি আমার কন্যা তোমার বিবাহে দিলাম এবং যে বিবাহ করে সে বলবে, আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালাতু আলা রাসূলিল্লাহ– আমি বিবাহ কবুল করলাম। সাহাবায়ে কেরাম উপদেশ দান ও পরামর্শ করার কাজে প্রথমে আল্লাহর হামদ করতেন।

(৩) কতক কাজ বার বার হয় না; কিন্তু হওয়ার পর বেশী দিন স্থায়ী থাকে এবং তাতে গুরুত্ব পাওয়া যায়। যেমন সফর করা, নতুন গৃহ ক্রয় করা, এহরাম বাঁধা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ করার পূর্বে দু'রাকআত নামায পড়া মোস্তাহাব। গৃহে আগমন ও গৃহ থেকে নির্গমন এগুলোর মধ্যে সর্বনিম্ন কাজ। এটাও যেন এক ছোট্ট সফর।

এস্তেখারার নামায– যেব্যক্তি কোন কাজ করার ইচ্ছা করে; কিন্তু কাজটি করা ভাল হবে কি না করা ভাল হবে, তা কিছুই জানে না, তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দু'রাকআত নামায পড়তে বলেছেন। সে প্রথম রাকআতে আলহামদু ও সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে আলহামদু ও সূরা এখলাস পাঠ করবে। নামাযান্তে এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَقَدِّرْهُ لِىْ ثُمَّ يَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَقَدِّرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كَانَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে আপনার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করি, আপনার শক্তির মাধ্যমে আপনার কাছে শক্তি এবং আপনার মহান কৃপা প্রার্থনা করি। কেননা, আপনি শক্তিমান, আমার কোন শক্তি নেই। আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত। হে আল্লাহ, যদি আপনার জ্ঞানে এ কাজটি আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর হয়, তবে এটি আমার জন্য অবধারিত করুন, অতঃপর একে আমার জন্যে সহজ করুন এবং এতে বরকত দিন। আর যদি আপনি জানেন, এ কাজটি

আমার ইহকাল, পরকাল, পরিণাম, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে ক্ষতিকর, তবে এ কাজ আমা থেকে এবং আমাকে এ কাজ থেকে দূরে রাখুন, আমার জন্যে কল্যাণ অবধারিত করুন, তা যেখানেই থাকুক না কেন। নিশ্চয়ই আপনি সর্ববিষয়োপরি ক্ষমতাবান।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে এস্তেখারার দোয়া কোরআনের আয়াতের ন্যায় গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা দিতেন । এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন দু'রাকআত নামায পড়বে এবং সে কাজের নাম উল্লেখপূর্বক উপরোক্ত দোয়া করবে। জনৈক দার্শনিক বলেন ঃ যেব্যক্তি চারটি বিষয় প্রাপ্ত হয়, সে চারটি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয় না। যে শোকর প্রাপ্ত হয় সে অতিরিক্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয় না; যে তওবা প্রাপ্ত হয় সে কবুল থেকে বঞ্চিত হয় না; যে এস্তেখারা লাভ করে সে মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয় না এবং যে পরামর্শ প্রাপ্ত হয়, সে সঠিক পথ থেকে বঞ্চিত হয় না।

হাজতের নামায– যেব্যক্তি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়, ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্যে তার উচিত হাজতের নামায পড়া । ওহায়ব ইবনুল ওরদ (রহঃ) বলেন ঃ যেসব দোয়া অগ্রাহ্য হয় না, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, বান্দা বার রাকআত নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু, আয়াতুল কুরসী ও কুল হুওয়াল্লাহু পড়বে। এর পর সেজদা করতঃ এই দোয়া পড়বে–

سُبْحٰنَ الَّذِىْ تَقَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهٖ سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهٖ سُبْحٰنَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهٗ سُبْحٰنَ ذِى الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحٰنَ ذِى الْعِزِّ وَالْكَرَمِ سُبْحٰنَ ذِى الطَّوْلِ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۔

অর্থাৎ, পবিত্র সেই সত্তা, যিনি মাহাত্ম্যকে আপন চাদর করেছেন এবং তদ্দ্বারা মহৎ হয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা, যিনি আপন জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে বেষ্টন করেছেন। পবিত্র সেই সত্তা, একমাত্র যাঁর জন্যে তসবীহ উপযুক্ত । পবিত্র, অনুগ্রহ ও কৃপাবিশিষ্ট সত্তা। পবিত্র ইযযত ও দানশীলতাবিশিষ্ট সত্তা । পবিত্র নেয়ামতবিশিষ্ট সত্তা । ইলাহী, আমি আপনার কাছে আপনার আরশের জন্যে উপযুক্ত ইযযতের মাধ্যমে এবং আপনার কিতাবের চূড়ান্ত রহমতের মাধ্যমে, আপনার উচ্চ শানের মাধ্যমে এবং আপনার পরিপূর্ণ কলেমাসমূহের মাধ্যমে, যা কোন সৎ ও অসৎ ব্যক্ত অতিক্রম করতে পারে না- এই প্রার্থনা করছি, মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের প্রতি রহমত নাযিল করুন।

এর পর আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করবে, যদি তা কোন গোনাহের বিষয় না হয় । ইনশাআল্লাহ এ প্রার্থনা কবুল হবে। ওহায়ব বলেন ঃ প্রাচীন লোকগণ বলতেন, এ দোয়া বোকাদেরকে শিখিয়ো না। নতুবা তারা এর মাধ্যমে গোনাহের কাজে সাহায্য নেবে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ রেওয়ায়েতটি রসূলে করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

সালাতুত্তাসবীহ্- এ নামাযটি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে হুবহু বর্ণিত আছে। এটা কোন সময় ও কারণের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ নামায একবার পড়া থেকে কোন সপ্তাহ অথবা মাস খালি না থাকা মোস্তাহাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পিতৃব্য আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে বললেন ঃ আমি আপনাকে একটি বস্তু দিচ্ছি, একটি বিষয় শেখাচ্ছি। আপনি যখন এটা করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনার ভূত-ভবিষ্যৎ, পরাতন ও নতুন, জানা ও অজানা এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল গোনাহ্ মাফ করে দেবেন। বিষয়টি এই, আপনি চার রাকআত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে আলহামদু ও একটি সূরা পাঠ করবেন। যখন প্রথম রাকআতের কেরাআত শেষ হয়, তখন দন্ডায়মান অবস্থায় সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার পনর বার, এরপর রুকু করে রুকুতে দশ বার এই কলেমা পড়বেন, এর পর দাঁড়িয়ে এই কলেমা দশ বার, এর পর সেজদা করে সেজদায় দশ বার, মাথা তুলে বসা অবস্থায় দশ বার, এভাবে প্রতি রাকআতে মোট পঁচাত্তর বার এই কলেমা পাঠ করে চার রাকআত

নামায সম্পন্ন করবেন। সম্ভব হলে এ নামায প্রত্যেক দিন পড়ুন, নতুবা প্রত্যেক জুমআর দিনে একবার, এটাও সম্ভব না হলে মাসে একবার পড়ুন। এক রেওয়ায়েতে আছে, শুরুতে সানা পড়বেন, এর পর পনের বার উপরোক্ত তসবীহ্ কেরাআতের পূর্বে এবং দশ বার কেরাআতের পরে পাঠ করবেন; রাকআতের অবশিষ্টাংশে প্রথম রেওয়ায়েতের অনুরূপ পাঠ করবেন; কিন্তু দ্বিতীয় সেজদার পর কিছুই পাঠ করবেন না। এই রেওয়ায়েত উত্তম। উভয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী চার রাকআত এক সালামে এবং রাতের বেলায় চার রাকআত দু'সালামে পড়বে। কেননা, হাদীসে আছে- صلوة الليل مثنى مثنى (রাতের নফল নামায দু'রাকআত করে)। উপরোক্ত কলেমার পরে وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ কলেমা যোগ করা উত্তম। কতক রেওয়ায়েতে এ কলেমাও বর্ণিত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত নফল নামাযসমূহের মধ্যে তাহিয়্যাতুল মসজিদ, গ্রহণের নামায ও বৃষ্টির নামায ছাড়া অন্য কোন নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া মোস্তাহাব নয়। ওযুর দু'রাকআত, সফরের দু'রাকআত, গৃহ থেকে বের হওয়ার নামায এবং এস্তেখারার নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না। কেননা, এসবের কারণ দুর্বল এবং মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ার নিষেধাজ্ঞা জোরদার। অতএব এসব নামায প্রথমোক্ত তিন প্রকার নামাযের মর্তবায় পৌঁছে না। আমি কতক সূফীকে মাকরূহ ওয়াক্তে ওযুর দু'রাকআত নামায পড়তে দেখেছি। অথচ এটা নীতিবিরুদ্ধ। কেননা, ওযু নামাযের কারণ নয়; বরং নামায ওযুর কারণ হয়। কাজেই নামায পড়ার জন্যে ওযু করা উচিত। এটা নয় যে, নামায পড়বে ওযু করার জন্যে। যেব্যক্তি মাকরূহ ওয়াক্তে তার ওযু নামায থেকে খালি রাখতে চায় না, তার উচিত ওযুর পরে দু'রাকআত কাযার নিয়ত করা। কেননা, তার যিম্মায় কোন কাযা নামায থাকা সম্ভবপর। কাযা নামায মাকরূহ ওয়াক্তেও মাকরূহ নয়। কিন্তু মাকরূহ ওয়াক্তে নফলের নিয়ত করার কোন কারণ নেই। এসব ওয়াক্তে নফল নামায পড়তে নিষেধ করার পেছনে তিনটি বিষয় উদ্দেশ্য। প্রথম, সূর্যপূজারীদের সাথে সামঞ্জস্য থেকে আত্মরক্ষা করা। দ্বিতীয়, শয়তান থেকে আত্মরক্ষা করা। হাদীস শরীফে রসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেন ঃ সূর্যোদয় হয় আর তার সাথে শয়তানের মস্তকের একটি প্রান্ত সংযুক্ত থাকে । সূর্য উপরে উঠে গেলে তা পৃথক হয়ে যায় । যখন ঠিক দ্বিপ্রহর হয় তখন আবার মিলিত হয়ে যায় । যখন ঢলে পড়ে তখন চলে যায়। এর পর যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে, তখন শয়তানের মাথা আবার সংযুক্ত হয় এবং অস্ত যাওয়ার পর আলাদা হয়ে যায় । রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ তিন সময়ে পড়তে নিষেধ করে তার কারণ বলে দিয়েছেন। তৃতীয়, আধ্যাত্ম পথের পথিক সর্বদা নিয়মিত নামায পড়ে। এবাদত একই প্রকারে নিয়মিত করা পরিণামে বিষণ্নতা সৃষ্টি করে। যদি এক ঘন্টা এবাদত বন্ধ রাখা হয় তবে প্রসন্নতা বৃদ্ধি পায় এবং ইচ্ছা নতুনতর হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা

জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা যাকাতকে ইসলামের একটি স্তম্ভ করেছেন এবং নামাযের পর এর কথাই উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُو الزَّكٰوةَ -

অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الله وان

محمدا عبده ورسوله واقام الصلوة وايتاء الزكوة -

অর্থাৎ, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত – এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রসূল, নামায কয়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা।

যারা যাকাত প্রদান করে না, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَايُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ -

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

এ আয়াতে আল্লাহর পথে ব্যয় করার অর্থ যাকাত প্রদান করা। আহ্নাফ ইবনে কয়স (রাঃ) বলেন ঃ আমি কয়েকজন কোরায়েশের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় হযরত আবু যর (রাঃ) সেখান দিয়ে গমন করলেন। তিনি বললেন ঃ কাফেরদেরকে শুনিয়ে দাও একটি দাগের খবর, যা তাদের পিঠে লাগবে এবং পাঁজরের হাড্ডি হয়ে বের হবে। আরেকটি দাগ তাদের গ্রীবায় লাগবে এবং কপাল পার হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এমন সময়ে পৌছলাম, যখন

তিনি কাবা গৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন ঃ কাবার পালনকর্তার কসম, তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত । আমি আরজ করলাম ঃ হুযুর, কাদের কথা বলছেন? তিনি বললেন ঃ যাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যারা ডানে, বামে, সম্মুখে ও পেছনে ধন-সম্পদ ছড়ায় এবং খয়রাত করে (তাদের কথা আলাদা), এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম । তিনি আরও বললেন ঃ যে উটওয়ালা, ছাগলওয়ালা ও গরুওয়ালা তাদের যাকাত প্রদান করে না, কেয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব বড় ও মোটাতাজা হয়ে আসবে এবং এ ব্যক্তিকে শিং দ্বারা গুঁতো মারবে আর খুর দ্বারা পিষ্ট করবে। যখন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জন্তু তাকে মারা শেষ করবে, তখন পুনরায় এমনিভাবে শুরু করবে। মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত এই আযাব অব্যাহত থাকবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

যাকাতের প্রকার ও ওয়াজেব হওয়ার কারণ

ধন-সম্পদের দিক দিয়ে যাকাত ছয় প্রকার । নিম্নে প্রত্যেক প্রকার আলাদা আলাদা বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকার– গৃহপালিত জন্তুর যাকাত প্রত্যেক মুসলমান স্বাধীন ব্যক্তির উপর ওয়াজেব । তার বালেগ ও বুদ্ধিমান হওয়া শর্ত । এখন যে চতুষ্পদ জন্তুর উপর যাকাত ওয়াজেব হয় তার জন্যে শর্ত পাঁচটি ; প্রথমতঃ বিশেষ চতুষ্পদ জন্তু হওয়া। কেননা, যাকাত কেবল উট, গরু ও ছাগলের মধ্যে ফরয। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার মধ্যে ফরয নয়। দ্বিতীয় ঃ জঙ্গলে ঘাস খাওয়া ; কেননা, যেসকল জন্তু গৃহেই ঘাস খায়, সেগুলোর উপর যাকাত নেই। তৃতীয়তঃ এক বছর সময় অতিবাহিত হওয়া। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لازكوة الا فى مال حتى يحول عليه الحول .

অর্থাৎ, যে মালের উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয় না, তাতে যাকাত নেই।

এ বিধানে বাচ্চা জন্তু বড় জন্তুর অনুগামী হয়। অর্থাৎ, বড় জন্তুর উপর দিয়ে এক বছর অতিবাহিত হয়ে-গেলে বাচ্চাদেরও যাকাত দিতে

হবে, যদিও সেগুলোর এক বছর পূর্ণ না হয়। বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই যা বিক্রয় করে দেয়া হয় অথবা দান করা হয়, তা হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। চতুর্থতঃ মালের উপর পূর্ণ মালিকানা শর্ত। ফলে হারানো মালের যাকাত দেয়া ওয়াজেব নয়, যে পর্যন্ত তা পুনরায় হস্তগত না হয়। হস্তগত হলে অতীত দিনেরও যাকাত ওয়াজেব হবে। যার কর্জ তার সম্পূর্ণ মালের অধিক, তার উপর যাকাত নেই। কেননা, এরূপ মালের কারণে সে ধনী নয়। এ মাল প্রয়োজনের অতিরিক্ত হলে তাকে ধনী বলা যেত । পঞ্চমতঃ নেসাব পূর্ণ হওয়া । এটা প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে আলাদা আলাদা । উদাহরণতঃ উটের সংখ্যা পাঁচ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত নেই। উট পাঁচটি হলে তাতে পূর্ণ এক বছর বয়সের একটি ভেড়া অথবা পূর্ণ দু'বছর বয়সের একটি ছাগল যাকাতস্বরূপ দিতে হবে। দশটি উটে দু'টি, পনরটিতে তিনটি এবং বিশটিতে চারটি ছাগল দিতে হবে। উট পঁচিশটি হলে তাতে একটি বিনতে মাখায অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করে দিতে হবে। ছত্রিশটি উটে একটি বিনতে লাবুন, অর্থাৎ উটের মাদী বাচ্চা, যা তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে– দিতে হবে। ছেচল্লিশটি উটে একটি হিক্কা অর্থাৎ, চতুর্থ বছরের মাদী উট দিতে হবে। একষট্টিটি উটে জিযআ, অর্থাৎ পাঁচ বছর বয়সের একটি উষ্ট্রী দিতে হবে। ছিয়াত্তরে দুটি বিনতে লাবুন, একানব্বইয়ে দু'হিক্কা এবং একশ' একুশ উটে তিনটি বিনতে লাবুন দিতে হবে। এর পর উটের সংখ্যা একশ' ত্রিশ হয়ে গেলে প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি হিক্কা এবং প্রতি চল্লিশটিতে একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। এই হিসাবে একশ' ত্রিশটিতে একটি হিক্কা ও দুটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে। গাভী ও বলদে ত্রিশটি হওয়া পর্যন্ত যাকাত নেই। ত্রিশটি হয়ে গেলে একটি তবী (দ্বিতীয় বছরে উপনীত নর বাছুর) যাকাত দিতে হবে । চল্লিশটি হলে একটি মুসিন্না অর্থাৎ, যে মাদী বাছুর তৃতীয় বছরে পদার্পণ করে– দিতে হবে। ষাটটি হলে দুটি তবী দিতে হবে। এর পর প্রত্যেক চল্লিশটিতে একটি মুসিন্না ও প্রত্যেক ত্রিশটিতে একটি তবী যাকাত দিতে হবে। চল্লিশটি না হওয়া পর্যন্ত ছাগল ভেড়ার মধ্যে যাকাত নেই। চল্লিশটি হলে তাতে একটি ভেড়ার 'জিযআ' (পূর্ণ এক বছরের ভেড়া) অথবা ছাগলের 'ছানিয়া' (পূর্ণ দু'বছরের ছাগল) দিতে হবে। এরপর একশ' বিশ পর্যন্ত এ হার অব্যাহত থাকবে। একশ' একুশটি হলে দুশ' পর্যন্ত দু'টি ছাগল দিতে হবে। দুশ'

এক হয়ে গেলে তিনশ' নিরানব্বই পর্যন্ত তিনটি ছাগল এবং চারশ' হয়ে গেলে চারটি ছাগল দিতে হবে। অতঃপর প্রতি শ'তে একটি করে ছাগল দিতে হবে। নেসাবের মধ্যে দু'শরীকের যাকাত এক মালিকের মতই হবে। উদাহরণতঃ দু'ব্যক্তির শরীকানায় চল্লিশটি ছাগল থাকলে তাদের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে এবং তিন ব্যক্তির শরীকানায় একশ' বিশটি ছাগল থাকলে সকলের উপর এক ছাগলই ওয়াজেব হবে। অথচ আলাদা করলে প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগে চল্লিশটি করে ছাগল পড়ে এবং তাতে একটি করে ছাগল ওয়াজেব হতে পারে। পালের মধ্যে সুস্থ জন্তু থাকলে অসুস্থ জন্তু যাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা জায়েয নয়। ভাল জন্তুর মধ্যে ভাল এবং মন্দ জন্তুর মধ্যে মন্দ জন্তুই নিতে হবে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ খাদ্য জতীয় ফসলের যাকাত। এরূপ ফসল আটশ' সের অর্থাৎ বিশ মণ হলে তাতে দশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। ফলমূল ও তুলার মধ্যে যাকাত নেই। খোরমা ও কিশমিশ শুষ্ক অবস্থায় বিশ মণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজেব।

তৃতীয় প্রকার ঃ রৌপ্য ও স্বর্ণের যাকাত। খাঁটি রৌপ্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হল, তার যাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। রৌপ্য আরও বেশী হলে এ হিসাবেই যাকাত ওয়াজেব হবে, যদিও এক দেরহাম বেশী হয়। স্বর্ণের নেসাব সাড়ে সাত তোলা। এতেও বছরান্তে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব। এক রতি বেশী হলেও এ হিসাবেই যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে নেসাব থেকে এক রতি কম হলেও যাকাত ওয়াজেব হবে না।

চতুর্থ প্রকার ঃ পণ্য দ্রব্যের যাকাত। এতে সোনা রূপার মত চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। এর বছর গণনা সেদিন থেকে হবে, যেদিন পণ্যদ্রব্য কেনার নেসাব পরিমাণ নগদ অর্থ ব্যবসায়ীর মালিকানায় আসে। যদি সেই নগদ অর্থ নেসাবের কম হয় অথবা দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যবসা করার নিয়তে মাল ক্রয় করে, তবে বছরের শুরু ক্রয় করার সময় থেকে হবে। বছরের শেষে পণ্যদ্রব্যের যে মুনাফা অর্জিত হয়, মূলধনের উপর এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে মুনাফার উপর যাকাত ওয়াজেব হয়ে যায়। মুনাফার উপর নতুনভাবে বছর অতিবাহিত হওয়ার প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম প্রকার ঃ মাটির নীচে পুঁতে রাখা মাল ও খনিজ সামগ্রীর যাকাত। পুঁতে রাখা মাল মানে সেই মাল, যা কুফরের আমলে পুঁতে রাখা হয় এবং এমন জমিনে পাওয়া যায়, ইসলামী আমলে যার উপর কারও মালিকানা হয়নি। যেব্যক্তি এই পুঁতে রাখা মাল পাবে, তার কাছ থেকে সোনা-রূপা হলে এক পঞ্চমাংশ নেয়া হবে। এতে বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই। নেসাবের শর্ত না হওয়াও উত্তম। কেননা, এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব হওয়ার কারণে যুদ্ধলব্ধ মালের সাথে এর সামঞ্জস্য বেশী। নেসাবের শর্ত রাখা হলেও তা অবান্তর নয়। কেননা, এই এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাতের মাসরাফ তথা ব্যয় খাত একই। এ কারণেই সহীহ্ মাযহাব অনুযায়ী খাঁটি সোনা রূপাকেই 'দফীনা' তথা পুঁতে রাখা মাল বলা হবে, অন্য কিছুকে নয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে কেবল সোনা-রূপার উপরই যাকাত ওয়াজেব হয়– অন্য কোন দ্রব্যের উপর ওয়াজেব হয় না। সোনা-রূপা খনি থেকে বের করে নেয়ার পর বিশুদ্ধতম উক্তি মোতাবেক তাতে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজেব হবে। এ উক্তি অনুযায়ী নেসাব হওয়া শর্ত। বছর অতিবাহিত হওয়ার ব্যাপারে দু'উক্তির মধ্যে এক উক্তি হচ্ছে, খনির সোনা-রূপার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ ওয়াজেব। কাজেই বছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত নেই।

সাবধানতা হচ্ছে অল্প হোক কি বেশী, সকল প্রকার খনি থেকে এক পঞ্চমাংশ প্রদান করা এবং বিশেষভাবে সোনা-রূপার খনি নয়– প্রত্যেক খনি থেকে এক-পঞ্চমাংশ দেয়া– যাতে মতভেদের কোন সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে।

ষষ্ঠ প্রকার ঃ সদকায়ে ফেতর। এটা এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যার কাছে ঈদুল ফেতরের দিনে তার এবং তার পরিবারের খাদ্যের অতিরিক্ত এক ছা' খাদ্য মৌজুদ থাকে। তিন সের আধা ছটাকে এক ছা' হয়। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ মাথাপিছু এক ছা'। পরিবারে যে খাদ্য খাওয়া হয়, তা অথবা তা থেকে উত্তম খাদ্য দেবে। সুতরাং পরিবারে গম খাওয়া হলে যব দেয়া দুরস্ত নয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া হলে যেটি উত্তম সেটি দেবে; যেকোন একটি দিলেও হবে। (১) পুরুষ গৃহকর্তার উপর তার স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং যাদের ভরণ-পোষণ করতে হয়, এমন আত্মীয়দের সদকা দেয়া ওয়াজেব। যেমন, বাপ-দাদা, মা-নানী ইত্যাদি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা যাদের ভরণ পোষণ কর, তাদের সদকায়ে ফেতর আদায় করে দাও। স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে ফেতরা

দিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে। যদি কারও কাছে এতটুকু খাদ্যই অতিরিক্ত হয়, যা কতক লোকের পক্ষ থেকে দিতে পারে, তবে কতক লোকের পক্ষ থেকেই আদায় করবে। তবে যাদের ভরণ-পোষণের তাকিদ বেশী, প্রথমে তাদের ফেতরা দেবে।

মোট কথা, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির এসব বিধান জেনে নেয়া উচিত এবং কোন বিরল পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আলেমগণের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে তার উপর আমল করা দরকার।

(১) হানাফী মাযহাবমতে সদকায়ে ফেতর এমন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব, যে প্রয়োজনীয় বাসস্থান, অন্ন বস্ত্র ও সাজসর ামের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়। এ নেসাবের উপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। এ সদকা সে নিজের থেকে, নিজের সন্তানদের পক্ষ থেকে এবং খেদমতের গোলামদের পক্ষ থেকে আদায় করবে। স্ত্রী এবং বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ থেকে দিতে হবে না। সদকায়ে ফেতরের পরিমাণ গম ও গম জাতীয় খাদ্যের অর্ধ ছা' এবং যব ও খেজুরের এক ছা'। এ পরিমাণ গমের মূল্য দিলেও সদকায়ে ফেতর আদায় হবে।

যাকাতের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ শর্তাবলী

বাহ্যিক শর্তাবলী ঃ উল্লেখ্য, যাকাতদাতা ব্যক্তি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। প্রথমতঃ মনে মনে ফরয যাকাত দেয়ার নিয়ত করা। অমুক অমুক মালের যাকাত দেই– এরূপ নির্দিষ্ট করা জরুরী নয়। ওলীর নিয়ত উন্মাদ ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের নিয়তের স্থলবর্তী হবে। তদ্রূপ শাসনকর্তার নিয়ত মালের মালিকের নিয়তের স্থলাভিষিক্ত হবে– যদি মালের মালিক যাকাত না দেয়। কিন্তু এটা দুনিয়ার বাহ্যিক বিধান। আখেরাতে সে দাবী থেকে মুক্ত হবে না যে পর্যন্ত নতুনভাবে যাকাত না দেয়। যাকাত দেয়ার জন্য কাউকে উকিল করা হলে এবং তখন নিয়ত করে নিলে অথবা উকিলকে নিয়তেরও উকিল করা হলে যথেষ্ট হবে। কেননা, নিয়তের জন্যে উকিল করাও নিয়ত। দ্বিতীয়তঃ বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তড়িঘড়ি যাকাত দেয়া উচিত। সদকায়ে ফেতর ঈদের দিন থেকে বিলম্বিত করা উচিত নয়। যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মালের যাকাত

দিতে বিলম্ব করে, সে গোনাহগার হবে। এর পর যদি তার মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যাকাতের প্রাপককে পাওয়ার সামর্থ্য থাকে, তবে যাকাত তার যিম্মায় থেকে যাবে। যদি যাকাতের প্রাপিক না পাওয়ার কারণে বিলম্ব হয় এবং ইতিমধ্যে মাল বিলুপ্ত হয়ে যায় তবে যাকাত যিম্মায় থাকবে না। বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেও যাকাত দেয়া জায়েয যদি মাল নেসাব পরিমাণে হয়ে যায়। দু'বছরের যাকাত অগ্রিম দেয়াও জায়েয। অগ্রিম যাকাত দিলে যদি যাকাত গ্রহীতা মিসকীন বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায় অথবা দর্মত্যাগী হয়ে যায় অথবা অন্য কোন মাল প্রাপ্তির কারণে ধনী হয়ে যায়, অথবা মালের মালিকের মাল বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে যা কিছু সে অগ্রিম দিয়েছিল তা যাকাতরূপে গণ্য হবে না। দেয়ার সময় ফিরিয়ে দেয়ার শর্ত যোগ করে না থাকলে এটা ফেরত লওয়াও সম্ভবপর নয়। কাজেই মালের মালিককে অবশ্যই পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রিম যাকাত দিতে হবে।

তৃতীয়তঃ যাকাতস্বরূপ যে মাল ওয়াজেব হয়, তার বিনিময়ে মূল্য দিতে পারবে না; বরং যে মাল ওয়াজেব হয় তাই দেবে। এমনকি, স্বর্ণের বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ দেবে না, যদিও মূল্য বাড়িয়েই দেয়া হয়। সম্ভবতঃ যারা ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য বুঝে না, তারা এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তারা কেবল দেখে, ফকীরের অভাব দূর করাই উদ্দেশ্য। অথচ এটা প্রকৃত জ্ঞানের কথা নয়। কেননা, ফকীরের অভাব দূর করা যাকাতের উদ্দেশ্য ঠিকই; কিন্তু এটা পূর্ণ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্যের একটি অংশ মাত্র। শরীয়তের ওয়াজেব বিষয়সমূহ তিন প্রকার। এক, নিছক এবাদত। এতে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কোন দখল নেই। উদাহরণতঃ হজ্জে কংকর নিক্ষেপ করা। এতে কাজটি শুরু করাই শরীয়তের উদ্দেশ্য, যাতে বান্দা তার দাসত্ব ও গোলামী এমন কাজ দ্বারা প্রকাশ করে, যার অর্থ বোধগম্য নয়। কেননা, যে কাজের অর্থ বোধগম্য, তা সম্পাদনে মানুষের মনও সাহায্য করে। ফলে তাতে খাঁটি দাসত্ব প্রকাশ পায় না। কারণ একমাত্র মাবুদের আদেশের কারণেই কর্ম সম্পাদন করাকে দাসত্ব বলা হয়। হজ্জের অধিকাংশ ক্রিয়াকর্ম এমনি ধরনের। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) স্বীয় এহরামে এরশাদ করেন ঃ

لبيك لحجة حقا تعبدا ورقا ـ

আমি উপস্থিত আছি দাসত্বস্বরূপ হজ্জের জন্যে। অর্থাৎ, এ এহরাম

কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে দাসত্ব প্রকাশ করা এবং যেভাবে আদেশ হয়েছে তা মেনে নেয়া এমন কোন যুক্তি ব্যতিরেকে, যা এ আদেশ পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্ম এমন, যার পেছনে কোন যুক্তিযুক্ত উদ্দেশ্য রয়েছে– নিছক এবাদত বা দাসত্ব প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়; যেমন কর্জ শোধ করা এবং ছিনিয়ে নেয়া বস্তু ফেরত দেয়া। এতে নিয়ত ও কর্মই ধর্তব্য নয়; বরং হকদারের কাছে তার হক আসল অথবা বিনিময়– যেকোন আকারে পৌঁছে গেলেই ওয়াজেব আদায় হয়ে যাবে। এ দু'প্রকার ওয়াজেব সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা, ফলে সকলেরই বোধগম্য। কিন্তু তৃতীয় প্রকার ওয়াজেব কর্মে বান্দার অভাব দূর করা এবং তার দাসত্ব পরীক্ষা করা উভয় বিষয় উদ্দেশ্য। এ প্রকার ওয়াজেব কর্মে উভয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজেব এবং যে বিষয় অধিক প্রকাশ্য, তার দিকে লক্ষ্য রেখে অপর বিষয়টি ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা, অপর বিষয়টি অর্থাৎ দাসত্ব পরীক্ষার দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া বিচিত্র নয়। যাকাত এমনি ধরনের একটি ওয়াজেব কর্ম। ইমাম শাফেয়ী ব্যতীত অন্য কেউ এ নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয়। যাকাতে গরীবের অভাব দূর করা একটি প্রকাশ্যতম বিষয় বিধায় এটা সহজে বোধগম্য। বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী যাকাত প্রদান করে দাসত্ব প্রকাশ করাও শরীয়তের লক্ষ্য। এদিক দিয়েই যাকাত নামায ও হজ্জের সমকক্ষ হয়ে ইসলামের একটি স্তম্ভ সাব্যস্ত হয়েছে। এতে সন্দেহ নেই, প্রত্যেক প্রকারের মাল পৃথক করা, তা থেকে যাকাতের পরিমাণ বের করা এবং তা বর্ণিত আট প্রকার খাতে বন্টন করা একটি কঠিন কাজ। এতে শৈথিল্য করলে গরীবের স্বার্থে কোন ত্রুটি দেখা দেয় না; কিন্তু দাসত্ব প্রকাশে অবশ্যই ত্রুটি থেকে যায়।

চতুর্থতঃ যাকাতের অর্থ অন্য শহরে স্থানান্তর করবে না। কেননা প্রত্যেক শহরের মিসকীন সেই শহরের যাকাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। স্থানান্তর করা হলে তাদের আশা ভঙ্গ হবে। স্থানান্তর করলে এক উক্তি অনুযায়ী যাকাত আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু মতভেদজনিত সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা ভাল। কাজেই প্রত্যেক শহরের যাকাতের মাল সেই শহরের গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে।

পঞ্চমতঃ কোরআনের বর্ণিত আট প্রকার খাতের মধ্যে থেকে যে কয় প্রকার খাত শহরে বিদ্যমান আছে, যাকাতের মাল ততভাগে ভাগ করবে। কেননা, নির্ধারিত খাতে যাকাতের অর্থ পৌছানো যাকাতদাতার উপর

ওয়াজেব। إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ الخ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ তাই। অর্থাৎ, যাকাত এই লোকদের কাছে পৌঁছা উচিত। এ আয়াতটি এমন, যেমন কোন রুগ্ন ব্যক্তি ওসিয়ত করে, তার এক-তৃতীয়াংশ মাল ফকীর ও মিসকীনদের জন্যে। এ ওসিয়ত এটাই চায় যে, তার মালের মধ্যে উভয় প্রকার লোক অংশীদার থাকবে। আয়াতেও সকল প্রকারের অংশীদারিত্ব বুঝানো হয়েছে। এবাদত অধ্যায়ে বাহ্যিক বিষয়াদিতে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির প্রতিও দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয়। আট প্রকারের মধ্যে দু'প্রকার খাত তো অধিকাংশ শহরেই অনুপস্থিত। এক, অন্তর জয় করার জন্যে যাদেরকে যাকাত দেয়া হয় এবং দুই, যাকাতের কর্মচারীবৃন্দ। চার প্রকার খাত সকল শহরেই বিদ্যমান আছে– ফকীর-মিসকীন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও নিঃস্ব মুসাফির। দু'প্রকার খাত কতক শহরে পাওয়া যায় এবং কতক শহরে পাওয়া যায় না। তারা হল গাযী ও মুকাতাব।

সুতরাং যাকাতদাতার শহরে যদি পাঁচ প্রকার খাত বিদ্যমান থাকে, তবে যাকাতের অর্থ সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করবে এবং প্রত্যেক প্রকার খাতকে এক ভাগ দেবে। প্রত্যেক খাতের সমান সংখ্যক ব্যক্তিকে দেয়াই ওয়াজেব নয়; বরং এক প্রকারের দশ ব্যক্তিকে এবং অন্য প্রকারের বিশ ব্যক্তিকে দেয়ার অধিকার যাকাতদাতার রয়েছে। তবে প্রত্যেক প্রকারের সংখ্যা যেন তিন জনের কম না হয়। সুতরাং শহরে পাঁচ প্রকার খাত বিদ্যমান থাকলে যাকাত পনর-ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করবে। যাকাতের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে এভাবে বন্টন করা কঠিন হলে অন্য যাকাতদাতাদের সাথে শরীক হয়ে যাবে এবং সকলের মাল একত্রিত করে পনর ব্যক্তিকে সমর্পণ করবে, যাতে তারা পরস্পরে ভাগাভাগি করে নেয়। কেননা, সকলকে দেয়া জরুরী।

যাকাতের আভ্যন্তরীণ শিষ্টাচার

জানা উচিত, যারা আখেরাতের কামনা করে, তাদের জন্যে যাকাত প্রদানে কয়েকটি আদব বা শিষ্টাচার রয়েছে। প্রথমতঃ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ হৃদয়ঙ্গম করা এবং একথা অনুধাবন করা, যাকাত কোন দৈহিক এবাদত নয়; আর্থিক ক্ষমতা প্রয়োগ। এতদসত্ত্বেও এটা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সাব্যস্ত হল কেন? যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কারণ তিনটি–

(১) শাহাদতের উভয় কলেমা পাঠের মানে হল তওহীদকে অপরিহার্য করা এবং মাবুদের একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করা। এটা এমনভাবে পূর্ণ করতে হবে, যেন তওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন কিছু প্রিয় না থাকে। কেননা, মহব্বত অংশীদারিত্ব কবুল করে না এবং কেবল মুখে তওহীদ উচ্চারণ করা তেমন উপকারী নয়। বরং মহব্বত আছে কিনা, প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ দ্বারা তা পরীক্ষা করা যায়। মানুষের কাছে মাল ও অর্থকড়ি অত্যন্ত প্রিয় বস্তু। কেননা, এটাই সাংসারিক কার্যোদ্ধারের মোক্ষম হাতিয়ার। দুনিয়াতে মানুষ অর্থ-সম্পদকেই আপন মনে করে এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে। অথচ মৃত্যুর মধ্যে আরাধ্য পরম প্রিয়ের সাক্ষাৎ ঘটে। তাই মানুষের দাবীর সত্যতা যাচাই করার জন্যে কাম্য ও প্রিয় অর্থ সম্পদ আল্লাহর পথে বিসর্জন দিতে বলা হয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

আল্লাহ্ মুমিনদের জান ও মাল বেহেশতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন।

বলাবাহুল্য, এটা জেহাদ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার দীদার লাভের আগ্রহে প্রাণ বিসর্জন দেয়া এবং অর্থকড়ি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া সাথে সম্পর্ক রাখে। অর্থ ব্যয় করার এই রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করলে মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রথম শ্রেণী তারা, যারা তওহীদকে সত্যিকাররূপে মেনে এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করে সমস্ত ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়। তারা নিজেদের কাছে না কোন আশরাফী রাখে, না টাকা-পয়সা। যাকাত ওয়াজেব হওয়ার কোন সুযোগই তারা রাখে না। জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ দুশ' দেরহামে কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব ? তিনি বলেন ঃ শরীয়তের আইনে সাধারণ মানুষের উপর পাঁচ দেরহাম ওয়াজেব, কিন্তু আমাদের উপর গোটা দুশ' দেরহামই দিয়ে দেয়া ওয়াজেব। একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন দান খয়রাতের ফযীলত বর্ণনা করলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাঁর সমস্ত ধনসম্পদ এবং হযরত ওমর (রাঃ) অর্ধেক মাল দান করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি তোমার

পরিবারের জন্যে কি রেখেছ ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে রেখেছি। হযরত ওমরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি রেখেছ? তিনি বললেন ঃ পরিবারের জন্যে ততটুকু রেখে দিয়েছি, যতটুকু এখানে উপস্থিত করেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের মধ্যে ততটুকু তফাৎ, যতটুকু তোমাদের কথার মধ্যে তফাৎ। দ্বিতীয় শ্রেণী তারা, যারা অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে এবং অভাব-অনটনের সময় খয়রাতের মওসুমের অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের মর্তবা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কম। সঞ্চয় করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য থাকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করা, বিলাসব্যসনে উড়িয়ে না দেয়া এবং প্রয়োজন মেটানোর পর কিছু বেঁচে গেলে সময় সুযোগ বুঝে তা সৎপথে ব্যয় করা। তারা কেবল যাকাতের অর্থ প্রদান করেই ক্ষান্ত থাকে না; বরং অন্য দান-খয়রাত করে। নখয়ী, শা'বী, আতা ও মুজাহিদ প্রমুখ আলেমের অভিমত, অর্থ সম্পদের মধ্যে যাকাত ছাড়া আরও হক আছে। শা'বীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ হাঁ, আরও হক আছে। তুমি আল্লাহ তাআলার এই এরশাদ শ্রবণ করনি, وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى এবং মালের মহব্বত সত্ত্বেও তা আত্মীয় ও অনাথদেরকে দান করে। এই আলেম وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (আমি তাদেরকে যা দেই, তা থেকে তারা ব্যয় করে।) এবং وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ (তোমরা আমার দেয়া রিযিক থেকে ব্যয় কর।) আয়াত দুটিকেও তাদের দাবীর সপক্ষে পেশ করে বলেন ঃ এসব আয়াত যাকাতের আয়াত দ্বারা রহিত হয়নি; বরং মুসলমানদের পারস্পরিক হক এসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত । অর্থ এই, ধনী ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্তকে পেলে যাকাত ছাড়া অন্য মাল দ্বারা তার অভাব দূর করবে। এ সম্পর্কে ফেকাহ্ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, অভাবের কারণে কেউ মরণাপন্ন হয়ে গেলে তার অভাব দূর করা অন্যদের উপর ফরযে কেফায়া। কিন্তু এতে বলা যায়, ধনী ব্যক্তির উপর কেবল এতটুকু ওয়াজেব, যে পরিমাণ অর্থ দ্বারা তার অভাব দূর হয়ে যায়, সেই পরিমাণ অর্থ তাকে কর্জ দেবে । যাকাত দিয়ে থাকলে দান করে দেয়া তার উপর ওয়াজেব নয়। কেউ কেউ বলেন ঃ দান করাই ওয়াজেব– কর্জ দেয়া দুরস্ত নয়। মোট কথা, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে কর্জ দেয়া হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যাওয়া, যা সর্বসাধারণের স্তর।

তৃতীয় শ্রেণী তারা, যারা কেবল ওয়াজেব যাকাত আদায় করেই ক্ষান্ত থাকে – বেশীও দেয় না এবং কমও দেয় না। এটা সর্বনিম্ন মর্তবা । সাধারণ মানুষ তাই করে। কারণ তারা ধন-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট ও কৃপণ হয়ে থাকে এবং পরকালের আসক্তি তাদের মধ্যে কম। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا ۔

অর্থাৎ, যদি তিনি তোমাদের কাছে অর্থ সম্পদ চান এবং পীড়াপীড়ি করেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে।

যাকাত ওয়াজেব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষকে কৃপণতা দোষ থেকে মুক্ত করা। কেননা, এটা হচ্ছে অন্যতম বিনাশকরী দোষ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى يتبع وعجائب المرء بنفسه ۔

তিনটি বিষয় বিনাশকারী– লোভ, খেয়ালখুশী এবং আত্মপ্রীতি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

যাদেরকে লোভ–লালসা থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়, তারাই সফলকাম। বলাবাহুল্য, অর্থ সম্পদ দান করার অভ্যাস গড়ে তোলাই কৃপণতা দোষ দূর করার উপায় । এ কারণের দিক দিয়ে যাকাত পবিত্রকারী ; অর্থাৎ যাকাত যাকাতদাতাকে কৃপণতার মারাত্মক অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে দেয়। এ পবিত্রকরণ ততটুকু হবে, যতটুকু মানুষ দান করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে আনন্দ ও খুশী অনুভব করবে। যাকাত ওয়াজেব হওয়াব তৃতীয় কারণ, নেয়ামতের শোকর আদায় করা। কেননা, আল্লাহ তাআলার নেয়ামত যেমন বান্দার শরীরে নিহিত নেয়ামতের শোকর, তেমনি আর্থিক এবাদত অর্থসম্পদে নিহিত নেয়ামতেরও শোকর। সুতরাং যেব্যক্তি গরীবকে অভাবী হয়ে তার কাছে হাত পাততে দেখেও আল্লাহ তাআলার শোকর করে না যে, আল্লাহ তাকে ধনী করেছেন এবং অপরকে তার প্রতি মুখাপেক্ষী করেছেন, সে অত্যন্ত নীচ।

দ্বিতীয় আদব, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ যাকাত ওয়াজেব হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করে দেয়া, যাতে তাদের খোদায়ী আদেশ পালনে আগ্রহ বুঝা যায়, গরীবরা মানসিক শান্তি লাভ করে এবং সময়ের বাধাবিঘ্ন থেকে মুক্ত থাকা যায়। বিলম্বে যাকাত আদায় করার মধ্যে অনেক বিপদাপদের আশংকা থাকে। প্রথমতঃ এতে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। সুতরাং অন্তরে পুণ্যের প্রেরণা প্রকাশ পেলে তাকে সুবর্ণ সুযোগ জ্ঞান করবে। এরূপ প্রেরণা ফেরেশতা কর্তৃক অবতীর্ণ হয়ে থাকে। মুমিনের অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে থাকে। তাতে পরিবর্তন আসতে দেরী লাগে না। এছাড়া শয়তান দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অপকর্মের আদেশ করে। তাই সৎকর্মের প্রেরণা অন্তরে উদয় হওয়া গনীমত মনে করবে। একত্রে যাকাত দিলে তা আদায় করার জন্যে কোন উত্তম মাস নির্দিষ্ট করে নেবে, যাতে মাসের গুণে নৈকট্য অধিক অর্জিত হয়। উদাহরণতঃ বছরের প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম মাসে অথবা পবিত্র রমযান মাসে যাকাত দেবে। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ মাসে সর্বাধিক দান খয়রাত করতেন; এমনকি গৃহে কোন কিছু রাখতেন না। রমযানে শবে কদরেরও ফযীলত আছে, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলতেন ঃ রমযান বলো না। কেননা, এটা আল্লাহ তাআলার একটি নাম; বরং রমযান মাস বলো। যিলহজ্জ মাসও অন্যতম সম্মান ও ফযীলতের মাস। এতে হজ্জে আকবর হয়। কোরআনে উল্লিখিত আইয়্যামে মালূমাত এবং আইয়্যামে মাদুদাত এ মাসেই রয়েছে। রমযান মাসের শেষ দশ দিন এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অধিক ফযীলত রাখে।

তৃতীয় আদব হচ্ছে সুখ্যাতি ও রিয়া থেকে দূরে থাকার জন্যে গোপনে যাকাত আদায় করা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

افضل الصدقة جهد المقل الى فقير في سر .

সর্বোত্তম দান এই যে, দরিদ্র ও সম্বলহীন ব্যক্তি শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করে তা গোপনে কোন ফকীরকে দিয়ে দেবে। জনৈক আলেম বলেন ঃ তিনটি বিষয় দান-খয়রাতে সওয়াব ভান্ডার। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে গোপনে দান করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ বান্দা গোপনে কোন কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর সে

যদি তা প্রকাশ করে তবে আল্লাহ তাআলা তা গোপন খাতা থেকে প্রকাশ্য খাতায় স্থানান্তর করেন। এর পর যদি সে এ কর্মের কথা অন্য কাউকে বলে, তবে গোপন ও প্রকাশ্য উভয় খাতা থেকে তা দূর করে রিয়ার খাতায় লেখে দেয়া হয়। এক মশহুর হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেদিন ছায়াতলে রাখবেন যেদিন আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি, যে কোন কিছু দান করলে তার বাম হাতও জানতে পারে না যে, ডান হাত কি দান করেছে। এক হাদীসে আছে- وصدقة السر تطفى غضب الرب। গোপন দান আল্লাহ তাআলার ক্রোধ নির্বাপিত করে। আল্লাহ বলেনঃ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ যদি দান খয়রাত গোপনে ফকীরদের হাতে পৌঁছাও, তবে এটা তোমাদের জন্যে উত্তম। গোপনে দান করার উপকারিতা হচ্ছে রিয়া ও খ্যাতির কুফর থেকে আত্মরক্ষা করা। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যারা খ্যাতির জন্যে দান করে, দানের কথা অন্যের কাছে বলে এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করে, আল্লাহ তাআলা তাদের দান কবুল করেন না। যে দানের কথা অন্যের কাছে বলে বেড়ায় সে খ্যাতি অন্বেষণ করে। যে জনসমাবেশে দান করে, সে রিয়াকার। গোপনে দান করলে এ দুটি বিপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বুযুর্গগণ গোপনে খয়রাত করার ব্যাপারে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। গ্রহীতা যাতে দাতাকে চিনতে না পারে সে ব্যাপারে তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এজন্যে কেউ কেউ অন্ধের হাতে খয়রাত রেখে দিতেন। কেউ ফকীরের গমন পথে ও তার বসার জায়গায় খয়রাত ফেলে রাখতেন। কেউ ঘুমন্ত ফকীরের কাপড়ের কোণে খয়রাত বেঁধে দিতেন। কেউ অন্যের হাতে ফকীরের কাছে পৌঁছে দিতেন যাতে ফকীর দাতার অবস্থা না জানে। তারা আল্লাহর ক্রোধ নির্বাপিত করার উপায় সৃষ্টি করা এবং খ্যাতি ও রিয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশে এভাবে দান খয়রাত করতেন। যদি কোন এক ব্যক্তিকে অবহিত না করে খয়রাত করা অসম্ভব হয়, তবে মিসকীনকে সমর্পণ করার জন্যে একজন উকিলের হাতে খয়রাত সোপর্দ করা উত্তম। এতে মিসকীন জানতে পারবে না, দাতা কে ? কারণ মিসকীন জানলে রিয়া ও অনুগ্রহ উভয়টি হয়। আর উকিলের জানার মধ্যে কেবল রিয়াই হবে। সুখ্যাতি লাভের উদ্দেশে দান করলে দানকর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। কেননা, যাকাতের উদ্দেশ্য কৃপণতা দূর এবং

ধনসম্পদের মহব্বত হ্রাস করা। ধনসম্পদের মহব্বতের তুলনায় খ্যাতির মহব্বত মনকে অধিক আচ্ছন্ন করে। আখেরাতে উভয়টিই ক্ষতিকর। কিন্তু কৃপণতা কবরে দংশনকারী বিচ্ছুর এবং রিয়া বিষধর সর্পের আকৃতি লাভ করবে। মানুষকে উভয় শত্রু দুর্বল ও নির্ধন করার আদেশ দেয়া হয়েছে, যাতে এদের যন্ত্রণা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় অথবা হ্রাস পায়।

চতুর্থ আদব, যেখানে জানা যায়, প্রকাশ্যে দান করলে অন্যরা উৎসাহিত হবে, সেখানে প্রকাশ্যে দান করবে। এক্ষেত্রে রিয়া থেকে আত্মরক্ষা করার উপায় আমরা রিয়া অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। প্রকাশ্যে দান করা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَ ـ

যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান খয়রাত কর, তবে তা খুবই ভাল। এটা এমন স্থলে, যেখানে অপরকে উৎসাহিত করা উদ্দেশ্য হয় অথবা সওয়ালকারী জনসমাবেশে সওয়াল করে। এক্ষেত্রে রিয়ার ভয়ে প্রকাশ্যে দান বর্জন করা উচিত নয় ; বরং দান করা উচিত এবং মনকে যথাসম্ভব রিয়া থেকে মুক্ত রাখা দরকার। কারণ, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে অনুগ্রহ প্রকাশ ছাড়া আর একটি অপকারিতা আছে। তা হচ্ছে, ফকীরের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়া। কেননা, অধিকাংশ ফকীর তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া অপছন্দ করে। সুতরাং প্রকাশ্যে প্রার্থনা করে সে যখন নিজের পর্দা নিজেই খুলে দেয়, তখন তার বেলায় এই অপকারিতা নিষিদ্ধ নয়। উদাহরণতঃ কেউ যদি গোপনে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে পাপাচার করে, তবে প্রকাশ করা ও খোঁজাখুঁজি করা অন্যের জন্যে নিষিদ্ধ। কিন্তু যেব্যক্তি নিজে পাপাচার প্রকাশ করে, অন্যেরা তার পাপাচার প্রকাশ করলে তা তার জন্যে শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু এ শাস্তির আসল কারণ সে নিজেই। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

من القى جلباب الحياء فلاغيبة له ـ

অর্থাৎ, যেব্যক্তি লজ্জার মুখোশ দূরে নিক্ষেপ করে, তার গীবত গীবত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً ـ

অর্থাৎ, আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় কর।

এ আয়াতে প্রকাশ্যে দান করারও আদেশ করা হয়েছে। কারণ, এতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করার উপকারিতা আছে।

মোট কথা, প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে যেসব উপকারিতা ও অপকারিতা রয়েছে, সেগুলো সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত । ব্যক্তি বিশেষে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা হয়ে থাকে । কতক পরিস্থিতিতে কতক ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্যে দান করাই উত্তম হয়। উপকারিতা ও অপকারিতা জানার পর কিভাবে দান করা উত্তম, তা আপনা আপনিই ফুটে উঠবে।

পঞ্চম আদব, দান-খয়রাতকে من ও اذى দ্বারা পণ্ড না করা । আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى তোমরা তোমাদের দান-খয়রাতকে من ও اذى দ্বারা বাতিল করো না। এ দুটি শব্দের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানীগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেন ঃ من শব্দের অর্থ দানের কথা আলোচনা করা এবং اذى শব্দের উদ্দেশ্য প্রকাশ্যে দান করা। সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি من করে, তার দান নিষ্ফল হয়ে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ اذى কিভাবে হয়? তিনি বললেন ঃ দানের কথা আলোচনা করা এবং মানুষের কাছে বলে বেড়ানো। কেউ বলেন ঃ من -এর উদ্দেশ্য হল দানের বিনিময়ে ফকীরের কাছ থেকে কাজ নেয়া আর اذى শব্দের অর্থ ফকীরকে লজ্জা দেয়া। কারও মতে, من হল দান করে ফকীরের কাছে অহংকার করা। আর সওয়াল করার কারণে ফকীরকে ধমকানো হলো اذى রসূলে আকরাম (সঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ প্রকাশকারীর দান কবুল করেন না। আমার মতে من -এর একটি শিকড় ও ভিত্তি আছে, যা অন্তরের অবস্থাসমূহের অন্যতম। এই অবস্থা মুখে ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এর মূল হচ্ছে নিজেকে এরূপ মনে করা যে, সে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহ করেছে। অথচ তার মনে করা উচিত ছিল, ফকীর তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। সে আল্লাহ তাআলার হক তার কাছ থেকে আদায় করে নিয়েছে। ফলে সে পবিত্র হবে ও দোযখ থেকে মুক্তি পাবে। যদি ফকীর দান কবুল না করত, তবে সে এই হকের মধ্যে আবদ্ধ থাকত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ দান-খয়রাত ফকীরের হাতে পৌঁছার পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার হাতে পড়ে। কাজেই বুঝা উচিত, দাতা আল্লাহ তাআলার হক

দেয় আর ফকীর তা গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তার রিযিক নেয়। দানের মাল প্রথমে আল্লাহ তাআলার হয়ে যায়, এর পর ফকীর পায়। মনে করুন, এই ধনী ব্যক্তির যিম্মায় যদি কারও কর্জ থাকত এবং সে বলে দিত, এই কর্জের টাকা আমার খাদেম অথবা গোলামকে দিয়ে দিয়ো, যার পানাহার ও ভরণ-পোষণ আমার যিম্মায়, তবে খাদেম অথবা গোলামকে কর্জের টাকা দিয়ে ধনী ব্যক্তি কি মনে করতে পারত, সে তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে? এরূপ মনে করলে এটা তার নির্বুদ্ধিতা ও মূর্খতা হবে। কেননা, পানাহার ও ভরণ পোষণ যার দায়িত্বে, সে-ই তার প্রতি অনুগ্রহ করে। ধনী ব্যক্তি তো কেবল তার কর্জের টাকা শোধ করে। সুতরাং কর্জ শোধ করা নিজেরই উপকার– অন্যের প্রতি অনুগ্রহ নয়। উপরে যাকাত ওয়াজেব হওয়ার যে তিনটি কারণ আমরা উল্লেখ করেছি, সেগুলো অথবা তার কোন একটি কারণ বুঝে নিলে কোন দাতা নিজেকে অন্যের প্রতি অনুগ্রহকারীরূপে চিন্তা করতে পারবে না। বরং এটাই বুঝবে যে, সে নিজের প্রতিই অনুগ্রহ করেছে; অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রকাশ করার জন্যে অথবা নিজেকে কৃপণতার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করার জন্যে অথবা ধনসম্পদের শোকর আদায় করার জন্যে দান করছে। এ তিন অবস্থায় তার মধ্যে ও ফকীরের মধ্যে অনুগ্রহের কোন ব্যাপার নেই। এ মূল কথা বিস্মৃত হলে এবং নিজেকে ফকীরের প্রতি অনুগ্রহকারী মনে করলে সে দানের কথা আলোচনা করে এবং ফকীরের কাছে প্রতিদান কামনা করে। اذى শব্দের বাহ্যিক অর্থ ধমকানো, কটু কথা বলা ও কঠোর ব্যবহার করা, কিন্তু অন্তরে এর উৎপত্তির কারণ দু'টি– এক, ধনসম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া খারাপ মনে করা এবং দুই, এরূপ মনে করা, আমি ফকীর অপেক্ষা উত্তম। অভাবী হওয়ার কারণে ফকীর মর্তবায় আমার চেয়ে কম। এ দুটি বিষয়ই মূর্খতাপ্রসূত। উদাহরণতঃ অর্থকড়ি দেয়া খারাপ মনে করা নির্বুদ্ধিতা। কারণ, কেউ যদি হাজার দেরহামের বিনিময়ে এক দেরহাম দেয়া খারাপ মনে করে, তবে তার চেয়ে নির্বোধ আর কে হবে? আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সওয়াবের জন্যে অর্থ দান করা হয়। এগুলো অর্থের তুলনায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অথবা কৃপণতার অনিষ্ট দূর করার জন্যে অর্থ দান করা হয়। অথবা বেশী নেয়ামত পাওয়ার আশায় কিংবা শোকারগুজারীর জন্যে দান করা হয়। এসব কারণের মধ্যে কোনটিই খারাপ নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ নিজেকে ফকীর অপেক্ষা উত্তম মনে করা মূর্খতা। কেননা, মানুষ যদি ধনাঢ্যতার তুলনায় দারিদ্র্যের

ফযীলত জানতে পারে এবং ধনীদের বিপদাপদ অবগত হতে পারে, তবে সে কখনও ফকীরকে হেয় মনে করবে না। বরং তার মাধ্যমে বরকত হাসিল করবে এবং তার মর্তবা কামনা করবে। কারণ, ধনীদের মধ্যে যেব্যক্তি সৎকর্মপরায়ণ হবে, সে ফকীরদের চেয়ে পাঁচ'শ বছর পরে জান্নাতে প্রবেশাধিকার পাবে। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ هم الاخسرون ورب الكعبة কাবার প্রভুর কসম, তারাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। হযরত আবু যর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ তারা কারা? তিনি বললেন ঃ هم الاكثرون اموالا অর্থাৎ, যাদের কাছে প্রভূত ধনদৌলত রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা ফকীরের জন্যে ধনী ব্যক্তিকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন। সে স্বীয় প্রচেষ্টায় অর্থ উপার্জন করে, পরিশ্রম করে তা বাড়ায় এবং হেফাযত করে। এর পর ফকীরকে প্রয়োজন অনুযায়ী দান করা তার জন্যে জরুরী করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং যে ফকীরের রুজির জন্যে সে কাজ কারবার করে, তাকে কিরূপে হেয় মনে করতে পারে? ফকীর ধনী ব্যক্তির চেয়ে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, ধনী ব্যক্তি অপরের হক নিজের যিম্মায় গ্রহণ করে এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসম্পদের হেফাযত করে। যখন সে মারা যায়, তখন অন্যে সেই ধনসম্পদ ভক্ষণ করে। এমতাবস্থায় ফকীরকে দেয়া কিরূপে খারাপ হতে পারে? এভাবে যখন দান করা খারাপ মনে করবে না; তখন ফকীরকে পেয়ে খুশী হবে, তার প্রশংসা করবে এবং তার অনুগ্রহ স্বীকার করবে। ফলে من ও اذى কিছুই থাকবে না। দান করার পর নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করার একটি বাহ্যিক প্রতিকার আছে। তা হচ্ছে, দাতা ফকীরের সামনে এমন কাজ করবে, যা কোন অনুগ্রহপ্রাপ্ত ঋণী ব্যক্তি করে। সেমতে কোন কোন বুযুর্গ ফকীরের সামনে দান রেখে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দান কবুল করার জন্যে তাকে অনুরোধ করতেন। মনে হত যেন তিনিই সওয়ালকারী। বুযুর্গগণ তাঁদের কাছে ফকীরের আগমন ভাল মনে করতেন না; বরং তাঁরা স্বয়ং ফকীরের কাছে গিয়ে দান করা সমীচীন মনে করতেন। কতক বুযুর্গ হাতে দানের অর্থ রেখে ফকীরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন যাতে ফকীর তা তুলে নেয় এবং ফকীরের হাতই উপরে থাকে। হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) যখন কিছু খয়রাত কোন ফকীরের কাছে প্রেরণ করতেন, তখন দূতকে বলে দিতেন ঃ ফকীর

দোয়ার যেসব বাক্য বলবে, সেগুলো মুখস্থ করে আসবে। দূত ফিরে এসে দোয়ার বাক্য বর্ণনা করলে তাঁরাও সেসব দোয়ার বাক্য ফকীরের জন্যে উচ্চারণ করতেন এবং বলতেন, আমাদের খয়রাত বাঁচানোর জন্যে আমরা দোয়ার বদলে দোয়া করে দিলাম। মোট কথা, পূর্ববর্তীগণ দান করে ফকীরের কাছে দোয়া আশা করতেন না। কেননা, দোয়াও দানের একটি প্রতিদানের মত। কেউ তাদের জন্যে দোয়া করলে বিনিময়ে তার জন্যে তেমনি দোয়া তাঁরা করে দিতেন। হযরত ওমর ও তদীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) তাই করেছিলেন। যাকাতের মধ্যে من ও اذى না থাকার শর্ত নামাযের মধ্যে খুশু তথা বিনয়ের শর্তের স্থলবর্তী। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নামায সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ ليس للمرء من صلوة الا ماعقل মানুষ নামাযের যতটুকু অংশ বুঝে, ততটুকুই পায়। যাকাত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ لايقبل الله صدقة منان আল্লাহ্ তাআলা কোন অনুগ্রহ প্রকাশকারীর খয়রাত কবুল করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ لَاتُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও দানগ্রহীতার মনে কষ্ট দিয়ে তোমাদের খয়রাতসমূহ বরবাদ করো না। এ শর্তের অনুপস্থিতিতেও ফেকাহবিদরা ফতোয়া দেন, তার যাকাত আদায় হয়ে গেছে। এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

ষষ্ঠ আদব, নিজের দানকে কম মনে করা। কারণ, অনেক মনে করলে আত্মপ্রীতিতেও লিপ্ত হবে, যা একটি মারাত্মক ব্যাধি। আত্মপ্রীতি আমলসমূহ বাতিল করে দেয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا .

হুনায়ন যুদ্ধের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত করে দিয়েছিল, অতঃপর তা তোমাদের কোন উপকার করেনি।

বলা হয়, এবাদতকে যতই ক্ষুদ্র জ্ঞান করা হবে, তা আল্লাহর কাছে ততই বড় হবে। পক্ষান্তরে গোনাহকে যতই বড় মনে করা হবে, তা আল্লাহর কাছে ততই ক্ষুদ্র হবে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তিনটি বিষয়

ব্যতীত খয়রাত পূর্ণ হয় না– এক, খয়রাতকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করা, দুই খয়রাত আদায়ে বিলম্ব না করা এবং তিন, গোপনে খয়রাত করা। আত্মপ্রীতি ও বড় মনে করা সকল এবাদতেই রয়েছে। এর প্রতিকার হল এলেম ও আমল। এলেম একথা জানা যে, সমস্ত মালের মধ্যে দশ ভাগের একভাগ অথবা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ খুবই কম। এ পরিমাণ খয়রাত নেহায়েত নিম্নস্তরের খয়রাত। সুতরাং এই নিম্নস্তরের খয়রাতের জন্যে লজ্জা করা উচিত– একে বড় মনে করা উচিত নয়। আর যদি কেউ সমস্ত মাল অথবা অধিকাংশ মাল খয়রাত করে তবে তার চিন্তা করা উচিত যে, মাল তার কাছে কোত্থেকে এল এবং সে তা কোথায় ব্যয় করছে। মাল তো আসলে আল্লাহ তাআলার। তিনি অনুগ্রহপূর্বক বান্দাকে দান করেছেন এবং ব্যয় করার তওফীক দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পথে অধিকাংশ দান করে তাকে বড় মনে করা উচিত নয়। যদি দোয়ার নিয়তে মাল দান করে, তবে যার বিনিময়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ সওয়াব পাবে, তাকে বড় মনে করবে কেন? আমল এই যে, লজ্জিত হয়ে দান করবে। কারণ, অবশিষ্ট মাল নিজের কাছে রেখে দেয়া হয়। এটা যেন এমন, যেমন কেউ কারও কাছে কিছু আমানত রাখে। এর পর ফেরত দেয়ার সময় কিছু অংশ ফেরত দেয় এবং কিছু অংশ রেখে দেয় । এটা লজ্জার বিষয় নয় কি? মাল সমস্তটাই আল্লাহর। তিনি সমস্তটা দান করার আদেশ দেননি । কারণ, কৃপণতার কারণে এ আদেশ পালন করা তোমাদের জন্যে কঠিন হত । সেমতে তিনি নিজেই বলেন ঃ فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا অর্থাৎ, যদি তিনি আতিশয্য সহকারে সমস্ত মাল দান করার আদেশ দেন, তবে তোমরা কৃপণতা করবে; সানন্দে ও সন্তুষ্ট চিত্তে দান করবে না।

সপ্তম আদব, নিজের মালের মধ্যে যা উৎকৃষ্ট; পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয় তাই খয়রাতের জন্যে বেছে নেয়া । কেননা, আল্লাহ তাআলা পবিত্র । তিনি পবিত্র মালই কবুল করেন। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্যে, যে গোনাহ ছাড়া হালাল উপায়ে অর্জিত মাল দান করে। নিকৃষ্ট মাল দান করার মানে হচ্ছে নিজের অথবা পরিবারের লোকদের জন্যে উৎকৃষ্ট মাল রাখা এবং আল্লাহ্ তাআলার উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া । এটা নিঃসন্দেহে বেআদবী । যদি কেউ মেহমানের সাথে এরূপ

ব্যবহার করে এবং ভাল খাদ্য নিজেরা খেয়ে মেহমানের সামনে খারাপ খাদ্য পেশ করে, তবে মেহমান নিঃসন্দেহে তার শত্রু হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَنفِقُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُوا۟ فِيهِ ـ

অর্থাৎ, মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের উপার্জন থেকে এবং আমি মাটি থেকে যা উৎপন্ন করি, তা থেকে পবিত্র বস্তু ব্যয় কর। তোমরা ব্যয় করার জন্যে অপবিত্র বস্তুর নিয়ত করো না, যা তোমরা নিজেরা চক্ষু বন্ধ না করে গ্রহণ করতে পার না। অর্থাৎ এমন বস্তু দান করো না, যা তোমরা লজ্জা ও অপছন্দ ছাড়া গ্রহণ কর না।

মোট কথা, আপন পালনকর্তার জন্যে এমন বস্তু পছন্দ করো না। হাদীসে আছে, এক দেরহাম লক্ষ দেরহামকেও পেছনে ফেলে দেয়। কারণ, মানুষ এই একটি দেরহামকে তার উৎকৃষ্ট ও হালাল মাল থেকে সানন্দে দান করে। আর কখনও লক্ষ দেরহাম এমন মাল থেকে দান করা হয়, যাকে সে নিজেই খারাপ মনে করে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দা করেছেন, যারা আল্লাহর জন্যে এমন বস্তু সাব্যস্ত করে, যা তারা নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ ـ

তারা তাদের অপছন্দনীয় বস্তু আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করে। তাদের মুখ মিথ্যা বর্ণনা করে, পুণ্য তাদের জন্যই। এটা স্বতঃসিদ্ধ, তাদের জন্যে রয়েছে অগ্নি।

অষ্টম আদব, দান খয়রাতের জন্যে এমন লোক তালাশ করা, যাদের দ্বারা দান-খয়রাত মর্যাদাশীল ও পবিত্র হয়। যেনতেন লোকের হাতে তা পৌঁছে দেয়া ঠিক নয়। ছয়টি গুণের মধ্যে থেকে দুটি গুণ যাদের মধ্যে পাওয়া যায় তাদেরকে খয়রাত দেবে।

প্রথম- এমন লোক তালাশ করবে, যে পরহেযগার, সংসারবিমুখ ও কেবল আখেরাতের ব্যবসায়ে লিপ্ত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

لا تاكل الا طعام تقى ولا ياكل طعامك الاتقى -

পরহেযগার ব্যক্তির খাদ্য ছাড়া খেয়ো না এবং তোমার খাদ্য যেন পরহেযগার ছাড়া কেউ না খায়।

এর কারণ, পরহেযগার ব্যক্তি খেয়ে তার পরহেযগারীকে শক্তি যোগাবে। ফলে যে খাওয়াবে সে তার এবাদতে শরীক হয়ে যাবে। হাদীসে আরও আছে- তোমরা তোমাদের খাদ্য পরহেযগারদেরকে খাওয়াও আর অনুগ্রহ যা কর, ঈমানদারদের প্রতি কর। জনৈক আলেম তার দানের মাল সুফী ফকীরগণ ছাড়া অন্য কাউকে দিতেন না। তাকে কেউ বলল ঃ এ মাল বিশেষ এক সম্প্রদায়কে না দিয়ে সকল ফকীরকে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ না, এই বিশেষ সম্প্রদায়ের সাহসিকতা আল্লাহর জন্যে ব্যয়িত হয়ে যায়।। তারা উপবিষ্ট হলে তাদের সাহসিকতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এক ব্যক্তিকে দান করে যদি আমি তার সাহসিকতা আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করতে পারি, তবে এটা আমার মতে হাজার ব্যক্তিকে দান করা অপেক্ষা উত্তম, যাদের সাহসিকতা কেবল সংসারের দিকেই নিবিষ্ট। এ উক্তিটি হযরত জুনায়দ বাগদাদী (রহঃ)-এর কাছে কেউ উত্থাপন করলে তিনি একে চমৎকার উক্তি বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন ঃ এ লোকটি একজন ওলী আল্লাহ। বহু দিন যাবত আমি এর চেয়ে উত্তম উক্তি শ্রবণ করিনি। কথিত আছে, এক সময় এই বুযুর্গ ব্যক্তি আর্থিক সংকটে পড়ে দোকান বন্ধ করে দিতে মনস্থ করেন। হযরত জুনায়দ তাঁর কাছে কিছু পুঁজি প্রেরণ করে বললেন ঃ এই অর্থ দ্বারা দোকানের মাল কিনে নাও, দোকান বন্ধ করো না। তোমার মত ব্যক্তির জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিকর নয়। লোকটি ছিলেন সবজি বিক্রেতা। কোন দরিদ্র লোক তাঁর কাছ থেকে সবজি ক্রয় করলে তিনি দাম নিতেন না।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে এলেমধারী ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে। তাকে দিলে তার এলেমকে সাহায্য যোগানো হবে। এলেম এবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যদি তাতে নিয়ত ঠিক তাঁকে। হযরত ইবনে মোবারক (রহঃ) দান-খয়রাত বিশেষভাবে এলেমধারীদেরকে দিতেন। কেউ তাঁকে বলল ঃ

আপনার খয়রাত ব্যাপকভাবে দিলেই তো ভাল হত। তিনি বললেন ঃ আমি নবুওয়তের মর্তবার পর আলেমদের মর্তবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন মর্তবা আছে বলে জানি না। আলেমের মন যদি অভাব অনটনে ব্যাপৃত থাকে, তবে সে এলেমের জন্যে সময় সুযোগ পাবে না। কাজেই তাঁকে দেয়ার অর্থ এলেমের জন্যে তাঁকে সুযোগ করে দেয়া।

তৃতীয়– তাকওয়ায় সাচ্চা ও তওহীদে পাকা ব্যক্তিকে খয়রাত দেবে। তওহীদে সাচ্চা হওয়ার অর্থ, যখন কারও কাছ থেকে খয়রাত গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তাআলার হামদ ও শোকর করবে এবং মনে করবে, এ নেয়ামত তাঁরই পক্ষ থেকে। মধ্যবর্তী ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করবে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দরবারে বান্দার শোকর এটাই যে, সে সকল নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। লোকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশ দেন, নিজের ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে অপরকে নেয়ামতদাতা সাব্যস্ত করবে না। যেব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপরের শোকর করে, সে যেন নেয়ামতদাতাকে চেনেই না এবং বিশ্বাস করে না যে, মধ্যবর্তী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণাধীন। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তাকে দানে বাধ্য করেছেন এবং দানের আসবাবপত্র সরবরাহ করেছেন। সে যদি দান না করতে চাইত, তবে তা পারত না। কেননা, পূর্বাহ্নে আল্লাহ মনে জাগরূক করেছেন যে, দান করার মধ্যেই তার ইহলৌকিক কল্যাণ নিহিত। যেব্যক্তি এটা বিশ্বাস করে, তার দৃষ্টি আল্লাহ ব্যতীত অপরের দিকে যাবে না। দাতার জন্য এরূপ ব্যক্তির বিশ্বাস প্রশংসা ও শোকরের চেয়ে বেশী উপকারী। যেব্যক্তি দান করার কারণে প্রশংসা ও দোয়া করে, সে দান না করার কারণে নিন্দা এবং বদ দোয়াও করতে পারবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন এক ফকীরের কাছে কিছু খয়রাত প্রেরণ করে দূতকে বলে দিলেন ঃ ফকীর যা বলে মনে রাখবে। ফকীর খয়রাত গ্রহণ করে বলল ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি রিযিকদানকারীকে ভুলেন না এবং শোকরকারীকে বরবাদ করেন না। ইলাহী! আপনি আমাকে বিস্মৃত না হলে আপনার রসূল (সাঃ)-কে এমন করুন যে, তিনি আপনাকে না ভুলে যান। দূত এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জানালে তিনি ফকীরের উক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। দেখ, এই ফকীর তার দৃষ্টি কিভাবে আল্লাহ তাআলাতে নিবদ্ধ করেছে! রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক ব্যক্তিকে তওবা করতে বললে সে বলল ঃ আমি কেবল 'আল্লাহ

তাআলার দিকে তওবা করি– মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দিকে নয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি হকদারের হক চিনতে পেরেছ। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদ মোচনের আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আয়েশা! দাঁড়াও, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মস্তক চুম্বন কর। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি এরূপ করবো না। আমি আল্লাহ্ ব্যতীত কারও কাছে কৃতজ্ঞ নই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবু বকর! তাকে ছাড়, কিছু বলো না। এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পিতা আবু বকরকে এই জওয়াব দেন–

الحمد لله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك -

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার শোকর। এতে আপনার ও আপনার সঙ্গীর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন অনুগ্রহ নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অস্বীকৃতি জানাননি, অথচ অপবাদ মোচনের তাঁর মাধ্যমেই হযরত আয়েশার কাছে পৌঁছেছিল। নেয়ামত আল্লাহ তাআলা ছাড়া অপরের পক্ষ থেকে মনে করা কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। সেমতে আল্লাহ বলেন–

وَإِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ -

যখন এককভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর স্তব্ধ হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য দেবদেবীদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে যায়।

যেব্যক্তির অন্তর মাধ্যমের প্রতি তাকানো থেকে মুক্ত নয় এবং একে নিছক মাধ্যম মনে করে না, তার মন যেন শেরকে খফী তথা গোপন শেরক থেকে আলাদা হয়নি। তার উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং স্বীয় তওহীদকে শেরকের ময়লা ও সন্দেহ থেকে পরিষ্কার করা।

চতুর্থ– যারা আপন অবস্থা গোপন রাখে, অভাব-অভিযোগ ও কষ্টের কথা খুব একটা বর্ণনা করে না, অথবা যেব্যক্তি পূর্বে ধনী ছিল, এখন সর্বস্বহারা, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস পরিত্যাগ করে না এবং পুরোপুরি ভদ্রতা বজায় রেখে জীবন যাপন করে– এরূপ লোককে খয়রাত দেবে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ لَا يَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

সওয়াল থেকে বেঁচে থাকার কারণে মূর্খরা তাদেরকে ধনী মনে করে। তুমি তাদেরকে চেহারা দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের গায়ে পড়ে সওয়াল করে না। অর্থাৎ, সওয়াল করার মধ্যে আতিশয্য করে না। কারণ, তারা আপন বিশ্বাসে ধনী এবং সবর দ্বারা সম্মানী। প্রত্যেক মহল্লায় ধার্মিক লোকদের মাধ্যমে এরূপ ব্যক্তিদের তালাশ করা উচিত। এরূপ সম্ভ্রমী লোকদের মনের অবস্থা খয়রাতকারীদের জানা উচিত। কেননা, তাদেরকে খয়রাত দেয়া প্রকাশ্য সওয়ালকারীদেরকে খয়রাত দেয়ার তুলনায় কয়েক গুণ বেশী সওয়াব রাখে।

পঞ্চম– যারা অধিক সন্তান-সন্ততিসম্পন্ন অথবা রোগাক্রান্ত অথবা কোন কারণে দুর্দশাগ্রস্ত, তাদেরকে খয়রাত দেবে। আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ـ

সেসব ফকীরের জন্যে, যারা আল্লাহর পথে আটকা পড়েছে, তারা স্বদেশে চলাফেরা করতে পারে না। অর্থাৎ, যারা আখেরাতের পথে পরিবার-পরিজনের কারণে অথবা রুজি-রোজগারের স্বল্পতার কারণে অথাব আত্মসংশোধনের কারণে আটকা পড়েছে। ফলে দেশে সফর করার শক্তি রাখে না। কেননা, এসব কারণে তাদের হাতে পায়ে জিঞ্জির পড়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) এক গৃহের লোকদেরকে এক পাল ছাগল অথবা দশটি ছাগল অথাবা আরও বেশী দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অনুযায়ী দান করতেন। হযরত ওমর (রাঃ)-কে কেউ জাহ্দুল বালা'র উদ্দিষ্ট অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ সন্তান সন্ততির আধিক্য এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতা।

ষষ্ঠ– যে ফকীর আত্মীয় এবং রক্তের সাথে সম্পর্কশীল, তাকে খয়রাত দেবে। এতে খয়রাতও হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় থাকবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অনেক সওয়াব। হযরত

আলী (রাঃ) বলেন ঃ যদি আমি এক দেরহাম দিয়ে আমার কোন ভাইয়ের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে তা আমার মতে বিশ দেরহাম খয়রাত করা অপেক্ষা উত্তম। যদি বিশ দেরহাম দিয়ে সম্পর্ক বজায় রাখি, তবে এটা একশ' দেরহাম খয়রাত করার চেয়ে ভাল। পরিচিতদের মধ্যে বন্ধুদেরকে আগে দান করা উচিত; যেমন অপরিচিতদের তুলনায় আত্মীয়কে আগে দেয়া উত্তম।

মোট কথা, এসব প্রার্থিত গুণের প্রতি লক্ষ্য রেখে খয়রাত দেয়া উচিত। এগুলোর প্রত্যেকটিতে অনেক স্তর রয়েছে। সর্বোচ্চ স্তর অন্বেষণ করা উচিত। কোন ব্যক্তির মধ্যে এসব গুণের মধ্য থেকে কয়েকটি পাওয়া গেলে তাকে নেয়ামত মনে করতে হবে। যে উপযুক্ত লোক খোঁজাখুঁজি করবে, সে দ্বিগুণ সওয়াব পাবে। ভুল হয়ে গেলেও এক সওয়াব নষ্ট হবে না।

যাকাতের হকদার হওয়ার কারণ

প্রকাশ থাকে যে, এমন ব্যক্তি যাকাতের হকদার, যে মুসলমান, স্বাধীন (হাশেমী ও মুত্তালেবী বংশীয় নয়) এবং যার মধ্যে কোরআন বর্ণিত আটটি গুণের মধ্য থেকে কোন একটি গুণ বিদ্যমান আছে। এই আটটি গুণ إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কাফের, গোলাম ও হাশেমী বংশীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয নয়। নিম্নে আট প্রকার লোক আলাদা আলাদা বর্ণিত হচ্ছে।

প্রথম প্রকার– ফকীর। যার কাছে অর্থ-সম্পদ নেই এবং যে উপার্জনক্ষম নয়, তাকে ফকীর বলা হয়। যার কাছে একদিনের খাদ্য ও পোশাক আছে, সে ফকীর নয়; বরং মিসকীন। অর্ধেক দিনের খাদ্য থাকলে সে ফকীর। সওয়াল করা যেব্যক্তির অভ্যাস সে ফকীর দলের বাইরে নয়। কেননা, সওয়াল করা কোন উপার্জনের পেশা নয়। হাঁ, উপার্জন করতে সক্ষম হলে সে ফকীরদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে। যন্ত্রপাতি দিয়ে উপার্জন করতে সক্ষম ব্যক্তিও ফকীর, তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে যন্ত্রপাতি কিনে দেয়া জায়েয। যদি কেউ এমন পেশা অবলম্বনে করতে সক্ষম না হয়, যা তার ভদ্রতা ও মর্যাদার অনুপযোগী, তবে সে ফকীর বলেই গণ্য হবে। এমনিভাবে আলেম ব্যক্তির যদি কোন পেশা গ্রহণ এলেম চর্চায় বাধ্য সৃষ্টি করে, তবে সে-ও ফকীর। পেশা গ্রহণ করো

এবাদতে বাধা সৃষ্টি করলেও তা করা উচিত। কেননা, খয়রাতের তুলনায় কাজ করা উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন طلب الحلال فريضة بعد الفريضة হালাল জীবিকা অন্বেষণ ঈমানী ফরযের পরের ফরয। উদ্দেশ্য, উপার্জনের চেষ্টা করা দরকার। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ হালাল-হারামের সন্দিগ্ধ উপার্জন সওয়াল অপেক্ষা উত্তম।

দ্বিতীয় প্রকার– মিসকীন। যার আয় ব্যয়ের জন্যে যথেষ্ট নয়, তাকে মিসকীন বলা হয়। অতএব কেউ হাজার দেরহামের মালিক হয়েও মিসকীন হতে পারে। পক্ষান্তরে একটি কুড়াল ও রশির মালিক হয়েও মিসকীন না হতে পারে। মাথা গোঁজার মত গৃহ ও অবস্থানুযায়ী পোশাক পরিচ্ছদ থাকলেই মানুষ মিসকীনদের দল থেকে খারিজ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে ঘরকন্নার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রও মানুষকে মিসকীনদের দল থেকে খারিজ করে দেয় না। ফেকাহ্ শাস্ত্রের কিতাবসমূহের মালিকানাও মিসকিনীর পরিপন্থী নয়। কিতাব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর মালিক না হলে তার উপর সদকায়ে ফেতর ওয়াজেব নয়। কিতাবপত্র এবং পোশাক পরিচ্ছদও গৃহের জরুরী আসবাবপত্রের অনুরূপ। তবে কিতাবের প্রয়োজন বুঝার ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত। তিনটি উদ্দেশে কিতাবের প্রয়োজন হয়, পড়া, পড়ানো ও অধ্যয়ন করা। চিত্তবিনোদন কোন প্রয়োজন নয়। উদাহরণতঃ কবিতা, ইতিহাস, সংবাদপত্র এবং দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারী নয় এমন কিতাব সংগ্রহ এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। এ ধরনের কিতাব মিসকিনীর পরিপন্থী। বেতনভুক্ত শিক্ষক যেসকল কিতাবের সাহায্যে পাঠদান করে, সেগুলো তার জন্যে দর্জি প্রমুখ পেশাদার ব্যক্তিদের যন্ত্রপাতির অনুরূপ। এগুলো থাকলেও কেউ মিসকীন হতে পারে।

তৃতীয় প্রকার– আমেল (কর্মচারী)। বিচারক ও শাসনকর্তা ছাড়া যারা যাকাত আদায় করে, তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। দলপতি, হিসাব রক্ষক, ক্যাশিয়ার, নকল নবীশ প্রমুখ কর্মচারীও এর মধ্যে দাখিল। তাদের কাউকে এ কাজের সাধারণ মজুরির চেয়ে বেশী দেয়া যাবে না।

চতুর্থ প্রকার– তারা, যাদেরকে মন জয় করার উদ্দেশে যাকাতের অর্থ দেয়া হয়। তারা আপন আপন গোত্রের সর্দার হয়ে থাকে। তাদেরকে দেয়ার উদ্দেশ্য তাদেরকে ইসলামের উপর কায়েম রাখা এবং তাদের অধীনস্থদেরকে উৎসাহ প্রদান করা।

পঞ্চম প্রকার– মুকাতাব। যে গোলামকে তার প্রভু কিছু অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে বলে, তাকে মুকাতাব বলা হয়। মুকাতাবের অংশ তার প্রভুকে দেয়া উচিত। স্বয়ং মুকাতাবকে দেয়াও জায়েয। প্রভু তার মালের যাকাত মুকাতাবকে দেবে না। কেননা, সে এখনও তার গোলাম।

ষষ্ঠ প্রকার– ঋণী ব্যক্তি। যারা বৈধ কাজে ঋণ গ্রহণ করে, অতঃপর দারিদ্র্যের কারণে শোধ করতে পারে না; তারা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। গোনাহের কাজে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে যে পর্যন্ত তওবা না করে তাকে যাকাতের অর্থ দেয়া যাবে না। ধনী ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ থাকলে যাকাতের অর্থ দ্বারা তা শোধ করা যাবে না। তবে সে কোন জনকল্যাণমূলক কাজের জন্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা শোধ করতে অসুবিধা নেই।

সপ্তম প্রকার– গাজী। সরকারী ভাতাভুকদের রেজিস্টারে যার কোন ভাতা নেই; তাকে যাকাতের একটি অংশ দেয়া উচিত– যদিও সে ধনী হয়। এতে জেহাদে সাহায্য করা হবে।

অষ্টম প্রকার– মুসাফির। যেব্যক্তি সফরের উদ্দেশে আপন শহর থেকে রওয়ানা হয়, সে মুসাফির। সফর গোনাহের উদ্দেশে না হলে এবং মুসাফির ব্যক্তি নিঃস্ব হলে তাকে যাকাত দিতে হবে। তার স্বগৃহে ধন সম্পদ থাকলে তাকে এতটুকু দিতে হবে, যদ্দ্বারা সে গৃহে পৌঁছতে পারে।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত আট প্রকার হকদার ব্যক্তিকে কিরূপে চেনা যাবে? জওয়াব, ফকীর ও মিসকীনের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উক্তিই যথেষ্ট হবে। এ জন্যে সাক্ষ্য ও কসম নিতে হবে না। আমি ফকীর– কেউ একথা বললেই তাকে যাকাত দেয়া যাবে, যদি সে মিথ্যাবাদী বলে দৃঢ় বিশ্বাস না হয়। জেহাদ ও সফর ভবিষ্যতের ব্যাপার। যদি কেউ বলে, সে সফর অথবা জেহাদের ইচ্ছা রাখে, তবে তাকে দেয়া জায়েয। যদি কেউ পরবর্তীতে এই ইচ্ছা পূর্ণ না করে, তবে যা দেয়া হয়, তা ফেরত নিতে হবে। অবশিষ্ট চার প্রকার হকদারকে চেনার জন্যে সাক্ষী অত্যাবশ্যক। এ পর্যন্ত হকদার হওয়ার শর্ত ও কারণসমূহ বর্ণিত হল।

যাকাত গ্রহীতার আদব

যাকাত গ্রহীতার আদব পাঁচটি ঃ (১) সে মনে করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এক চিন্তা ছাড়া সকল চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার জন্যে অন্যের উপর যাকাত ওয়াজেব করেছেন। মানুষের নিষ্ঠাকে আল্লাহ তাআলা এবাদত সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ কেবল আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের কথা চিন্তা করবে– অন্য কোন চিন্তায় মগ্ন হবে না। নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ তাই ঃ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ আমি মানুষ ও জ্বিনকে একমাত্র আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলার আদি রহস্যের তাগিদ অনুযায়ী বান্দার উপর কামনা-বাসনা ও অভাব-অনটন চাপিয়ে তার চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। তাই অনুগ্রহস্বরূপ তাকে বিভিন্ন নেয়ামতও পৌছানো হয়েছে, যাতে তার অভাব অনটন মোচনের জন্যে যথেষ্ট হয়। এ দৃষ্টিতে প্রভূত ধন-সম্পদ সৃষ্টি করে বান্দার হাতে দেয়া হয়েছে। এসব ধন-সম্পদ বান্দার প্রয়োজনাদি মেটানোর ওসিলা এবং এবাদতের জন্যে অবকাশ লাভের উপায়। আল্লাহ তাআলা কতক বান্দাকে অগাধ ধন-দৌলত দান করেছেন, যাতে তা তাদের জন্যে পরীক্ষা হয়। কতক লোককে তিনি তাঁর মহব্বত দ্বারা গৌরবান্বিত করে দুনিয়ার ঝামেলা থেকে এমনভাবে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যেমন দরদী ও স্নেহশীল চিকিৎসক রোগীকে কুপথ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখে। অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে দুনিয়াব অতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম থেকে আলাদা রেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ধনীদের হাত দিয়ে তাদের কাছে পৌছিয়েছেন, যাতে উপার্জনের চিন্তা, সঞ্চয়ের পরিশ্রম, হেফাযতের পেরেশানী ধনীদের দায়িত্বে থাকে এবং তার লাভ ফকীররা ভোগ করে; ফলে তারা আল্লাহ তাআলার এবাদতেই সর্বক্ষণ মগ্ন থাকে এবং পরকালের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফকীরদের প্রতি এটি আল্লাহ তায়ালার পরম নেয়ামত। ফকীরদের উচিত এ নেয়ামতের কদর করা এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করা, দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রেখে আল্লাহ তাদের প্রতি একান্তই কৃপা করেছেন।

সারকথা, ফকীর যা নেবে, তদ্দ্বারা স্বীয় রিযিক ও এবাদতে সাহায্য

লাভের উদ্দেশে নেবে। যদি তা সম্ভবপর না হয়, তবে এ দানের অর্থ আল্লাহ তাআলার অনুমোদিত খাতে ব্যয় করবে। যদি এই অর্থ দ্বারা পাপ কাজে সাহায্য লাভ করে, তবে সে আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ হবে এবং তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির পাত্র হবে।

(২) ফকীর দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে এবং তার জন্যে নেক দোয়া করবে। দোয়া এভাবে করবে যেন দাতাকে মধ্যবর্তী ছাড়া অন্য কিছু মনে না করা হয়। বরং এটাই বুঝবে, আল্লাহর নেয়ামত পৌছার পথ ও উপায় এ ব্যক্তি হয়ে গেছে। এ ধারণা নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে বলে বিশ্বাস করার পরিপন্থী নয়। সেমতে হাদীসে বলা হয়েছে- من لم يشكر الناس لم يشكر الله যেব্যক্তি মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহ তাআলার শোকর করে না। আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলের জন্যে তার প্রশংসা অনেক জায়গায় করেছেন। উদাহরণতঃ এক জায়গায় বলেছেন- نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ আইউব চমৎকার বান্দা। সে আমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আরও অনেক আয়াতে এই বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। গ্রহীতা এভাবে দোয়া করবে- আল্লাহ পবিত্র লোকদের অন্তরের সাথে আপনার অন্তরকে পবিত্র করুন এবং সৎকর্মীদের কর্মের সাথে আপনার কর্মকে পরিষ্কার করুন। শহীদদের আত্মা সাথে আপনার আত্মার প্রতি রহমত নাযিল করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তাকে কিছু বিনিময় দাও। আর কিছু সম্ভব না হলে তার জন্যে দোয়া কর। এত দোয়া কর যেন প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার মনে বিশ্বাস জন্মে। শোকরের পরিশিষ্ট হচ্ছে, দানের মধ্যে কিছু দোষ থাকলে তা গোপন করবে এবং তার নিন্দা করবে না। দাতা যদি না দেয়, তবে তাকে লজ্জা দেবে না। দিলে তার কাজকে মানুষের সামনে বড় বলে প্রকাশ করবে। কেননা, দাতার আদব হল নিজের দানকে ছোট মনে করা এবং কৃতজ্ঞ হওয়া।

(৩) গ্রহীতা যে অর্থ নিতে চায়, তা হারাম কিনা প্রথমে দেখে নেয়া উচিত। নাজায়েয ও হারাম হলে তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অন্য কোথাও থেকে তাকে দেয়াবেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ -

যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তাকে রিযিক দেন, যার কল্পনাও সে করে না। এরূপ নয় যে, কেউ হারাম থেকে বিরত থাকলে সে হালাল মাল পাবে না। মোট কথা, সরকারী কর্মচারীদের মাল এবং যাদের উপার্জন অধিকাংশই হারাম, তাদের মাল গ্রহণ করবে না। কিন্তু অবস্থা সংকটজনক হলে এবং প্রদত্ত মালের কোন মালিক জানা না থাকলে প্রয়োজনমাফিক তা গ্রহণ করা জায়েয। কেননা, এরূপ মাল খয়রাত করে দেয়াই বিধান।

(৪) গ্রহীতা সন্দেহের জায়গা থেকে বেঁচে থাকবে এবং যা নেবে তার পরিমাণে সন্দেহ হলে যতটুকু জায়েয, ততটুকুই নেবে। নিজের মধ্যে হকদার হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে– একথা না জানা পর্যন্ত নেবে না। উদাহরণতঃ যদি ঋণী হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে ঋণের পরিমাণের বেশী নেবে না। যদি মুসাফির হওয়ার কারণে যাকাত নেয়, তবে পাথেয় এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছা পর্যন্ত যানবাহনের যা ভাড়া লাগে, তার বেশী নেবে না। এসব বিষয়ের আন্দাজ গ্রহীতা নিজের ইজতেহাদ দ্বারা করবে। এর কোন সীমা নির্দিষ্ট নেই। মোট কথা, প্রয়োজন পরিমাণ হয়ে গেলে যাকাতের মাল বেশী গ্রহণ করবে না; বরং এই বছরের জন্যে যথেষ্ট হয়, এই পরিমাণ গ্রহণ করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পোষ্যদের জন্যে এক বছরের খাদ্য একত্রিত করেছেন। অতএব ফকীর ও মিসকীনের জন্যে এ সীমাই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। যদি একমাস অথবা একদিনের প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়, তবে এটা তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী।

যাকাত ও খয়রাত থেকে ফকীরের কি পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত, এ সম্পর্কে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ এত বেশী কম বলেন যে, একদিন এক রাতের খাদ্যের বেশী না নেয়া তাদের মতে ওয়াজেব। তাদের এ দাবীর সমর্থনে সহল ইবনে হানযালিয়া বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে। তা এই, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মালদারী থাকা

অবস্থায় সওয়াল করতে নিষেধ করেছেন। এর পর মালদারী কি, এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেছেন– সকাল ও সন্ধ্যার খাদ্য থাকা। কেউ কেউ বলেন, ধনাঢ্যতার সীমা হচ্ছে যাকাতের নেসাব। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা যাকাত কেবল ধনাঢ্যদের উপর ফরয করেছেন। তারা এর অর্থ এই বের করেছেন, নিজের জন্যে এবং পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যাকাতের নেসাব পর্যন্ত গ্রহণ করা জায়েয। কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা পঞ্চাশ দেরহাম বলেছেন। কেননা, হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من سال وله ما يغنيه جاء يوم القيامة وفى وجهه خموس وقيل وما عناه قال خمسون درهما او قيمتها من الذهب ـ

যেব্যক্তি মালদার হওয়া সত্ত্বেও সওয়াল করবে, সে কেয়ামতের দিন মুখমণ্ডলে ঘা নিয়ে উপস্থিত হবে। প্রশ্ন করা হল ঃ মালদারী কি? তিনি বললেন ঃ পঞ্চাশ দেরহাম অথবা তার সমতুল্যের স্বর্ণ। কথিত আছে, এ হাদীসের একজন রাবী দুর্বল। কেউ কেউ ধনাঢ্যতার সীমা চল্লিশ দেরহাম বর্ণনা করেছেন। কেননা, আতা ইবনে ইয়াসারের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من سال وله اوقية فقد الحف فى السوال এক ওকিয়া অর্থাৎ, চল্লিশ দেরহাম থাকা সত্ত্বেও যেব্যক্তি সওয়াল করে, সে অযথা সওয়াল করে। অন্য আলেমগণ বিষয়টি অধিক প্রশস্ত করে বলেছেন ঃ ফকীর এই পরিমাণে গ্রহণ করতে পারে, তদ্দ্বারা এক খণ্ড জমিন ক্রয় করে জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যায় অথবা কোন পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে অভাবমুক্ত হয়ে যায়। কেননা, জীবিকার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়াকেই নিশ্চিন্ততা বলে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ যখন এই দান কর, তখন ধনী করে দাও। কারও কারও মতে, কোন ব্যক্তি ফকীর হয়ে গেলে সে এই পরিমাণ গ্রহণ করতে পারে, যদ্দ্বারা তার পূর্বাবস্থা বহাল হয়ে যায়, যদিও তা দশ হাজার দেরহাম দ্বারা হয়। একবার হযরত আবু তালহা (রাঃ) তাঁর বাগানে নামায পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় বাগানের দিকে তাঁর ধ্যান চলে যাওয়ায় তিনি বললেন ঃ আমি এ বাগান খয়রাত করলাম।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ তুমি এ বাগান তোমার আত্মীয়দের মধ্যে খয়রাত কর। এটা তোমার জন্যে ভাল। সেমতে তিনি বাগানটি হযরত হাস্‌সান ও আবু কাতাদাহ্ (রাঃ)-কে দান করে দিলেন। একটি খোরমার বাগান পেয়ে তারা উভয়েই ধনী হয়ে গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) জনৈক গেঁয়ো ব্যক্তিকে একটি বাচ্চা উট সেটির পিতামাতাসহ দিয়ে দেন। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, ফকীররা বেশী গ্রহণ করতে পারে। আমাদের মতে, নিম্নে এক দিবা-রাত্রির খাদ্য অথবা চল্লিশ দেরহাম থাকলে সওয়াল করবে না এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরাফেরা করবে না। ভিক্ষাবৃত্তি নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে পরহেযগার ব্যক্তিকে বলে দেয়া উচিত, তুমি তোমার মনের কাছ থেকে ফতোয়া নাও, অন্যেরা তোমাকে যত ফতোয়াই দিক না কেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাই বলেছিলেন। গ্রহীতা যদি সেই মালের ব্যাপারে মনে কোন খটকা পায়, তবে আল্লাহকে ভয় করে মাল গ্রহণ করা উচিত। ফতোয়াকে বাহানা বানিয়ে তা গ্রহণ করা উচিত নয়। কেননা, যাহেরী আলেমগণের ফতোয়া প্রয়োজনের শর্ত থেকে মুক্ত এবং এতে অনেক সন্দেহ থাকে। ধার্মিক ও আখেরাতের পথিকদের অভ্যাস সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা।

(৫) ফকীর মালদার ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে, তার উপর কি পরিমাণ যাকাত ওয়াজেব। জানার পর দেখবে, যতটুকু সে পেয়েছে তা মোট যাকাতের এক-অষ্টমাংশের বেশী কিনা। বেশী হলে তা নেবে না। কেননা, সে এবং তার আরও দু'জন শরীক মিলে কেবল এক-অষ্টমাংশের হকদার। সুতরাং সে এক অষ্টমাংশের এক-তৃতীয়াংশ নেবে, বেশী নেবে না। এটা জিজ্ঞেস করা অধিকাংশ লোকের উপর ওয়াজেব। কারণ, মানুষ এই ভাগাভাগির প্রতি লক্ষ্য করে না মূর্খতার কারণে অথবা সহজ করার কারণে। তবে হারাম হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল না হলে এসব বিষয় জিজ্ঞেস না করা জায়েয।

নফল দান-খয়রাত ও তার ফযীলত

নফল দান খয়রাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস নিম্নরূপ ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ সদকা কর যদিও তা একটি খেজুর হয়। কেননা, এটা ক্ষুধার্তের কিছু না কিছু কষ্ট দূর করে এবং গোনাহকে এমনভাবে নির্বাপিত করে, যেমনভাবে পানি অগ্নি নির্বাপিত করে। তিনি

আরও বলেন ঃ

اتقوا النار ولو بشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة

অর্থাৎ, এক খন্ড খেজুর দান করে হলেও দোযখ থেকে আত্মরক্ষা কর। যদি তা না পাও, তবে ভাল কথা বলে আত্মরক্ষা কর।

রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে মুসলমান বান্দা তার পবিত্র উপার্জন থেকে সদকা করে– আল্লাহ তাআলা পবিত্রকেই গ্রহণ করেন– আল্লাহ তাআলা এই সদকা ডান হাতে গ্রহণ করেন, অতঃপর তা লালন-পালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ উটের বাচ্চা লালন-পালন করে। অবশেষে খেজুর বেড়ে ওহুদ পাহাড়ের সমান হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু দারদাকে বললেন ঃ যখন তুমি শুরবা রান্না কর তখন তাতে বেশী পরিমাণে পানি দাও। অতঃপর তা থেকে প্রতিবেশীদেরকে দান কর। তিনি আরও বলেন ঃ যে বান্দা ভাল সদকা দেয়, আল্লাহ তার সম্পদে অনেক বরকত দেন।

এক হাদীসে আছে–

كل امرا فى ظل صدقته حتى يقضى بين الناس -

অর্থাৎ, হাশরের মাঠে মানুষের মধ্যে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তার সদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।

আরও আছে–

الصدقة تسد سبعين بابا من الشر

অর্থাৎ, সদকা অনিষ্টের সত্তরটি দরজা বন্ধ করে।

আরও আছে–

صدقة السر تطفى غضب الرب -

অর্থাৎ, গোপন সদকা পালনকর্তার ক্রোধ নির্বাপিত করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে– যেব্যক্তি সচ্ছলতাবশতঃ দান করে, সে সওয়াবে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম নয়, যে অভাবের কারণে তা কবুল করে। এর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই, যেব্যক্তি সদকা কবুল করে নিজের অভাব

দূর করে, যাতে ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, সে সেই দাতার সমান, যে তার দান দ্বারা ধর্মের অগ্রগতির নিয়ত করে। কেউ রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ কোন্‌টি সদকা উত্তম? তিনি বললেন ঃ এমন সময়ে সদকা করা উত্তম, যখন মানুষ সুস্থ থাকে, মাল আটকে রাখতে চায়, অনেক দিন বাঁচার আশা রাখে এবং উপবাসকে খুব ভয় করে। সদকা দিতে এতদূর বিলম্ব করবে না যে, মরণোন্মুখ অবস্থায় বলতে থাকবে, এই পরিমাণ অমুককে এবং এই পরিমাণ অমুককে দেবে, অথচ তখন তোমার মাল অন্যের অর্থাৎ ওয়ারিসদের হয়ে গেছে। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা সদকা কর। এক ব্যক্তি আরজ করল ঃ আমার কাছে একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি নিজের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটি স্ত্রীর জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আরও একটি দীনার আছে, তিনি বললেন ঃ এটি সন্তানদের জন্য ব্যয় কর। লোকটি আরজ করল, আমার কাছে আরেকটি দীনার আছে, তিনি বললেন এটি খাদেমের জন্যে ব্যয় কর। লোকটি বলল ঃ আমার কাছে আর একটি দীনার আছে। তিনি বললেন ঃ এটা যেখানে ভাল মনে কর, ব্যয় কর। রসূলে আকরাম (সাঃ) আরও বলেন ঃ মুহাম্মদ পরিবারের জন্যে সদকা হালাল নয়। কারণ, সদকা মানুষের সম্পদের ময়লা। তিনি আরও বলেন ঃ যেব্যক্তি ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেয়, ফেরেশতারা তার গৃহের উপর সাত দিন পর্যন্ত ছায়া দান করেন না। দুটি কাজ রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যের হাতে সোপর্দ করতেন না– নিজে করতেন। এক, ওযুর পানি নিজে রাখতেন ও তা ঢেকে দিতেন এবং দুই, মিসকীনকে নিজের হাতে দান করতেন। তিনি বলেন ঃ সে ব্যক্তি মিসকীন নয়, যাকে এক খেজুর অথবা দুই খেজুর এবং এক লোকমা অথবা দুই লোকমা দিয়ে বিদায় করা হয়; বরং সেই মিসকীন যে সওয়াল থেকে বিরত থাকে। তুমি এ আয়াত পড়ে দেখ–

لَا يَسْـئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ـ

অর্থাৎ, তারা মানুষের কাছে গায়ে পড়ে সওয়াল করে না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বলেন ঃ যে মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে বস্ত্র পরিধান করায়, সে মিসকীনের গায়ে ঐ বস্ত্রের তালি থাকা পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার হেফাযতে থাকে।

নফল সদকা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গগণের উক্তি নিম্নরূপ ঃ

ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) পঞ্চাশ হাজার দেরহাম খয়রাত করেন অথচ তাঁর কোর্তায় তালিই থাকত। হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ ইলাহী, ধনসম্পদ ও ধনাঢ্যতা আমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তিকে দান করুন। সম্ভবতঃ সে তা আমাদের অভাবগ্রস্তদেরকে পৌছাবে। আবদুল আজীজ ইবনে ওমায়র (রহঃ) বলেন ঃ নামায মানুষকে অর্ধেক পথে পৌছায়, রোযা বাদশাহের দ্বারে নিয়ে যায় এবং সদকা বাদশাহের সামনে উপস্থিত করে। ইবনে আবিল জা'দ (রহঃ) বলেন ঃ সদকা মানুষ থেকে সত্তর প্রকার অনিষ্ট দূর করে। প্রকাশ্যে সদকা দেয়ার তুলনায় গোপনে দেয়ায় সত্তর গুণ বেশী সওয়াব। সদকা সত্তর শয়তানের চোয়াল বিদীর্ণ করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি সত্তর বছর আল্লাহ তাআলার এবাদত করার পর কোন একটি কবীরা গোনাহ করায় তার এবাদত বাতিল করে দেয়া হল। অতঃপর সে এক মিসকীনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে এক খন্ড রুটি সদকা করল। ফলে আল্লাহ তার অপরাধ মার্জনা করে সত্তর বছরের এবাদত বহাল করে দিলেন। লোকমান তাঁর পুত্রকে বললেন ঃ তুমি যখন কোন গোনাহ কর, তখন সদকা করবে। ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (রহঃ) বলেন ঃ সদকার দানা ব্যতীত কোন দানা দুনিয়ার পাহাড়ের সমান হয়ে যায় বলে আমার জানা নেই। সদকার দানা অবশ্যই এতটুকু হয়ে যায়। আবদুল আজীজ ইবনে আবী রুয়াদ বলেন ঃ প্রথম যমানায় বলা হত, তিনটি বিষয় জান্নাতের ভান্ডারসমূহের মধ্যে দাখিল– রোগ গোপন করা, সদকা গোপন করা এবং বিপদাপদ গোপন করা। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমলসমূহ একে অপরের উপর গর্ব করল। সদকা বলল ঃ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবদুল্লাহ (রহঃ) চিনি খয়রাত করতেন এবং বলতেন ঃ আমি দেখলাম, আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ -

অর্থাৎ, তোমরা প্রিয় বস্তু ব্যয় না করা পর্যন্ত পূর্ণ নেকী পাবে না।

আমি চিনি ভালবাসি, একথা আল্লাহ তাআলা জানেন। নখয়ী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর জন্যে যে বস্তু দেব তাতে কোন দোষ থাকা আমার

পছন্দনীয় নয়। ওবায়েদ ইবনে ওমায়ের (রহঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন মানুষ সকল দিন অপেক্ষা অধিক ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। অতঃপর যেব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর জন্যে ক্ষুধার্তকে আহার দিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে পেট ভরে আহার করাবেন। যেব্যক্তি আল্লাহর জন্যে বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরিধান করিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে বস্ত্র পরিধান করাবেন। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকে ধনাঢ্য করে দিতেন– তোমাদের মধ্যে ফকীর থাকত না। কিন্তু তিনি একজনকে অপরজন দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। শা'বী (রহঃ) বলেন ঃ ফকীর ধনীর সদকার যতটুকু মুখাপেক্ষী, যদি ধনী তার তুলনায় আপন সদকার সওয়াবের অধিক মুখাপেক্ষী না হয়, তবে তার সদকা অনর্থক। এ সদকা তার মুখে নিক্ষেপ করা হবে। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন ঃ যে পানি সদকা করা হয় এবং মসজিদে পান করানো হয়, তা থেকে ধনী ব্যক্তি পান করলে আমরা দোষ মনে করি না। কেননা, যে পানি সদকা করে, সে পিপাসার্তদের জন্যে সদকা করে। বিশেষভাবে ফকীর-মিসকীনকে সদকা করার নিয়ত তার থাকে না। কথিত আছে, জনৈক দাস বিক্রেতা এক বাঁদী সঙ্গে নিয়ে হযরত হাসান বসরীর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই বাঁদী এক দুই দেরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করতে সম্মত আছ কি? সে বলল ঃ না। হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ যাও, আল্লাহ তাআলা তো এক পয়সা ও এক লোকমা সদকা করার বিনিময়ে বেহেশতের হুর দিতে সম্মত আছেন।

সদকা গোপনে ও প্রকাশ্যে গ্রহণ করা

আধ্যাত্ম পথের পথিকগণ মতভেদ করেছেন, সদকা গোপনে বা প্রকাশ্যে গ্রহণ করার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম। কারও মতে গোপনে গ্রহণ করা উত্তম এবং কেউ বলেন, প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল। আমরা প্রথমে উভয় বিষয়ের উপকারিতা ও অপকারিতা বর্ণনা করব, এর পর যা সত্য তার ব্যাখ্যা করব। প্রকাশ থাকে যে, গোপনে সদকা গ্রহণ করার উপকারিতা পাঁচটি।

(১) গ্রহীতার গোপনীয়তা বজায় থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে ভদ্রতার পর্দা ছিন্ন হয়ে যায়, অভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সওয়াল করার ভীতি দূর হয়ে যায়।

(২) গোপনে সদকা গ্রহণ করলে মানুষের অন্তর ও মুখ নিরাপদ

থাকে। কেননা, প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে মানুষ তার প্রতি হিংসা করে অথবা তার গ্রহণ অপছন্দ করে একথা ভেবে যে, সে ধনী হওয়া সত্ত্বেও সদকা গ্রহণ করেছে অথবা বেশী পরিমাণে গ্রহণ করেছে। হিংসা ও কুধারণা বড় গোনাহ। মানুষকে এসব গোনাহ থেকে নিরাপদ রাখা উত্তম। আবু আইউব সুখতিয়ানী (রহঃ) বলেন ঃ আমি নতুন বস্ত্র পরিধান করি না এই আশংকায়, কোথাও প্রতিবেশীদের মনে হিংসা সৃষ্টি না হয়ে যায়। অন্য এক দরবেশ বলেন ঃ আমি আমার ভাইদের খাতিরে অধিকাংশ বস্তুর ব্যবহার বর্জন করি, যাতে তারা একথা না বলে যে, তার কাছে এটা কোত্থেকে এল? ইবরাহীম তায়মীর গায়ে নতুন জামা দেখে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ এটা আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বললেন ঃ আমার ভাই খায়সামা আমাকে পরিধান করিয়েছে। যদি জানতাম, তার পরিবারের লোকেরা এটা জানে, তবে কখনও কবুল করতাম না।

(৩) গোপনে দান গ্রহণ করলে দাতাকে গোপনে আমল করতে সাহায্য করা হয়। বলাবাহুল্য, দান গোপনে করাই উত্তম। অতএব এ ব্যাপারে গ্রহীতা দাতাকে সাহায্য করলে উত্তম কাজে সাহায্য করা হবে, যা নিঃসন্দেহে ভাল। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের প্রচেষ্টা ছাড়া গোপনে দান হতে পারে না। ফকীর নিজের অবস্থা প্রকাশ করে দিলে দাতার অবস্থাও প্রকাশ হয়ে পড়বে। এক ব্যক্তি জনৈক আলেমকে প্রকাশ্যে কিছু দান করলে তিনি গ্রহণ করলেন না। অন্য এক ব্যক্তি তাকে গোপনে কিছু দান করলে তিনি গ্রহণ করলেন। অতঃপর এ কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি তার খয়রাতে আদব ও নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে– গোপনে দিয়েছে। তাই আমি কবুল করেছি। এক ব্যক্তি জনৈক দরবেশ সুফীকে জনসমাবেশে কিছু দান করলে দরবেশ তা ফিরিয়ে দিলেন। লোকটি বলল ঃ যে বস্তু আপনাকে আল্লাহ তাআলা দিলেন, তা গ্রহণ করলেন না কেন? দরবেশ বললেন ঃ যে বস্তু একান্তভাবে আল্লাহর ছিল, তাতে অপরকে শরীক করে নিয়েছ। কেবল আল্লাহর দেখা তুমি যথেষ্ট মনে করনি। কাজেই তোমার শেরক আমি তোমার কাছেই ফিরিয়ে দিলাম। জনৈক সাধক এক বস্তু গোপনে কবুল করে নিলেন, যা তিনি প্রকাশ্যে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। দাতা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ প্রকাশ্যে দেয়ার কারণে তুমি আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে। তাই আমি তোমাকে সাহায্য করিনি। এখন গোপনে দেয়ার

কারণে তুমি আল্লাহর আনুগত্য করেছ। তাই আনুগত্যের কাজে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেন ঃ যদি আমি জানতাম, কোন ব্যক্তি দান করে তার আলোচনা করবে না এবং অন্যের কাছে বলবে না, তবে আমি তার দান গ্রহণ করতাম।

(৪) গোপনে গ্রহণ করলে গ্রহীতা অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে বেঁচে থাকে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে লাঞ্ছনা হয়। নিজেকে লাঞ্ছিত করা ঈমানদার ব্যক্তির জন্যে শোভন নয়। কোন আলেমকে গোপনে কেউ কিছু দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং প্রকাশ্যে দিলে গ্রহণ করতেন না। তিনি বলতেন ঃ প্রকাশ্যে নেয়ার মধ্যে এলেমের লাঞ্ছনা এবং আলেমগণের বেইযযতী হয় । তাই আমি দুনিয়ার ধন-সম্পদকে উঁচু করে বিনিময়ে এলেম ও আলেমগণকে নীচু করি না।

(৫) গোপনে গ্রহণ করলে শরীকানার সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তির কাছে কোন উপঢৌকন আসে, তার কাছে যত লোক থাকে, তারা সকলেই উপঢৌকনে শরীক থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্য হলেও তা উপঢৌকন। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের দেয়া উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে রূপা অথবা খাদ্য, যা খাওয়ানো হয়। এতে রূপাকেও উপঢৌকন বলা হয়েছে। এ থেকে জানা গেল, জনসমাবেশে সকলের সম্মতি ছাড়া বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কিছু দেয়া মাকরূহ। সকলের সম্মতি সন্দিগ্ধ বিধায় একান্তে দিলে এই সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এখন সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা এবং অন্যের কাছে তার আলোচনা করার মধ্যে যেসকল উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো বর্ণিত হচ্ছে। এতে চারটি উপকারিতা আছে।

(১) সদকা প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে আন্তরিকতা ও সততা প্রকাশ পায়, নিজের অবস্থা সম্পর্কে অপরকে ধোঁকা দেয়া হয় না এবং রিয়া থেকে মুক্ত থাকা যায়। কারণ, এতে বাস্তব অবস্থাই প্রকাশ পায়। এরূপ হয় না যে, বাস্তব অবস্থা অন্যরূপ এবং লোক দেখানোর উদ্দেশে তা প্রকাশ করা হয় না।

(২) প্রকাশ্যে গ্রহণ করলে জাঁকজমকপ্রীতি দূর হয়ে যায়, দাসত্ব ও দীনতা প্রকাশ পায়, অহংকার ও অভাবমুক্ততার দাবী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া

যায় এবং মানুষের দৃষ্টিতে হেয় হওয়া যায়। এ কারণেই জনৈক সাধক তাঁর শিষ্যকে বলেন ঃ সদকা সর্বাবস্থায় প্রকাশ্যে নেবে। এরূপ করলে তোমার ব্যাপারে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল হবে, যাদের মনে তোমার কোন মর্যাদা থাকবে না । এট তো অভীষ্ট লক্ষ্যই। কেননা, এটা তোমার ধর্মের নিরাপত্তার জন্য অধিক উপকারী । আরেক দল হবে, যাদের মনে তোমার প্রতি সহানুভূতি বেশী হবে। কারণ, তুমি আপন অবস্থা ঠিক ঠিক প্রকাশ করে দিয়েছ। এটা তোমার ভাইয়ের কাম্য। কারণ, তার উদ্দেশ্য বেশী বেশী সওয়াব পাওয়া। সে যখন তোমাকে মহব্বত বেশী করবে তখন সে সওয়াবও অবশ্যই পাবে। এ সওয়াব তুমিও পাবে। কেননা, তার সওয়াব বেশী হওয়ার কারণ তুমিই।

(৩) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে তওহীদকে শেরক থেকে বাঁচানো যায়। কেননা, সাধকের দৃষ্টি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য দিকে নিবদ্ধ হয় না। গোপনও প্রকাশ্য তার জন্যে সমান। এ অবস্থার পরিবর্তন তওহীদে শেরকের নামান্তর । জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যেব্যক্তি গোপনে গ্রহণ এবং প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করত, আমরা তার দোয়ার কোনই মূল্য দিতাম না । উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত মানুষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হালের ক্ষতি বৈ নয়। দৃষ্টি সর্বদা এক আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকা উচিত। কথিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তাঁর মুরীদগণের মধ্যে একজনের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। এটা অন্য মুরীদদের কাছে দুঃসহ মনে হলে বুযুর্গ ব্যক্তি তাদের কাছে সেই মুরীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চাইলেন। সেমতে প্রত্যেক মুরীদকে একটি করে মুরগী দিয়ে তিনি বললেন ঃ প্রত্যেকেই আপন আপন মুরগী এমন জায়গা থেকে জবাই করে আনবে, যেখানে অন্য কেউ না দেখে। সকল মুরীদ গিয়ে আপন আপন মুরগী জবাই করে আনল । কিন্তু সেই মুরীদ জীবিত মুরগী নিয়ে এল । বুযুর্গ তাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি এমন কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে কেউ দেখে না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্রই দেখেন। বুযুর্গ ব্যক্তি মুরীদগণকে বললেন ঃ এ কারণেই আমি তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট । সে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি ধ্যান দেয় না।

(৪) প্রকাশ্যে সদকা গ্রহণ করলে শোকরের সুন্নত আদায় হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ তুমি তোমার

পালনকর্তার নেয়ামত বর্ণনা কর। নেয়ামত গোপন করা অকৃতজ্ঞতার শামিল । যারা আল্লাহর নেয়ামত গোপন করে, আল্লাহ তাদের নিন্দা করেন এবং কৃপণ আখ্যা দেন। বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

অর্থাৎ, যারা কৃপণতা করে, মানুষকে কৃপণতা করতে আদেশ করে এবং আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ গোপন করে।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন, তখন বান্দাকে সেই নেয়ামতের উপযোগী দেখাও পছন্দ করেন। এক ব্যক্তি জনৈক সাধককে গোপনে কিছু দিলে সাধক আপন হাত উঁচু করে বললেন ঃ এটা দুনিয়ার বস্তু। এটা প্রকাশ্যে দেয়া উত্তম। আখেরাতের কাজ গোপন করা উত্তম। এ কারণেই জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ তোমাকে জনসমাবেশে কিছু দেয়া হলে তুমি তা গ্রহণ কর। এর পর একান্তে তা ফেরত দিয়ে দাও। সদকার ক্ষেত্রে শোকরের প্রতি উৎসাহ বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ من لم يشكر الناس لم يشكر الله عزوجل যে মানুষের শোকর করে না, সে আল্লাহরও শোকর করে না। শোকর প্রতিদানের স্থলবর্তী হয়ে থাকে । রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তুমি তার প্রতিদান দাও। প্রতিদান সম্ভব না হলে উত্তমরূপে তার প্রশংসা কর এবং সেই পর্যন্ত দোয়া কর, যে পর্যন্ত প্রতিদান হয়ে গেছে বলে তোমার বিশ্বাস না জন্মে। মুহাজিরগণ মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে শোকর সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমরা আনসারদের চেয়ে উত্তম লোক দেখিনি। আমরা তাঁদের কাছে এলে তাঁরা আপন বিষয়-সম্পত্তি আমাদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। আমাদের আশংকা হচ্ছে, সব সওয়াব তাঁরাই নিয়ে যাবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, তা নয়। তোমরা যে তাঁদের শোকর করেছ এবং প্রশংসা করেছ, এতে প্রতিদান হয়ে গেছে।

এসব উপকারিতা জানার পর এখন জানা দরকার, এ সম্পর্কে বর্ণিত মতভেদ মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে নয়; বরং এটা হাল তথা অবস্থার মতভেদ।

এ ক্ষেত্রে সত্য এই যে, গোপনে গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় উত্তম অথবা প্রকাশ্যে গ্রহণ করা ভাল, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। বরং এটা নিয়তের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে থাকে। হাল ও ব্যক্তির পার্থক্যের কারণে নিয়ত আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এখলাসবিশিষ্ট ব্যক্তির উচিত নিজের দেখাশুনা করা এবং বিভ্রান্তিতে না পড়া। এ ব্যাপারে মনের প্রতারণা ও শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। প্রকাশ্যে গ্রহণ করার তুলনায় গোপনে গ্রহণ করার কারণসমূহের মধ্যে ধোঁকা প্রতারণা বেশী রয়েছে– যদিও উভয়ের মধ্যেই প্রতারণা আছে। গোপনে গ্রহণ করার মধ্যে প্রতারণার কারণ, মন গোপনে গ্রহণ করার প্রতি আগ্রহী থাকে। কারণ, এতে জাঁকজমক ও মর্যাদা বহাল থাকে। মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান ঠিক থাকে। কেউ মিসকীনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে এবং দাতাকে তার প্রতি অনুগ্রহকারী ও নেয়ামতদানকারীরূপে দেখে না। এই রোগ মনের মধ্যে গোপন থাকে এবং শয়তান এর মাধ্যমে উপকারিতা প্রকাশ করে। এমনকি, পূর্ববর্ণিত পাঁচটি উপকারিতাকেই গোপনে গ্রহণ করার কারণরূপে উল্লেখ করে।

প্রকাশ্যে গ্রহণ করার প্রতিও মন আগ্রহী থাকে। কারণ, এতে দাতার মন প্রফুল্ল হয় এবং সে দানে উৎসাহিত হয়। এখানে শয়তান বলে, শোকর আদায় করা সুন্নত এবং গোপন রাখা রিয়া। এমনকি, শয়তান পূর্বোল্লিখিত চারটি উপকারিতাকেও প্রমাণস্বরূপ পেশ করে, যাতে প্রকাশ্যে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

অতএব ফয়সালা এই যে, দাতাকে দেখতে হবে। যদি সে শোকর ও প্রকাশ্যে দেয়া পছন্দ করে, তবে তার দান গোপন রাখবে এবং শোকর করবে না। কেননা, শোকর তলব করা একটি জুলুম। এই জুলুমের কাজে তাকে সাহায্য না করা চাই। পক্ষান্তরে যদি দাতা শোকর পছন্দ না করে, তবে গ্রহীতা তার শোকর করবে এবং দান প্রকাশ করবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে লোকেরা এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা তাকে মেরে ফেলেছ। সে শুনলে কল্যাণ প্রাপ্ত হবে না। অথচ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষের প্রশংসা তাদের উপস্থিতিতে করতেন। কারণ, তিনি তাদের ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন, এ প্রশংসা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হবে না। বরং তাদের সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ আরও বৃদ্ধি

করবে। উদাহরণতঃ তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ সে গেঁয়ো লোকদের সর্দার। অন্য এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন ঃ তোমাদের কাছে কোন সম্প্রদায়ের সর্দার আগমন করলে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। এক ব্যক্তির কথাবার্তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুব ভাল লাগলে তিনি বললেন ঃ ان من البيان لسحرا নিঃসন্দেহে কিছু বর্ণনা জাদু হয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন ঃ اذا امدح المؤمن ربى الايمان فى قلبه মুমিনের প্রশংসা করা হলে তার অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজেকে সম্যক চেনে, মানুষের প্রশংসা তার জন্যে ক্ষতিকর হয় না। সারকথা, জনসমাবেশে গ্রহণ করা এবং একান্তে না করা উত্তম ও নিরাপদ পন্থা। হাঁ, যদি মারেফত কামেল হয় এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ ও গোপনে গ্রহণ উভয়টি সমান হয়ে যায়, তবে গোপনে গ্রহণ করার মধ্যেও দোষ নেই। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। আলোচনায় আছে– বাস্তবে পাওয়া ভার। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং তওফীক দান করুন।

সদকা গ্রহণ করা উত্তম না যাকাত

ইবরাহীম খাওয়াস, জুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ বুযুর্গের অভিমত হচ্ছে, যাকাতের তুলনায় সদকার অর্থ গ্রহণ করা উত্তম। কেননা, যাকাতের অর্থ গ্রহণ করলে মিসকীনদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করা হয়। এছাড়া যাকাতের হকদার হওয়ার জন্যে যেসকল বিশেষণ ও শর্ত উল্লিখিত আছে, সেগুলো নিজের মধ্যে থাকে না। সদকার মধ্যে এ ব্যাপারে অবকাশ বেশী । কেউ কেউ বলেন ঃ যাকাত গ্রহণ করা উচিত– সদকা নয়। কেননা, যাকাত গ্রহণ করলে মানুষকে ফরয আদায়ে সাহায্য করা হয়। সকল মিসকীন যাকাত নেয়া ত্যাগ করলে সকল মানুষ গোনাহ্গার হবে। এছাড়া যাকাত কারও অনুগ্রহ নয়। এটা মালদারের যিম্মায় আল্লাহর ওয়াজেব হক। এর মাধ্যমে অভাবী বান্দাদের রুজি অর্জিত হয়। আরও কারণ, যাকাত অভাবের কারণে গ্রহণ করা হয়। অভাব প্রত্যেক ব্যক্তির নিশ্চিতরূপে জানা থাকে। কিন্তু সদকা গ্রহণ করা দ্বীনদারীর কারণে হয়। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাতা তাকেই সদকা দেয়, যার দ্বীনদারী সম্পর্কে তার বিশ্বাস থাকে ।

এক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে, এ বিষয়টি প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ হয়। যে ধরনের অবস্থা প্রবল এবং যেরূপ নিয়ত হয়, সেই ধরনের বিধান হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে, তার মধ্যে যাকাতের হকদার হওয়ার শর্ত আছে কিনা, তবে তার যাকাত গ্রহণ না করা উচিত । আর যদি নিজেকে হকদার বলে নিশ্চিতরূপে জানে, তবে যাকাত গ্রহণ করতে পারে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির যিম্মায় ঋণ আছে, যা সে উত্তম পথে ব্যয় করেছে। এখন ঋণ শোধ করার কোন উপায় নেই। এরূপ ব্যক্তি নিশ্চিতরূপেই যাকাতের হকদার । তাকে সদকা ও যাকাতের মধ্যে এখতিয়ার দেয়া হলে সে চিন্তা করবে– যদি আমি এই সদকা গ্রহণ না করি, তবে মালিক সদকা করবে না। এমতাবস্থায় সে সদকাই গ্রহণ করবে। আর যদি যাকাত নিলে মিসকীনদের কোন অসুবিধা না হয়, তবে সদকা ও যাকাত প্রত্যেকটি গ্রহণ করবে। এতদসত্ত্বেও নফসকে হেয় করার ব্যাপারে যাকাত গ্রহণের প্রভাব সম্ভবতঃ অনেক বেশী ।
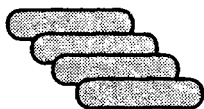
ষষ্ঠ অধ্যায়

রোযার তাৎপর্য

প্রকাশ থাকে যে, রোযা ঈমানের এক-চতুর্থাংশ । কারণ, এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ الصوم نصف الصبر (রোযা সবরের অর্ধেক) এবং অন্য এক হাদীসে বলেন ঃ الصبر نصف الايمان (সবর ঈমানের অর্ধেক)। এ থেকে জানা গেল, রোযা ঈমানের অর্ধেকের অর্ধেক অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ। রোযা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধায় ইসলামের সকল রোকনের মধ্যে এটা সেরা রোকন। সেমতে আল্লাহ তাআলার উক্তি রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেছেন। উক্তিটি এই ঃ সকল সৎ কাজের সওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত হবে; কিন্তু রোযা একান্তভাবে আমার জন্যে বিধায় আমিই এর প্রতিদান দেব। আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করা হবে।

রোযা সবরের অর্ধেক। তাই এর সওয়াব হিসাব-কিতাবের আওতা বহির্ভূত হবে। শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্যে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এ উক্তিই যথেষ্ট, তিনি এরশাদ করেন ঃ

والذى نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل يذر شهوته وطعامه وشرابه لاجلى فالصوم لى وانا اجزى به .

আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ– নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মেশকের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ বলেন, রোযাদার তার কামনা-বাসনা ও পানাহার একমাত্র আমার জন্যে পরিত্যাগ করে। অতএব রোযা আমার জন্যে এবং আমিই এর প্রতিদান

দেব। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরও বলেন ঃ

للجنة باب يقال له الريان لايدخله الا الصائمون وهو موعود بلقاء الله تعالى هى جزاء صومه ـ

জান্নাতের একটি দ্বারকে বলা হয় 'বাবুর রাইয়ান'। এতে রোযাদারগণ ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। রোযাদারকে তার রোযার বিনিময়ে আল্লাহর দীদারের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আরও বলা হয়েছে ঃ

للصائم فرحتان فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء ربه ـ

রোযাদারের দুটি আনন্দ। এক আনন্দ ইফতারের সময় এবং এক আনন্দ তার পালনকর্তার দীদার লাভ করার সময়।

এক হাদীসে আছে– প্রত্যেক বস্তুর একটি দরজা আছে। এবাদতের দরজা হল রোযা। আরও বলা হয়েছে ঃ রোযাদারের নিদ্রা এবাদত। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন রমযান মাস শুরু হয়, তখন জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। শয়তানকে শিকল পরানো হয়। জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করে– যারা কল্যাণ কামনা কর, তারা এগিয়ে আস এবং যারা অনিষ্ট কামনা কর তারা সরে যাও। কোরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে– তোমরা অতীত দিনগুলোতে যা পাঠিয়েছ, তার বিনিময়ে আজ জান্নাতে স্বচ্ছন্দে পানাহার কর। এর তফসীর প্রসঙ্গে ওকী বলেন, এখানে অতীত দিন বলে রোযার দিন বুঝানো হয়েছে। কেননা, রোযার দিনে তারা পানাহার ত্যাগ করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সংসার ত্যাগ ও রোযাকে গর্বের বিষয়সমূহের মধ্যে এক কাতারে রেখেছেন। সংসার ত্যাগ সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা যুবক এবাদতকারীকে নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন, হে আমার জন্যে আপন বাসনা বর্জনকারী যুবক, হে আমার সন্তুষ্টিতে যৌবন অতিবাহিতকারী যুবক! তুমি আমার কাছে ফেরেশতার মতই। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোযাদার সম্পর্কে বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উদ্দেশে বলেন, ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাকে দেখ, সে আমার কারণে তার কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করেছে।

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ -

অর্থাৎ, কেউ জানে না তাদের আমলের প্রতিদানস্বরূপ তাদের জন্যে কি লুক্কায়িত রয়েছে, যা তাদের চক্ষুকে শীতল করবে।

কোরআনের এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কোন কোন তফসীরকার বলেন, এখানে আমল বলে রোযা বুঝানো হয়েছে। কেননা, সবরকরীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

অর্থাৎ, সবরকারীকে বেহিসাব পুরস্কার দেয়া হবে।

এ থেকে জানা যায়, সবরকারীর জন্যে অগণিত সওয়াবের স্তূপ সাজানো হবে, যা অনুমানও করা যায় না। এরূপ হওয়াই সমীচীন। কেননা, রোযা আল্লাহ তাআলার জন্যে এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে গৌরবোজ্জ্বল। সকল এবাদতই আল্লাহর জন্যে। তবুও রোযা কাবা গৃহের ন্যায় প্রাধান্য রাখে, যদিও সমস্ত ভূপৃষ্ঠই আল্লাহর। রোযার এই প্রাধান্য দুটি কারণে– (১) রোযা রাখার অর্থ কয়েকটি বিষয় থেকে বিরত থাকা এবং কয়েকটি বিষয় বর্জন করা। এটি আভ্যন্তরীণ কাজ। এতে এমন কোন আমল নেই, যা চোখে দেখা যায়। অন্যান্য এবাদত মানুষের দৃষ্টিতে থাকে। কিন্তু রোযা আল্লাহ ব্যতীত কেউ দেখে না। (২) রোযা আল্লাহ তাআলার শত্রুর উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং প্রবল হয়। কেননা, কামনা-বাসনা হচ্ছে শয়তানের ওসিলা বা হাতিয়ার, যা পানাহারের মাধ্যমে শক্তিশালী হয় । এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ শয়তান মানুষের ধমনী (রক্ত চলার পথে) বিচরণ করে। সুতরাং ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বারা তার পথসমূহ সংকীর্ণ করে দাও। এদিকে লক্ষ্য করে রসূলে পাক (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন ঃ সর্বদা জন্নাতের দরজা খট্খটাও। আরজ করা হল ঃ কিসের মাধ্যমে? তিনি বললেন ঃ ক্ষুধার মাধ্যমে। যেহেতু রোযা বিশেষভাবে শয়তানের মূলোৎপাটন করে, তার চলার পথ রুদ্ধ এবং সংকীর্ণ করে, তাই রোযা বিশেষভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার যোগ্য হয়েছে। কেননা, শয়তানের মূলোৎপাটনে আল্লাহ সাহায্য করেন। বান্দাকে সাহায্য করা নির্ভর করে বান্দার পক্ষ

থেকে আল্লাহকে সাহায্য করার উপর। সে মতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ـ

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় রাখবেন।

মোট কথা, চেষ্টা শুরু করা বান্দার পক্ষ থেকে এবং বিনিময়ে হেদায়েত তথা সৎপথ প্রদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে। যেমন– আল্লাহ বলেন ঃ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ, যারা আমার পথে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করি। আরও বলেন ঃ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। পরিবর্তনের জন্যে কামনা-বাসনাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা, কামনা বাসনা শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। যে পর্যন্ত এই বিচরণ ক্ষেত্র সবুজ শ্যামল থাকবে, শয়তানের বিচরণ বন্ধ হবে না। বিচরণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর প্রতাপ বান্দার কাছে প্রকাশ পাবে না এবং দীদারের পথে পর্দা পড়ে থাকবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যদি মানুষের অন্তরে শয়তানের যাতায়াত না থাকত, তবে মানুষ ঊর্ধ্বজগত নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হত। এদিক দিয়ে রোযা এবাদতসমূহের দরজা ও ঢাল।

রোযার বাহ্যিক ওয়াজেবসমূহ

(১) রমযান মাসের সূচনা জ্ঞাত হওয়া। এটা চাঁদ দেখা অথবা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে শাবানের ত্রিশ দিন পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে জ্ঞাত হওয়া যায়। চাঁদ দেখার উদ্দেশ্য চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা জানা, যা একজন আদেল ব্যক্তির কথায় হতে পারে। ঈদুল ফেতরের চাঁদ দুজন আদেল ব্যক্তির কথা ছাড়া প্রমাণিত হয় না। যেব্যক্তি একজন আদেল ব্যক্তির কাছে চাঁদ দেখার কথা শুনে এবং বিশ্বাস করে, তার উপর রোযা ওয়াজেব হবে, যদিও সরকারীভাবে রোযা রাখার আদেশ না হয়। যদি এক শহরে চাঁদ দেখা যায় ও অন্য শহরে দেখা না যায় এবং উভয় শহরের মধ্যবর্তী দূরত্ব বেশী হলে প্রত্যেক শহরের বিধান আলাদা হবে। (প্রকাশ

থাকে যে, হানাফী মাযহাবে দেশের এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল শহরের মানুষের উপর রোযা রাখা ওয়াজেব হবে, দূরত্ব বেশী হোক কিংবা কম।)

(২) প্রত্যেক রোযার জন্যে রাত থেকে নির্দিষ্ট করে ও বিশ্বাস সহকারে নিয়ত করা। সুতরাং সমগ্র রমযান মাসের নিয়ত এক দফায় করে নিলে যথেষ্ট হবে না। দিনের বেলায় নিয়ত করলে রমযানের রোযা হবে না; বরং নফল রোযা হবে। (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা চলে।) শুধু রোযার নিয়ত করলে জায়েয হবে না, বরং নির্দিষ্ট করে রমযানের ফরয রোযার নিয়ত করতে হবে। (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শুধু রোযা কিংবা নফল রোযার নিয়ত করলেও রমযানের ফরয রোযাই হবে।) আগামীকাল রমযান হলে রোযা রাখব- এরূপ সন্দেহজনক নিয়ত করা যথেষ্ট নয়। বরং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে নিয়ত করতে হবে। (হানাফী মাযহাবে এটা জরুরী নয়।)

(৩) রোযা স্মরণ থাকা অবস্থায় পেটে কোন কিছু যেতে না দেয়া। সুতরাং রোযা রেখে জেনে-শুনে কিছু খেলে অথবা পান করলে অথবা নাকের ছিদ্র পথে কোন বস্তু পেটে চলে গেলে অথবা পেটে ওষুধ প্রবেশ করালে রোযা ভেঙ্গে যাবে। যে বস্তু ইচ্ছা ব্যতিরেকে পেটে চলে যায়; যেমন পথের ধুলাবালি অথবা মাছি অথবা কুলি করার সময় পানি, তাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। কিন্তু কুলিতে গরগরা করার সময় পেটে পানি চলে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কেননা, এটা রোযাদারের ত্রুটি। রোযার কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

(৪) স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা। যদি রাত্রে সহবাস করে অথবা স্বপ্নদোষ হয় এবং নাপাক অবস্থায় সকাল হয়ে যায়, তবে তাতে রোযা নষ্ট হয় না।

(৫) বীর্যপাত করা থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ, ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাসের মাধ্যমে অথবা সহবাস ছাড়াই বীর্যস্খলন ঘটাবে না। এরূপ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। স্ত্রীকে চুম্বন করলে অথবা কাছে শোয়ালে রোযা নষ্ট হয় না, যে পর্যন্ত বীর্যপাত না হয়, কিন্তু এসব কাজ মাকরূহ।

(৬) বমি করা থেকে বিরত থাকা। ইচ্ছা করে বমি করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনা আপনি হলে রোযা নষ্ট হবে না। গলা থেকে

অথবা বুক থেকে শ্লেষ্মা নির্গত হলে রোযা নষ্ট হবে না। যদি শ্লেষ্মা মুখে পৌঁছার পর তা গিলে ফেলে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

রোযার কাযা ও কাফফারা

কোন ওযরের কারণে অথবা ওযর ছাড়াই রোযা না রাখলে তার কাযা করা ওয়াজেব। রমযানের রোযার কাযা একাদিক্রমে (ফাঁক না দিয়ে) করা ওয়াজেব নয়। সহবাস ব্যতীত অন্য কোন কারণে রোযার কাফফারা ওয়াজেব হয় না। (হানাফী মাযহাবে ওযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার অথবা সহবাস করে রোযা ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজেব হয়।) উদাহরণতঃ পানাহার এবং সহবাস ব্যতীত বীর্যপাত ঘটালে কেবল কাযা ওয়াজেব হবে- কাফফারা নয়। কাফফারা হল একটি গোলাম মুক্ত করা। এটি সম্ভব না হলে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখা। এটাও সম্ভব না হলে ষাট জন মিসকীনকে পেট ভরে খাওয়ানো। যাদের রোযা নিজেদের দোষে নষ্ট হয়ে যায়, তাদের উপর ইমসাক অর্থাৎ দিনের অবশিষ্ট অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজেব। কষ্টের আশংকা না থাকলে সফরে রোযা রাখা এবং কষ্টের আশংকা থাকলে রোযা না রাখা উত্তম। শায়খে ফানী অর্থাৎ যে বৃদ্ধ রোযা রাখার ক্ষমতা রাখে না, সে প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে অর্ধ সা' গম দান করবে।

রোযার সুন্নতসমূহ

রোযার সুন্নত ছয়টি- (১) বিলম্বে সেহরী খাওয়া, (২) খোরমা অথবা পানি দ্বারা মাগরিবের নামাযের পূর্বে ইফতার করা, (৩) দ্বিপ্রহরের পরে মেসওয়াক না করা, (৪) রমযান মাসে দান খয়রাত করা, (৫) কোরআন পড়া ও পড়ানো এবং (৬) মসজিদে এতেকাফ করা; বিশেষতঃ শেষ দশ দিনে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন খুব এবাদত করতেন- নিজেও মেহনত করতেন এবং পরিবারের লোকজনকেও মেহনত করাতেন। কারণ, এই দশ দিনের মধ্যে শবে কদর রয়েছে। এই দশ দিন নিরন্তর এতেকাফ করা উত্তম। এতেকাফের নিয়ত করার পর শরীয়তসম্মত প্রয়োজন ব্যতিরেকে মসজিদ থেকে বের হলে নিরন্তর এতেকাফ হবে না। যেমন, কোন রোগীকে দেখার জন্যে, সাক্ষ্য দেয়ার

জন্যে, জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে এবং যিয়ারত করার জন্যে বের হওয়া। প্রস্রাব পায়খানার জন্যে বের হলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওযু ব্যতীত অন্য কোন কাজে মশগুল হওয়া যাবে না। দেহের কিছু অংশ মসজিদ থেকে বের করলে এতেকাফের নিরন্তরতা ভঙ্গ হবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের মস্তক আয়েশা (রাঃ)-এর কক্ষে বের করে দিতেন এবং তিনি চিরুনি করে দিতেন।

রোযার আভ্যন্তরীণ শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, রোযার তিনটি স্তর আছে– সাধারণের রোযা, বিশেষ ব্যক্তিগণের রোযা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা।

সাধারণের রোযা হচ্ছে, উদর ও লজ্জাস্থানকে কামোদ্দীপনা পূর্ণ করা থেকে বিরত রাখা; যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত-পা এবং সমস্ত অঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখা এবং বিশিষ্টতম ব্যক্তিবর্গের রোযা হচ্ছে, অন্তরকে দুঃসাহস, পার্থিব চিন্তা এবং আল্লাহ ব্যতীত সকল বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখা। এই প্রকার রোযা আল্লাহ তাআলা ও আখেরাত ছাড়া অন্য বস্তুর চিন্তা এবং সাংসারিক চিন্তার কারণে নষ্ট হয়ে যায়। হাঁ, ধর্ম পালনের জন্যে যতটুকু পার্থিব চিন্তা জরুরী, ততটুকুর চিন্তা রোযা নষ্ট করে না। কেননা, এটা আখেরাতের পাথেয়– দুনিয়ার নয়। এমনকি, বুযুর্গগণ বলেন ঃ যেব্যক্তি দিনের বেলায় এ চিন্তায় ব্যাপৃত হয় যে, ইফতারীর ব্যবস্থা করে নেয়া দরকার, তাকে ভ্রান্ত বলা হবে। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা কম করে এবং তাঁর প্রতিশ্রুত রিযিকে বিশ্বাস কম রাখে। এটা নবী, সিদ্দীক ও নৈকট্যশীলগণের স্তর। আমরা এ স্তরের অধিক বর্ণনা দিতে চাই না। এই রোযা তখন অর্জিত হয়, যখন মানুষ সমস্ত সাহসিকতা সহকারে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করে, অন্য সবকিছুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু তার উপর আচ্ছন্ন হয়ে যায়–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِىْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ـ

বল, আল্লাহ, অতঃপর তাদেরকে তাদের ছিদ্রান্বেষা নিয়ে খেলা করতে দাও।

বিশিষ্ট অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রোযা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ছয়টি বিষয় দ্বারা এই রোযা পূর্ণতা লাভ করে।

(১) দৃষ্টি নত রাখা, মন্দ বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয় এমন বিষয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মন্দ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা শয়তানের একটি বিষ মিশ্রিত তীর। আল্লাহ তাআলার ভয়ে যে এটা বর্জন করে, আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করে। হযরত জাবের (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ঃ

خمس يفطرن الصائم الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظرة شهوة ـ

পাঁচটি বিষয় রোযাদারের রোযা নষ্ট করে দেয়– মিথ্যা বলা, কুটনামি করা, পশ্চাদনিন্দা করা, মিথ্যা কসম খাওয়া এবং কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা।

(২) অনর্থক কথাবার্তা, মিথ্যা, পরনিন্দা, অশ্লীলতা, জুলুম, কলহ বিবাদ ইত্যাদি গর্হিত কর্ম থেকে রসনা সংযত রাখা, সাধ্যমত নিরবতা পালন করা এবং যিকির ও তেলাওয়াতে ব্যাপৃত থাকা এটা জিহ্বার রোযা। সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ পরনিন্দা রোযা বিনষ্ট করে। হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে– দুটি অভ্যাস রোযা নষ্ট করে– পরনিন্দা ও মিথ্যা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ রোযা ঢাল। তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে, তখন যেন মূর্খোচিত ও অশ্লীল কথা না বলে। কেউ তার সাথে ঝগড়া করলে অথবা গালি দিলে সে যেন বলে দেয়– আমি রোযাদার। এক হাদীসে আছে– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে দু'জন মহিলা রোযা রাখে। রোযার শেষ ভাগে তাদের ক্ষুধা ও পিপাসা তীব্র আকার ধারণ করে এবং তারা মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। তারা রোযা ভঙ্গের অনুমতি নেয়ার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একজনকে প্রেরণ করল। তিনি প্রেরিত লোকের হাতে একটি পেয়ালা দিয়ে বললেন ঃ মহিলাদ্বয়কে বলো, তারা যা খেয়েছে তা যেন এই পেয়ালায় বমি করে

দেয়। একজন মহিলা তাজা রক্ত ও টাটকা মাংস দিয়ে অর্ধেক পেয়ালা ভরে দিল। অপর মহিলাও এসব বস্তু বমি করল। ফলে পেয়ালা কানায় কানায় ভর্তি হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু দ্বারা রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দ্বারা রোযা নষ্ট করেছে। তারা একে অপরের কাছে বসে পরনিন্দায় মেতে উঠেছে। তাদের এই পরনিন্দাই পেয়ালায় গোশতের আকারে দেখা যাচ্ছে।

(৩) কুকথা শ্রবণ থেকে কর্ণকে বিরত রাখা। কেননা, যেসব কথা বলা হারাম সেগুলো শ্রবণ করাও হারাম। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারীদের পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ـ

অর্থাৎ, তারা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম ভক্ষণকারী।

আরও বলা হয়েছে–

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ـ

তাদের দরবেশ ও আলেমগণ তাদেরকে গোনাহের কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না কেন?

সুতরাং পরনিন্দা শুনে চুপ থাকা হারাম। আল্লাহ বলেন اِنَّكُمْ اِذًا مِّثْلُهُمْ (তখন তোমরাও তাদের মত।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ المغتاب والمستمع شريكان فى الاثم ـ (গীবতকারী ও শ্রবণকারী উভয়েই গোনাহে শরীক।)

(৪) হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খারাপ বিষয় থেকে এবং ইফতারের সময় পেটকে সন্দেহযুক্ত খাদ্য থেকে বিরত রাখা। কেননা, যদি কেউ সারাদিন হালাল থেকে বিরত থাকে এবং হারাম দ্বারা ইফতার করে, তবে তার রোযা কিছুই হয় না। সে সেই ব্যক্তির মত, যে একটি প্রাসাদ তৈরী করে এবং একটি নগরী বিধ্বস্ত করে। কেননা, হালাল খাদ্যের আধিক্যই ক্ষতিকর। এ ক্ষতি হ্রাস করার জন্যে রোযার বিধান।

যেব্যক্তি অনেক ওষুধ সেবনের ক্ষতিকে ভয় করে বিষ পান করে, সে নির্বোধ। হারাম খাদ্য বিষতুল্য, যা ধর্ম বরবাদ করে এবং হালাল খাদ্য ওষুধস্বরূপ, যা কম খাওয়া উপকারী এবং বেশী খাওয়া ক্ষতিকর। রোযার উদ্দেশ্য হালালের ক্ষতি হ্রাস করা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন–

অনেক রোযাদারের রোযায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। কেউ বলেন, যে হারাম দ্বারা ইফতার করে, হাদীসে তাকেই বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে সে ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে হালাল খাদ্য থেকে বিরত থাকে এবং মানুষের গোশত অর্থাৎ গীবত দ্বারা ইফতার করে, যা হারাম। আবার কেউ কেউ বলেন, যেব্যক্তি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে না, হাদীসে তাকে বুঝানো হয়েছে।

(৫) ইফতারে হালাল খাদ্য এত বেশী খেতে নেই যাতে পেট স্ফীত হয়ে যায়। কেননা, আল্লাহ তাআলার কাছে হালাল খাদ্য দ্বারা পরিপূর্ণ পেটের চেয়ে অধিক মন্দ পাত্র আর একটিও নেই। এছাড়া সারা দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার ক্ষতি ইফতারের সময় পূরণ করে নেয়া হলে মানুষ রোযা দ্বারা শয়তানকে কিরূপে দাবিয়ে রাখবে এবং কামভাবকে কিরূপে চূর্ণ করবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোযার মধ্যে নানা প্রকারের খাদ্যের আয়োজন হয়ে থাকে। সেমতে মানুষের অভ্যাস এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা রমযান মাসের জন্যে সব খাদ্য গুছিয়ে রাখে এবং রমযানে এত বেশী খায়, যা অন্য সময় কয়েক মাসেও খায় না। বলাবাহুল্য, রোযার উদ্দেশ্য পেট খালি রাখা এবং কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করা, যাতে তাকওয়া শক্তিশালী হয়। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উদরকে অভুক্ত রাখার পর যখন খাদ্যস্পৃহা অনেক বেড়ে যায়, তখন পেট পুরে ও তৃপ্তি সহকারে সুস্বাদু খাদ্য খেলে নফসের আনন্দ শক্তি আরও দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এমন সব কুবাসনা জাগ্রত হয়, যা রমযান মাস না হলে হয় তো জাগ্রত হত না। মোট কথা, যেসব শক্তি মানুষকে মন্দ কাজের দিকে টেনে নেয়ার ওসিলা এবং শয়তানের হাতিয়ার, সেগুলোকে দুর্বল করা রোযার উদ্দেশ্য। এটা অল্প ভক্ষণ ছাড়া অর্জিত হয় না। অর্থাৎ, রোযার রাতে এতটুকু খাবে, যতটুকু রোযা ছাড়া প্রত্যেক রাতে খাওয়ার অভ্যাস ছিল। রোযা রেখে দ্বিপ্রহর ও রাত্রির খাদ্য এক সাথে খেয়ে ফেললে সেই রোযা দ্বারা কোন উপকার হবে না। ক্ষুধা, পিপাসা ও দৈহিক দুর্বলতা উপলব্ধি করার কারণে

দিনের বেলায় বেশী নিদ্রা না যাওয়া মোস্তাহাব। রাতেও কিছু দুর্বলতা থাকা ভাল, যাতে তাহাজ্জুদ ও ওজিফা সহজসাধ্য হয়। এতে শয়তান মনের আশেপাশে ভিড়তে পারবে না। ফলে মানুষের দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বজগত উদ্ভাসিত হয়ে গেলে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। শবে কদর সেই রাত্রকেই বলে, যাতে ঊর্ধ্বজগতের কিছু মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। যেব্যক্তি অন্তর ও বুকের মধ্যে খাদ্যের আড়াল সৃষ্টি করে, সে ঊর্ধ্ব জগতের অন্তরালে থেকে যায়।

(৬) ইফতারের পর মনে একাধারে আশা ও ভয় এবং সন্দেহ থাকা। কেননা, একথা কারও জানা নেই যে, রোযাদারের রোযা কবুল হয়েছে কিনা এবং সে নৈকট্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিনা। প্রত্যেক এবাদত শেষে এমনি ধরনের অবস্থা থাকা ভাল। বর্ণিত আছে, হযরত হাসান বসরী ঈদের দিন একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যারা তখন হাস্যরত ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা রমযান মাসকে দৌড়ের মাঠ করেছেন, যাতে সকল মানুষ তার আনুগত্যের জন্যে মাঠে দৌড় দেয়। কিছু লোক তো অগ্রসর হয়ে মনযিলে মকছুদে পৌঁছে গেছে। আর কিছু লোক পেছনে থেকে নিরাশ হয়েছে। যেদিন অগ্রগামীরা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে এবং বাতিলপন্থীরা বঞ্চিত রয়েছে, সেদিন যারা হাসি-তামাশা করে, তাদের প্রতি বিস্ময় লাগে। আল্লাহর কসম, প্রকৃত পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলা হলে মকবুল ব্যক্তিরা আনন্দের আতিশয্যে ক্রীড়া-কৌতুক বর্জন করবে এবং প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিরা দুঃখের আতিশয্যে হাস্য, রসিকতা থেকে বিরত থাকবে। আহনাফ ইবনে কায়স (রাঃ)-কে কেউ বলল ঃ আপনি বুড়ো মানুষ। রোযা আপনাকে দুর্বল করে দেয়। এ জন্যে কোন উপায় করা আপনার জন্যে মঙ্গলজনক। তিনি বললেন ঃ আমি একটি দীর্ঘ সফরের জন্যে রোযাকে প্রস্তুত করছি। আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে সবর করা তাঁর আযাবে সবর করার তুলনায় অনেক সহজ। এ পর্যন্ত রোযার ছয়টি আভ্যন্তরীণ বিষয় বর্ণিত হল।

যেব্যক্তি কেবল উদর ও লজ্জাস্থানের কামনা-বাসনা থেকে বিরত থাকে এবং এগুলো পালন করে না, ফেকাহবিদগণ তাদের রোযা জায়েয বলে থাকেন। এখন যদি প্রশ্ন হয়, ফেকাহবিদগণ যে রোযাকে জায়েয বলেন, আপনি তা অশুদ্ধ বলেন কেন, তবে আমার পক্ষ থেকে এর

জওয়াব হচ্ছে, ফেকাহবিদগণ বাহ্যদর্শী। তাঁরা এমন দলীল দ্বারা বাহ্যিক শর্তাবলী প্রমাণ করেন, যা বাতেনী শর্তাবলীর মধ্যে আমাদের বর্ণিত দলীলের তুলনায় নেহায়েত দুর্বল। বিশেষতঃ পরনিন্দা, কলহ-বিবাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে। বাহ্যদর্শী ফেকাহবিদগণকে এমন বিধান দিতে হয়, যাতে গাফেল ও সংসারাসক্ত ব্যক্তিরাও দাখিল থাকতে পারে। তাই বহ্যিক শর্তাবলী দৃষ্টে অনেক বিষয়কে তাদের শুদ্ধ বলতে হয়। কিন্তু আখেরাতবিদগণের মতে শুদ্ধ হওয়ার অর্থ কবুল হওয়া। আর কবুল হওয়ার মানে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা। তাঁরা বলেন ঃ রোযার উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার একটি গুণ ক্ষুধা পিপাসা থেকে মুক্ত হওয়াকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করা এবং কামনা-বাসনা চূর্ণ করার ব্যাপারে যথাসাধ্য ফেরেশতাগণের অনুসরণ করা। মানুষের মর্তবা চতুষ্পদ জন্তুর মর্তবা থেকে ঊর্ধ্বে; কেননা, মানুষ বিবেকের সাহায্যে তার কামনা-বাসনা চূর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু চেষ্টার মাধ্যমে কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে হয় বলে মানুষের মর্তবা ফেরেশতাগণের নীচে। এ কারণেই মানুষ যখন কামনা-বাসনায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে, তখন সে أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ তথা নিম্নতমদের স্তরে নেমে যায় এবং চতুষ্পদ জন্তুর কাতারে শামিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যখন মানুষ কামনা-বাসনার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়, তখন أَعْلَى عِلِّيِّيْنَ তথা মর্যাদার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে ফেরেশতাগণের স্তরে পৌঁছে যায়। ফেরেশতাগণ আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী। যে লোক তাদের অনুসরণ করে এবং তাদের মত অভ্যাস গড়ে তোলে, সে-ও তাদের মত আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হয়ে যায়। এই নৈকট্য স্থান ও দূরত্বের দিক দিয়ে নয়; বরং গুণাবলীর দিক দিয়ে। মনস্তত্ত্ববিদদের মতে রোযার মূল উদ্দেশ্য যখন এই, তখন দ্বিপ্রহরের খাদ্য দেরী করে সন্ধ্যার খাদ্যের সাথে একেবারে খেয়ে নিলে এবং সারাদিন কামনা বাসনায় নিমজ্জিত থাকলে কি উপকার হবে? এরূপ রোযা দ্বারা উপকার হলে এই হাদীসের অর্থ কি যে, অনেক রোযাদারের রোযা ক্ষুধায় তৃষ্ণা ছাড়া কিছুই অর্জিত হয় না? এ কারণেই জনৈক আলেম বলেন ঃ অনেক রোযাদার রোযাখোর এবং অনেক রোযাখোর রোযাদার হয়ে থাকে। অর্থাৎ, রোযাখোর হয়েও রোযাদার তারা, যারা আপন

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে মুক্ত রেখে পানাহার করে এবং রোযাদার হয়েও রোযাখোর তারা, যারা ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত তো থাকে; কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহ থেকে বিরত রাখে না। রোযার অর্থ ও মূল লক্ষ্য অবগত হওয়ার পর জানা গেল, যেব্যক্তি পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বেঁচে থাকে; কিন্তু গোনাহের কাজ করে রোযা নষ্ট করে দেয়, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে ওযুর অঙ্গ তিন বার মাসেহ করে নেয়। এখানে সে বাহ্যতঃ তিন বার মাসেহ করল; কিন্তু আসল উদ্দেশ্য যে ধৌত করা ছিল, তা ছেড়ে দিল। এরূপ ব্যক্তির নামায অজ্ঞতার কারণে তার মুখের উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। যেব্যক্তি খেয়ে রোযা নষ্ট করে এবং আপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে এক একবার অঙ্গ ধৌত করে। তার নামায ইনশাআল্লাহ মকবুল। কেননা, সে আসল ফরয আদায় করেছে, যদিও ফযীলত বর্জন করেছে। আর যেব্যক্তি পানাহার বর্জন করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও রোযা রাখে অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে, সে সেই ব্যক্তির মত, যে ওযুর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিন বার ধৌত করে। সে আসল ও ফযীলত উভয়টি অর্জন করেছে, যা পূর্ণতার স্তর।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ নিশ্চয় রোযা একটি আমানত। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এই আমানতের হেফাযত করা। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ـ

(আল্লাহ আদেশ করেন, তোমরা আমানত আমানতের মালিকদের কাছে পৌঁছে দাও।) আয়াত পাঠ শেষে তিনি আপন কান ও চোখের উপর হাত রেখে বললেন ঃ কানে শুনা এবং চোখে দেখা আমানত। যদি শুনা ও দেখা রোযার অন্যতম আমানত না হত, তবে তিনি কখনও বলতেন না যে, কেউ বিবাদ করতে চাইলে বলে দেবে– আমি রোযাদার। অর্থাৎ, আমি আমার জিহ্বা আমানত রেখেছি। আমি তার হেফাযত করব। তোমাকে জওয়াব দিয়ে এই হেফাযত কিরূপে নষ্ট করব?

নফল রোযা

প্রকাশ থাকে যে, উত্তম দিনে রোযা রাখা উত্তম হয়ে থাকে। উত্তম দিনসমূহের মধ্যে কতক সম্বৎসরের মধ্যে, কতক প্রত্যেক মাসে এবং কতক প্রতি সপ্তাহে পাওয়া যায়। সম্বৎসরের মধ্যে যেসব দিন পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে আরাফার দিন, আশুরার দিন, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন ও মহররমের দশ দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শা'বান মাসে এত বেশী রোযা রাখতেন যে, মনে হত তাও যেন রমযান মাস। এক হাদীসে আছে– রমযানের রোযার পর উত্তম রোযা হচ্ছে মহররমের রোযা। এর কারণ, মহররম বছরের প্রথম মাস। এ মাসকে সৎ কাজ দ্বারা পরিপূর্ণ করলে সারা বছর এর বরকত আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে– মহররম মাসে একদিন রোযা রাখা অন্য মাসের ত্রিশ রোযার চেয়েও উত্তম। রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা মহররমে ত্রিশ রোযার চেয়ে উত্তম। এক হাদীসে আছে– যেব্যক্তি মহররম মাসে তিন দিন অর্থাৎ বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবারে রোযা রাখে, তার প্রত্যেক রোযার বিনিময়ে সাতশ' বছরের এবাদতের সওয়াব লেখা হয়। এক হাদীসে আছে– শাবানের অর্ধেকের পর রমযান পর্যন্ত কোন রোযা নেই। এ কারণেই রমযানের পূর্বে কিছু দিন রোযা না রাখা উত্তম। শাবানের রোযার সাথে রমযানের রোযা মিলিয়ে দেয়াও জায়েয। কারণ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার এরূপও করেছেন। কোন কোন সাহাবী সম্পূর্ণ রজব মাস রোযা রাখা মাকরূহ বলেছেন, যাতে রমযান মাসের মত না হয়ে যায়। মোট কথা, যিলহজ্জ, মহররম রজব ও শাবান উত্তম মাস। এক হাদীসে আছে, যিলহজ্জের দশ দিনের তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে আমল করলে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় হয়। এর এক দিনের রোযা সারা বছরের রোযার সমান। এর এক রাত্রির জাগরণ শবে কদরে জাগরণের সমান। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ আল্লাহর পথে জেহাদ করাও কি এই দিনের আমলের সমান নয়। তিনি বললেন ঃ জেহাদও সমান নয়, তবে যদি তার ঘোড়া মারা যায় এবং সে নিজে শহীদ হয়।

যেসকল দিন মাসের মধ্যে উত্তম পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছে মাসের শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিনসমূহ। মাসের মধ্যবর্তী দিনগুলোকে আইয়ামে

বীয বলা হয়। এগুলো হচ্ছে চান্দ্রমাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখ। সপ্তাহের উত্তম দিন হচ্ছে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবার। উল্লিখিত উত্তম দিনগুলোতে রোযা রাখা ও বেশী পরিমাণে খয়রাত করা মোস্তাহাব। এসব দিনের বরকতে আমলের সওয়াব অনেক বেড়ে যায়।

সর্বকালের রোযার মধ্যে আরও অতিরিক্ত দিনসহ এ সকল দিনও শামিল। কিন্তু এ ব্যাপারে সাধককুলের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ সর্বকালের রোযা মাকরূহ বলেন। হাদীস থেকে তাই বুঝা যায়। সর্বকালীন রোযার এক প্রকার হচ্ছে দুই ঈদের দিন এবং তাশরীকের দিনগুলোতেও রোযা রাখা। একে সওমে দাহর বলা হয়। এই প্রকার রোযা যে মাকরূহ, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া সর্বকালীন রোযার মধ্যে রোযার বিরতি জনিত সুন্নত, থেকে মুখ ফেরানো হয় এবং রোযাকে নিজের উপর জরুরী করে নেয়া হয়। অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে রোযা না রাখার যে অনুমতি আছে, তা পালন করা আল্লাহ পছন্দ করেন, যেমন ফরয ও ওয়াজেব পালন করা তিনি পছন্দ করেন। এ কারণেও সর্বকালীন রোযা মাকরূহ। যদি সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে উপরোক্ত দুটি অনিষ্টের মধ্য থেকে একটিও না হয় এবং সর্বকালীন রোযা রাখার মধ্যে নফসের কল্যাণ জানা যায়, তবে সর্বকালীন রোযা রাখবে। কেননা, অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী সর্বকালীন রোযা রেখেছেন। হযরত আবু মূসা আশআরী (রঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم هكذا -

অর্থাৎ, যেব্যক্তি দাহরের রোযা রাখে, 'জাহান্নামে তার জন্য কোন স্থান থাকে না।

রোযার আর একটি স্তর হচ্ছে অর্ধ দাহরের রোযা রাখা। অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা। এভাবে সারা জীবন রোযা রাখা। এটা নফসের জন্যে অধিক কঠিন। ফলে নফস খুব দমিত হয়। হাদীসে এ রোযার ফযীলত বর্ণিত আছে। এ রোযায় বান্দা একদিন সবর করে ও একদিন শোকর করে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ আমার সামনে দুনিয়ার ধন-ভান্ডারের চাবি এবং ভূপৃষ্ঠে সমাহিত ধন-সম্পদ পেশ করা হয়েছে। আমি সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে বলেছি ঃ আমি একদিন অভুক্ত থাকব এবং একদিন পেট পুরে আহার করব। যেদিন

পেট পুরে খাব, সেদিন আপনার প্রশংসা করব। আর যেদিন অভুক্ত থাকব, সেদিন আপনার কাছে মিনতি করব। এক হাদীসে আছে–

আমার ভাই দাঊদ (আঃ)-এর রোযা উত্তম রোযা ছিল। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা রাখতেন না।

জীবনের অর্ধেক দিন রোযা রাখা সম্ভব না হলে এক-তৃতীয়াংশ দিন রোযা রাখবে। অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে এবং দুদিন রোযা রাখবে না। মাসের প্রথম তিন দিন, আইয়ামে বীযের তিন দিন এবং শেষ তিন দিন রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশে এবং উত্তম দিনেও রোযা হয়ে যায়। সপ্তাহে সোম, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোযা রাখলে এক-তৃতীয়াংশের কিছু বেশী হয়ে যায়।

যেব্যক্তি অন্তরের সূক্ষ্ম অবস্থা বুঝে এবং আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখে, কোন কোন সময় চায়, সে সর্বকালে রোযা রাখুক এবং কখনও চায়, সর্বকালে রোযা না রাখুক। আবার কখনও চায়, মাঝে মাঝে রোযা রাখুক। এ কারণেই বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও এত রোযা রাখতেন যে, লোকেরা মনে করত তিনি আর কখনও রোযা ছাড়বেন না। কখনও এত বেশী দিন রোযাহীন অবস্থায় অতিবাহিত করতেন যে, মানুষ মনে করত, তিনি আর রোযা রাখবেন না। তিনি রাত্রিকালে এত বেশী নিদ্রা যেতেন, মনে করা হত, তাহাজ্জুদের জন্যে গাত্রোত্থান করবেন না। আবার জাগরণও এত বেশী করতেন যে, বলা হত আর নিদ্রা যাবেন না। কোন কোন আলেম নিরন্তর চার দিনের বেশী রোযাহীন অবস্থায় থাকা মাকরূহ বলেছেন। তাঁদের মতে এটা অন্তরকে কঠোর করে, বদভ্যাস সৃষ্টি করে এবং কামনা বাসনার দ্বার উন্মুক্ত করে। বাস্তবে রোযাহীন অবস্থা অধিকাংশ লোকের মধ্যে এ প্রভাবই সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ যারা দিনে ও রাতে দু'বার আহার করে, তাদের জন্যে এটা খুবই ক্ষতিকর।

সপ্তম অধ্যায়

হজ্জের তাৎপর্য

ইসলামের রোকনসমূহের মধ্যে হজ্জ সারা জীবনের এবাদতের সৌন্দর্য ও আমলের পরিণাম এবং ইসলাম তথা ধর্মের পূর্ণতা। হজ্জ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাযিল করেছেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ـ

অর্থাৎ, অদ্য আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে পছন্দ করলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ

যেব্যক্তি হজ্জ না করে মারা যায়, সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খ্রীস্টান হয়ে মরুক, তাতে কিছু আসে যায় না। সুতরাং এমন এবাদতের মাহাত্ম্য বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না, যা না হলে ধর্ম অপূর্ণ থেকে যায় এবং যার বর্জনকারী ইহুদী ও খ্রীস্টানের সমান হয়ে যায়। সেমতে এই মহান রোকনের ব্যাখ্যা, আরকান, সুনান, মোস্তাহাব ও ফযীলত বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করা আবশ্যক।

হজ্জের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ ـ

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও যে, তারা তোমার কাছে পদব্রজে এবং কৃশকায় উটের পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত থেকে আগমন করবে।

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে হজ্জের ঘোষণা করতে বললেন, তখন তিনি সজোরে বললেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ্ তাআলা একটি গৃহ নির্মাণ করেছেন। তোমরা এর হজ্জ কর। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই কণ্ঠ প্রত্যেক এমন ব্যক্তির কানে পৌছে দিলেন, যাদের সম্পর্কে তিনি কেয়ামত পর্যন্ত জানতেন যে, তারা হজ্জ করবে। আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (তারা যেন তাদের উপকারের স্থানে পৌছে)। কতক তফসীরকারের মতে উপকারের স্থান হচ্ছে হজ্জ মওসুমের ব্যবসা-বাণিজ্য ও আখেরাতের সওয়াব। আল্লাহ তাআলা কোরআন পাকে শয়তানের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–

لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকব।

কতক তফসীরবিদ বলেন, এখানে সরল পথ বলে মক্কা মোয়ায্যমার পথ বুঝানো হয়েছে। শয়তান মানুষকে হজ্জ করতে নিষেধ করার উদ্দেশে এ পথে বসে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

যেব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জ করে, অতঃপর শ্লীলতা হানি না করে ও পাপাচার না করে, সে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের মত গোনাহ্ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন ঃ শয়তানকে আরাফার দিনের চেয়ে বেশী অন্য কোন দিন অধিক লাঞ্ছিত, অধিক বিতাড়িত, অধিক হেয় ও অধিক ক্রুদ্ধ দেখা যায় না। এর কারণ আল্লাহর রহমতের অবতরণ এবং বড় গোনাহসমূহ ক্ষমাকরণ সে স্বচক্ষে দেখতে পায়। কথিত আছে, কতক গোনাহ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান ব্যতীত মাফ হয় না। হযরত ইমাম জাফর (রহঃ) একে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি বলেও সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। জনৈক নৈকট্যশীল কাশফবিশিষ্ট বুযুর্গ বর্ণনা করেন, অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের আকৃতি ধারণ করে একদিন তাঁর কাছে আগমন করে। তিনি তাকে ক্ষীণ দেহ, ফ্যাকাসে বর্ণ, ক্রন্দনরত ও কোমর ভাঙ্গা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর কান্নার কারণ কি? ইবলীস বললঃ হাজীগণ আল্লাহকে উদ্দেশ করেই বেরিয়ে পড়েছে। কোন ব্যবসা বাণিজ্য

তাদের লক্ষ্য নয়। যদি আল্লাহ্ তাদেরকে বঞ্চিত না করেন, তবেই তো আমার সর্বনাশ। এ দুঃখেই আমি কাঁদছি। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর ক্ষীণদেহী হওয়ার কারণ কি? সে বলল ঃ আল্লাহর পথে ঘোড়ার চেঁচামেচি আমাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। ঘোড়াগুলো আমার পথে চেঁচামেচি করলে আমি আনন্দিত হতাম। বুযুর্গ বললেন ঃ তোকে বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে কেন? সে বলল ঃ আল্লাহর আনুগত্যে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা আমাকে বিবর্ণ করে দিয়েছে। তারা গোনাহের কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করলে আমার কাছে পছন্দনীয় কাজ হত। বুযুর্গ জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোর কোমর ভেঙ্গে গেল কেন? ইবলীস বলল ঃ বান্দার এই দোয়ার কারণে যে, ইলাহী, আমি তোমার কাছে শুভ পরিণাম কামনা করি। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জ অথবা ওমরা করার নিয়তে গৃহ থেকে বের হয়, অতঃপর মারা যায়, তার জন্যে হজ্জকারী ও ওমরাকারীর সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আর যেব্যক্তি দুই হেরেম শরীফের যেকোন একটিতে মারা যায়, তাকে হিসাব-নিকাশের জন্যে পেশ না করেই বলা হবে– জান্নাতে প্রবেশ কর।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মকবুল হজ্জ দুনিয়া ও দুনিয়াস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম এবং মকবুল হজ্জের প্রতিদান একমাত্র জান্নাত। আরও বলা হয়েছে, যারা হজ্জ ও ওমরা করে, তারা আল্লাহ তাআলার দূত ও মেহমান। তারা কিছু যাঞ্ছা করলে তিনি তা দান করেন, মাগফেরাত চাইলে মাগফেরাত করেন, দোয়া করলে কবুল করেন এবং সুপারিশ করলে মঞ্জুর করেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

সর্ববৃহৎ গোনাহগার সে ব্যক্তি, যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেও ধারণা করে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেননি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ কা'বা গৃহের উপর প্রত্যহ একশ' বিশটি রহমত নাযিল হয়। ষাটটি তওয়াফকারীদের জন্যে, চল্লিশটি নামায আদায়কারীদের জন্যে এবং বিশটি দর্শকদের জন্যে। এক হাদীসে আছে, বায়তুল্লাহর তওয়াফ বেশী বেশী কর। এটি বড় এবাদত। কেয়ামতের দিন আমলনামায় একে পাবে এবং এর সমান ঈর্ষাযোগ্য আর কোন আমল পাবে না। এ কারণেই হজ্জ ও ওমরা ছাড়া প্রথমেই তওয়াফ করা

মোস্তাহাব। এক হাদীসে আছে, যেব্যক্তি নগ্নপদে ও নগ্ন দেহে সাত চক্কর তওয়াফ করে, সে যেন একটি গোলাম মুক্ত করে। আর যেব্যক্তি সাত চক্কর তওয়াফ বৃষ্টির মধ্যে করে, তার পূর্ববর্তী গোনাহ মাফ করা হয়। কথিত আছে, আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা কোন বান্দার গোনাহ মাফ করলে যেব্যক্তি সেই বান্দার স্থানে পৌঁছে, তারও মাগফেরাত করা হয়। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ বলেন ঃ আরাফার দিন শুক্রবার পড়লে আরাফাতে উপস্থিত সকলকে আল্লাহ তাআলা মাগফেরাত দান করেন। যে শুক্রবারে আরাফা পড়ে, সেই দিনটি দুনিয়ার সকল দিনের চেয়ে উত্তম। এদিনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিদায় হজ্জ করেন এবং তাঁর আরাফাতের ময়দানে থাকা অবস্থায় এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

অর্থাৎ, আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্যে সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্যে মনোনীত করলাম।

আহলে কিতাবের বক্তব্য ছিল– যদি এই আয়াত আমাদের উপর নাযিল হত, তবে যেদিন নাযিল হত, সেদিনকে আমরা ঈদ করে নিতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, এ আয়াতটি দু'ঈদের দিনে নাযিল হয়েছে; অর্থাৎ আরাফা ও শুক্রবার দিনে। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত ছিলেন। এক হাদীসে রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

হে আল্লাহ! হাজীকে ক্ষমা কর এবং হাজী যার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাকেও ক্ষমা কর। বর্ণিত আছে, আলী ইবনে মোয়াফফাক (রহঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি হজ্জ করেন। তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে বলছেন ঃ হে ইবনে মোয়াফফাক, তুমি আমার পক্ষ থেকে হজ্জ করেছ? আমি আরজ করলামঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি আমার পক্ষ থেকে লাব্বায়কা বলেছ? আমি আরজ করলাম ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ এর প্রতিদান আমি তোমাকে কেয়ামতের দিন দেব। মানুষ যখন হিসাব-নিকাশের

কঠোরতা ভোগ করতে থাকবে, তখন আমি হাত ধরে তোমাকে জান্নাতে দাখিল করে দেব। মুজাহিদ ও অন্য আলেমগণ বলেন ঃ হাজীগণ যখন মক্কা মোয়াযযমায় আসে, তখন ফেরেশতারা উষ্ট্রারোহীদেরকে সালাম করে, গাধায় আরোহীদের সাথে করমর্দন করে এবং যারা পায়ে হেঁটে আসে, তাদের সাথে কোলাকুলি করে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি রমযানের পরে মারা যায় অথবা জেহাদের পরে অথবা হজ্জের পরে, সে শহীদ হয়ে মারা যায়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, হাজীদের গোনাহ মাফ করে দেয়া হয়। যিলহজ্জ, মহররম, সফর ও রবিউল আউয়ালের বিশ তারিখ পর্যন্ত তারা যাদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করে তাদেরকেও মাফ করে দেয়া হয়। পূর্ববর্তী মনীষীগণের রীতি ছিল, তাঁরা গাজীদেরকে বিদায় দেয়ার জন্যে সঙ্গে যেতেন এবং হাজীদেরকে আনার জন্যে এগিয়ে যেতেন। তাঁরা তাঁদের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে কপালে চুম্বন করতেন এবং যে পর্যন্ত হাজীরা গোনাহে লিপ্ত না হত, তাঁদের দোয়া চাইতেন।

আলী ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ আমি এক বছর হজ্জে আরাফার রাতে মসজিদে খায়ফে অবস্থান করলাম। স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন ফেরেশতা আকাশ থেকে সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় অবতরণ করলেন। তাদের একজন অপরজনকে 'আবদুল্লাহ' বলে ডাক দিলে অপরজন বলল ঃ লাব্বায়িক। প্রথম ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি কি জান এ বছর কতজন লোক আমাদের পালনকর্তার গৃহের হজ্জ করেছে? দ্বিতীয় জন বলল ঃ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ এবার ছয় লাখ লোক হজ্জ করেছে। এখন তুমি বলতে পার কি তাদের মধ্যে কতজনের হজ্জ কবুল হয়েছে? দ্বিতীয় জন বলল ঃ আমার জানা নেই। প্রথম জন বলল ঃ তাদের মধ্যে মাত্র ছয় জনের হজ্জ কবুল হয়েছে। একথা বলার পর উভয় ফেরেশতা আকাশের দিকে উঠে আমার দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল। আমি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হলাম। এক নিদারুণ দুঃখ আমায় চেপে বসল। আমি নিজের কথা চিন্তা করে মনে মনে বললাম ঃ যখন ছয় জনেরই মাত্র হজ্জ কবুল হয়েছে, তখন আমি তাদের মধ্যে কোথায় থাকব। যখন আমি আরাফা থেকে ফিরে এসে মাশআরে হারামের নিকটে রাত্রি যাপন করলাম, তখন এ চিন্তায়ই বিভোর ছিলাম

যে, এত বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে মাত্র এই কয়েকজনের হজ্জ কবুল হল! চিন্তার মধ্যেই আমি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আবার স্বপ্নে দেখলাম, সেই দুই ফেরেশতা পূর্বেকার আকার আকৃতিতে অবতরণ করল এবং একজন অপরজনকে ডেকে পূর্বের কথাবার্তার পুনরাবৃত্তি করল। অতঃপর একজন বলল ঃ তুমি কি জান অদ্য রাতে আমাদের পরওয়ারদেগার কি আদেশ দিয়েছেন? দ্বিতীয় ফেরেশতা বলল ঃ আমি জানি না। প্রথম জন বলল ঃ আল্লাহ্ তাআলা ছয় জনের প্রত্যেককে এক এক লাখ মানুষ দিয়েছেন, অর্থাৎ এই ছয় জনের সুপারিশ ছয় লাখ মানুষের জন্যে মঞ্জুর হবে। ইবনে মোয়াফফাক্ বলেন ঃ এর পর যখন আমার চক্ষু খুলল, তখন আমার আনন্দ ছিল বর্ণনাতীত।

অন্য এক বর্ণনায় ইবনে মোয়াফফাক বলেন ঃ এক বছর হজ্জে যখন আমি সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলাম, তখন যাদের হজ্জ নামঞ্জুর হয়েছে, তাদের কথা চিন্তা করলাম। সেমতে আমি দোয়া করলাম ইলাহী, আমি আমার হজ্জ ও তার সওয়াব সেই ব্যক্তিকে দান করলাম, যার হজ্জ কবুল হয়নি। ইবনে মোয়াফফাক বলেন, রাতে আমি আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি বলছেন ঃ হে আলী, তুমি আমার সামনে দানশীলতা প্রকাশ করছ! জেনে রাখ, আমি দানশীলতা ও দাতাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সকল দাতার চেয়ে অধিক দাতা ও দানশীল আমিই। সারা জাহানের মানুষের তুলনায় দান করার যোগ্যতা আমার বেশী। আমি যাদের হজ্জ কবুল করিনি, তাদেরকে এমন লোকদের যিম্মায় দিয়েছি যাদের হজ্জ কবুল করেছি।

বায়তুল্লাহ ও মক্কা মোয়ায্যমার ফযীলত

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, প্রতিবছর অনূন্য ছয় লাখ মানুষ এ গৃহের হজ্জ করবে। কম হলে আল্লাহ ফেরেশতা দ্বারা এ সংখ্যা পূর্ণ করে দেবেন। কেয়ামতের দিন বায়তুল্লাহ নববধূর ন্যায় হাশরের ময়দানে উত্থিত হবে। দুনিয়াতে যাঁরা হজ্জ করেছেন বা করবেন তাঁরা এর গেলাফে ঝুলে থাকবেন এবং চারপাশে চলবেন। অবশেষে বায়তুল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাজীরাও সাথে জান্নাতে দাখিল হবে।

এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ হাজারে আসওয়াদ (কাল পাথর)

জান্নাতের ইয়াকূতসমূহের মধ্যে একটি ইয়াকূত। কেয়ামতের দিন এটি দু'চক্ষুবিশিষ্ট হয়ে উত্থিত হবে। তার একটি জিহ্বাও থাকবে, তদ্দ্বারা সে সেই ব্যক্তির জন্যে সাক্ষ্য দেবে, যে তাকে নিষ্ঠা ও সততা সহকারে চুম্বন করে থাকবে। রসূলুল্লাহ্ হাজারে আসওয়াদকে বার বার চুম্বন করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি এর উপর সেজদাও করেছেন। সওয়ারীতে বসে তওয়াফ করলে তিনি আপন ছড়ির অগ্রভাগ পাথরে স্পর্শ করে তাতে চুম্বন করতেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এই পাথরটি চুম্বন করার পর বললেন ঃ আমি জানি, তুমি একটি পাথর বৈ আর কিছু নও। কারও ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা তোমার নেই। যদি আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুম্বন করতাম না। অতঃপর তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করলেন। এর পর পেছন ফিরে হযরত আলী (রাঃ)-কে দেখতে পেয়ে বললেন ঃ আবুল হাসান, এটা অশ্রুপাত করার স্থান। এখানে দোয়া কবুল হয়। হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, এই পাথর ক্ষতি ও উপকার করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে? হযরত আলী বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা যখন আদম সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেন, তখন একটি লিপি লেখে এই পাথরকে খাইয়ে দেন। সুতরাং এই পাথর ঈমানদারের জন্যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং কাফেরদের জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাক্ষ্য দেবে। কথিত আছে, এই পাথর চুম্বন করার সময় এই দোয়া পাঠ করা হয় ঃ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এ কাজ করছি তোমার প্রতি ঈমানের কারণে, তোমার কিতাব সত্যায়ন করা ও তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার জন্যে। এতে সেই অঙ্গীকারই বুঝানো হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে– মক্কা মোয়াযযমায় একদিন রোযা রাখা এক লাখ রোযার সমান। এক দেরহাম খয়রাত করা এক লাখ দেরহাম খয়রাত করার সমান। এমনিভাবে প্রত্যেক পুণ্য কাজ এক লাখ পুণ্য কাজের সমান। কথিত আছে– সাত চক্করের একটি তওয়াফ এক ওমরার সমান এবং তিনটি ওমরা এক হজ্জের সমান। এক হাদীসে আছে–

عمرة فى رمضان كحجة معى ـ

রমযানে একটি ওমরা করা আমার সাথে এক হজ্জ করার সমান। আর এক হাদীসে আছে–

মহানবী (সঃ) বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমার কবরের মাটি বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আমি বাকী নামক গোরস্থানে যাব এবং তাদের হাশর আমার সাথে হবে। এর পর আমি মক্কাবাসীদের কাছে যাব এবং আমার হাশর দুই হেরেমের মাঝখানে হবে। এক হাদীসে আছে ঃ হযরত আদম (আঃ) যখন হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁর সাথে সাক্ষাত করে বলল ঃ হে আদম! আপনার হজ্জ কবুল হয়েছে। আমরা এ গৃহের হজ্জ দু'হাজার বছর পূর্বে করেছি। এক রেওয়ায়েতে আছে– আল্লাহ তাআলা প্রতি রাত্রে পৃথিবীবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। সকলের অগ্রে হেরেমের অধিবাসীদেরকে এবং তাদের মধ্যে কা'বা মসজিদের লোকদেরকে দেখেন। এমতাবস্থায় যাকে তওয়াফ করতে দেখেন তাকে ক্ষমা করে দেন, যাকে নামায পড়তে দেখেন তাকে মাগফেরাত দান করেন এবং যাকে কেবলামুখী দন্ডায়মান দেখেন তাকেও মাগফেরাত দান করেন। কথিত আছে– প্রত্যহ যখন সূর্য অস্ত যায় তখন বায়তুল্লাহর তওয়াফ একজন আবদাল অবশ্যই করেন এবং প্রত্যেক রাত্রির প্রভাতে একজন আওতাদ ব্যক্তি কাবার তওয়াফ করেন। এ তওয়াফ না থাকা পৃথিবী থেকে কাবার উঠে যাওয়ার কারণ হবে এবং মানুষ সকালে গাত্রোত্থান করে দেখবে, কাবার স্থান শূন্য। সেখানে কাবার কোন চিহ্ন নেই। এটা তখন হবে, যখন সাত বছর পর্যন্ত কাবার হজ্জ কেউ করবে না। এরপর কোরআনের অক্ষর মাসহাফ থেকে মুছে যাবে। মানুষ সকালে দেখবে কোরআনের পাতা অক্ষর শূন্য সাদা হয়ে আছে। এর পর মানুষের মন থেকে কোরআন মিটিয়ে ফেলা হবে। ফলে তার একটি শব্দও কারও মনে থাকবে না। এর পর মানুষ কবিতা, রাগ-রাগিনী ও জাহেলিয়াত যুগের কেস্সা-কাহিনীতে মেতে থাকবে। দাজ্জাল বের হবে এবং হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করে তাকে হত্যা করবেন। কেয়ামত তখন এত নিকটবর্তী হবে যেমন, গর্ভ ধারণের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর গর্ভবতীর যে কোন সময় সন্তান প্রসব আশা করা যায়। এক হাদীসে আছে– এ গৃহটি তুলে নেয়ার পূর্বে বেশী পরিমাণে এর তওয়াফ করে নাও। কারণ, দুবার এ গৃহ বিধ্বস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় বার তুলে নেয়া হবে। হযরত আলীর

(রাঃ) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা বলেন– যখন আমি দুনিয়াকে ধ্বংস করতে চাইব, তখন নিজের ঘর থেকে শুরু করব। প্রথমে একে ধ্বংস করে পরে দুনিয়া ধ্বংস করব।

মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান ঃ সাবধানী আলেমগণ তিন কারণে মক্কা মোয়াযযমায় অবস্থান অনুচিত মনে করেন। প্রথমতঃ তাঁরা বেশী দিন অবস্থানের কারণে বিতৃষ্ণভাব এবং তার দৃষ্টিতে মক্কা শরীফের মর্যাদাও অন্যান্য শহরের সমান হয়ে যাওয়ার আশংকা করেন। কেননা, এটা মক্কার প্রতি সম্মানের ক্ষেত্রে অন্তরের উষ্ণতা লাঘবে প্রভাব বিস্তার করে। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) হজ্জ সমাপ্ত করার পর হাজীগণকে তাকিদ দিয়ে বলতেন ঃ ইয়ামনের অধিবাসীরা, তোমরা ইয়ামনে চলে যাও। সিরিয়ার অধিবাসীরা, তোমরা সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং ইরাকীরা ইরাকের পথ ধর। এ জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) অধিক তওয়াফ করতে নিষেধ করার ইচ্ছা করেন। তিনি বলেন ঃ আমার আশংকা হয়, না জানি মানুষ এ গৃহকে নিজের বাড়ী ঘরে পরিণত করে নেয়। ফলে এর যথাযথ সম্মান ক্ষুণ্ন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ দূরে থাকলে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিকটে আসার জন্যে আকুতি সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা কাবা গৃহকে مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا (মানুষের সম্মিলন ও শান্তির স্থল) বলেছেন। যেখানে বার বার আসা হয়, তাকে সম্মিলিত স্থল বলা হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি তুমি অন্য শহরে অবস্থান কর এবং তোমার মন মক্কার প্রতি উৎসুক থাকে, তবে এটা মক্কায় অবস্থান করে মক্কার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ অনেক মানুষ খোরাসানে বসবাস করে; কিন্তু তারা কাবা প্রদক্ষিণকারীদের তুলনায় মক্কার অধিক নিকটবর্তী। কথিত আছে– আল্লাহ তাআলার কিছু নৈকট্যশীল বান্দা এমন রয়েছেন যে, স্বয়ং কাবা গৃহ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে তাদের তওয়াফ করে।

তৃতীয়তঃ মক্কার মাহাত্ম্যের কারণে এখানে গোনাহ করলে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হওয়ার আশংকা অধিক। ওয়াহাব রেওয়ায়েত করেন– আমি এক রাতে হাতীমে কাবায় নামাযরত ছিলাম। হঠাৎ কাবা প্রাচীর ও পর্দার মাঝখান থেকে আমার কানে আওয়াজ এল (কারা বলছে), হে

জিবরাঈল! আমার চার পাশে তওয়াফকারীরা যেসকল বাজে ওযিফা পাঠ করে, তাতে আমার দুঃখ হয়। এই অভিযোগ আমি প্রথমে আল্লাহর কাছে করি, অতঃপর তোমার কাছে করি। যদি তারা এসব বিষয় থেকে বিরত না হয়, তবে আমি এমন এক ঝাঁকুনি দেব যাতে আমার প্রতিটি পাথর সেই পাহাড়ে চলে যাবে, যেখান থেকে এগুলো আনা হয়েছিল। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা ছাড়া এমন কোন শহর নেই, যেখানে কেবল পাপ কাজের ইচ্ছা করলেই তা পাপ হিসাবে লেখা হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ -

যেব্যক্তি এখানে মন্দ অভিপ্রায়বশতঃ বক্র পথে চলার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাব। অর্থাৎ, এ শাস্তি কেবল ইচ্ছা করার উপর বলা হয়েছে। কথিত আছে, মক্কায় যেমন সৎ কাজ দ্বিগুণ হয়, তেমনি অসৎ কাজও দ্বিগুণ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ মক্কায় খাদ্য শস্য কিনে গুদামজাত করা এবং দুর্মূল্যের আশায় অপেক্ষা করা হরম শরীফে খোদাদ্রোহিতা করার শামিল। তিনি আরও বলেন ঃ যদি আমি রুকিয়াতে সত্তরটি গোনাহ করি তবে এটা আমার কাছে মক্কায় এক গোনাহ করার চেয়ে লঘু। রুকিয়া মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি মনযিল। এ ভয়ের কারণেই কোন কোন অবস্থানকারীর অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, তাঁরা হরম শরীফের মাটিতে প্রস্রাব-পায়খানা করতেন না; বরং এ জন্যে হরমের বাইরে চলে যেতেন। কেউ কেউ পূর্ণ এক মাস মক্কায় থেকেও আপন পার্শ্ব মাটিতে রাখেননি। মক্কায় অবস্থান নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে কোন কোন আলেম সেখানকার ঘর ভাড়া নেয়া মাকরূহ বলেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, মক্কায় অবস্থান করা যে মাকরূহ, এর কারণ হচ্ছে সেই পবিত্র স্থানের হক আদায় করতে মানুষের অক্ষমতা। সুতরাং আমরা যখন বলি, মক্কায় অবস্থান না করা উত্তম, তখন এর অর্থ, সেখানে অবস্থান করে গোনাহ করা এবং বিতৃষ্ণ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হতে পারে, এত অধিকাল অবস্থান না করা ভাল। এ অর্থ নয় যে, হক আদায় করার পরেও অবস্থান করা মাকরূহ হবে। এটা কিরূপে হতে পারে? মক্কা তো এমন স্থান যেখানে অবস্থান করার আকাঙ্ক্ষা রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও ব্যক্ত

করেছেন। তিনি যখন মক্কা থেকে মদীনায় গমন করেন, তখন কাবার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আল্লাহর ভূপৃষ্ঠে তুমি শ্রেষ্ঠ। সকল স্থানের তুলনায় তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয়। যদি আমি তোমার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত না হতাম, তবে কখনও তোমাকে ত্যাগ করতাম না। এ ছাড়া কাবা গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবাদত। এমতাবস্থায় এটা কিরূপে সম্ভব যে, এতে অবস্থান না করা অবস্থান করার তুলনায় সর্বাবস্থায় উত্তম হবে?

মদীনা মোনাওয়ারার ফযীলত ঃ মক্কার পরে পৃথিবীর কোন শহর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শহর মদীনা তাইয়েবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানেও আমল দ্বিগুণ হয়। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

আমার এই মসজিদে এক নামায মক্কার মসজিদে হারাম বাদে অন্য সকল মসজিদে এক হাজার নামাযের চেয়েও উত্তম। অনুরূপভাবে মদীনায় প্রত্যেকটি আমল হাজার আমলের সমান। মদীনার পরের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাসের। তাতে এক নামায পাঁচশ' নামাযের সমান। আমলের অবস্থাও তদ্রূপ। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মদীনার মসজিদে এক নামায দশ হাজার নামাযের সমান, বায়তুল মুকাদ্দাসে এক হাজার নামাযের সমান এবং মসজিদে হারামে এক লাখ নামাযের সমান। তিনি আরও বলেন–

যে কেউ মদীনার কঠোরতা সহ্য করবে, আমি কেয়ামতের দিন তার সুপারিশকারী হব। আরও বলা হয়েছে– যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাই করে। কেননা, যে মদীনায় মারা যাবে আমি তার সুপারিশকারী হব।

উপরোক্ত তিনটি স্থান ব্যতীত অন্য সকল স্থান সমান, যুদ্ধের ব্যূহ ছাড়া। শত্রুর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে ব্যূহে অবস্থান করার ফযীলত অনেক। এ জন্যেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

সফর করা যাবে না; কিন্তু তিন মসজিদের দিকে– মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আকসা। কোন কোন আলেম এই হাদীসের ভিত্তিতে পবিত্র স্থান ও কামেল ব্যক্তিবর্গের কবরে যেতে নিষেধ করেছেন। এই দলীল সঠিক বলে আমার মনে হয় না। কেননা, কবর যিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন যিয়ারত কর। উপরোক্ত হাদীস মসজিদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।

মাযারসমূহের বিধান তদ্রূপ নয়। কেননা, তিনটি মসজিদ ছাড়া সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। এমন কোন শহর নেই, যেখানে মসজিদ নেই। তাই সফর করে অন্য মসজিদে যাওয়ার কোন মানে নেই। কিন্তু মাযার সবগুলো এক পর্যায়ভুক্ত নয়। আল্লাহ তাআলার কাছে ওলীগণের মর্তবা যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি তাঁদের মাযার যিয়ারতের বরকতও আলাদা আলাদা। তবে কেউ যদি এমন গ্রামে বাস করে যেখানে মসজিদ নেই, তার জন্যে মসজিদবিশিষ্ট গ্রামের সফর জায়েয। এর পর আমি জানি না হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ইয়াহইয়া (আঃ) প্রমুখ পয়গম্বরের মাযারে যেতে নিষেধ করা হবে কিনা। নিষেধ করা তো একান্তই অসম্ভব। সুতরাং যখন তাঁদের মাযারে যাওয়া জায়েয বলা হবে, তখন ওলী আল্লাহগণের মাযারে যাওয়া নাজায়েয হবে কেন? এ হচ্ছে সফরের কথা। এখন অবস্থানের বিধান শুন। সফরের উদ্দেশ্য এলেম হাসিল করা না হলে মুরীদের জন্যে গৃহে অবস্থান করাই ভাল, যদি তার অবস্থা ঠিক থাকে। আর যদি অবস্থার নিরাপত্তা না থাকে, তবে এমন জায়গা তালাশ করবে, যেখানে কেউ তাকে চেনে না এবং ধর্মের নিরাপত্তা থাকে। যেখানে একনিষ্ঠভাবে এবাদত করা যায়, মুরীদের জন্যে তেমন স্থান সর্বোত্তম। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ শহর সবগুলো আল্লাহর এবং মানুষ সকলেই তাঁর বান্দা। এমতাবস্থায় যেখানে নম্রতা ও সুযোগ সুবিধা দেখবে, সেখানে অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তাআলার শোকর করবে।

আবু নায়ীম বলেন ঃ আমি হযরত সুফিয়ান সওরীকে দেখলাম, তিনি পাথেয় সামগ্রীর থলেটি কাঁধে চাপিয়ে এবং পানির কলসটি হাতে নিয়ে কোথাও চলে যাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আবু আবদুল্লাহ! কোথায় যেতে মনস্থ করেছেন? তিনি বললেন ঃ এমন শহরে চললাম, যেখানে এক দেরহাম দিয়ে আমার এই থলেটি ভরে নিতে পারি। অন্য এক রেওয়ায়েতে তাঁর এই জওয়াব বর্ণিত আছে– আমি এক গ্রামে সুলভ মূল্যের কথা শুনেছি। সেখানে অবস্থান করব। তুমিও যখন কোন শহরে সুলভ মূল্যের কথা শুনবে, তখন সেখানে চলে যেও। এতে তোমার ধর্মও ঠিক থাকবে এবং চিন্তা-ভাবনা কম করতে হবে। তিনি বলতেন ঃ এটা অশুভ যমানা। এতে অখ্যাত ব্যক্তিও নিরাপদ থাকতে পারে না। খ্যাতদের তো কথাই নেই। এখন মানুষ ধর্মকে ফেতনার কবল থেকে বাঁচানোর জন্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে হিজরত করবে। তিনি আরও বলেন ঃ

আল্লাহর কসম, কোন্ শহরে যে থাকব তা বুঝে উঠতে পারি না। লোকেরা বলল ঃ খোরাসানে থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে বিভিন্ন মাযহাব এবং খারাপ মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। লোকেরা বলল ঃ সিরিয়ায় থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেখানে সুখ্যাতি হয়ে যায়। কেউ বলল ঃ ইরাকে থাকুন। তিনি বললেন ঃ সেটা জালেমদের দেশ। বলা হল ঃ মক্কায় বসবাস করুন। তিনি বললেন ঃ মক্কা জ্ঞান ও দেহকে জীর্ণ করে দেয়। একবার জনৈক মুসাফির তাঁকে বলল ঃ আমি নিয়ত করেছি, এখন মক্কায় বসবাস করব। আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি– (১) প্রথম কাতারে নামায পড়ো না, (২) কোন কোরায়শীর সংসর্গ অবলম্বন করো না এবং (৩) সদকা প্রকাশ্যে দিয়ো না। প্রথম কাতারে নামায পড়তে নিষেধ করার কারণ, এতে মানুষ খ্যাত হয়ে যায়। অর্থাৎ, কোন দিন অনুপস্থিত থাকলে তাকে খোঁজ করা হয়। ফলে আসল বানোয়াট হয়ে যায়।

হজ্জের শর্তসমূহ

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ জায়েয হওয়ার শর্ত দুটি– সময় হওয়া ও মুসলমান হওয়া। কাজেই কোন শিশু হজ্জ করলেও তা সঠিক হবে। সে যদি ভালমন্দ বুঝার ক্ষমতা রাখে তবে নিজে এহরাম বাঁধবে। আর যদি ছোট হয় তবে তার পক্ষ থেকে ওলী এহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের ক্রিয়াকর্ম তথা তওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি সব করিয়ে দেবে। হজ্জের সময় শওয়াল মাস থেকে শুরু করে যিলহজ্জের দশম রাত্রি অর্থাৎ কোরবানীর দিনের সোবহে সাদেক পর্যন্ত। সুতরাং যেব্যক্তি এ সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে এহরাম বাঁধবে, তার হজ্জ হবে না– ওমরা হবে। ওমরার সময় সারা বছর।

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি– মুসলমান হওয়া, মুক্ত হওয়া, বালেগ হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া এবং সামর্থ্য থাকা। সুতরাং যদি নাবালেগ শিশু ও গোলাম এহরাম বাঁধে এবং আরাফার দিনে নাবালেগ বালেগ হয়ে যায় ও গোলাম মুক্ত হয়ে যায় কিংবা মুযদালেফায় এরূপ হয় এবং সোবহে সাদেকের পূর্বে আরাফায় চলে যায়, তবে তাদের সেই হজ্জের দ্বারাই ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কেননা, আরাফাতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করাই প্রকৃতপক্ষে হজ্জ। আর এটা বালেগ ও মুক্ত অবস্থায় সম্ভব।

হজ্জের নফল হওয়ার শর্ত বালেগের জন্যে পূর্বে ফরয হজ্জ আদায় করা। কেননা, ফরয হজ্জ সর্বাগ্রে, এর পর আরাফাতে অবস্থান করে থাকলে তার কাযার স্তর, এর পর মান্নতের হজ্জ, এর পর অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করার স্তর এবং সর্বশেষে নফল হজ্জের স্তর। এ ক্রম জরুরী। এর খেলাফ নিয়ত করলেও হজ্জ এই ক্রমানুসারেই হবে। অর্থাৎ, কারও উপর হজ্জ ফরয থাকলে সে যদি মান্নতের নিয়তে অথবা কারও স্থলাভিষিক্ত হয়ে হজ্জের এহরাম বাঁধে, তবে তার নিয়ত ধর্তব্য হবে না এবং তার নিজের ফরয হজ্জ হয়ে যাবে।

হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করার জন্যে সামর্থ্য এই যে, প্রথমতঃ সুস্থ হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ পথিমধ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য সুলভ হওয়া এবং স্থলপথে ও নৌপথে ভয়ভীতি না থাকা। তৃতীয়তঃ যাওয়া এবং দেশে ফিরে আসার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থকড়ি থাকা। এ ছাড়া সে যাদের ভরণপোষণ করে, তাদের খরচপত্রও ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্যে থাকা।

বিকলাঙ্গ ব্যক্তির জন্যে সামর্থ্য হচ্ছে এই পরিমাণ অর্থ থাকা, যা দ্বারা সে নিজের পক্ষ থেকে অন্য একজনকে হজ্জ করতে পাঠাবে, যে প্রথমে নিজের ফরয হজ্জ করবে, অতঃপর পরবর্তী বছর বিকলাঙ্গের পক্ষ থেকে হজ্জ করবে।

যেব্যক্তির সামর্থ্য হয়ে যায়, তার উপর হজ্জ করা ওয়াজেব; কিন্তু বিলম্বে যাওয়াও জায়েয। তবে এতে হজ্জ করতে না পারার আশংকা রয়েছে। জীবনের শেষ পর্যন্ত যদি হজ্জ করে নিতে পারে, তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে। যদি হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জ করার পূর্বে কেউ মারা যায়, তবে সে গোনাহগার হয়ে আল্লাহর সামনে যাবে। সে ওসিয়ত করে না থাকলেও তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে হজ্জ করাতে হবে। ঋণের অবস্থাও তদ্রূপ। ওসিয়ত ছাড়াই তা শোধ করতে হয়। যদি এক বছর কারও সামর্থ্য হয়, কিন্তু সে হজ্জে গেল না, অতঃপর হজ্জ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই তার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেল এবং সে-ও মারা গেল, তবে তাকে হজ্জের জন্যে পাকড়াও করা হবে না। পক্ষান্তরে যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করে মারা যায়, সে গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমি শহরে শহরে এই পরওয়ানা পাঠাতে চাই যে, হজ্জের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ করে না,

তার উপর জিযিয়া কর আরোপ করা হবে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, ইবরাহীম নখয়ী, মুজাহিদ ও তাউস (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন ঃ আমরা যদি জানি, এক ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয ছিল; কিন্তু হজ্জ করার পূর্বেই সে মারা গেছে, তবে আমরা তার জানাযার নামায পড়ব না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ যেব্যক্তি যাকাত না দিয়ে এবং হজ্জ না করে মারা যায়, সে পৃথিবীতে ফিরে আসার আবেদন করে। অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ ـ

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমাকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারি যা আমি পরিত্যাগ করেছি।

এখানে সৎকর্ম বলে হজ্জ বুঝানো হয়েছে। হজ্জের আরকান পাঁচটি। এগুলো ব্যতীত হজ্জ সঠিক হয় না– এহরাম বাঁধা, তওয়াফ করা, তওয়াফের পরে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করা, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা এবং এক উক্তি অনুযায়ী কেশ মুন্ডন করা। ওমরার আরকানও তাই। তবে ওমরার মধ্যে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে হয় না। হজ্জের কতকগুলো ওয়াজেব কর্ম আছে। সেগুলো ছেড়ে দিলে কোরবানীর জন্তু যবেহ করে তার ক্ষতিপূরণ করতে হয়। এরকম ওয়াজেব কর্ম ছয়টি ঃ (১) মীকাত (এহরামের নির্দিষ্ট স্থান) থেকে এহরাম বাঁধা। কেউ এহরাম না বেঁধেই মীকাত অতিক্রম করে গেলে একটি ছাগল যবেহ করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে। (২) কংকর নিক্ষেপ করা। এটা ছেড়ে দিলে সকল রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী করা জরুরী। (৩) আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা। (৪) রাত্রে মুযদালেফায় যাওয়া, (৫) রাত্রে মিনায় অবস্থান করা এবং (৬) বিদায়ী তওয়াফ করা। এ চারটি ছেড়ে দিলে এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী কোরবানী জরুরী এবং এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী জরুরী নয়; বরং মোস্তাহাব।

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ ও ওমরা তিন প্রকারে আদায় করা যায়– (১) এফরাদ। এটা সর্বোত্তম। এর নিয়ম, প্রথমে শুধু হজ্জ করবে। হজ্জ শেষে হরমের বাইরে গিয়ে এহরাম বাঁধবে এবং ওমরা করবে। ওমরার এহরামের জন্যে হরমের বাইরে সর্বোত্তম স্থান জেয়েররানা, এর পর তানয়ীম, এর পর হুদায়বিয়া। যারা এফরাদ করে, তাদের উপর কোন

কোরবানী ওয়াজেব নয়। নফল কোরবানী করতে পারে।

(২) কেরান, অর্থাৎ এহরামে হজ্জ ও ওমরা উভয়টির নিয়ত করবে এবং বলবে ঃ لبيك حجة وعمرة معا (আমি হজ্জ ও ওমরা একসাথে করার জন্যে উপস্থিত)। এরূপ ব্যক্তির জন্যে হজ্জের ক্রিয়াকর্ম করাই যথেষ্ট। এতেই ওমরাও আদায় হয়ে যায়। যেমন গোসল দ্বারা ওযু আদায় হয়ে যায়। কিন্তু যদি তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার দৌড় আরাফাতে অবস্থান করার পূর্বে করে নেয়, তবে দৌড় তো উভয়টির পক্ষ থেকে গণ্য হবে; কিন্তু তওয়াফ হজ্জে গণ্য করা হবে না। কেননা, হজ্জে তওয়াফের জন্যে শর্ত হচ্ছে আরাফাতে অবস্থানের পরে করা। যে কেরান করে, তার উপর একটি ছাগল যবেহ করা ওয়াজেব। তবে মক্কার অধিবাসী হলে ওয়াজেব নয়। কেননা, সে মীকাত ছেড়ে দেয়নি। তার মীকাত মক্কা। (৩) তামাত্তোর নিয়ম– মীকাত থেকে ওমরার এহরাম বাঁধবে। অতঃপর হজ্জের এহরাম বাঁধবে। পাঁচটি বিষয় ছাড়া তামাত্তো হয় না– (১) যে তামাত্তো করবে, তার বাসস্থান ও মসজিদে হারামের মধ্যে শরীয়তসম্মত সফরের দূরত্ব না থাকা, (২) হজ্জের পূর্বে ওমরা করা, (৩) হজ্জের মাসসমূহেই ওমরা করা, (৪) হজ্জের মীকাত পর্যন্ত ফিরে না যাওয়া এবং (৫) তার হজ্জ ও ওমরা এক ব্যক্তির পক্ষ থেকেই হওয়া। তামাত্তোকারীর উপর একটি ছাগল কোরবানী করা ওয়াজেব। ছাগল পাওয়া না গেলে ১০ই যিলহজ্জের পূর্ব পর্যন্ত তিনটি রোযা রাখবে এবং দেশে ফিরে সাতটি রোযা রাখবে। হজ্জের দিনে তিন রোযা না রাখলে দেশে ফিরে নিরন্তর অথবা ফাঁক দিয়ে দশটি রোযা রাখবে। কেরানে ছাগল না পাওয়া গেলেও এভাবে রোযা রাখবে। এই তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম প্রকার হচ্ছে এফরাদ, এর পর তামাত্তো, এর পর কেরান।

হজ্জ ও ওমরায় ছয়টি বিষয় নিষিদ্ধ– (১) কোর্তা, পায়জামা, মোজা ও পাগড়ী পরিধান করা। এমতাবস্থায় লুঙ্গি, চাদর ও সেন্ডেল পরিধান করা উচিত। সেন্ডেল না হলে জুতা পরিধান করবে। লুঙ্গি না হলে পায়জামা পরবে। মাথা আবৃত করা উচিত নয়। কারণ, পুরুষের এহরাম মাথায়। মহিলা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করতে পারে যদি মুখ এমন বস্তু দ্বারা আবৃত না করে, যা মুখমন্ডলে লাগে। কেননা, মহিলার এহরাম মুখমন্ডলে।

(২) সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সুগন্ধি লাগালে এবং কাল পোশাক পরিধান করলে একটি ছাগল কোরবানী করা জরুরী হবে।

(৩) চুল মুন্ডন করা ও কাটা নিষিদ্ধ। এটা করলেও ছাগল কোরবানী করা জরুরী। সুরমা লাগানো এবং চুলে চিরুনি করায় কোন দোষ নেই।

(৪) স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। এটা যবেহ ও মাথা মুন্ডনের পূর্বে করলে হজ্জ বাতিল হয়ে যাবে এবং উট, গরু অথবা সাতটি ছাগল যবেহ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর যদি যবেহ ও মাথা মুন্ডনের পরে করে, তবে কোরবানী ওয়াজেব হবে; কিন্তু হজ্জ বাতিল হবে না।

(৫) স্ত্রীর সাথে এমনভাবে চুম্বন, কোলাকুলি করা এবং তাকে স্পর্শ করা নিষিদ্ধ, যাতে মযি বের হয়ে পড়ে। এতে এক ছাগল কোরবানী করা জরুরী।

(৬) জঙ্গলের শিকার বধ করা নিষিদ্ধ, যার গোশত খাওয়া যায়। এহরাম অবস্থায় শিকার বধ করলে তার উপর এই শিকারের মতই চতুষ্পদ জন্তু দেয়া ওয়াজেব হবে। নদীর শিকার হালাল। এতে কোন দম নেই।

সফর থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত বাহ্যিক কর্মসমূহ

গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় থেকে এহরাম বাঁধা পর্যন্ত আটটি বিষয় সুন্নত ঃ

(১) সফরের ইচ্ছা করার সময় প্রথমে তওবা করবে। যাদের হক বলপূর্বক আত্মসাত করে থাকবে, তাদেরকে তা ফেরত দেবে। ঋণ থাকলে তা শোধ করবে। যাদের ভরণ-পোষণ তার যিম্মায়, ফিরে আসা পর্যন্ত তা তাদেরকে দেবে। কারও আমানত থাকলে তা তাকে সমর্পণ করবে। যাতায়াতের খরচের জন্যে পর্যাপ্ত হালাল ও পবিত্র টাকা-পয়সা সাথে নেবে, যাতে সংকটে পড়তে না হয় এবং সামর্থ্যানুযায়ী ফকীর-মিসকীনের প্রতিও দয়া দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতে পারে। রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কিছু খয়রাত করবে। এটা অর্থ সম্পর্কিত সুন্নত।

(২) একজন সৎ, হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধুভাবাপন্ন সফরসঙ্গী তালাশ করবে, যাতে সে পথের বিপদাপদে বল ভরসা দিতে পারে। অতঃপর বন্ধুবান্ধব, ভাই-বেরাদর ও প্রতিবেশীদের কাছ থেকে যথারীতি বিদায়

নেবে এবং তাদের কাছে দোয়া প্রার্থনা করবে। বিদায়ের সময় এই দোয়া পড়বে– أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ আমি তোমার ধর্ম, তোমার আমানত ও তোমার কর্মের পরিণতি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। অর্থাৎ তোমার পরিণতি শুভ হোক। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসাফিরের জন্যে এই দোয়া করতেন ঃ

فِىْ حِفْظِ اللّٰهِ وَكُنْفِهِ وَزَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَجَنَّبَكَ الرَّدِيّ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَوَجَّهَكَ لِلْخَيْرِ اَيْنَمَا تَوَجَّهْتَ ـ

অর্থাৎ আল্লাহর হেফাযতে ও আশ্রয়ে সমর্পণ করি। আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়ার পাথেয় দিন, তোমাকে ধ্বংস থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, তোমার গোনাহ্ ক্ষমা করুন এবং যেদিকে তুমি যাও সেদিকেই তোমাকে মঙ্গলের সম্মুখীন করুন। এটা সফরসঙ্গী সম্পর্কিত সুন্নত।

(৩) গৃহ থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করার সময় প্রথমে দু'রাকআত নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে আলহামদুর পরে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা এখলাস পড়বে। সালামের পর হাত তুলে পূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা সহকারে দোয়া করবে– ইলাহী, তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী। তুমিই আমাদের গৃহ, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নায়েব ও রক্ষক। আমাদেরকে ও তাদেরকে সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা করো। ইলাহী, এ সফরে আমরা তোমার কাছে পরহেযগারী প্রার্থনা করি। আমরা যেন এমন কর্ম করি, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। ইলাহী, তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদেরকে সফরের দূরত্ব অতিক্রম করিয়ে দাও, সফর আমাদের জন্যে সহজ কর। সফরে আমাদের দেহের, ধন-সম্পদের ও ধর্মের নিরাপত্তা দান কর এবং তোমার গৃহের, তোমার নবী (সাঃ)-এর কবরের যিয়ারত পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাও। ইলাহী, আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট থেকে, দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসা থেকে এবং পরিবারের লোকজন, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে দুর্দশাগ্রস্ত দেখা থেকে। ইলাহী, আমাদেরকে ও তাদেরকে আপন হেফাযতে গ্রহণ কর, আমাদের থেকে ও তাদের থেকে আপন নেয়ামত ছিনিয়ে নিও না এবং আমাদেরকে ও তাদেরকে যে আরাম দিয়ে রেখেছ, তা পরিবর্তন করো না। এটা গৃহ থেকে বের হওয়া সম্পর্কিত সুন্নত।

Contents

(৪) গৃহের দরজায় পৌঁছে এই দোয়া করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ يُضَلَّ اَوْ اَذِلَّ اَوْيُذَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ يُزَلَّ اَوْ اَظْلَمَ اَوْ يُظْلِمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ـ

আল্লাহর নামে শুরু করছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। গোনাহ থেকে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি নেই আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। পরওয়ারদেগার, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা থেকে অথবা আমার লাঞ্ছিত হওয়া থেকে অথবা আমাকে পদস্খলিত করা থেকে অথবা আমার জুলুম করা থেকে অথবা আমার প্রতি জুলুম করা থেকে। আরও বলবে– ইলাহী, আমি অহংকারবশে, আস্ফালনবশে ও সুখ্যাতির জন্যে বের হইনি; বরং তোমার ক্রোধের ভয়ে, তোমার সন্তুষ্টির জন্যে তোমার ফরয আদায় করার জন্যে, তোমার নবীর সুন্নত পালন করার জন্যে এবং তোমার দীদারের আগ্রহে বের হয়েছি।

পথ চলার সময় নিম্নরূপ দোয়া পড়বে–

হে আল্লাহ, তোমার সাহায্যে আমি চলেছি, তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমাকেই আঁকড়ে ধরেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি। হে আল্লাহ! তুমিই আমার ভরসা, তুমিই আমার আশা। অতএব আমাকে বাঁচাও সেই বিষয় থেকে, যা আমার সামনে আসে, যার ব্যবস্থা আমি করতে পারি না এবং যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। তোমার প্রশংসা মহান। তুমি ছাড়া মাবুদ নেই। হে আল্লাহ, আমাকে তাকওয়ার পাথেয় দাও, আমার গোনাহ্ মাফ কর এবং আমি যেখানেই যাই মঙ্গলকে আমার সাথী কর।

(৫) যানবাহনে সওয়ার হওয়ার সময় নিম্নরূপ দোয়া পাঠ করা সুন্নত–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ

وَمَا لَمْ يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ . اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ كُلَّهُ اِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِىْ جَمِيْعِ اُمُوْرِىْ عَلَيْكَ اَنْتَ حَسْبِىْ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ .

আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি। কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই; কিন্তু সুউচ্চ ও মহান আল্লাহ্‌র সাহায্য ছাড়া। আল্লাহ যা চেয়েছেন তা হয়েছে এবং তিনি যা চাননি তা হয়নি। পবিত্র তিনি, যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা তা বশ করতে পারতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের পালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে মুখ করেছি, আমার সকল বিষয় তোমাকে সমর্পণ করেছি এবং সকল বিষয়ে তোমার উপর ভরসা করেছি। তুমি আমার জন্যে যথেষ্ট ও চমৎকার কার্যনির্বাহী।

সওয়ারীর উপর সুস্থিরে বসা ও সওয়ারী নিয়ন্ত্রণে আসার পর সাত বার বলবে—

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ .

আল্লাহ পবিত্র! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ্ মহান। আরও বলবে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَآ اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَامِلُ عَلَى الظَّهْرِ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْاُمُوْرِ .

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ পথ পদর্শন না করলে আমরা পথ পেতাম না। হে আল্লাহ, তুমিই সওয়ারীর পিঠে বহন করিয়েছ। সকল বিষয়ে তোমার কাছেই সাহায্য চাওয়া হয়।

(৬) সওয়ারী থেকে অবতরণের ক্ষেত্রে সুন্নত এই যে, রৌদ্র প্রখর না হওয়া পর্যন্ত অবতরণ করবে না। রাতের বেলায় অনেক পথ অতিক্রম করে নেবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ শেষ রাতে চল। রাতে এত পথ চলা যায়, যা দিনে যায় না। রাতে কম ঘুমানো উচিত, যাতে রাতের বেলায় পথ চলতে সহায়ক হয়। মনযিল দৃষ্টিগোচর হলে বলবে–

হে আল্লাহ্! পালনকর্তা সপ্ত আকাশের এবং সেসব বস্তুর, যাদের উপর সপ্ত আকাশ ছায়াপাত করে এবং পালনকর্তা সপ্ত পৃথিবীর এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে শয়তানরা পথভ্রষ্ট করেছে এবং পালনকর্তা শয়তানের এবং তাদের যাদেরকে বাতাস উড়িয়ে নেয় এবং পালনকর্তা সমুদ্রের এবং সেসব বস্তুর, যাদেরকে সমুদ্র বয়ে নিয়ে যায়– আমি তোমার কাছেএই মনযিলের কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং এর অধিবাসীদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তোমার কাছে এই মনযিলের অকল্যাণ থেকে এবং এতে যা আছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। তাদের দুষ্টদের অনিষ্ট আমা থেকে হটিয়ে দাও। মনযিলে অবতরণ করে দু'রাকআত নামায পড়বে। এর পর বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ـ

হে আল্লাহ্! আমি আল্লাহর পূর্ণ কলেমা দ্বারা– যেগুলোকে কোন সৎ ও অসৎ অতিক্রম করতে পারে না– সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। যখন রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে, তখন বলবে ঃ

হে পৃথিবী! আমার ও তোমার রব আল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে তোমার ও তোমার মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার উপর যা বিচরণ করে, তা থেকে। আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে প্রত্যেক সিংহ, অজগর, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে এবং শহরবাসী, পিতা ও সন্তান এবং যারা রাতে ও দিনে বসবাস করে, তার অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৭) পথ চলার সময় সাবধানে চলবে এবং দিনের বেলায় কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে চলবে না। কারণ, এতে কোন তস্করের হাতে মারা যাওয়া অথবা পথ ভুলে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় হুশিয়ার থাকবে। রাতের শুরুতে নিদ্রা গেলে হাত প্রসারিত করবে না। শেষ রাতে নিদ্রা গেলে হাত কিছু উঠিয়ে রাখবে এবং হাতের তালুতে মাথা রেখে নিদ্রা যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরে এমনিভাবে নিদ্রা যেতেন। কেননা, অন্যভাবে নিদ্রা গেলে নিদ্রা গভীর হয়ে যেতে পারে। রাতের বেলায় দু'জন সঙ্গী পালাক্রমে জাগ্রত থেকে একে অপরের পাহারা দেয়া মোস্তাহাব। রাতে অথবা দিনে শত্রু কিংবা হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আয়াতুল কুরসী, شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ সূরা এখলাস এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে নেবে। সর্বশেষে এই দোয়া পাঠ করবে–

بِسْمِ اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ حَسْبِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَايَاتِي بِالْخَيْرَاتِ اِلَّا اللّٰهُ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَايَصْرِفُ السُّوْءَ اِلَّا اللّٰهُ حَسْبِيْ وَكَفٰى سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مُنْتَهًى وَلَا دُوْنَ اللّٰهِ مَلْجًا كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ تَحَصَّنْتُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَاسْتَعَنْتُ بِالْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ اَللّٰهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِيْ لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِيْ لَايُرَامُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا فَلَاتَهْلِكُ وَاَنْتَ ثِقَتُنَا وَرَجَاءُنَا اَللّٰهُمَّ اعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوْبَ عِبَادِكَ وَاَمَائِكَ بِرَافَةٍ وَرَحْمَةٍ اِنَّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۔

(প্রথমাংশের অর্থ পূর্বের দোয়াসমূহে বর্ণিত হয়েছে।) মঙ্গল আনয়ন করে না; কিন্তু আল্লাহ। আল্লাহই অনিষ্ট বিদূরিত করেন। আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট। যে দোয়া করে আল্লাহ্ তার কথা শুনেন। আল্লাহর পশ্চাতে

কোন শেষ সীমা নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন আশ্রয় নেই। আল্লাহ্ বলেছেন, আমি ও আমার রসূলগণ জয়ী হবো। নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রান্ত। আমি মহান আল্লাহর সাহায্যকে দুর্গ করেছি এবং সাহায্য চেয়েছি চিরঞ্জীবের কাছে, যিনি মারবেন না। ইলাহী, আপন চোখে আমাদের হেফাযত কর, যে নিদ্রিত হয় না এবং আমাদেরকে আশ্রয় দাও আপন ইযযত দ্বারা, যা তলব করা হয় না। ইলাহী, আপন কুদরত দ্বারা আমাদের প্রতি রহম কর, যাতে আমরা ধ্বংস না হই, যখন তুমি আমাদের ভরসা ও আশা। ইলাহী, আমাদের প্রতি তোমার দাস দাসীদের অন্তরকে কৃপাশীল করে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠতম রহমকারী।

(৮) পথিমধ্যে কোন উঁচু জায়গায় আরোহণ করলে তিন বার আল্লাহু আকবার বলে এই দোয়া পড়া মোস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۔

হে আল্লাহ! সকল গৌরবের উপরে তোমার গৌরব এবং তোমার প্রশংসা সর্বাবস্থায়। নিম্নভূমিতে অবতরণ করার সময় 'সোবহানাল্লাহ' বলবে। সফরে মনে আতঙ্ক দেখা দিলে এই দোয়া পড়বে–

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَّلَتِ السَّمٰوَاتُ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ ۔

যিনি বিশ্ব জাহানের মহান অধিপতি, ফেরেশতাগণ ও জিব্রাঈলের পরওয়ারদেগার, যার ইযযত ও প্রতাপে আকাশমণ্ডলী আচ্ছন্ন হয়ে আছে, সে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

মীকাত থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত এহরামের আদব

মীকাত অর্থাৎ এহরাম বাঁধার স্থান থেকে মক্কায় প্রবেশ পর্যন্ত আদব পাঁচটি ঃ

(১) যে প্রসিদ্ধ স্থানে হাজীরা এহরাম বাঁধে, সেখানে পৌছার পর

এহরামের নিয়তে গোসল করবে, দেহকে খুব পরিষ্কার করবে, মাথায় ও দাড়িতে চিরুনি করবে, নখ কাটবে এবং গোঁফ ছাঁটবে।

(২) সেলাই করা পোশাক খুলে ফেলবে। অতঃপর এহরামের পোশাক তথা একটি সাদা লুঙ্গি ও একটি সাদা চাদর পরিধান করবে। সাদা পোশক আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় ও প্রিয়। পোশাক ও শরীরে সুগন্ধি লাগাবে। এহরামের পরেও সুগন্ধির অংশবিশেষ থেকে গেলে কোন ক্ষতি নেই। কেননা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সিঁথিতে মেশকের চিহ্ন এহরামের পরেও লোকেরা দেখেছে, যা তিনি এহরামের পূর্বে লাগিয়েছিলেন।

(৩) এহ্রাম পরিধান করার পর যখন চলা শুরু করবে, তখন হজ্জ, ওমরা, কেরান অথবা এফরাদের নিয়ত করবে। এহ্রাম সহীহ হওয়ার জন্যে মনে মনে ইচ্ছা করাই যথেষ্ট। তবে 'লাব্বায়কার' এই দোয়া পাঠ করা সুন্নত–

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ ـ

আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই। আমি হাযির। প্রশংসা ও নেয়ামত তোমার। সাম্রাজ্য তোমার, তোমার কোন শরীক নেই। আরও বেশী বলতে চাইলে এরূপ বলবে–

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرَ كُلَّهُ بِيَدِكَ وَالرَّغْبَاءُ اِلَيْكَ لَبَّيْكَ لِحَجَّةٍ حَقًّا وَتَعَبُّدًا وَرِقًّا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

আমি হাযির। আমি তৎপর। যাবতীয় কল্যাণই তোমার হাতে। আগ্রহ তোমার প্রতি। আমি হাযির হজ্জের জন্যে। প্রকৃত বন্দেগী ও গোলামীর জন্যে। হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের বংশধরের প্রতি রহমত করুন।

(৪) লাব্বায়েক বলার মাধ্যমে এহ্রাম হয়ে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত দোয়া বলা মোস্তাহাব–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَاَعِنِّىْ عَلٰى اَدَاءِ فَرْضِهِ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ نَوَيْتُ اَدَاءَ فَرِيْضَتِكَ فِى الْحَجِّ فَاجْعَلْنِىْ مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لَكَ وَاٰمَنُوْا بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ وَفْدِكَ الَّذِيْنَ رَضِيْتَ عَنْهُمْ وَارْتَضَيْتَ وَقَبِلْتَ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ فَيَسِّرْلِىْ اَدَاءَ مَا نَوَيْتُ مِنَ الْحَجِّ اَللّٰهُمَّ قَدْ اَحْرَمَ لَكَ لَحْمِىْ وَشَعْرِىْ وَدَمِىْ وَعَصَبِىْ وَمُخِّىْ وَعِظَامِيْ وَحَرَّمْتُ عَلٰى نَفْسِى النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلُبْسَ الْمُخِيْطِ اِبْتِغَاءَ وَجْهِكَ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةِ ـ

হে আল্লাহ! আমি হজ্জ করতে চাই। অতএব একে আমার জন্য সহজ কর। এর ফরয আদায়ে আমাকে সাহায্য কর এবং আমার পক্ষ থেকে কবুল কর। ইলাহী, আমি হজ্জে তোমার ফরয আদায় করার নিয়ত করেছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমার আদেশে সাড়া দিয়েছে, তোমার প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছে এবং তোমার আদেশ অনুসরণ করেছে। আমাকে তোমার সেই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের প্রতি তুমি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত এবং যাদের হজ্জ তুমি কবুল করেছ। ইলাহী, যে হজ্জের নিয়ত করেছি তা আদায় করা আমার জন্য সহজ কর। ইলাহী, তোমার জন্য আমার মাংস, আমার চুল, আমার রক্ত, শিরা-উপশিরা, অস্থিমজ্জা এহরাম বেঁধেছে। আর আমি নিজের উপর নারী, সুগন্ধি ও সেলাই করা কাপড় কেবল তোমার সন্তুষ্টি ও আখেরাতের উদ্দেশে হারাম করে দিয়েছি। এহরামের সময় থেকে পূর্ববর্ণিত ছয়টি নিষিদ্ধ বিষয় হারাম হয়ে যায়।

(৫) এহরাম অব্যাহত থাকার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে লাব্বায়কা বলা মোস্তাহাব; বিশেষত সঙ্গী-সাথীদের সাথে সাক্ষাতের সময়, সমাবেশের সময়, উচ্চভূমিতে উঠার সময়, নিম্নভূমিতে অবতরণের সময় এবং সওয়ারীতে উঠানামা করার সময় সরবে লাব্বায়কা বলা উচিত। চীৎকার করে এবং শ্বাসরুদ্ধ করে বলতে হবে না। কেননা, উদ্দেশ্য আল্লাহকে

শুনানো। তিনি বধির ও অনুপস্থিত নন যে, চীৎকার করতে হবে। হাদীসেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে হারাম, মসজিদে খায়ফ ও মসজিদে মীকাতে উচ্চ স্বরে লাব্বায়কা বললে ক্ষতি নেই। এ তিনটি মসজিদই হজ্জের আরকান আদায় করার জায়গা। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য মসজিদে নীরবে লাব্বায়কা বললে কোন দোষ হবে না।

মক্কায় প্রবেশ করার আদব

মক্কায় প্রবেশ করার পর তওয়াফ পর্যন্ত আদব ছয়টি ঃ

মক্কায় প্রবেশের জন্যে যী-তুয়ায় গোসল করবে। হজ্জে সুন্নত গোসল নয়টি- (১) এহরামের জন্যে মীকাতে, (২) মক্কায় যাওয়ার জন্যে, (৩) তওয়াফের জন্যে, (৪) আরাফাতে অবস্থানের জন্যে, (৫) মুযদালেফায় অবস্থানের জন্যে (৬) তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে, (৭-৮) দু'গোসল দু'জামরার কংকর নিক্ষেপের জন্যে- জামরা আকাবার কংকর নিক্ষেপের জন্য গোসল নেই, (৯) বিদায়ী তওয়াফের জন্যে।

(২) মক্কার বাইরে যখন হরমের সীমায় প্রবেশ করবে তখন বলবে ঃ

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَاَمْنُكَ فَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ وَبَشَرِىْ عَلَى النَّارِ وَاٰمِنِّىْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِىْ مِنْ اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ .

হে আল্লাহ! এটা তোমার হরম ও আশ্রয়স্থল। অতএব আমার মাংস, রক্ত ও ত্বককে জাহান্নামের জন্যে হারাম কর, পুনরুত্থানের দিন আমাকে আযাব থেকে নিরাপদ রাখ এবং আমাকে তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(৩) মক্কায় কুদা গিরিপথ দিয়ে পানির স্রোতের দিকে যাবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মধ্যবর্তী পথ ছেড়ে এ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা ভাল। মক্কা থেকে বের হওয়ার সময় কুদা গিরিপথ দিয়ে রেব হবে। এটা কিছু নীচু ও প্রশস্ত।

(৪) মক্কায় প্রবেশের সময় বনী জুমাহে পৌছালে কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়বে। তখন এই দোয়া বলা উচিত-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَدَارُكَ دَارُ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ يَا ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظَّمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ اَللّٰهُمَّ فَزِدْهُ تَعْظِيْمًا وَزِدْهُ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَزِدْهُ مَهَابَةً وَزِدْهُ مَنْ حَجَّهُ بِرًّا وَكَرَامَةً اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادْخِلْنِىْ جَنَّتَكَ وَاَعِذْنِىْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! তুমি শান্তি, তোমা থেকে শান্তি। তোমার গৃহ শান্তির গৃহ। তুমি বরকতওয়ালা, হে প্রতাপশালী, সম্মানিত, হে আল্লাহ! এটা তোমার গৃহ, যাকে তুমি মহত্ত্ব দিয়েছ, সম্মান দিয়েছ ও গৌরবান্বিত করেছ। হে আল্লাহ! বৃদ্ধি কর তার মাহাত্ম্য, গৌরব ও সম্মান। আরও বৃদ্ধি কর তার ভয়ভীতি। যে এ গৃহের হজ্জ করে তার সততা ও সম্মান বৃদ্ধি কর। হে আল্লাহ! তোমার রহমতের দরজা আমার জন্যে খুলে দাও, আমাকে তোমার জান্নাতে দাখিল কর এবং আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও।

(৫) মসজিদে হারামে প্রবেশ করার সময় বনী শায়বার দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَاِلَى اللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

আল্লাহর নামে শুরু, আল্লাহর সাহায্যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে, আল্লাহর দিকে এবং আল্লাহর পথে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী। কা'বা গৃহের নিকটবর্তী হলে বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلٰى اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِكَ وَعَلٰى جَمِيْعِ اَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ـ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। সালাম তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি। হে আল্লাহ! রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদের প্রতি, যিনি তোমার বান্দা, তোমার রসূল, ইব্রাহীমের প্রতি, যিনি তোমার খলীল এবং সকল নবী ও রসূলের প্রতি। অতঃপর হাত তুলে নিম্নরূপ দোয়া করবে–

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই স্থানে আমার হজ্জের প্রথম কর্মে প্রার্থনা করছি, আমার তওবা কবুল কর, আমার ত্রুটি মার্জনা কর এবং আমার উপর থেকে গোনাহের বোঝা নামিয়ে দাও। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে তাঁর পবিত্র গৃহে পৌঁছিয়েছেন, যে গৃহকে তিনি মানুষের জন্যে করেছেন প্রত্যাবর্তনের স্থল ও আশ্রয়। একে আরও করেছেন বরকতময় ও বিশ্বজগতের জন্যে হেদায়াত। হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, এ শহর তোমার শহর, এ হরম তোমার হরম, এ গৃহ তোমার গৃহ। আমি তোমার রহমত তলব করতে এসেছি। আমি অক্ষমের মত, তোমার শাস্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তির মত, তোমার রহমত প্রার্থীর মত, তোমার সন্তুষ্টি কামনাকারীর মত তোমার কাছে প্রার্থনা করছি।

(৬) এর পর কাল পাথরের কাছে গিয়ে ডান হাতে তা স্পর্শ করবে এবং চুম্বন করে বলবে– হে আল্লাহ্! আমি আমার আমানত প্রত্যর্পণ করলাম এবং আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করলাম। তুমি এই পূর্ণতায় সাক্ষী থাক। চুম্বন সম্ভবপর না হলে পাথরের সামনে দাঁড়িয়ে এ দোয়া পড়ে নেবে। এর পর তওয়াফ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি মনোযোগ দেবে না। এ তওয়াফকে 'তওয়াফে কুদুম' বলা হয়। তখন অন্যান্য লোক ফরয নামাযে নিয়োজিত থাকলে নিজেও ফরয নামাযে শরীক হয়ে যাবে এবং পরে তওয়াফ করবে।

তওয়াফের আদব

তওয়াফে কুদুম অথবা অন্য কোন তওয়াফ শুরু করলে ছয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে ঃ

(১) নামাযের শর্তসমূহ পূর্ণ করতে হবে অর্থাৎ, অযু করতে হবে, কাপড়-চোপড়, শরীর ও তওয়াফের জায়গা পাক হতে হবে এবং নগ্নতা দূর করতে হবে। কেননা, কা'বা গৃহের তওয়াফও নামাযের সমতুল্য।

এতে অবশ্য পারস্পরিক কথা বলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তওয়াফের পূর্বে এস্তেবাগ করে নেয়া উচিত। অর্থাৎ, চাদরের প্যাঁচ ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে উভয় প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রেখে দেবে। এমতাবস্থায় চাদরের এক প্রান্ত পিঠে ঝুলবে এবং অপর প্রান্ত বুকের উপর। তওয়াফের শুরু থেকে 'লাব্বায়কা' বলা বন্ধ করবে। তওয়াফের দোয়াসমূহ পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

(২) এস্তেবাগ সমাপ্ত হলে কা'বা গৃহকে বাম দিকে রাখবে এবং কাল পাথরের সামান্য দূরে দাঁড়াবে, যাতে তওয়াফের শুরুতে সমস্ত দেহ কাল পাথরের বিপরীত দিকে চলে যায়। নিজের মধ্যে এবং কাবা ঘরের মধ্যে তিন কদম দূরত্ব রাখা উচিত, যাতে কাবা গৃহের কাছেও থাকে এবং শাযরাওয়ানের উপর তওয়াফও না হয়। এটা কাবার অন্তর্ভুক্ত। কাল পাথরের কাছে শাযরাওয়ান মাটির সাথে মিশে গেছে। এখানে ধোকা লাগে। যে এর উপর দিয়ে তওয়াফ করে, তার তওয়াফও হয় না। কেননা, সে যেন কাবার অভ্যন্তরে তওয়াফ করে। অথচ কাবার বাইরে তওয়াফ করার আদেশ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, শাযরাওয়ান কাবা প্রাচীর প্রস্থ। প্রাচীর তৈরী করার সময় এই প্রস্থটি ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই পরিত্যক্ত প্রস্থকে শাযরাওয়ান বলা হয়। মোট কথা, কাল পাথরের নিকট থেকে তওয়াফ শুরু করবে।

(৩) তওয়াফের শুরুতে অর্থাৎ, কাল পাথর থেকে সামনে আগমনের পূর্বেই এই দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নামে শুরু। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ, আমি এই তওয়াফ করছি তোমার প্রতি বিশ্বাসের কারণে, তোমার কিতাবকে সত্য মনে করার কারণে, তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করার লক্ষ্যে এবং তোমার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণ করার কারণে। এরপর তওয়াফ শুরু করে কাল পাথর থেকে এগিয়ে কাবা গৃহের বিপরীতে পৌঁছবে। তখন

এই দোয়া বলবে-

اَللّٰهُمَّ هٰذَا الْبَيْتُ بَيْتُكَ وَهٰذَا الْحَرَمُ حَرَمُكَ وَهٰذَا الْاَمْنُ اَمْنُكَ وَهٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! এই গৃহ তোমার গৃহ, এই হরম তোমার হরম, এই আশ্রয় তোমার আশ্রয়। এটা দোযখ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনাকারীর স্থান। স্থান বলার সময় মকামে ইবরাহীমের দিকে ইশারা করে বলবে-

اَللّٰهُمَّ اِنَّ بَيْتَكَ عَظِيْمٌ وَوَجْهُكَ كَرِيْمٌ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ فَاَعِذْنِىْ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وَحَرِّمْ لَحْمِىْ وَدَمِىْ عَلَى النَّارِ وَاٰمِنِّىْ مِنْ اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاكْفِنِىْ مُؤْنَةَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার গৃহ মহান এবং তোমার সত্তা কৃপাশীল। তুমি সেরা রহমতকারী। অতএব আমাকে দোযখ থেকে এবং বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দান কর। আমার রক্ত মাংসকে দোযখের জন্যে হারাম করে দাও। আমাকে কেয়ামত দিবসের ত্রাস থেকে আশ্রয় দাও এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা কর। অতঃপর সোবহানাল্লাহ ও আলহাম্‌দু লিল্লাহ বলতে বলতে রোকনে এরাকীতে পৌঁছবে। তখন এই দোয়া পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَالشَّكِّ وَالْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوْءِ الْاَخْلَاقِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْاَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে শেরক, সন্দেহ, কুফর, নেফাক, বিভেদ, দুশ্চরিত্রতা থেকে এবং পরিবার, ধন-সম্পদ ও সন্তানের মধ্যে কুদৃশ্য দেখা থেকে। অতঃপর মীযাবে পৌঁছে বলবে-

اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنَا تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ عَرْشِكَ اَللّٰهُمَّ اَسْقِنِىْ بِكَاسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةً لَاَاظْمَاُ بَعْدَهَا اَبَدًا ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার আরশের ছায়ায় স্থান দাও, যে দিন তোমার আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না। হে আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পেয়ালা দিয়ে শরবত পান করাও, যাতে আমার পিপাসা চিরতরে নিবৃত্ত হয়ে যায়। অতঃপর রোকনে শামীর বিপরীতে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَسَعْيًا مَشْكُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفُوْرُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি একে পরিণত কর মকবুল হজ্জ, কৃতজ্ঞ সায়ী (দৌড়), মার্জনাকৃত গোনাহ ও এমন ব্যবসায়, যাতে কখনও লোকসান হয় না। হে পরাক্রান্ত, হে ক্ষমাশালী! হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর। তুমি যে গোনাহ জান, তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি অধিক সম্মানী ও মহৎ। রোকনে ইয়ামানীর বিপরীতে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِزْيِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি কুফর থেকে। আরও আশ্রয় চাই দারিদ্র্য, কবরের আযাব, জীবন ও মরণের পরীক্ষা থেকে এবং আশ্রয় চাই তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের লাঞ্ছনা থেকে। রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মাঝখানে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ ও পরকালে কল্যাণ দান কর। আপন রহমতে আমাদেরকে কবর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। অতঃপর কাল পাথরের কাছে পৌঁছে বলবে–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ بِرَحْمَتِكَ اَعُوْذُ بِرَبِّ هٰذَا الْحَجَرِ مِنَ الدَّيْنِ وَالْفَقْرِ وَضِيْقِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনার রহমতে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি এই পাথরের পরওয়ারদেগারের কাছে আশ্রয় চাই ঋণ থেকে, মনের সংকীর্ণতা থেকে এবং কবরের আযাব থেকে।

এভাবে এক চক্কর পূর্ণ হল। এমনিভাবে সাত চক্কর দেবে এবং প্রত্যেক চক্করে উপরোক্ত দোয়াসমূহ যথারীতি পাঠ করবে।

(৪) প্রথম তিন চক্করে রমল করবে। অবশিষ্ট চার চক্করে স্বাভাবিক চলবে। রমলের অর্থ দ্রুত চলা এবং কাছে কাছে পা রাখা। এটা দৌড়ের চেয়ে কম এবং গতিতে স্বাভাবিক চলার চেয়ে বেশী। এস্তেবাগ ও রমল করার উদ্দেশ্য নির্ভীকতা এবং বীরত্ব প্রদর্শন করা। কাফেরদেরকে নিরাশ করার জন্যে প্রথম যুগে এটা প্রচলিত হয়েছিল। কিন্তু পরেও এ সুন্নত অব্যাহত রয়ে গেছে। রমল কাবা ঘরের সন্নিকটে করা উত্তম। কিন্তু ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে দূরত্ব থেকে রমল করাই ভাল। অর্থাৎ, তওয়াফের স্থানের কিনারে রমল করবে এবং তিন চক্কর রমল করার পর কাবা গৃহের সন্নিকটে ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবে। অতঃপর স্বাভাবিক গতিতে চার চক্কর দেবে। প্রত্যেক চক্করে কাল পাথর চুম্বন করতে পারলে ভাল। ভীড়ের কারণে তা সম্ভব না হলে হাতে কাল পাথরের দিকে ইশারা করে হাত চুম্বন করবে। এমনিভাবে রোকনে ইয়ামানীকে চুম্বন করা মোস্তাহাব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোকনে ইয়ামানী চুম্বন করতেন এবং আপন গণ্ড তার উপর রাখতেন। তবে কাল পাথর চুম্বন করা এবং রোকনে ইয়ামানীকে কেবল হাতে স্পর্শ করা উত্তম। কারণ, এ রেওয়ায়েতেই

বেশী প্রসিদ্ধ।

(৫) তওয়াফের সাতটি চক্কর সমাপ্ত হয়ে গেলে মুলতাযামে, অর্থাৎ কাল পাথর এবং কাবা গৃহের দরজার মধ্যবর্তী স্থানে আগমন করবে। এটা দোয়া কবুল হওয়ার স্থান। এখানে প্রাচীরের সাথে চিমটে যাবে। পর্দা ধরে নিজের পেট প্রাচীরের সাথে মিলিয়ে দেবে। ডান গণ্ড প্রাচীরে রাখবে এবং হাত ও হাতের তালু তাতে ছড়িয়ে দেবে। এ সময় নিম্নোক্ত দোয়া করবে–

"হে প্রাচীন গৃহের প্রভু! আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত কর। আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দাও। আমাকে প্রত্যেক মন্দ কাজ থেকে রক্ষা কর। আমাকে সন্তুষ্ট কর তোমার দেয়া রিযিকের উপর এবং আমাকে দেয়া তোমার রিযিকে বরকত দান কর। হে আল্লাহ! এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা এবং এটা জাহান্নাম থেকে আশ্রয়প্রার্থীর স্থান। হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি তোমার কাছে আগমনকারীদের মধ্যে অধিক সম্মানিত কর।"

এর পর এ স্থানে বেশী পরিমাণে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করবে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সকল পয়গম্বরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে, নিজের বিশেষ মকসূদের জন্যে দোয়া এবং গোনাহের মাগফেরাত কামনা করবে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এ স্থানে খাদেমদেরকে বলতেন ঃ আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের সামনে নিজের গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করতে পারি।

(৬) মুলতাযামে করণীয় সমাপ্ত হলে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত নামায পড়বে। পথম রাকআতে কুল ইয়াআইউহাল কা-ফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে কুল হুআল্লাহ পাঠ করবে। এটা তওয়াফের দু'রাকআত। যুহরী বলেন ঃ চিরাচরিত সুন্নত এটাই যে, প্রত্যেক সাত চক্কর শেষে দু'রাকআত নামাযে পড়বে। যদি অনেক তওয়াফ করে এবং সবগুলোর পরে দু'রাকআত নাময পড়ে নেয়, তাও জায়েয। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরূপ করেছেন। সাত চক্কর মিলে এক তওয়াফ হয়। তওয়াফের দু'রাকআত পড়ার পর নিম্নরূপ দোয়া বলবে–

"হে আল্লাহ! সহজ করে দাও আমার জন্যে কঠিন বিষয়, আমাকে রক্ষা কর কঠিন বিষয় থেকে এবং আমাকে ইহ ও পরকালে ক্ষমা কর।

হে আল্লাহ! আমাকে আপন কৃপায় গোনাহ্ থেকে রক্ষা কর, যাতে তোমার নাফরমানী না করি, আমাকে তোমার তওফীক দ্বারা আনুগত্যে সাহায্য কর, আমাকে তোমার নাফরমানী থেকে আলাদা রাখ এবং আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা তোমাকে, তোমার ফেরেশতাগণকে, তোমার রসূলগণকে এবং তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদেরকে ভালবাসে। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ফেরেশতাগণের, রসূলগণের ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণের প্রিয় কর। হে আল্লাহ! তুমি যেমন আমাকে ইসলামের দিকে পথ প্রদর্শন করেছ, তেমনি আপন কৃপায় ও ক্ষমতাবলে আমাকে ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। আমার দ্বারা আপন আনুগত্য ও রসূলের আনুগত্যের কাজ নাও এবং আমাকে এমন ফেতনা থেকে আশ্রয় দাও, যার কোন প্রতিকার নেই।"

অতঃপর কাল পাথরের কাছে পুনরায় আসবে এবং সেটি চুম্বন করে তওয়াফ শেষ করবে।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি সাত চক্কর দিয়ে কাবা গৃহের তওয়াফ করে এবং দু'রাকআত নামায পড়ে, সে একটি ক্রীতদাস মুক্ত করার সওয়াব পায়। এ পর্যন্ত তওয়াফের পদ্ধতি বর্ণিত হল। এতে নামাযের শর্তসমূহ ছাড়া আরও ওয়াজেব এই যে, সমগ্র কা'বার চার পাশে সাত চক্কর পূর্ণ করতে হবে। কাল পাথর থেকে শুরু করতে হবে এবং কাবা গৃহকে বাম দিকে রেখে মসজিদের ভিতরে এবং কাবার বাইরে তওয়াফ করতে হবে। সবগুলো চক্কর নিরন্তর করতে হবে। মামুলী ফাঁকের বেশী ফাঁক দেয়া যাবে না। এ ছাড়া আর যেসব বিষয় রয়েছে, সেগুলো সুন্নত ও মোস্তাহাব।

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে দৌড়ানো

তওয়াফ শেষ করার পর বাবে সাফা দিয়ে বাইরে যাবে। এটা রোকনে ইয়ামানী ও কাল পাথরের মধ্যবর্তী প্রাচীরের সোজাসুজি একটি দরজা। এ দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে পৌঁছবে। এর কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করার পর কাবা গৃহ দৃষ্টিগোচর হবে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পর্যন্ত কা'বা গৃহ দৃষ্টিগোচর না হওয়া পর্যন্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেন। সাফা পাহাড়ের গোড়া থেকে দৌড়ানো তথা 'সায়ী' শুরু করা যথেষ্ট।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে আরোহণ করা মোস্তাহাব। কিছু সিঁড়ি নতুন তৈরী হয়েছে, সেগুলোও বাদ দেবে না। বাদ দিলে 'সায়ী' পূর্ণ হবে না। (অধুনা সাফা পাহাড়ের গোড়ায় এত বেশী মাটি জমে গেছে যে, গোড়া থেকে এবং দু'এক সিঁড়ি উপরে উঠলেও কা'বা দৃষ্টিগোচর হয়। কাজেই এখন সিঁড়িতে না চড়লেও সায়ী অপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা নেই।) সাফা থেকে সায়ী শুরু করে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাত বার সায়ী করবে। সাফা পাহাড়ে আরোহণের সময় কা'বার দিকে মুখ করে যে দোয়া পড়া হয় তা নিম্নরূপ–

"আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। কারণ তিনি আমাদেরকে হেদায়াত করেছেন। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই। প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। কল্যাণ তাঁর হাতেই। তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক। তিনি আপন ওয়াদা পালন করেছেন, আপন বান্দাকে সাহায্য করেছেন (অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ে), আপন বাহিনীকে জয়ী করেছেন এবং একা কাফের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন (অর্থাৎ, খন্দক যুদ্ধে), আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁর জন্যে এবাদতকে খাঁটি কর। সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-পালক আল্লাহর জন্যে। আল্লাহ্ পবিত্র। স্মরণ কর তাঁকে সন্ধ্যায় ও দুপুরে। তাঁরই প্রশংসা আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সন্ধ্যায় এবং দ্বিপ্রহরে। তিনি জীবিতকে বের করেন মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে। ভূমি মরে যাওয়ার পর তাকে জীবিত করেন, এমনিভাবে তোমরা উত্থিত হবে। তার অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এখন তোমরা মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিরস্থায়ী ঈমান, সত্যিকার বিশ্বাস, উপকারী জ্ঞান, বিনয়ী অন্তর ও যিকিরকারী জিহ্বা প্রার্থনা করি। আরও প্রার্থনা করি ক্ষমা, নিরাপত্তা এবং ইহ ও পরকালীন স্থায়ী শান্তি।"

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী দোয়া করবে। এর পর নেমে সায়ী শুরু করবে এবং বলতে থাকবে–

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদেগার! ক্ষমা কর, রহম কর এবং যে গোনাহ্ তুমি জান তা মার্জনা কর। নিশ্চয় তুমি সম্মানিত! দানশীল। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দান কর। আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

অতঃপর সবুজ মাইল ফলক পর্যন্ত নম্রতা বজায় রেখে চলবে। সাফা পাহাড় থেকে নেমেই এই মাইল ফলক পাওয়া যায়। মসজিদে হারামের দিকে আসতে গিয়ে যখন ছয় হাত দূরত্ব থেকে যায়, তখন দ্রুত চলবে। অর্থাৎ, রমলের মত গতিতে চলবে। পরবর্তী মাইল ফলক পর্যন্ত এভাবেই চলবে। অতঃপর ধীরগতিতে চলবে। মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে তার সিঁড়িতে চড়বে, যেমন সাফা পাহাড়ে চড়েছিলে। এখানে সাফা পাহাড়ে যে দোয়া পড়েছিলে, সে দোয়াই পড়বে। এটা হল সায়ী। পুনরায় যখন সাফা পাহাড়ে যাবে, তখন দু'বার সায়ী হবে। এমনিভাবে সাত বার সায়ী করবে। প্রত্যেক সায়ীতে দু'টি মাইল ফলকের মাঝখানে রমল করবে। সায়ী সমাপ্ত হওয়ার পর বুঝতে হবে, দু'টি কাজ অর্থাৎ, তওয়াফ ও সায়ী সমাপ্ত হল। উভয়টি সুন্নত। সায়ী করার সময় ওযু থাকা মোস্তাহাব– ওয়াজেব নয়। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে সায়ী করলে এটাই রোকন হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। কেননা, সায়ী আরাফাতে অবস্থানের পরে হওয়া শর্ত নয়; বরং এটা তওয়াফে যিয়ারতের জন্যে শর্ত। তবে তওয়াফের পরে সায়ী করা শর্ত।

আরাফাতে অবস্থান

যদি হাজী আরাফার দিনে আরাফাতে পৌঁছে, তবে তওয়াফে কুদুম ও মক্কায় প্রবেশের প্রস্তুতি আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে করবে না। বরং প্রথমে আরাফাতে অবস্থান করবে। আরাফার কয়েক দিন পূর্বে পৌঁছালে মক্কায় প্রবেশ করে তওয়াফে কুদুম করবে এবং যিলহজ্জ পর্যন্ত এহ্রাম

অবস্থায় মক্কায় অবস্থান করবে। ইমাম এই তারিখেই যোহরের পরে কাবার নিকটে খোতবা দেবেন এবং হাজীদেরকে আদেশ দেবেন ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্যে। হাজীগণ ৯ই যিলহজ্জ ভোরে সেখান থেকে আরাফায় যাবে। দ্বিপ্রহরের পরে আরাফাতে অবস্থানের ফরয আদায় করবে। কেননা, আরাফাতে অবস্থানের সময় ৯ই যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পর থেকে ১০ই যিলহজ্জ সোবহে সাদেক পর্যন্ত। হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদনের জন্যে সামর্থ্য থাকলে মক্কা থেকে শেষ অবধি পদব্রজে চলা মোস্তাহাব। মসজিদে ইবরাহীম (আঃ) থেকে অবস্থানের স্থান পর্যন্ত পদব্রজে চলার তাকিদ আছে। এটা উত্তম।

হাজীগণ মিনায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বেন–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا مِنًى فَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهٖ عَلٰى اَوْلِيَائِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এটা মিনা। অতএব তুমি আমার প্রতি সেই নেয়ামত দ্বারা অনুগ্রহ কর, যদ্দারা তুমি তোমার ওলী ও আনুগত্যশীলদের প্রতি অনুগ্রহ করেছ।"

নয় তারিখের রাতে মিনায় অবস্থান করবে। এ সময়ের সাথে হজ্জের কোন কাজ সম্পৃক্ত নয়। ভোর হলে ফজরের নামায পড়বে এবং সাবীর পাহাড়ের উপরে সূর্য উঠে গেলে এই দোয়া পড়ে আরাফাতে রওয়ানা হয়ে যাবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا خَيْرَ غَدْوَةٍ وَقَدْوَتِهَا قَطُّ وَاَقْرِبْهَا مِنْ رِضْوَانِكَ اَبْعِدْهَا مِنْ سَخَطِكَ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ غَدَوْتُ وَاِيَّاكَ رَجَوْتُ وَعَلَيْكَ اِعْتَمَدْتُ وَوَجْهَكَ اَرَدْتُ فَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ تُبَاهِىْ بِهِ الْيَوْمَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّىْ وَاَفْضَلُ ـ

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! এ ভোর আমার সকল ভোর অপেক্ষা উত্তম কর। একে তোমার সন্তুষ্টির নিকটবর্তী কর, তোমার ক্রোধ থেকে দূরবর্তী কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার দিকে ভোর করেছি, তোমাকেই আশা

করেছি, তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমার সত্তারই ইচ্ছা করেছি। অতএব আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের নিয়ে তুমি আজ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করবে।"

আরাফাতে পৌঁছে নামেরা মসজিদের সন্নিকটে তাঁবু স্থাপন করবে। এখানেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। আরাফাতে অবস্থানের জন্যে গোসল করা উচিত। সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে ইমাম সংক্ষিপ্ত খোতবা পাঠ করে বসে যাবেন, অতঃপর দ্বিতীয় খোতবা শুরু করবেন। মুয়ায্যিন আযান দেবে। আযানে দুই তকবীর মিলিয়ে বলবে। তকবীর শেষে ইমাম খোতবা শেষ করে যোহর ও আসর এক আযান ও দু'তকবীর সহকারে পড়বে। নামায কসর পড়বে। নামাযের পর অবস্থানস্থলে গিয়ে আরাফাতে অবস্থান করবে– আরনা উপত্যকায় অবস্থান করবে না। মসজিদে ইবরাহীমের সম্মুখবর্তী অংশ আরনার এবং পশ্চাতের অংশ আরাফাতের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদে আরাফাতের স্থান সেখানে বিছানো বড় বড় পাথর দ্বারা জানা যায়। অবস্থানের সময় আল্লাহর প্রশংসা, দোয়া ও তওবা বেশী পরিমাণে করবে। সেদিন রোযা রাখবে না, যাতে সারাদিন দোয়া পাঠ করার শক্তি থাকে। আরাফার দিনে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে না; রবং কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও দোয়ায় মগ্ন থাকবে। সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করা উচিত নয়, যাতে সে রাতও দ্বিতীয় দিনের রাত আরাফাতেই একত্রিত হয়। এর দ্বিতীয় উপকার এই যে, চাঁদ দেখায় ভুল হলে কিছু সময় আরাফাতে অবস্থান হয়ে যাবে। যেব্যক্তি দশই যিলহজ্জ ভোর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করতে পারে না, তার হজ্জ বাতিল হয়ে যায়। তার উচিত ওমরার ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করে এহরাম ছেড়ে দেয়া এবং পরবর্তী বছর হজ্জের কাযা করা।

আরাফার দিনে সর্বাধিক সময় দোয়ায় ব্যয় করবে। কারণ, এ স্থানে ও এরূপ সমাবেশে দোয়া কবুলের আশা করা যায়। আরাফার দিনে যেসব দোয়া রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে সেগুলো পড়া উচিত। এরূপ একটি দোয়ার সারমর্ম নিম্নরূপ–

"আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সাম্রাজ্য তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি চিরজীবী– মৃত্যুবরণ করেন না। তাঁরই হাতে কল্যাণ।

তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে নূর দাও, আমার কানে নূর দাও, আমার চোখে নূর দাও, আমার জিহ্বায় নূর দাও। হে আল্লাহ, আমার বক্ষ উন্মোচন কর এবং আমার কর্ম আমার জন্যে সহজ কর। হে আল্লাহ! প্রশংসার মালিক, তোমারই প্রশংসা যেমন আমরা করে থাকি। বরং তার চেয়েও উত্তম প্রশংসা তোমার। তোমারই জন্যে আমার নামায, আমার হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু। তোমারই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন এবং তোমারই দিকে আমার সওয়াব। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে মনের কুমন্ত্রণা, দুরবস্থা এবং কবরের আযাব থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে সে বস্তুর অনিষ্ট থেকে যা বাতাস বয়ে আনে এবং যমানার ধ্বংসাত্মক বস্তুর অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই তোমার কাছে তোমার দেয়া সুস্থতার বিবর্তন থেকে, তোমার আকস্মিক প্রতিশোধ থেকে এবং তোমার যাবতীয় ক্রোধ থেকে। হে আল্লাহ! আমাকে সৎপথ প্রদর্শন কর এবং আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা কর। আজ সন্ধ্যায় আমাকে এমন নেয়ামত দান কর, যা আপন সৃষ্টির মধ্য থেকে কাউকে এবং আপন গৃহের হাজীদের মধ্য থেকে কাউকে দান করনি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমকারী, হে আল্লাহ! হে মর্যাদা বৃদ্ধিকারী, অনুগ্রহ প্রেরণকারী, হে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর স্রষ্টা, তোমার সামনে মানুষ বিভিন্ন ভাষায় ফরিয়াদ করে। তোমার কাছে আমরা প্রয়োজন যাঞ্ছা করি। আমার প্রয়োজন এই যে, আমাকে এই পরীক্ষাগারে ভুলো না, যখন দুনিয়ার মানুষ আমাকে ভুলে যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুন, আমার অবস্থান দেখ, আমার গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জান, আমার কোন বিষয় তোমার কাছে গোপন নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, নিঃস্ব ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, ভীত, সন্ত্রস্ত, গোনাহ্ স্বীকারকারী, আমি তোমার কাছে মিসকীনের মত প্রার্থনা করি এবং তোমার সামনে গোনাহ্গার লাঞ্ছিতের মত মিনতি করি, ভীত ক্ষতিগ্রস্তের ন্যায় তোমাকে ডাকি, এমন ব্যক্তির ন্যায়, যার গর্দান তোমার উদ্দেশে নত হয়, যার অশ্রু তোমার জন্যে প্রবাহিত হয়, যার দেহ তোমার জন্যে নুয়ে পড়ে এবং যার নাক তোমার জন্যে ধুলাধূসরিত হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার দয়া থেকে বঞ্চিত করো না, তুমি আমার জন্যে মেহেরবান ও দয়ালু হও হে উত্তম দাতা। ইলাহী, আমি তো নিজেকে তিরস্কার করি। ইলাহী, পাপ আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, অতঃপর

আমার আমলের কোন ওসিলা নেই এবং প্রত্যাশা ব্যতীত আমার কোন সুপারিশকারী নেই। ইলাহী, আমি জানি আমার গুনাহ্ তোমার কাছে আমার কোন মর্যাদা বাকী রাখেনি এবং ওযর করার কোন পথ অবশিষ্ট রাখেনি, কিন্তু তুমি দাতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইলাহী, যদি আমি তোমার রহমত পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্য নাও হই, তবুও তোমার রহমত তো আমার কাছে পৌঁছার যোগ্য। ইলাহী, তোমার রহমত সকল সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত এবং আমিও এক সৃষ্টি। ইলাহী, আমার গোনাহ যদিও বৃহৎ, কিন্তু তোমার ক্ষমার তুলনায় নেহায়েত ক্ষুদ্র। অতএব আমার গোনাহসমূহ মাফ কর হে কৃপাশীল। ইলাহী, তুমি তো তুমিই আর আমি আমিই। আমি বার বার গোনাহের দিকে ফিরে যাই, আর তুমি বার বার মাগফেরাতের দিকে ফিরে যাও। ইলাহী, যদি তুমি তোমার আনুগত্যশীলদের ছাড়া কারও প্রতি রহম না কর, তবে গোনাহ্গাররা কার কাছে কাকুতি-মিনতি করবে? ইলাহী, আমি তোমার আনুগত্য থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে নিবৃত্ত রয়েছি এবং তোমার নাফরমানীতে জেনেশুনে রত হয়েছি। অতএব তুমি পবিত্র, আমার উপর তোমার প্রমাণ কত বৃহৎ এবং তোমার ক্ষমা আমার প্রতি কত বড় আশীর্বাদ! আমি তোমার মুখাপেক্ষী, তুমি আমা থেকে বেপরওয়া। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমাই কর। হে তাদের উত্তম যাদেরকে দোয়াকারী ডাকে, হে তাদের শ্রেষ্ঠ, যাদের কোন প্রত্যাশাকারী প্রত্যাশা করে, ইসলামের ইযযত ও মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দায়িত্বকে আমি তোমার সামনে ওসিলা করছি। অতএব আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ কর। আমাকে এই জায়গা থেকে প্রয়োজন মিটিয়ে বিদায় দাও। আমি যা চেয়েছি, তা আমাকে দান কর। আমি যে বিষয়ের বাসনা করেছি তা পূরণ কর। ইলাহী, আমি সে দোয়া করছি যা তুমি শিখিয়েছ। অতএব আমাকে সে আশা থেকে বঞ্চিত করো না, যা তুমি আমাকে বলেছ। ইলাহী, তুমি আজ রাতে সে বান্দার সাথে কি ব্যবহার করবে, যে আপন গোনাহ্ স্বীকার করে তোমার কাছে বিনয় প্রকাশ করে, আপন গোনাহের কারণে মিসকীন, আপন আমলের কারণে তোমার সামনে মিনতি করে, তোমার প্রতি তওবা করে, জুলুম করার কারণে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ক্ষমার জন্যে তোমার কাছে কান্নাকাটি করে, অভাব দূরীকরণে তোমাকে অন্বেষণ করে, আপন অবস্থানের জায়গায় তোমার কাছে প্রত্যাশা করে, অথচ তার

গোনাহ অনেক। হে আশ্রয়স্থল প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তির, প্রত্যেক মুমিনের বন্ধু, যে সৎকাজ করে সে তোমার রহমতে সফল হয় এবং যে গোনাহ্ করে, সে তার গোনাহের কারণে বরবাদ হয়। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছেই এসেছি, তোমার আঙ্গিনায় অবস্থান করছি, তোমাকেই আশা করছি, তোমার কাছে যা আছে তা তলব করছি, তোমার অনুগ্রহ কামনা করছি, তোমার রহমত আশা করছি, তোমার শাস্তিকে ভয় করছি, তোমারই কাছে গোনাহের বোঝা নিয়ে পালিয়ে এসেছি, তোমার সম্মানিত গৃহের হজ্জ করেছি। হে সেই সত্তা! যে প্রার্থনাকারীদের প্রয়োজনসমূহের মালিক এবং যে নিশ্চুপদের মনের কথা জানে, হে সেই সত্তা, যার সাথে আর কোন প্রভু নেই, যার কাছে দোয়া করা যায় এবং যার কোন স্রষ্টা নেই, যাকে ভয় করা যায়।

হে সেই সত্তা, বেশী সওয়াল করলে যার দানশীলতাই কেবল বৃদ্ধি পায় এবং বেশী প্রয়োজন হলে যার অনুগ্রহ ও কৃপাই শুধু বেড়ে যায়। হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক মেহমানের জন্যে ভোজ রেখেছ। আমরা তোমার মেহমান। অতএব আমাদের জন্যে জান্নাতী ভোজের ব্যবস্থা কর। হে আল্লাহ! প্রত্যেক প্রতিনিধি দলের জন্যে একটি পুরস্কার রয়েছে, প্রত্যেক যিয়ারতকারীর জন্যে এক সম্মান রয়েছে, প্রত্যেক সওয়ালকারীর জন্যে এক দান রয়েছে, প্রত্যেক আশাকারীর জন্যে এক সওয়াব রয়েছে, প্রত্যেক আবেদনকারীর জন্যে এক প্রতিদান রয়েছে, প্রত্যেক রহমকারীর জন্যে এক রহমত রয়েছে, প্রত্যেক আগ্রহীর জন্যে তোমার কাছে নৈকট্য রয়েছে এবং প্রত্যেক ওসিলা অন্বেষণকারীর জন্যে ক্ষমা রয়েছে। আমরা প্রতিনিধি হয়ে এসেছি তোমার সম্মানিত গৃহের দিকে, আমরা অবস্থান করেছি মহান স্থানসমূহে এবং উপস্থিত হয়েছি এসব বরকতময় ভূমিতে, তোমার কাছে যা আছে তার আশা নিয়ে। অতএব তুমি প্রত্যাশাকে বিফল করো না।

ইলাহী, তুমি একের পর এক এত নেয়ামত দিয়েছ যাতে আমাদের মন শান্ত হয়ে গেছে। তুমি চিন্তার স্থান এত ব্যাপক করেছ যে, নির্বাক বস্তুসমূহ তোমার প্রমাণ উচ্চারণে মুখর হয়ে রয়েছে। তুমি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছ যে, তোমার ওলীগণও তোমার হক আদায়ে অক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তুমি এত নিদর্শনাবলী প্রকাশ করেছ যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তোমার অস্তিত্বের প্রমাণসমূহ বর্ণনা করেছে। তুমি

তোমার কুদরত দ্বারা এমনভাবে সকল বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছ যে, প্রত্যেক বস্তু তোমার ইযযতের সামনে মাথা নত করেছে এবং সকল মুখমণ্ডল তোমার মাহাত্ম্যের মোকাবিলায় নত হয়ে গেছে। তোমার বান্দারা যখন অসৎ কাজ করে তখন তুমি সহ্য কর এবং সময় দাও। পক্ষান্তরে তারা সৎকাজ করলে তুমি কৃপা কর ও কবুল কর। তারা নাফরমানী করলে তুমি গোপন কর। তারা ত্রুটি করলে তুমি ক্ষমা কর। আমরা দোয়া করলে তুমি কবুল কর আর ডাকলে শ্রবণ কর। আমরা তোমার প্রতি মনোযোগী হলে তুমি নিকটবর্তী হও। আর তোমার প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে তুমি আমাদের আহ্বান কর। ইলাহী, তুমি তোমার প্রকাশ্য কিতাবে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বলেছ ঃ কাফেরদেরকে বল, তারা কুফর থেকে বিরত হলে তাদের অতীত কুকর্ম ক্ষমা করা হবে। সুতরাং অস্বীকারের পর তাদের তরফ থেকে কলেমায়ে তওহীদের স্বীকারোক্তিতে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমরা তো তওহীদের সাক্ষ্য বিনীতভাবে এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের সাক্ষ্য আন্তরিকতা সহকারে দেই। অতএব এই সাক্ষ্যের বিনিময়ে আমাদের অতীত গোনাহসমূহ মাফ করে দাও। এতে আমাদের অংশ নও-মুসলিমদের অংশ থেকে কম করো না। ইলাহী, আমাদের কেউ তার গোলাম মুক্ত করে তোমার নৈকট্য হাসিল করলে তুমি তা পছন্দ কর। আমরা তো তোমার গোলাম; আর তুমি অনুগ্রহ করার অধিক যোগ্য। অতএব আমাদেরকে মুক্ত কর, তোমার আদেশ– আমরা যেন আমাদের মধ্যকার গরীব মিসকীনদেরকে খয়রাত দেই। আমরা তোমার কাছে মিসকীন এবং তুমি খয়রাত দানের অধিক যোগ্য। অতএব আমাদেরকে খয়রাত দাও। যারা আমাদের উপর জুলুম করে, তাদেরকে ক্ষমা করার উপদেশ তুমি আমাদেরকে দিয়েছ। আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। আর তুমি কৃপা করার অধিক হকদার, অতএব আমাদেরকে মার্জনা কর। পরওয়ারদেগার, আমাদেরকে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও। আপন রহমত দ্বারা তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।

এছাড়া খিযির (আঃ)-এর দোয়াও বেশী পরিমাণে পাঠ করবে। তা এই–

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ وَلَا سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ

وَلَاتَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْاَصْوَاتُ يَا مَنْ لَاتُغْلِطُهُ الْمَسَائِلُ وَلَاتَخْتَلِفُ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ يَا مَنْ لَايُبْرِمُهُ الْحَاحُ الْمَحِيْنِ وَلَاتُضْجِرُهُ مَسْئَلَةُ السَّائِلِيْنَ اَذِقْنَا بَرْدَ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ .

অর্থাৎ, হে সেই সত্তা, যাঁকে তার এক অবস্থা অন্য অবস্থা থেকে উদাসীন করে না, এক আবেদন অন্য আবেদন শুনা থেকে গাফেল করে না এবং যার কাছে অনেক কণ্ঠস্বর বিমিশ্র হয় না। হে সেই সত্তা, যাঁকে অনেক আবেদন বিরত করে না এবং যাঁর কাছে অনেক ভাষা বিভিন্ন নয়। হে সেই সত্তা! যাঁকে ঠকায় না হটকারীদের পীড়াপীড়ি এবং যাঁকে অনেক আবেদনকারীর আবেদন বিমর্ষ করে না, তুমি আমাদেরকে তোমার ক্ষমার শীতলতা এবং রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাও।

এছাড়া আরও দোয়া জানা থাকলে তা পড়বে। (এ ক্ষেত্রে "হেযবুল আমরের" দোয়া খুব চমৎকার। এতে কোরআন ও হাদীসের দোয়া শামিল রয়েছে।) নিজের জন্যে, পিতামাতার জন্যে এবং সকল মুসলমান নারী ও পুরুষের মাগফেরাতের জন্যে খুব আগ্রহ সহকারে দোয়া করবে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে কোন কিছুই বড় নয়। মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ্ আরাফাতে বলেছিলেন ঃ ইলাহী, তুমি আমার কারণে সকল মানুষের আবেদন নামঞ্জুর করো না। বকর মুযানীর কাছে জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ আমি আরাফাতের হাজীদেরকে দেখে ধারণা করলাম, আমি তাদের মধ্যে না থাকলে সকলেরই মাগফেরাত হয়ে যেত।

অবস্থানের পরবর্তী করণীয় বিষয়

আরাফাতে অবস্থানের পরবর্তী করণীয় হচ্ছে মুযদালেফায় অবস্থান, জামরায় কংকর নিক্ষেপ, যবেহ করা, কেশ মুণ্ডন ও তওয়াফ করা।

সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে ফেরার পথে গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করা উচিত। কতক লোকের রীতি অনুযায়ী ঘোড়া অথবা উট দৌড়ানো উচিত নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সওয়ারীর ঘোড়া ও উট দৌড়াতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং সুচারুরূপে পথ চল। কোন দুর্বল ব্যক্তিকে পিষ্ট করো না এবং মুসলমানকে কষ্ট দিয়ো না।

মুযদালেফায় পৌঁছে গোসল করবে। মুযদালেফা হরমের অন্তর্ভুক্ত। তাই গোসল করে এখানে প্রবেশ করবে। পায়ে হেঁটে প্রবেশ করলে অধিক উত্তম এবং হরমের সম্মানের উপযোগী। পথিমধ্যে সজোরে লাব্বায়ক বলতে থাকবে। মুযদালেফায় পৌঁছে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذِهٖ مُزْدَلِفَةٌ جُمِعَتْ فِيْهَا السُّنَّةُ مُخْتَلِفَةٌ نَسْئَلُكَ حَوَائِجَ مُؤْتَنِفَةً فَاجْعَلْنِىْ مِمَّنْ دَعَاكَ فَاسْتَجَبْتَ لَهٗ وَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهٗ ـ

হে আল্লাহ! এটা মুযদালেফা। এতে বিভিন্ন সুন্নতের সমাবেশ হয়েছে। আমরা তোমার কাছে নতুনভাবে প্রার্থনা করছি। অতএব তুমি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের দোয়া তুমি কবুল কর এবং যারা তোমার উপর ভরসা করলে তুমি তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাও।

অতঃপর মুযদালেফায় এশার সময়ে মাগরিব এবং এশা এক আযান ও দু'তকবীরসহ একত্রে পড়বে। এশার নামায কসর পড়বে। উভয় ফরযের মাঝখানে কোন নফল পড়বে না। কিন্তু উভয় ফরযের পরে মাগরিব ও এশার নফল এবং বেতের পড়ে নেবে। প্রথমে মাগরিবের ও পরে এশার নফল পড়বে। এর পর এ রাত্রি মুযদালেফায় কাটাবে। এ রাত্রিটি হজ্জের করণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেউ অর্ধ রাত্রির পূর্বে সেখান থেকে চলে গেলে তাকে 'দম' তথা কোরবানী করতে হবে। দরূদ ও ওযিফার মধ্য দিয়ে এ রাত্রি অতিবাহিত করা উত্তম, সওয়াবের কাজ। রাত্রির অর্ধেক অতিবাহিত হয়ে গেলে সেখান থেকে প্রস্থানের প্রস্তুতি নেবে। এখানে নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। তাই জামরার জন্যে এখান থেকে সত্তরটি কংকর কুড়িয়ে নেবে। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা হেতু বেশী নিলেও ক্ষতি নেই। কংকর হালকা হওয়া চাই, যাতে অঙ্গুলির ডগায় আসে। এর পর অন্ধকারের মধ্যে ফজরের নামায পড়বে এবং রওয়ানা হয়ে যাবে। মুযদালেফার শেষ সীমা মাশ'আরে হারামে পৌঁছে থেমে যাবে এবং চার দিক ফর্সা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দোয়ায় মশগুল থাকবে। বলবে–

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ

اَلْحَرَامِ وَالرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ رُوْحَ مُحَمَّدٍ مِنَّا التَّحِيَّةَ وَالسَّلَامَ وَاَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মাশআরে হারাম, খানায়ে কাবা, সম্মানিত মাস, রোকন ও মকামের ওসিলায় মুহাম্মদ (সঃ)-এর রূহের প্রতি আমাদের সালাম ও অভিবাদন পৌঁছে দাও এবং আমাদেরকে শান্তির গৃহে দাখিল কর, হে প্রতাপান্বিত ও সম্মানিত।

অতঃপর সেখান থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে রওয়ানা হয়ে যাবে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসার' নামক স্থানে পৌঁছে দ্রুত সওয়ারী চালিয়ে ময়দান অতিক্রম করে যাবে। পদব্রজে গেলে দ্রুত হেঁটে যাবে। ১০ই যিলহজ্জের ভোর হয়ে গেলে কখনও লাব্বায়কা বলবে এবং কখনও তকবীর বলবে। এভাবে মিনায় পৌঁছবে। এখানে জামরা সামনে পড়বে। জামরা সংখ্যায় তিনটি। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরা এমনিতেই অতিক্রম করে যাবে। দশ তারিখে এগুলোতে কোন কাজ করতে হয় না। যখন তৃতীয় জামরা আকাবায় পৌঁছবে এবং সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যাবে, তখন এই জামরায় কংকর নিক্ষেপ করবে। এ জামরাটি কেবলামুখী ব্যক্তির ডান দিকে পাহাড়ের নীচে অবস্থিত। কংকর মারার স্থানটি একটু উঁচুতে। কংকর মারার নিয়ম হচ্ছে, কেবলার দিকে অথবা জামরার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে, অতঃপর হাত তুলে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবে। এ সময় লাব্বায়কার পরিবর্তে তকবীর বলবে। প্রত্যেক কংকরের সাথে এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى طَاعَةِ الرَّحْمٰنِ وَرَغْمِ الشَّيْطٰنِ اَللّٰهُمَّ تَصْدِيْقَ بِكِتَابِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহ মহান। আমি আল্লাহর আনুগত্য করার এবং শয়তানকে লাঞ্ছিত করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করছি। হে আল্লাহ! তোমার কিতাবকে সত্য জ্ঞান করার জন্যে এবং তোমার নবীর সুন্নত অনুসরণ করার জন্যে কংকর নিক্ষেপ করেছি।"

কংকর নিক্ষেপ শেষ হলে লাব্বায়কা ও তকবীর উভয়টি বন্ধ করে দেবে। কিন্তু ফরয নামাযের পর নয় তারিখের যোহর থেকে তের

তারিখের আসরের পর পর্যন্ত তকবীর বলা অব্যাহত রাখবে। নামাযের পরে তকবীর এভাবে পড়বে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

এদিন দোয়ার জন্যে জামরার কাছে অবস্থান করবে না; বরং আপন বাসস্থানে গিয়ে দোয়া করবে। অতঃপর সঙ্গে কোরবানীর জীব থাকলে তা যবেহ করবে। নিজ হাতে যবেহ করা উত্তম। যবেহ করার সময় এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَبِكَ وَاِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ خَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর নামে শুরু। আল্লাহ মহান। হে আল্লাহ! এ কোরবানী তোমার পক্ষ থেকে আদায় হয়েছে, তোমারই কারণে আদায় হয়েছে এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। আমার পক্ষ থেকে এটা কবুল কর, যেমন তুমি তোমার খলীল ইবরাহীম (আঃ)-এর পক্ষ থেকে কবুল করেছিলে।"

উট কোরবানী করা উত্তম, এর পর গরু, এর পর ছাগল। ছাগলের তুলনায় দুম্বা কোরবানী করা উত্তম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন– الاضحية الكبش الاقرن উত্তম কোরবানী শিংবিশিষ্ট দুম্বা। সাদা রং লালিমা মিশ্রিত কাল ও কাল রঙের চেয়ে উত্তম। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন– একটি সাদা দুম্বা কোরবানীর বেলায় দু'টি কাল দুম্বার চেয়ে উত্তম। নফল কোরবানী হলে তা থেকে খাবে। দোষযুক্ত জীব কোরবানী করবে না। যেসব দোষের কারণে কোরবানী হয় না, সেগুলো এই ঃ

ল্যাংড়া হওয়া, নাক অথবা কান কর্তিত হওয়া, কান উপরে অথবা নীচে বিদীর্ণ হওয়া, শিং ভাঙ্গা হওয়া, সামনের পা খাটো হওয়া, অত্যধিক জীর্ণশীর্ণ হওয়া। কোরবানীর পরে কেশ মুণ্ডন করবে। কেশ মুণ্ডনের সময় এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اَثْبِتْ لِىْ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً وَامْحِ عَنِّىْ بِهَا سَيِّئَةً وَارْفَعْ لِىْ بِهَا عِنْدَكَ دَرَجَةً -

অর্থাৎ, "হে আল্লাহ! আমার জন্যে এটির প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একটি নেকী রাখ, প্রত্যেক চুলের বদলে একটি গোনাহ্ মিটিয়ে দাও এবং প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে তোমার কাছে আমার একটি মর্তবা বাড়িয়ে দাও।"

নারী তার কেশ সামান্য ছোট করবে। টেকো ব্যক্তির জন্যে মাথায় খুর ফিরিয়ে দেয়া মোস্তাহাব। কেশ মুণ্ডনের সাথে সাথে এহরাম খতম হয়ে যায়। নারী সম্ভোগ ও শিকার ব্যতীত অন্যান্য সকল নিষিদ্ধ কাজ এর পর হালাল হয়ে যায়। এখন মক্কায় গিয়ে তওয়াফ করবে। এ তওয়াফ হজ্জের রোকন। একে তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। এর সময় দশ তারিখের অর্ধ রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে শুরু হয়। শেষ ওয়াক্তের কোন সীমা নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা বিলম্বে এ তওয়াফ করা যায়। কিন্তু তওয়াফ না করা পর্যন্ত এহরামের কিছু প্রভাব বাকী থাকবে। অর্থাৎ, নারী সম্ভোগ করতে পারবে না। তওয়াফে যিয়ারত করে নেয়ার পর নারী সম্ভোগ করতে পারবে এবং পুরোপুরি হালাল হয়ে যাবে। এর পর বাকী থাকে কেবল আইয়ামে তশরীকে জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা এবং মিনায় রাত্রি অতিবাহিত করা। এ দু'টি কাজ এহরাম খতম হওয়ার পরে হজ্জের অনুসরণে ওয়াজিব। তওয়াফে যিয়ারত দু'রাকআত নামাযসহ। তওয়াফে কুদুমের পর যদি সাফা মারওয়ার সায়ী না করে থাকে, তবে এখন তওয়াফে যিয়ারতের পর পূর্বোল্লিখিত নিয়মে সায়ী করে নেবে। পূর্বে সায়ী করে থাকলে সেটাই রোকন হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার করতে হবে না। এহরাম থেকে হালাল হওয়ার উপায় তিনটি ঃ কংকর নিক্ষেপ করা, মাথা মুণ্ডন করা ও তওয়াফে যিয়ারত করা। যবেহসহ এ তিনটিকে আগে পাছে করায় কোন দোষ নেই। কিন্তু প্রথমে কংকর নিক্ষেপ করা

উত্তম, এর পর যবেহ করা, এর পর মাথা মুণ্ডন করা এবং অবশেষে তওয়াফে যিয়ারত করা।

ইমামের জন্যে সূর্য ঢলে পড়ার পর দশ তারিখে খোতবা পাঠ করা সুন্নত। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিদায়ী খোতবা ছিল। হজ্জে মোট চারটি খোতবা আছে– একটি সাত তারিখে, একটি নয় তারিখে, একটি দশ তারিখে এবং একটি মিনা থেকে প্রথম বিদায়ের দিন অর্থাৎ বার তারিখে। এ চারটি খোতবাই দ্বিপ্রহরে সূর্য ঢলে পড়ার পর। নয় তারিখে আরাফার খোতবা দু'টি। বাকীগুলো এক এক খোতবা। দু'খোতবার মাঝখানে কিছু বসতে হবে।

তওয়াফে যিয়ারত শেষ করার পর রাতের বেলায় থাকা এবং কংকর মারার জন্যে মিনায় ফিরে আসবে। এগার তারিখে যখন সূর্য ঢলে পড়ে তখন কংকর মারার জন্যে গোসল করবে এবং প্রথম জামরার দিকে রওয়ানা হবে। এটা আরাফাতের দিক থেকে প্রথমে ঠিক সড়কের উপর অবস্থিত। সেখানে সাতটি কংকর মারবে। অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে রাস্তা থেকে সামান্য আলাদা হয়ে কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তাআলার হামদ ও তকবীর পাঠ করে অন্তরের উপস্থিতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনয় সহকারে ততক্ষণ দোয়া করবে যতক্ষণ সময় সূরা বাকারা পাঠ করতে লাগে। এর পর দ্বিতীয় জামরার দিকে অগ্রসর হবে। সেখানেও প্রথম জামরার অনুরূপ কংকর নিক্ষেপ করবে। এর পর সামনে অগ্রসর হয়ে জামরা আকাবাতেও সাতটি কংকর মারবে। এর পর কোন কাজ না করে আপন বাসস্থানে এসে রাত কাটাবে। পরদিন অর্থাৎ, বার তারিখের যোহরের নামায বাদে একুশটি কংকর আগের দিনের মত তিনটি জামরায় মারবে। এর পর ইচ্ছা করলে মিনায় অবস্থান করবে এবং ইচ্ছা করলে মক্কায় ফিরে আসবে। সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করলে ভালো। আর যদি রাত্রি পর্যন্ত মিনা ত্যাগ না করে, তবে তার জন্যে বাইরে যাওয়া জায়েয নয়; বরং রাত্রে মিনায় অবস্থান করে তের তারিখে পূর্বের ন্যায় একুশটি কংকর মারতে হবে। রাত্রে না থাকলে এবং কংকর নিক্ষেপ করলে কোরবানী করতে হবে। এ কোরবানীর গোশ্ত সদকা করে দেবে। মিনায় অবস্থানের রাত্রিগুলোতে কাবা গৃহের যিয়ারত করা জায়েয। তবে রাত্রে মিনাতেই থাকতে হবে। মিনায় থাকাকালে ফরয

নামাযসমূহ ইমামের পেছনে মসজিদে খায়ফে পড়বে। এর অনেক সওয়াব। মিনা থেকে মক্কায় যাওয়ার পথে মুহাস্‌সারে বিরতি দেয়া উত্তম। আসর, মাগরিব ও এশার নামায সেখানে পড়বে এবং সামান্য নিদ্রা যাবে। এটা সুন্নত। অনেক সাহাবী থেকে এ সুন্নত বর্ণিত আছে। এটা করলে কোন কাফফারা দিতে হবে না।

ওমরা ও তার পরবর্তী করণীয়

যেব্যক্তি হজ্জের আগে অথবা পরে ওমরা করতে চায়, তার উচিত গোসল করে ওমরার কাপড় পরিধান করা এবং ওমরার মীকাত থেকে এহরাম বাঁধা। তার জন্যে উত্তম মীকাত হচ্ছে জেয়েররানা। এটা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এক জায়গার নাম, এর পরে তানয়ীম ও এর পরে হুদায়বিয়া। এহরাম করার সময় ওমরার নিয়ত করে লাব্বায়কা বলবে এবং মসজিদে আয়েশায় গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে। এখানে যা মনে চায় দোয়া করবে। এর পর লাব্বায়কা বলতে বলতে মক্কায় আসবে এবং মসজিদে হারামের অভ্যন্তরে ঢুকে লাব্বায়কা বলা বন্ধ করবে। অতঃপর সাত চক্কর তওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাত বার সায়ী করবে। সায়ী শেষে মাথা মুণ্ডন করবে। এখন ওমরা পূর্ণ হয়ে গেল। যেব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করে, তার উচিত ওমরা ও তওয়াফ বেশী করে করা এবং কাবা গৃহের পানে বেশী পরিমাণে তাকানো। কাবা গৃহের অভ্যন্তরে নগ্নপদে গাম্ভীর্য সহকারে প্রবেশ করবে। যমযম কূপের পানি অধিক পরিমাণে পান করবে। সম্ভব হলে অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজ হাতে পানি তুলে পান করবে। এত বেশী পান করবে যেন উদর ভর্তি হয়ে যায়। এ সময় এই দোয়া পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمٍ وَارْزُقْنِى الْاِخْلَاصَ وَالْيَقِيْنَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

হে আল্লাহ! এ পানিকে প্রত্যেক অসুখ বিসুখের প্রতিষেধক কর এবং আমাকে আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তা নসীব কর। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

ماء زمزم لما شرب له অর্থাৎ, যমযমের পানি যে মকসূদে পান করা হয়, তা হাসিল হয়। তাই দোয়া করা উচিত।

বিদায়ী তওয়াফ

হজ্জ ও ওমরার পর যখন দেশে ফিরতে মনে চায়, তখন সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে কা'বা থেকে বিদায় নেবে। এই বিদায় নেয়ার নিয়ম হচ্ছে, পূর্ববর্ণিত পন্থায় সাত চক্করের তওয়াফ করবে। এতে রমল ও এস্তেবাগ করবে না। তওয়াফ শেষে মকামে ইবরাহীমের পেছনে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং যমযমের পানি পান করে মুলতাযামে আসবে। অতঃপর দোয়া ও কাকুতি মিনতি করবে। বলবে–

"হে আল্লাহ! নিশ্চয় এ গৃহ তোমার গৃহ, এ বান্দা তোমার বান্দা– তোমার গোলামের ও তোমার বাঁদীর পুত্র। আমার জন্য নিয়োজিত বস্তুতে তুমি আমাকে সওয়ার করিয়েছ, তোমার শহরসমূহ পরিভ্রমণ করিয়েছ এবং আপন নেয়ামত আমাকে পৌঁছিয়েছ, এমনকি হজ্জের ক্রিয়াকর্ম আদায় করতে আমাকে সাহায্য করেছ। সুতরাং আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে তুমি আমাকে আরও বেশী সন্তুষ্টি দাও। নতুবা এখন তোমার গৃহ থেকে দূরে যাওয়ার পূর্বে আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। এটা আমার দেশে ফেরার সময়, যদি তুমি অনুমতি দাও– এমতাবস্থায় যে, আমি যেন তোমার বদলে অন্য কাউকে অবলম্বন না করি, তোমার গৃহের পরিবর্তে অন্য গৃহ পছন্দ না করি, যেন তোমার প্রতি বিরূপ এবং তোমার গৃহের প্রতি অসন্তুষ্ট না হই। হে আল্লাহ! দৈহিক সুস্থতা ও ধর্মীয় হেফাযতকে আমার সঙ্গী কর। আমার প্রত্যাবর্তন সুন্দর কর। জীবিত থাকা পর্যন্ত আমাকে তোমার আনুগত্য দান কর। আমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্রিত কর। তুমি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখ। হে আল্লাহ! একে তোমার গৃহে আমার সর্বশেষ উপস্থিতি করো না। যদি সর্বশেষ উপস্থিতি কর, তবে এর বিনিময়ে আমাকে জান্নাত দান কর।"

এর পর দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া পর্যন্ত কা'বা গৃহ থেকে চক্ষু না ফেরানো উত্তম।

মদীনার যিয়ারত ও তার আদব

রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন–

من زارني بعد وفاتي فكانما زارني في حياتي ۔

যেব্যক্তি আমার ওফাতের পরে আমার যিয়ারত করে, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করে।

তিনি আরও বলেন–

من وجد سعته ولم يفد الى فقد جفاني ۔

যেব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে না আসে, সে আমার প্রতি জুলুম করে।

আরও বলেন–

من جاء ني زائرا لايهمه الا زيارتي كان حقا على الله سبحنه ان اكون له شفيعا ۔

যেব্যক্তি যিয়ারতের উদ্দেশে আগমন করে এবং আমার যিয়ারত ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা না থাকে, আল্লাহর যিম্মায় তার হক হয়ে যায় যে, আমি তার সুপারিশকারী হই।

সুতরাং যেব্যক্তি মদীনার যিয়ারত করার ইচ্ছা করে, তার পথিমধ্যে বেশী করে দরূদ পাঠ করা উচিত। মদীনার প্রাচীর ও বৃক্ষসমূহের উপর দৃষ্টি পতিত হলে সে বলবে–

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْهُ لِىْ وِقَايَةً مِنَ النَّارِ وَاَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَسُوْءِ الْحِسَابِ ۔

হে আল্লাহ! এটা তোমার রসূলের হরম। অতএব তুমি একে আমার জন্যে দোযখ থেকে আত্মরক্ষার উপায় ও মন্দ হিসাব-নিকাশ থেকে মুক্তির কারণ করে দাও।

অতঃপর প্রস্তরময় ভূমিতে গোসল করবে; সুগন্ধি লাগাবে এবং

নিজের উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে। এর পর বিনয় ও তাযীম সহকারে মদীনায় প্রবেশ করবে এবং এই দোয়া পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ـ

শুরু আল্লাহর নামে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ধর্মের নিয়মে। পরওয়ারদেগার, আমাকে সত্যের উপর দাখিল কর, সত্যের উপর বের কর এবং আমার জন্যে তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য বরাদ্দ কর।

অতঃপর মসজিদের উদ্দেশে রওয়ানা হবে। মসজিদের অভ্যন্তরে গিয়ে মিম্বরের কাছে এভাবে দু'রাকআত নামায পড়বে যেন মিম্বরের স্তম্ভ ডান কাঁধের বরাবর থাকে, মুখ সেই স্তম্ভের দিকে থাকবে, যার বরাবরে সিন্দুক রাখা আছে এবং মসজিদের কেবলায় অবস্থিত বৃত্তটি চোখের সামনে থাকবে। এ স্থানটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাঁড়ানোর জায়গা ছিল। ইদানীং মসজিদের যদিও পরিবর্তন হয়েছে, তথাপি চেষ্টা করবে যাতে পরিবর্তনের পূর্বেকার আসল মসজিদে নামায পড়া যায়। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রওযা মোবারকে যাবে এবং তাঁর মুখমণ্ডলের বামে এমনভাবে দাঁড়াবে যে, পিঠ কা'বার দিকে এবং মুখ রওযা মোবারকের প্রাচীরের দিকে থাকবে। সেই প্রচীরের কোণের স্তম্ভ থেকে চার হাত দূরে দাঁড়াবে। প্রাচীরে হাত লাগানো অথবা চুম্বন করা সুন্নত নয়; বরং তাযীম সহকারে দূরে দাঁড়ানো অধিকতর সমীচীন। দাঁড়িয়ে বলবে ঃ সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর নবী! সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর বিশ্বস্ত! সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর হাবীব। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর মনোনীত। সালাম তোমার প্রতি হে আল্লাহর পছন্দনীয়। সালাম তোমার প্রতি হে আহমদ। সালাম তোমার প্রতি হে মুহাম্মদ। সালাম তোমার প্রতি হে আবুল কাসেম। সালাম তোমার প্রতি হে কুফর বিলুপ্তকারী। সালাম তোমার প্রতি হে পেছনে আগমনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে সতর্ককারী। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্রতম। সালাম তোমার প্রতি হে পবিত্র। সালাম তোমার প্রতি হে আদম সন্তানের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত। সালাম তোমার প্রতি হে রসূলগণের সর্দার। সালাম তোমার প্রতি হে সর্বশেষ

নবী। সালাম তোমার প্রতি হে বিশ্ব পালনকর্তার রসূল। সালাম তোমার প্রতি হে কল্যাণের নেতা। সালাম তোমার প্রতি হে পুণ্য উদঘাটনকারী। সালাম তোমার প্রতি হে রহমতের নবী। সালাম তোমার প্রতি হে উম্মতের পথপ্রদর্শক। সালাম তোমার প্রতি হে উজ্জ্বল হাত পা বিশিষ্ট মুমিনদের নেতা। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পরিবারবর্গের প্রতি, যাঁদের থেকে আল্লাহ নাপাকী দূর করেছেন এবং যাঁদেরকে পবিত্র করেছেন। সালাম তোমার প্রতি এবং তোমার পূত পবিত্র সহচরগণের প্রতি এবং তোমার পবিত্রাত্মা সহধর্মিণীগণের প্রতি, যাঁরা মুমিনগণের জননী। আল্লাহ তোমাকে আমাদের পক্ষ থেকে এমন প্রতিদান দিন যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীকে তাঁর কওমের পক্ষ থেকে এবং কোন রসূলকে তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। যখনই স্মরণকারীরা তোমাকে স্মরণ করে এবং যখনই উদাসীনরা তোমা থেকে উদাসীন হয়। অগ্রগামীদের ও পশ্চাদগামীদের প্রতি। আল্লাহ আমাদেরকে তোমার মাধ্যমে গোমরাহী থেকে বাঁচিয়েছেন। তোমার মাধ্যমে আমাদেরকে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং মূর্খতা থেকে জ্ঞানের পথে এনেছেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, তুমি তাঁর বান্দা, রসূল, বিশ্বস্ত, মনোনীত, সৃষ্টির মধ্যে পছন্দনীয়। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি আল্লাহর পয়গাম পৌছিয়েছ, আমানত যথার্থরূপে আদায় করেছ, উম্মতকে উপদেশ দিয়েছ, শত্রুর সাথে জেহাদ করেছ, উম্মতকে সৎপথে পরিচালিত করেছ এবং আমরণ আপন প্রভুর এবাদত করেছ। অতএব রহমত নাযিল করুন আল্লাহ তোমার প্রতি, তোমার পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, শান্তিবর্ষণ করুন, গৌরব, সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করুন।

যদি কেউ তার সালাম পৌছানোর কথা বলে থাকে, তবে বলবে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ فُلَانٍ অমুকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি সালাম।

অতঃপর এক হাত পরিমাণ সরে এসে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর প্রতি সালাম পড়বে। কেননা, তাঁর মাথা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাঁধের কাছে রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ)-এর মাথা হযরত আবু বকরের কাঁধের কাছে রয়েছে। তাই আরও এক হাত সরে এসে তাঁকেও সালাম

বলবে এবং এই দোয়া পাঠ করবে–

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيْرَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُعَاوِنِيْنَ لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِالدِّيْنِ مَادَامَ حَيًّا وَالْقَائِمِيْنَ فِىْ فَجَزَاكُمَا اللّٰهُ خَيْرَ مَاجُزِىَ وَزِيْرَىْ نَبِىٍّ عَنْ دِيْنِهٖ -

"তোমাদের প্রতি সালাম হে রসূলুল্লাহর উযীরদ্বয়, তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত ধর্মের কাজে তাঁর সাহায্যকারীদ্বয় এবং তাঁর পরে উম্মতের মধ্যে ধর্মীয় কাজের ব্যবস্থাপকদ্বয়। তোমরা এক্ষেত্রে তাঁর হাদীস অনুসরণ করেছ এবং তাঁর সুন্নত মেনে চলেছ। অতএব তোমাদেরকে আল্লাহ এমন প্রতিদান দিন, যা সেই প্রতিদান থেকে উত্তম, যা কোন নবীর উযীরদ্বয়কে তাঁর ধর্মের পক্ষ থেকে দিয়েছেন।"

এর পর সরে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মাথার কাছে কবর ও ইদানীং নির্মিত স্তম্ভের মাঝখানে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করবে এবং বলবে ঃ ইলাহী, তুমি বলেছ এবং তোমার কথা সত্য–

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا -

"যদি তারা নিজেদের উপর জুলুম করার পর তোমার কাছে আসে, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চায়, তবে তারা আল্লাহকে তওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।"

ইলাহী, আমরা তোমার এরশাদ শুনেছি, তোমার আদেশ পালন করে তোমার রসূলের কাছে এসেছি এবং তাঁকে তোমার দরবারে আমাদের অজস্র গোনাহের ব্যাপারে সুপারিশকারী করেছি। আমরা গোনাহ্ থেকে তওবা করছি এবং নিজেদের ভুলত্রুটি স্বীকার করছি। ইলাহী, আমাদের তওবা কবুল কর, নবী করীম (সাঃ)-এর সুপারিশ আমাদের ব্যাপারে

মঞ্জুর কর এবং তোমার কাছে তাঁর মর্যাদার দৌলতে আমাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান কর।

এর পর বলবে-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَاغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ مِنْ قَبْرِ نَبِيِّكَ وَمِنْ حَرَمِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

হে আল্লাহ! মুহাজির ও আনসারগণকে ক্ষমা কর এবং ক্ষমা কর আমাদেরকে এবং আমাদের সেই ভাইদেরকে, যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের সাথে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। হে আল্লাহ! একে তোমার নবীর কবরে এবং তোমার হরমে আমার শেষ উপস্থিতি করো না হে পরম দয়ালু।

এর পর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়বে এবং অনেক দোয়া করবে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন-

"আমার কবর ও মিম্বরের মধ্যস্থলে বেহেশতের একটি বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর হাউজে কাওসারের উপর অবস্থিত।" সুতরাং মিম্বরের কাছে দোয়া করবে। মিম্বরের নীচের স্তরে হাত রাখা মোস্তাহাব। বৃহস্পতিবার দিন ওহুদ পাহাড়ে যাওয়া এবং শহীদগণের কবর যিয়ারত করা মোস্তাহাব। অর্থাৎ ফজরের নামায মসজিদে নববীতে পড়ে যিয়ারত করতে যাবে এবং ফিরে এসে যোহরের নামায মসজিদে নববীতে পড়বে। এতে কোন ফরয নামায মসজিদের জামাআত থেকে ফওত হবে না। আরও মোস্তাহাব এই যে, প্রত্যহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করার পর জান্নাতুল বাকী গোরস্থানে যাবে এবং হযরত ওসমান গনী, হযরত হাসান (রাঃ), হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও ইমাম জা'ফর সাদেকের কবর যিয়ারত করবে এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর মসজিদে নামায পড়বে। এছাড়া হযরত ইবরাহীম ইবনে রসূলুল্লাহ (সাঃ), হযরত সফিয়্যা প্রমুখের কবরও যিয়ারত করবে। তাঁরা জান্নাতুল বাকীতেই সমাহিত রয়েছেন।

প্রত্যেক শনিবারে মসজিদে কোবায় গিয়ে নামায পড়াও মোস্তাহাব।

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন– যে কেউ বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদে কোবায় এসে নামায পড়ে, তার জন্যে এক ওমরার সমান সওয়াব রয়েছে। মসজিদে কোবা সংলগ্ন আরিস কূপের যিয়ারত করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এতে থুথু মোবারক নিক্ষেপ করেছিলেন। এমনিভাবে আরও মসজিদসমূহের যিয়ারত করবে। কথিত আছে, মদীনায় মসজিদ ও যিয়ারতের স্থান সর্বমোট ত্রিশটি। যতদূর সম্ভব এগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেসব কূপে ওযু করতেন, সেগুলোতে যাবে এবং রোগমুক্তির জন্যে তাবাররুক মনে করে সেগুলোর পানি দিয়ে গোসল করবে এবং পান করবে। এরূপ কূপ সাতটি।

যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে মদীনায় বসবাস করতে পারলে তার সওয়াব অনেক বেশী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

لايصبر على لاوائها وشدتها احد الا كنت له شفيعا يوم القيامة ـ

"যেব্যক্তি মদীনার কষ্ট সহ্য করে সেখানে বসবাস করে, আমি কেয়ামতের দিন তার জন্যে সুপারিশকারী হব।"

তিনি আরও বলেন–

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت فانه لن يموت بها احد الا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة

"যে মদীনায় মরতে সক্ষম হয়, সে যেন মদীনাতে মরে। কেননা, যে কেউ মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে, আমি তার জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী অথবা সাক্ষ্যদানকারী হব।।"

কাজ শেষে মদীনা ত্যাগ করার ইচ্ছা করলে মোস্তাহাব হচ্ছে, রওযা মোবারকে পুনরায় আসবে এবং পূর্বোল্লিখিত যিয়ারতের দোয়া পাঠ করবে। অতঃপর রসূলে খোদা (সাঃ)-এর কাছ থেকে বিদায় নেবে এবং পুনরায় যিয়ারতে হাযির হওয়ার তওফীক দানের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। এর পর ছোট রওযায় দু'রাকআত নামায পড়বে। এটা মসজিদের ভিতরকার সেই স্থান, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়াতেন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা, পরে ডান পা বাইরে রাখবে এবং এই দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْهُ اٰخِرَ الْعَهْدِ بِبَيْتِكَ وَحُطَّ اَوْزَارِيْ بِزِيَارَتِهٖ وَاصْحَبْنِيْ فِيْ سَفَرِي السَّلَامَةَ وَيَسِّرْ رُجُوْعِيْ اِلٰى اَهْلِيْ وَوَطَنِيْ سَالِمًا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ـ

"হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রহমত নাযিল কর। একে তোমার গৃহে আমার শেষ উপস্থিতি করো না। এর যিয়ারত দ্বারা আমার পাপের বোঝা নামিয়ে দাও। সফরে নিরাপত্তাকে আমার সঙ্গী কর এবং আমার নিরাপদে দেশে ফেরা সহজ কর হে পরম দয়ালু।"

সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সুন্নত

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন জেহাদ অথবা হজ্জ ইত্যাদি থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন উচ্চ ভূমিতে তিন বার আল্লাহু আকবর বলতেন এবং এই দোয়া পাঠ করতেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ رَبَّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهٗ ـ

অর্থাৎ, আমরা ফিরে এসেছি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, এবাদতকারী, সেজদাকারী ও প্রভুর প্রশংসাকারী হয়ে। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা সত্য করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং শত্রু বাহিনীকে একা পরাস্ত করেছেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এ শব্দও বর্ণিত আছে–

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ব্যতীত সবকিছু ধ্বংস হবে। রাজত্ব তাঁরই। তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। সফর থেকে ফেরার সময় এই সুন্নত পালন করা উচিত।

আপন বসতি এলাকা দৃষ্টিগোচর হলে সওয়ারী দ্রুত চালাবে এবং এই দোয়া পড়বে– اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَرِزْقًا হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এতে স্থিতি ও উত্তম রিযিক নসীব কর।

এর পর গৃহে খবর পৌঁছানোর জন্যে কাউকে পাঠাবে। কেননা, পূর্বাহ্নে ফিরে আসার সংবাদ দেয়া সুন্নত। রাতের বেলায় গৃহে আসা ঠিক নয়। শহরে প্রবেশ করে প্রথমে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায পড়বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করতেন। গৃহে প্রবেশ করে বলবে–

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا اَوْبًا لَايُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا ـ

আমি তওবাপরওয়ারদেগারের প্রতি সফর থেকে ফেরা অবস্থায়, যাতে তিনি কোন গোনাহ না রাখেন।

বাড়ীতে থাকাকালে আল্লাহ তাআলা বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও রওযা মোবারকের যিয়ারতের যে নেয়ামত দান করেছেন, তা বিস্মৃত হবে না এবং এর প্রতি উদাসীন হয়ে ক্রীড়া কৌতুক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে অকৃতজ্ঞ হবে না। কেননা, এটা মকবুল হজ্জের পরিচায়ক নয়। বরং মকবুল হজ্জের আলামত হচ্ছে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত এবং আখেরাতের প্রতি অধিক আসক্ত হবে এবং গৃহের যিয়ারতের পর গৃহের মালিক আল্লাহর যিয়ারতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

হজ্জের আভ্যন্তরীণ আদব নিম্নরূপ–

(১) হালাল অর্থ ব্যয় করে হজ্জ করা এবং এমন কোন ব্যবসা বাণিজ্যের সাথে জড়িত না হওয়া, যদ্দ্বারা মনোযোগ বিভক্ত হয়ে পড়ে; বরং মনোযোগ বিশেষভাবে কেবল আল্লাহর যিকির ও তাঁর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে নিবিষ্ট হওয়া। এক হাদীসে বর্ণিত আছে– শেষ যমানায় মানুষ চার ভাগে বিভক্ত হয়ে হজ্জ করতে বের হবে। এক, রাজা-বাদশাহ ও শাসনকর্তারা দেশ ভ্রমণ ও তামাশার উদ্দেশে; দুই, ধনী

ব্যক্তিরা ব্যবসার খাতিরে; তিন, ফকীররা ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে এবং চার, আলেমরা সুখ্যাতি লাভের আশায় হজ্জে যাবে। এ হাদীসে দুনিয়ার সেসব উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেগুলো হজ্জে অর্জিত হতে পারে। এগুলো হজ্জের ফযীলতের পরিপন্থী। যারা এসব উদ্দেশ্য নিয়ে হজ্জ করে, তারা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের তালিকা থেকে বাদ পড়ে; বিশেষতঃ এসব উদ্দেশ্য যদি বিশেষভাবে হজ্জের সাথেই সম্পৃক্ত হয়। উদাহরণতঃ মজুরি নিয়ে অন্যের জন্যে হজ্জ করলে আখেরাতের কাজে দুনিয়া তলব করা হবে। পরহেযগারদের কাছে এটা নিন্দনীয়। হাঁ, যদি কেউ মক্কায় বসবাস করার নিয়ত করে এবং সেখানে পৌঁছার খরচ তার কাছে না থাকে, তবে এ নিয়তে অন্যের কাছ থেকে কিছু নেয়ায় দোষ নেই। মোট কথা, আখেরাতকে দুনিয়া লাভের উপায় করবে না; বরং দুনিয়াকে আখেরাত লাভের উপায় করতে হবে। অন্যের হজ্জ করার বেলায় কাবার যিয়ারত এবং মুসলমান ভাইয়ের ফরয আদায় করার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার নিয়ত করতে হবে। এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তাআলা এক হজ্জের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে দাখিল করবেন– প্রথম, যে হজ্জের ওসিয়ত করে, দ্বিতীয়, যে হজ্জ জারি করে এবং তৃতীয়, যে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করে। আমরা একথা বলি না যে, যেব্যক্তি নিজের হজ্জ করে নিয়েছে, তার জন্যে অপরের হজ্জের মজুরি নেয়া নাজায়েয ও হারাম। বরং আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এরূপ না করা উত্তম। একে পেশা ও ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা আখেরাতের কারণে দুনিয়া দিয়ে দেন; কিন্তু দুনিয়ার কারণে আখেরাত দান করেন না। কিরূপ মজুরি নেয়া জায়েয, তার দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত আছে। যেব্যক্তি আল্লাহর পথে জেহাদ করে এবং মজুরি গ্রহণ করে, সে হযরত মূসা (আঃ)-এর জননীর মত। তিনি আপন শিশুকে দুগ্ধ পান করিয়ে তার মজুরি গ্রহণ করতেন। অতএব যেব্যক্তি হজ্জের বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করার ব্যাপারে মূসা জননীর মত হয়, তার জন্যে মজুরি নেয়ায় কোন দোষ নেই; অর্থাৎ হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতে সক্ষম হওয়ার উদ্দেশেই মজুরি নেবে এবং মজুরি পাওয়ার উদ্দেশে হজ্জ করবে না। যেমন মূসা জননীর মজুরি নেয়ার কারণ ছিল আপন শিশুকে দুগ্ধ পান করানো এবং নিজের অবস্থাও মানুষের কাছে গোপন রাখা।

(২) পথিমধ্যে খোদাদ্রোহীদেরকে টাকা পয়সা দেবে না। যারা টাকা-পয়সা নেয়, তারা মক্কার ধনী ও আরব সরদারদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। এরা পথের মধ্যে বসে মানুষকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দেয়। এদেরকে টাকা পয়সা দেয়া জুলুমের কাজে সাহায্য করা এবং জুলুমের উপকরণ সরবরাহ করার নামান্তর। তাই এই অর্থ দেয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্যে কোন উপায় অবশ্যই করা উচিত। কোন কোন আলেম বলেন ঃ নফল হজ্জ না করা এবং রাস্তা থেকে ফিরে আসা এই জালেমদেরকে সাহায্য করার চেয়ে উত্তম। এটা একটা নবাবিষ্কৃত বেদআত। এটা মেনে নেয়ার অনিষ্ট হচ্ছে, এতে করে এই জুলুম একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত হবে। এটা বহাল থাকার মধ্যে রয়েছে মুসলমানদের অপমান ও লাঞ্ছনা। আলেম ঠিকই বলেছেন। এ টাকা পয়সা জবরদস্তিমূলকভাবে নেয়া হয়। কাজেই এতে দাতার কোন দোষ নেই। একথা বলে কেউ দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না। কেননা, ঘরে বসে থাকলে অথবা রাস্তা থেকে ফিরে এলে কেউ জোর করে টাকা-পয়সা নেবে না। এই জালেমরা যাকে সুখী সচ্ছল দেখে, তার কাছেই বেশী চায়। ফকীরের বেশে দেখলে কেউ চায় না। কাজেই বুঝা গেল, এই অপারগ অবস্থাটা নিজেরই সৃষ্টি করা।

(৩) পাথেয় অধিক পরিমাণে সঙ্গে নেবে। কৃপণতা ও অপব্যয় ছাড়া মাঝারি পন্থায় সানন্দে দান ও ব্যয় করবে। অপব্যয়ের অর্থ আমাদের মতে উৎকৃষ্ট খাদ্য খাওয়া এবং ধনীদের ন্যায় বিলাস-ব্যসনের আসবাবপত্র রাখা। অধিক দান খয়রাতে অপব্যয় হয় না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ অপব্যয়ে কল্যাণ নেই এবং খয়রাতে অপব্যয় নেই। হজ্জের পথে পাথেয় দান করে দেয়ার মানে আল্লাহর পথে ব্যয় করা, যাতে এক দেরহাম সাতশ' দেরহামের সমান হয়ে থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ সফরে ভাল পাথেয় রাখাও দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত। হাজীদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার নিয়ত সর্বাধিক খাঁটি, পাথেয় পবিত্র এবং বিশ্বাস ভাল হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة فقيل يا

رسول الله ما بر الحج فقال طيب الكلام واطعام الطعام ـ

অর্থাৎ, মকবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া কিছুই নয়। কেউ জিজ্ঞেস করল, মকবুল হজ্জ কি, তিনি বললেন ঃ ভাল কথা বলা এবং আহার করানো।

(৪) হজ্জে গিয়ে অশ্লীলতা, অপকর্ম ও কলহ বিবাদ করা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

অর্থাৎ, রফস, ফুসুক ও জিদাল হজ্জে নেই। রফসের মধ্যে সর্বপ্রকার অনর্থক অশ্লীল কথাবার্তা অন্তর্ভুক্ত। নারীদের সাথে কথাবার্তা বলা, দৌড়াদৌড়ি করা, সঙ্গমের অবস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনা করাও এর মধ্যে দাখিল। কেননা, এসব বিষয় দ্বারা সহবাসের আগ্রহ জাগে, যা হজ্জে নিষিদ্ধ এবং নিষিদ্ধ কাজের আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়ও নিষিদ্ধ। 'ফুসুক' শব্দের অর্থ আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে যাওয়া, তা যেভাবেই হোক। জিদাল বলে যে ঝগড়া-বিবাদ পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাকে। হযরত সুফিয়ান সওরী বলেন ঃ যেব্যক্তি হজ্জে নির্লজ্জ কথা বলে, তার হজ্জ কলুষিত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাল কথা বলা এবং আহার করানোকে মকবুল হজ্জ বলেছেন। কথা কাটাকাটি করা ভাল কথার বিপরীত। তাই জরুরী যে, হজ্জের পথে মানুষ তার সঙ্গী, খাদেম প্রমুখের কাজে বেশী আপত্তি করবে না; বরং সকল হাজীর সামনে নত হয়ে থাকবে। সচ্চরিত্রতা নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নেবে। অপরকে কষ্ট না দেয়াই কেবল সচ্চরিত্রতা নয়; বরং অপরের দেয়া কষ্ট নীরবে সহ্য করাও সচ্চরিত্রতা। কেউ কেউ বলে ঃ সফরকে সফর বলার কারণ, সফর মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে তোল। এ কারণেই এক ব্যক্তি যখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করল, সে অমুক ব্যক্তিকে চেনে, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি কখনও তার সাথে সফরে ছিলে? সে বলল ঃ না, কখনও ছিলাম না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তা হলে আমার জানামতে তুমি তাকে চেন না। কেননা সফর দ্বারা মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী জানা যায়।

(৫) যদি শক্তি থাকে, তবে পদব্রজে হজ্জ করবে। এটা উত্তম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে পুত্রদেরকে ওসিয়ত করেন– বৎসগণ! পায়ে হেঁটে হজ্জ করবে। কেননা, যে পায়ে হেঁটে হজ্জ করে, সে প্রতি পদক্ষেপে হরমের নেকীসমূহ থেকে সাতশ' নেকী পায়। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ হরমের নেকী কি? তিনি বললেন ঃ এক নেকী লাখ নেকীর সমান। হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্য পথের তুলনায় মক্কা থেকে আরাফাত পর্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে চলা অধিক মোস্তাহাব। যদি পাঁয়ে হাঁটার সাথে আপন গৃহ থেকেই এহরামও বেঁধে নেয় তবে কথিত আছে, এটা হচ্ছে হজ্জ পূর্ণ করা, যার আদেশ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ, হজ্জ ও ওমরাকে আল্লাহর জন্যে পূর্ণ কর। হযরত ওমর, হযরত আলী ও হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এ আয়াতের তফসীর তাই করেছেন। কোন কোন আলেম বলেন ঃ সওয়ার হওয়া উত্তম। এতে অর্থ ব্যয় হয় এবং মন সংকীর্ণ হয় না। কষ্টও কম হয়। এতে নিরাপত্তা ও হজ্জ পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে দেখলে এ উক্তি প্রথম উক্তির বিপরীত নয়। কাজেই পদব্রজে চলা যার পক্ষে সহজ, তার জন্যে পদব্রজে চলা উত্তম। আর যদি কেউ দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা হজ্জের ক্রিয়াকর্মে ত্রুটি দেখা দেয়, তবে তার জন্যে সওয়ার হওয়া উত্তম। জনৈক আলেমকে কেউ প্রশ্ন করল, ওমরার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম, না এক দেরহাম দিয়ে একটি গাধা ভাড়া করে নেবে? বললেন– যদি এক দেরহাম ব্যয় করা তার কাছে অধিক অপ্রিয় হয়, তবে গাধা ভাড়া করা তার জন্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার তুলনায় উত্তম। আর যদি ধনীদের ন্যায় পায়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর মনে হয় তবে পায়ে হেঁটে যাওয়া উত্তম। এ জওয়াবে যে দিক অবলম্বন করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে মনের বিরুদ্ধে জেহাদ করা। মোট কথা, এটাও একটা দিক। কিন্তু পায়ে হেঁটে যাওয়াই উত্তম। এমতাবস্থায় সওয়ারীতে যে টাকা ব্যয় হত, তা খয়রাত করে দেবে। আর যদি কারও মন পায়ে হাঁটা ও খয়রাত করার দ্বিগুণ কষ্ট পছন্দ না করে তবে উপরোক্ত আলেম বর্ণিত পন্থাই উত্তম।

(৬) ভগ্নদশা, এলোকেশ ও ধুলাধূসরিত থাকবে– সাজসজ্জা করবে না এবং গর্ব ও ধনাঢ্যতার সামগ্রীর প্রতি প্রবণতা দেখাবে না, যাতে

কোথাও অহংকারী ও আরামপ্রিয়দের তালিকাভুক্ত না হয়ে যায় এবং ফকীর, মিসকীন ও সংকর্মপরায়ণদের কাতার থেকে খারিজ না হয়ে যায়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক হাদীসে মলিন বদন থাকা ও পায়ে হাঁটার আদেশ করেছেন এবং অলসতা বিলাসিতা করতে নিষেধ করেছেন। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– হাজী সে ব্যক্তির যার কেশ এলোমেলো থাকে এবং শরীর থেকে গন্ধ আসে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ আমার গৃহের যিয়ারতকারীদেরকে দেখ, কেমন প্রশস্ত ও গভীর গিরিপথ দিয়ে মলিন বদন ও ধুলাধূসরিত অবস্থায় চলে আসছে। এক আয়াতে আছে– ثُمَّ لْيَقْضُوْا تَفَثَهُمْ অর্থাৎ, এর পর তারা তাদের ধুলা-ময়লা খতম করুক। تفث শব্দের অর্থ চুল এলোমেলো এবং ধুলাধূসরিত হওয়া। একে খতম করার অর্থ কেশ মুণ্ডন করা, গোঁফ ও নখ কাটা। হযরত ওমর (রাঃ) সেনানায়কদের চিঠি লেখেন যে, পুরাতন বস্ত্র পরিধান কর এবং কঠোরতা সহ্য করার অভ্যাস গড়ে তোল। কেউ বলেন ঃ ইয়ামনবাসীরা হাজীদের সৌন্দর্য। কেননা, তারা বিনম্র, ভগ্নদশা এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের চরিত্রে চরিত্রবান। বিশেষভাবে লাল পোশাকে পরিধান এবং সুখ্যাতির বিষয়াদি থেকে সাধারণত বিরত থাকতে হবে। বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক সফরে ছিলেন। তাঁর সহচরগণ এক মনযিলে নেমে উট চরাতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, উটের গদিতে লাল রংয়ের চাদর পড়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ আমার মনে হয়, এই লাল রং তোমাদের উপর প্রবল হয়ে গেছে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ একথা শুনে আমরা সকলেই উঠে দাঁড়ালাম এবং চাদরগুলো উটের পিঠ থেকে নামিয়ে দিলাম। ফলে কতক উট পালিয়ে গেল।

(৭) চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করবে এবং সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা সেটির পিঠে চাপাবে না। উটের পিঠে খাট সংযুক্ত করাও তার শক্তির বাইরে এবং এর উপর নিদ্রা যাওয়া সেটির জন্যে কষ্টকর। বুযুর্গগণের নিয়ম ছিল, তাঁরা উটের পিঠে নিদ্রা যেতেন না; কেবল বসে বসে ঝিমিয়ে নিতেন। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত জন্তুর পিঠে থাকতেন না; বরং কিছু সময় বসতেন এবং কিছু সময় নেমে পায়ে হেঁটে যেতেন। রসূলে

করীম (সাঃ) বলেন ঃ তোমরা উটের পিঠকে চৌকি বানিয়ে নিয়ো না। কাজেই সকালে জন্তুকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে জন্তুর পিঠ থেকে নেমে পড়া উচিত। এটা সুন্নত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ থেকেও এ বিষয়টি বর্ণিত আছে। কোন কোন বুযুর্গ জন্তু ভাড়া করার সময় শর্ত করতেন, জন্তুর পিঠ থেকে নামবেন না এবং পূর্ণ ভাড়া দেবেন। এর পর নেমে পড়তেন, যাতে জন্তু আরাম পায় এবং তার সওয়াব তাঁদের আমলনামায় লিখিত হয়, মালিকের আমলনামায় লিখিত না হয়ে।

যেব্যক্তি জন্তুকে কষ্ট দেয় এবং সেটির উপর সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপায়, কেয়ামতের দিন তাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উটকে বললেন ঃ কেয়ামতের দিন পরওয়ারদেগারের সামনে আমার সাথে বিতর্ক করবে না। আমি কখনও তোর পিঠে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপাইনি। সারকথা, প্রত্যেক জন্তুর সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে সওয়াব রয়েছে। কিছুক্ষণের জন্যে নেমে পড়লে জন্তুও আরাম পায় এবং মালিকও খুশী হয়। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মোবারকের কাছে আরজ করল ঃ অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার চিঠিখানা নিয়ে যান এবং প্রাপককে পৌঁছে দিন। তিনি বললেন ঃ আমি উটের মালিককে জিজ্ঞেস করে নেই। সে অনুমতি দিলে তোমার চিঠি নিয়ে যাব। আমি উটটি ভাড়া করে নিয়েছি। এ ঘটনায় শিক্ষণীয় যে, চিঠি নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেও হযরত ইবনে মোবারক কতটুকু সাবধানতা অবলম্বন করলেন! অথচ চিঠির কোন ওজন হয় না। বলাবাহুল্য, তাকওয়ার ক্ষেত্রে এটাই সতর্কতার পথ। কেননা, বিনানুমতিতে সামান্য ওজন বহন করার পথ খোলা হলে আস্তে আস্ত বেশী বোঝা চাপিয়ে দিতেও মানুষ কুণ্ঠিত হয় না।

(৮) হজ্জে ওয়াজেব না হলেও নৈকট্য লাভের নিয়তে জন্তু যবেহ্ করবে। আর কোরবানীর জন্য উৎকৃষ্ট ও মোটা তাজা জন্তু ক্রয় করার চেষ্টা করবে। নফল কোরবানীর গোশত থেকে নিজে খাবে, ওয়াজেব কোরবানী হলে খাবে না।

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ (যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের সম্মান করে)- এই আয়াতের তফসীরে কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহর

নিদর্শনসমূহের সম্মান করার অর্থ উৎকৃষ্ট ও মোটাতাজা জন্তু কোরবানী করা।

কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হলে মীকাত থেকে কোরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে যাওয়া উত্তম। কোরবানীর জন্তু ক্রয় করার সময় কম মূল্যে ক্রয় করার চিন্তা করবে না। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ তিনটি বস্তু বেশী মূল্যে ক্রয় করতেন- এতে কম মূল্যে ক্রয় করার চেষ্টা খারাপ মনে করতেন- হজ্জে যবেহ্ করার জন্তু, কোরবানীর জন্তু এবং গোলাম। কেননা, এগুলোর মধ্যে সেটিই উৎকৃষ্ট ও উত্তম, যার মূল্য বেশী। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত ওমরের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি একবার হজ্জে যবেহ করার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান উষ্ট্রী সংগ্রহ করেন। লোকেরা তাঁর কাছ থেকে উষ্ট্রীটি তিনশ' আশরাফী দিয়ে কিনে নিতে চাইলে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে আরজ করলেন- আপনি অনুমতি দিলে এটি বিক্রয় করে এর মূল্য দিয়ে অনেকগুলো উট নিয়ে নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, হাদীর জন্যে এটিই পাঠিয়ে দাও। এর কারণ, উৎকৃষ্ট একটি বস্তু অনেকগুলো নিকৃষ্ট বস্তু অপেক্ষাও শ্রেয়। তখনকার দিনে তিনশ' আশরাফী দিয়ে ত্রিশটি উট কেনা যেত। এতে গোশতের প্রাচুর্য হত। কিন্তু কোরবানীতে গোশত উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে কৃপণতার দোষ থেকে পবিত্র করা এবং খোদায়ী তাযীমের অলংকার দ্বারা অলংকৃত করা। আল্লাহ্ বলেন-

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ـ

অর্থাৎ, "আল্লাহর কাছে কোরবানীর জন্তুর মাংস পৌঁছে না, রক্তও না, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া তথা খোদাভীতি।"

বেশী মূল্যে ক্রয় করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হয়- জন্তুর সংখ্যা কম হোক কিংবা বেশী। এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ মকবুল হজ্জ হচ্ছে জোরে লাব্বায়কা বলা এবং উষ্ট্রী কোরবানী করা। হযরত আয়েশার রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ কোরবানীর দিন আল্লাহ তাআলার কাছে মানুষের কোন আমল যবেহ্ করার চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। এই

কোরবানী কেয়ামতের দিন শিং ও খুরসহ উপস্থিত হবে। এ কোরবানীর রক্ত মাটিতে পড়ার আগে আল্লাহর কাছে একটি মর্তবা অর্জন করে নেয়। অতএব এতে তোমরা মনে মনে খুশি হও। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্যে সেটির ত্বকের প্রতিটি লোমের বদলে সওয়াব রয়েছে এবং রক্তের প্রতিটি ফোঁটার বিনিময়ে নেকী রয়েছে। এগুলো দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হবে। অতএব তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

(৯) হজ্জে কোরবানীর জন্তু ও দান খয়রাতে যা ব্যয়িত হয় তজ্জন্য মনে মনে আনন্দিত হবে। অনুরূপভাবে কোন ক্ষতি অথবা আর্থিক ও দৈহিক বিপদ হলে তজ্জন্যে দুঃখ করবে না। এটা হজ্জ কবুল হওয়ার আলামত। হজ্জের পথে ক্ষতি ও বিপদ হলে তাতে এমন সওয়াব পাওয়া যায়, যেমন আল্লাহর পথে এক দেরহাম খরচ করলে তাতে দশ দেরহামের সমান সওয়াব পাওয়া যায়। কথিত আছে, মকবুল হজ্জের অন্যতম আলামত হচ্ছে পূর্বে যে সকল গোনাহ করত, হজ্জের পর সেগুলো না করা। সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ভ্রাতৃত্ব করা এবং খেলাধুলা ও গাফিলতির মজলিসের পরিবর্তে আল্লাহর যিকিরের মজলিসে যাতায়াত করা।

নিয়ত খাঁটি করা ও পবিত্র স্থানসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার উপায়

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জে সর্বপ্রথম বুঝতে হবে, ধর্মের মধ্যে এর মর্তবা কি, এর পর হজ্জ করার আগ্রহ হওয়া, ইচ্ছা করা, সকল বাধা-বিপত্তি দূর করা, এহরামের বস্ত্র ক্রয় করা, পাথেয় সংগ্রহ করা, সওয়ারীর জন্তু ভাড়া করা, দেশের বাইরে যাওয়া, পথ অতিক্রম করা, মীকাত থেকে লাব্বায়কা সহকারে এহরাম বাঁধা, মক্কায় প্রবেশ করা এবং পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী হজ্জ সম্পন্ন করা। –এসব বিষয়ের প্রত্যেকটিতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্যে উপদেশ এবং শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে, জ্ঞানীদের জন্যে আছে অর্থবহ ইঙ্গিত।

এক্ষণে আমরা এ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয় উল্লেখ করছি। এগুলো সম্যক বুঝে এর কারণসমূহ জেনে নিলে প্রত্যেক হাজী

তার অন্তরের স্বচ্ছতা ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অনুযায়ী এসবের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

বোধ– জানা উচিত, মানুষ যে পর্যন্ত কামনা-বাসনা থেকে পবিত্র না হয়, অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহকে যথেষ্ট মনে করে ভোগ-বিলাস থেকে বিরত না হয় এবং তার সকল আচার-আচরণ ও চলাফেরা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্যে না হয়ে যায়, সে পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জন সম্ভব নয়। এজন্যেই পূর্ববর্তী ধর্মসমূহের অনুসারীরা মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতো, গভীর বনে অথবা পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করতো এবং আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গ লাভের উদ্দেশে সাময়িক ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করে পরকালীন স্থায়ী সুখের আশায় কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করতো। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে তাদের প্রশংসা করে বলেন–

ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ -

অর্থাৎ, এটা এ কারণে যে, তাদের মধ্যে রয়েছে জ্ঞানীজন ও সংসারত্যাগী দরবেশ এবং তারা অহংকার করে না।

অতঃপর এ বিষয়টি যখন প্রাচীন হয়ে গেল এবং মানুষ কামনা-বাসনার অনুসরণ করার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আল্লাহ্ তাআলার এবাদতের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করতে লাগল, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আখেরাতের পথ পুনঃ প্রবর্তন এবং পূর্ববর্তী রসূলগণের পথে চলা নবায়ন করার জন্যে প্রেরণ করলেন। ইহুদী ও খৃষ্টানরা নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছে ঃ আপনার ধর্মে বৈরাগ্য এবং দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো আছে কিনা? তিনি জওয়াবে বলেছেন– আল্লাহ্ তাআলা এ দু'টি বিষয়ের বিনিময়ে আমাদেরকে দু'টি বিষয় দান করেছেন– জেহাদ ও উচ্চ ভূমিতে তকবীর বলা, অর্থাৎ, হজ্জ। মোট কথা, এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ তাআল্যর এটা অনুগ্রহ যে, হজ্জকে তাদের জন্যে বৈরাগ্য করে দিয়েছেন, এর পর কাবা গৃহকে 'আমার ঘর' বলে সম্মানিত করেছেন এবং তাকে মানুষের অভীষ্ট সাব্যস্ত করেছেন। তিনি কাবার মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্যে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিকে হরম করেছেন এবং

আরাফাতকে হরমের সম্মুখবর্তী মাঠের মত করেছেন। এর পর তিনি এ জায়গায় শিকার ও বৃক্ষ কর্তন হারাম করে এর সম্মান অধিকতর জোরদার করে দিয়েছেন। তিনি একে বাদশাহদের দরবারের মত করেছেন। যিয়ারতকারীরা দূর দূরান্ত থেকে মলিন ও ধূলিধূসরিত অবস্থায় প্রভুর জন্যে নতমস্তকে এবং তাঁর প্রতাপ ও ইযযতের সামনে বিনম্র ও বিনীতভাবে চলে আসে। এতদসত্ত্বেও তারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তাআলা কোন গৃহে আবদ্ধ হওয়া এবং কোন শহরে অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। এতে করে তাদের বন্দেগী বেড়ে যায় এবং আনুগত্য ও বশ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। এ কারণেই হজ্জে এমন সব ক্রিয়াকর্ম ফরয করা হয়েছে, যার সাথে মানুষ পরিচিত নয় এবং বুদ্ধি-বিবেক যার কারণ খুঁজে পায় না। উদাহরণতঃ প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করা, সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে কয়েক বার আসা-যাওয়া করা ইত্যাদি। এ ধরনের ক্রিয়াকর্ম দ্বারা পূর্ণ বন্দেগী প্রকাশ পায়। কেননা, অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে কিছু মানসিক আনন্দ আছে; যেমন যাকাতে দানশীলতা আছে, মন থেকে কৃপণতা দূর করা এর কারণ। এটা বিবেক বুদ্ধির কাম্য। রোযার মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তির দমন আছে, যা শয়তানের হাতিয়ার। নামাযে সেজদা, রুকু ও অন্যান্য নম্রতাসূচক কাজকর্ম করে আল্লাহ তাআলার জন্যে বিনম্র হওয়া আছে এবং আল্লাহর তাযীমের সাথে বান্দা পরিচিত। কিন্তু সায়ীর চক্কর, কংকর নিক্ষেপ এবং এ ধরনের অন্যান্য কিয়াকর্ম পালন করার কারণ আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন বৈ কিছু নয়। কেননা, আল্লাহর আদেশ অবশ্য পালনীয় হয়ে থাকে। এক্ষত্রে বিবেক বুদ্ধির তৎপরতা শিকায় উঠে। কেননা, যেসকল বিষয়ের গূঢ়তত্ত্ব বিবেক বুঝে ফেলে, সেগুলোর প্রতি মনের কিছু আগ্রহ থাকে। এ আগ্রহই সে বিষয়টি পালন করতে উৎসাহ যোগায়। এ ধরনের আদেশ প্রতিপালন দ্বারা পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্য প্রকাশ পায় না। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বিশেষভাবে হজ্জ সম্পর্কে এরশাদ করেন ঃ لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا আমি উপস্থিত আছি সত্যিকার হজ্জের জন্যে এবং বন্দেগীর জন্যে। এ কথা তিনি নামায, রোযা ইত্যাদির বেলায় বলেননি।

মানুষের মুক্তিকে তাদের মনের চাহিদা বিরুদ্ধ ক্রিয়াকর্মের সাথে জড়িত করা এবং মুক্তির লাগাম শরীয়তের এখতিয়ারে রাখা– এ দু'টি বিষয় খোদায়ী রহস্যের কাম্য ছিল, যাতে মানুষ তাদের ক্রিয়াকর্মে আনুগত্যের উপায় সম্পর্কে ইতস্ততঃ করে। এ জন্যে যেসব ক্রিয়াকর্মের কারণ অনুসন্ধানে বিবেক বুদ্ধি পথ পায় না, আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে সেগুলো অবশ্যম্ভাবীরূপে সকল এবাদতের চেয়ে পূর্ণাঙ্গতম এবাদত প্রতিপন্ন হয়েছে। কেননা, মনকে স্বভাব চরিত্রের চাহিদা থেকে সরিয়ে দেয়া গোলামীর লক্ষ্য। এ থেকেই বুঝা যায়, এবাদতসমূহের রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই হজ্জের বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। মূল হজ্জ বুঝার জন্যে এতটুকু বর্ণনাই ইনশাআল্লাহ্ যথেষ্ট।

আগ্রহ– এ বিষয়টি যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করা থেকেই অন্তরে হজ্জ করার আগ্রহ জাগে এবং বিশ্বাস জন্মে যে, গৃহটি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর। তিনি একে রাজকীয় দরবারের অনুরূপ করেছেন। অতএব যেব্যক্তি এ দরবার অভিমুখে যাত্রা করে, সে আল্লাহর দিকে যাত্রা করে এবং তাঁর যিয়ারত করে। যেব্যক্তি দুনিয়াতে এ গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তার যিয়ারত বিনষ্ট না হওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ে তার খোদায়ী দীদার নসীব হওয়াই সমীচীন। কেননা, দুনিয়াতে দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি ও ধ্বংসশীলতার কারণে দীদারের নূর কবুল করা ও তা সহ্য করার ক্ষমতা নেই। পরজগতে দৃষ্টিশক্তি স্থায়িত্বের সহায়তা লাভ করবে এবং পরিবর্তন ও ধ্বংসের কবল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তাই তখন নজর ও দীদারের যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এতদসত্ত্বেও কাবা গৃহে যাওয়ার ইচ্ছা করা ও তার দিকে দৃষ্টিপাত করার কারণে খোদায়ী ওয়াদা অনুযায়ী কাবার মালিককে দেখার হক সৃষ্টি হয়ে যাবে। সুতরাং খোদায়ী দীদারের আগ্রহ কাবা দর্শনের প্রতি আগ্রহান্বিত করবে। কেননা, কাবার দীদার আল্লাহর দীদারের কারণ। এছাড়া আশেকের মনে মাশুকের বস্তুর প্রতি ঔৎসুক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকে। কাবা আল্লাহ্ তাআলার গৃহ। সুতরাং কেবল এই সম্পর্কের দিকে দিয়েই কাবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত সওয়াব লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়া উচিত।

ইচ্ছা– এ ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করবে, কাবা গৃহের যিয়ারতের উদ্দেশেই সে আপন পরিবার-পরিজন ত্যাগ করতে এবং কামনা বাসনা ও ভোগবিলাস বিসর্জন দিতে ইচ্ছুক হয়েছে। সুতরাং সে কাবা গৃহ ও তার

মালিকের মর্যাদা খুব বড় মনে করবে। তার জানা উচিত, সে এক বিরাট কাজের ইচ্ছা করেছে যা অত্যন্ত কষ্টকর। যে বড় কাজের অন্বেষী হয়, সে বড় কষ্টে পড়ে। সে তার ইচ্ছাকে একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে নিবিষ্ট করবে এবং রিয়া ও সুখ্যাতি থেকে দূরে রাখবে। একথা মনে গেঁথে নেবে, একমাত্র খাঁটি ইচ্ছা ও কর্মই মকবুল হবে। এটা খুবই মন্দ কথা, মানুষ বাদশাহের গৃহ ও হরমের নিয়ত করবে আর লক্ষ্য অন্য কিছু সাব্যস্ত করে নেবে। সুতরাং যা উৎকৃষ্ট, তার পরিবর্তে নিকৃষ্টকে অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

সম্পর্কচ্ছেদ– এর উদ্দেশ্য, সকল হকদারকে তাদের হক সমর্পণ করবে এবং যাবতীয় গোনাহ থেকে খাঁটিভাবে তওবা করবে। কেননা, হকও একটি সম্পর্ক এবং প্রত্যেক সম্পর্ক একজন কর্জদাতার অনুরূপ, যে জামার কলার চেপে ধরে বলে ঃ তুমি কোথায় যাচ্ছ? শাহানশাহের গৃহে যেতে চাও, অথচ আপন গৃহে তাঁর আদর্শকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পালন করছ না? তুমি যদি চাও, তোমার যিয়ারত কবুল হোক, তবে তাঁর আদেশ পালন কর। জুলুমের মাধ্যমে যাদের হক ছিনিয়ে নিয়েছ, তাদের হক প্রত্যর্পণ কর। সর্বপ্রথম গোনাহ থেকে তওবা কর এবং অন্তরকে সকল দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নাও, যাতে শাহানশাহের দিকে অন্তরের চেহারা দিয়ে মনোনিবেশ করতে পার। যেমন বাহ্যতঃ তুমি তাঁর গৃহের দিকে মুখ করে আছ। এরূপ না করলে তুমি এই সফর থেকে শুরুতে দুঃখ-কষ্ট এবং পরিণামে ধিকৃত হওয়া ছাড়া আর কিছুই পাবে না। দেশের সাথে সম্পর্ক এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করবে যেন সেখান থেকে চিরতরে বিদায় নেয়া হচ্ছে। মনে করে নেবে যেন সেখানে আর ফিরে আসবে না। পরিবার পরিজন ও সন্তানদের জন্য ওসিয়ত লেখে দেবে। কেননা, মুসাফির ব্যক্তি মৃত্যুর লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে; তবে যাকে আল্লাহ্ রক্ষা করেন তার কথা ভিন্ন। হজ্জের সফর করার জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় স্মরণ করবে, পরকালের সফরের জন্যেও এমনিভাবে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সফর সত্বরই করতে হবে। হজ্জের সফরে যা কিছু করবে তা দ্বারা পরকালের সফর সহজ হওয়ার আশা করবে। এ জন্যে প্রস্তুতিতে পরকালের সফর বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

পাথেয়– হালাল জায়গা থেকে পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। যদি মনে বাসনা থাকে, পাথেয় অনেক হোক, দূর-দূরান্তের সফর সত্ত্বেও তা উদ্বৃত্ত হোক এবং মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে তা ক্ষয়প্রাপ্ত ও পরিবর্তিত না হোক, তবে স্মরণ রাখা উচিত, পরকালের সফর এ সফরের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তার পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা খোদাভীতি। তাকওয়া ব্যতীত অন্য যে বস্তুকে পাথেয় জ্ঞান করা হয় তা মৃত্যুর সময় পশ্চাতে থেকে যাবে এবং ধোঁকা দেবে; যেমন টাটকা রান্না করা খাদ্য সফরের প্রথম মনযিলেই বাসী হয়ে পচে যায়। এর পর ক্ষুধার সময় মানুষ তা খেতে পারে না। কাজেই যে আমল পরকালের পাথেয় সেই আমল যাতে মৃত্যুর পর সঙ্গ ত্যাগ না করে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী।

আরোহণের জন্তু– সফর করার সময় যখন আরোহণের জন্তু সামনে আসে, তখন মনে মনে আল্লাহর নেয়ামতের শোকর করবে যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তুকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যাতে কষ্ট না হয় এবং সফর হাল্‌কা হয়। এ ছাড়া স্মরণ করবে, পরজগতের সওয়ারী একদিন এমনিভাবে সামনে আসবে অর্থাৎ জানাযার প্রস্তুতি হবে এবং তাতে সওয়ার হয়ে পরজগতের সফর করতে হবে। মোট কথা, হজ্জের অবস্থা কিছুটা পরজগতের সফরের অনুরূপ বিধায় জন্তুর পিঠে হজ্জের সফর করাটা পরজগতের পাথেয় হয় কিনা, তা অবশ্যই দেখে নেয়া উচিত। কেননা, পরজগতের সফর মানুষের খুবই নিকটবর্তী। কে জানে মৃত্যু নিকটেই কিনা এবং উটের উপর সওয়ার হওয়ার পূর্বেই শবাধারের উপর সওয়ার হয়ে যাবে কিনা। শবাধারের উপর অবশ্যই সওয়ার হতে হবে। পক্ষান্তরে পাথেয় সংগ্রহ অনিশ্চিত বিধায় হজ্জের সফরও একটি অনিশ্চিত ব্যাপার। সুতরাং অনিশ্চিত সফরে সাবধান হওয়া এবং পাথেয় ও সওয়ারীর জন্তুর সাহায্য নেয়া আর নিশ্চিত সফরের ব্যাপারে গাফেল থাকা কিরূপে শোভনীয় হতে পারে?

এহরামের পোশাক– এহরামের পোশাক ক্রয় করার সময় আপন কাফনও তাতে জড়ানোর কথা স্মরণ করবে। কেননা কাবা গৃহের নিকটে পৌঁছে এহরামের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করবে। সে পর্যন্ত সফর পূর্ণ হয় কিনা কে জানে। কাফনে জড়ানো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ

নিশ্চিত। আল্লাহর ঘরের যিয়ারত যেমন সাধারণ পোশাক পরিচ্ছদের বিপরীত পোশাক ছাড়া হয়নি, তেমনি মৃত্যুর পর আল্লাহর যিয়ারতও সেই পোশাক ব্যতীত হবে না, যা দুনিয়ার পোশাকের বিপরীত। এহরামের পোশাকও কাফনের কাপড়ের অনুরূপ সেলাইবিহীন।

শহর থেকে বের হওয়ার সময় মনে করবে, আমি আমার দেশবাসী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন সফরে যাচ্ছি, যা দুনিয়ার সফরের অনুরূপ নয়। তখন সে মনে মনে চিন্তা করবে, কিসের ইচ্ছা করছে, কোথায় যাচ্ছে এবং কার যিয়ারত করতে রওয়ানা হচ্ছে। তখন বুঝে নেবে, সে রাজাধিরাজের পানে তার যিয়ারতকারীদের দলভুক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে, যারা ডাক দেয়ার সাথে সাথে উপস্থিত হয়েছে, প্রেরণা দেয়ার সাথে সাথে আগ্রহান্বিত হয়েছে এবং আদেশ পেয়ে দূরদূরান্ত এলাকা অতিক্রম করে সকলকে ত্যাগ করে মহীয়ান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী গৃহ অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, যাতে প্রভুর যিয়ারতের পরিবর্তে তার গৃহের যিয়ারত করে অন্তর তুষ্ট করতে এবং অভীষ্ট কামনা সিদ্ধ করতে পারে। অন্তরে কবুলের প্রত্যাশা রাখবে। আপন আমলের উপর ভরসা না করে আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা করবে। তিনি তাঁর গৃহের যিয়ারতকারীদের জন্যে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। কাজেই প্রত্যাশা করবে, তিনি আপন ওয়াদা পূর্ণ করবেন। আরও আশা রাখবে, যদি তুমি কাবা গৃহ পর্যন্ত পৌঁছতে না পার এবং পথিমধ্যে মারা যাও, তবে আল্লাহর সাথে তাঁর পথের পথিক অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে। কেননা, তিনি নিজে বলেন–

وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ۔

যেব্যক্তি দেশত্যাগী অবস্থায় তার গৃহ থেকে আল্লাহ ও রসূলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, এর পর মারা যায়, তার সওয়াব আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয়ে যায়।

জঙ্গলে প্রবেশ করে মীকাত পর্যন্ত গিরিপথসমূহ দেখার সময় সেসব ভয়ংকর অবস্থা স্মরণ করবে যা মৃত্যুর পর দুনিয়া থেকে বের হয়ে কেয়ামতের মীকাত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। এর প্রত্যেক অবস্থার সাথে

কেয়ামতের প্রত্যেক অবস্থার মিল খুঁজে নেবে। উদাহরণতঃ দস্যুদের আতংক দ্বারা মুনকার নকীরের প্রশ্নের আতংক স্মরণ করবে। জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা কবরের সাপ বিচ্ছু ধ্যান করবে। আপন বাড়ীঘর ও আত্মীয়-স্বজনের বিরহ দ্বারা কবরের ত্রাস, কঠোরতা ও একাকিত্ব চিন্তা করবে। মোট কথা, আপন কথায় ও কাজে যে ভয় করবে, তা কবরের ভয়ের জন্যে পাথেয় করবে। মীকাতে 'লাব্বায়কা' বলর অর্থ এই মনে করবে, আল্লাহর ডাকে 'হাযির আছি' বলে সাড়া দিচ্ছে। তখন এই সাড়া কবুল হওয়ার আশা করবে এবং ভয় করবে, কোথাও لا لبيك ولا سعديك না বলে দেয়া হয়; অর্থাৎ, তুমি হাযির নও এবং তৎপর নও। তাই ভয় ও আশার মাঝখানে থাকবে এবং নিজের শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কৃপার উপর ভসসা রাখবে। কেননা, 'লাব্বায়কা' বলার সময়ই হচ্ছে হজ্জের সূচনা এবং এটা বিপদের সময়। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বলেন ঃ একবার হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) হজ্জের এহরাম বেঁধে সওয়ারীর উপর বসতেই তাঁর শরীরের রং ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তিনি কাঁপতে লাগলেন এবং নিজের মধ্যে 'লাব্বায়কা' বলার শক্তি পেলেন না। কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি 'লাব্বায়কা' বলছেন না কেন? তিনি বললেন ঃ আমার আশংকা হয়, কোথাও আমাকে لا لبيك ولا سعديك বলে না দেয়া হয়। এর পর যখন তিনি 'লাব্বায়কা' বললেন, তখন অজ্ঞান হয়ে সওয়ারী থেকে নীচে পড়ে গেলেন। হজ্জ পূর্ণ করা পর্যন্ত তাঁর এ অবস্থাই বিদ্যমান ছিল। আহমদ ইবনে আবিল হাওয়ারী বলেন ঃ আমি আবু সোলায়মান দারানীর সাথে একবার হজ্জে গিয়েছিলাম। তিনি এহরাম বেঁধে এক মাইল পর্যন্ত চুপচাপ চলে এলেন এবং 'লাব্বায়কা' বললেন না। এর পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ হে আহমদ! আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এই মর্মে ওহী প্রেরণ করেন, বনী ইসরাঈলের জালেমদেরকে বলে দাও তারা যেন আমাকে কম স্মরণ করে। কেননা, তাদের মধ্যে যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাকে অভিসম্পাত সহকারে স্মরণ করি। হে আহমদ! আমি শুনেছি, যেব্যক্তি অবৈধ হজ্জ করে এবং লাব্বায়কা বলে, আল্লাহ তাআলা তার জওয়াবে বলেন ঃ

لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك তুমি উপস্থিত নও এবং তৎপর নও, যে পর্যন্ত তোমার হাতে যা আছে তা ফিরিয়ে না দাও। অতএব, আমিও এরূপ জওয়াব পাওয়া থেকে শংকামুক্ত নই।

আল্লাহ বলেছেন- وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার কর। এ ডাকের জওয়াব দেয়ার উদ্দেশ্যে যখন মীকাতে সজোরে 'লাব্বায়কা' বলবে তখন ধ্যান করবে, শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার কারণে মানুষ এমনিভাবে আহূত হবে এবং কবর থেকে উঠে কেয়ামতের মাঠে একত্রিত হবে। তাদের অনেক প্রকার থাকবে। কেউ হবে নৈকট্যশীল এবং কেউ আল্লাহর গজবে নিপতিত। কেউ গৃহীত হবে এবং কেউ নিগৃহীত। তারা শুরুতে ভয় ও আশার মধ্যে দোদুল্যমান থাকবে; যেমন মীকাতে হাজীগণ হজ্জ পূর্ণ করতে পারবে কিনা এবং হজ্জ কবুল হবে কিনা, সে বিষয়ে দোদুল্যমান থাকে। মক্কায় প্রবেশ করার সময় মনে করবে, এখন নিরাপদে হরমে পৌঁছে গেছি। আশা করবে, মক্কায় প্রবেশের বদৌলত আল্লাহ্ তাআলা আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আশংকা করবে, যদি আমি নৈকট্যের যোগ্য না হই, তবে হরমে আসার কারণে গোনাহগার ও গজবের যোগ্য সাব্যস্ত হব। কিন্তু সব সময় আশা প্রবল থাকা উচিত। কেননা, আল্লাহর অনুকম্পা ব্যাপক এবং কাবা গৃহের সম্মান অত্যধিক। যারা আসে, তাদের প্রতি আল্লাহ কৃপা করেন এবং যারা এর আশ্রয় চায় ও দোহাই দেয়, তাদের সম্মান বিনষ্ট করেন না।

কাবা গৃহের উপর দৃষ্টি পড়ার সময় তাঁর মাহাত্ম্য অন্তরে উপস্থিত করবে এবং মনে করবে যেন গৃহের প্রভুকে দেখতে পাচ্ছ। তখন আশা করবে, আল্লাহ তাআলা যেমন তাঁর মহান গৃহ দেখা নসীব করেছেন, তেমনি তাঁর পবিত্র সত্তার দীদারও নসীব করবেন। আল্লাহ্ তাআলার শোকর করবে, তিনি এমন মর্তবায় উন্নীত করেছেন এবং তাঁর কাছে আগমনকারীদের দলভুক্ত করেছেন। তখন একথাও ধ্যান করবে যে, কেয়ামতে সকল মানুষ জান্নাতে দাখিল হওয়ার আশায় এমনিভাবে জান্নাতের পানে ধাবিত হবে। এর পর তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। কিছু লোক ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পাবে এবং কিছু লোককে ফিরিয়ে দেয়া হবে। যেমন হাজীদের দু'টি দল হয়েছে- এক দলের হজ্জ কবুল এবং এক দলের হজ্জ নামঞ্জুর। হজ্জে যেসকল পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে,

সেগুলো দেখে আখেরাতের বিষয়াদির স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া উচিত হবে না। কারণ, হাজীদের সকল অবস্থা আখেরাতের অবস্থা জ্ঞাপন করে।

কাবা গৃহের তওয়াফকে নামায গণ্য করবে। তাই তওয়াফের সময় অন্তরে তাযীম, ভয়, আশা ও মহব্বত এমনভাবে হাযির করবে, যেমন 'নামাযের রহস্য' অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছি। প্রকাশ থাকে যে, তওয়াফের দিক দিয়ে মানুষ সেই সকল নৈকট্যশীল ফেরেশতার অনুরূপ হয়ে যায়, যারা আরশের চার পাশে সমবেত হয়ে তওয়াফ করে। এটা মনে করবে না যে, তওয়াফের উদ্দেশ্য দেহের তওয়াফ করা; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের অন্তরের যিকিরের তওয়াফ প্রভুর চার পাশে করা। ফলে তওয়াফের সূচনা ও শেষ যেমন কাবা গৃহের উপর হয়, তেমনি যিকিরের সূচনা ও শেষ প্রভুর উপরই হতে হবে।

জানা উচিত, উৎকৃষ্ট তওয়াফ হচ্ছে অন্তরের তওয়াফ, যা আল্লাহর দরবারের চার পাশে হয়। কাবা গৃহ বাহ্যিক জগতে সেই দরবারের একটি নমুনা। কেননা, আল্লাহর দরবার আভ্যন্তরীণ জগতে অবস্থিত। ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। যেমন বাহ্যিক জগতে দেহ অন্তরের নমুনা। অন্তর অদৃশ্য জগতে রয়েছে, ফলে চোখে দৃষ্টিগোচর হয় না। আরও জেনে নেবে, বাহ্যিক জগত অদৃশ্য জগতের সিঁড়ি সেই ব্যক্তির জন্যে, যার জন্যে আল্লাহ্ এই দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে এই উক্তির মধ্যে। বায়তুল মামুর আকাশে কা'বার বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। ফেরেশতারা তার তওয়াফ করে, যেমন মানুষ কাবার তওয়াফ করে। অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের তওয়াফ করতে অক্ষম বিধায় সাধ্যমত সেই ফেরেশতাদের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার জন্যে তাদেরকে কাবা গৃহের তওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং ওয়াদা করা হয়েছে, যারা কোন সম্প্রদায়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, তারা তাদের মধ্যে গণ্য হবে। আর যেব্যক্তি ফেরেশতাদের অনুরূপ তওয়াফ করতে সক্ষম, সে এমন ব্যক্তি, যার সম্পর্কে বলা যায়, স্বয়ং কাবা তার যিয়ারত ও তওয়াফ করে। কতক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুযুর্গ কোন কোন ওলী আল্লাহর অবস্থা এমনি দেখেছেন।

'হাজারে আসওয়াদ' (কৃষ্ণ প্রস্তর) চুম্বন করার সময় এই বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর আনুগত্যের শপথ করছো। অতঃপর এই শপথ পূর্ণ করার জন্যে কৃতসংকল্প হবে। কেননা, যেব্যক্তি

শপথ ভঙ্গ করে, সে গজবের যোগ্য হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

الحجر الاسود يمين الله عز وجل في الارض يصافح بها خلقه كما يصلح الرجل اخاه

অর্থাৎ, 'হাজারে আসওয়াদ' পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার দক্ষিণ হস্ত। এর মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্ট মানবের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করেন, যেমন মানুষ তার ভাইয়ের সাথে করমর্দন করে। কা'বার গেলাফ ধারণ এবং মুলতাযামকে ধরার সময় নিয়ত করবে, গৃহ এবং গৃহের প্রভুর মহব্বতে নৈকট্য অন্বেষণ করছো। দেহের স্পর্শকে বরকত মনে করবে এবং আশা করবে, দেহের যে অংশ কা'বার সাথে সংযুক্ত হবে, তা অগ্নি থেকে হেফাযতে থাকবে। গেলাফ ধরার সময় নিয়ত করবে, মাগফেরাত ও শান্তির অন্বেষণে কাকুতি-মিনতি ও পীড়াপীড়ি করছো; যেমন কোন অপরাধী যার কাছে অপরাধ করে, তার আঁচল জড়িয়ে ধরে, অপরাধের জন্যে তার সামনে মিনতি সহকারে প্রকাশ করে, তুমি ব্যতীত আমার কোথাও ঠিকানা নেই। এখন আমি তোমার আঁচল ছাড়ব না যে পর্যন্ত না অপরাধ ক্ষমা কর এবং ভবিষ্যতের জন্যে অভয় না দাও।

কা'বা গৃহের চত্বরে সাফা ও মারওয়ার মধ্যস্থলে সায়ী তথা দৌড়াদৌড়ি এমন, যেমন গোলাম বাদশাহের প্রাসাদের চত্বরে বার বার আনাগোনা করে, যাতে খেদমতে আন্তরিকতা প্রকাশ পায় এবং রহমতের দৃষ্টি লাভ করে ধন্য হয়ে যায়। অথবা যেমন কেউ বাদশাহের কাছে যায়, এর পর বাইরে চলে আসে কিন্তু একথা জানে না, বাদশাহ্ তার সম্পর্কে কি আদেশ করবেন– মঞ্জুর করবেন, না নামঞ্জুর করবেন। ফলে সে বার বার প্রাসাদের চত্বরে আসা-যাওয়া করে যে, প্রথম বারে রহম না করলে দ্বিতীয় বারে রহম করবেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে আসা-যাওয়া করার সময় মনে করবে, কেয়ামতের ময়দানে মীযানের উভয় পাল্লার মাঝখানে এমনিভাবে ঘুরাফেরা করতে হবে। সাফাকে নেকীর পাল্লা এবং মারওয়াকে বদীর পাল্লা মনে করে নেবে। এর পর ধারণা করবে, এই পাল্লাদ্বয়ের মাঝখানে এমনিভাবে আসা-যাওয়া করতে হবে এটা দেখার জন্যে যে, কোন্ পাল্লাটি ভারী হয় এবং কোন্‌টি হালকা।

আরাফাতে অবস্থান করার সময় যখন মানুষের ভীড়, উচ্চ আওয়ায, ভাষার বিভিন্নতা এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আপন আপন ইমামের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে চলা দেখবে, তখন একথা স্মরণ করবে, কেয়ামতের ময়দানেও সকল উম্মত আপন আপন পয়গম্বরসহ এমনিভাবে একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক উম্মত তাদের পয়গম্বরের অনুসরণ করবে। তারা তাঁদের শাফায়াত আশা করবে এবং কবুল হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পেরেশান থাকবে। আরাফাতে যখন এই ধারণা মনে উদয় হয়, তখন কাকুতি-মিনতি ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া অপরিহার্য করে নেবে, যাতে কামিয়াব ও রহমতপ্রাপ্ত দলের সাথে হাশর হয়। এ স্থানে নিজের আশা কবুলই মনে করবে। কেননা, এই দরবার শরীফে আল্লাহর রহমত সকলের উপর নাযিল হয়। এই রহমত আসার ওসিলা হয় কুতুব ও আবদালগণের অন্তর। কুতুব ও আবদালের দল থেকে এ ময়দান কখনও খালি থাকে না। সৎকর্মপরায়ণগণও এখানে অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং হিম্মত একত্রিত হয়ে যখন তাদের অন্তর মিনতি করতে তাঁকে, হাত আল্লাহর দিকে প্রসারিত হয়, মস্তক তাঁর দিকে উত্তোলিত হয় এবং হিম্মত সহকারে রহমত তলব করার জন্যে তারা আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করেন, তখন এরূপ ধারণা করবে না যে, তারা আপন আশায় বঞ্চিত থাকবেন এবং তাদের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবে। বরং তখন তাদের উপর সর্বব্যাপী রহমত নাযিল হয়। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ্ তাআলা আমার মাগফেরাত করেননি– আরাফাতে উপস্থিত থেকে এরূপ ধারণা করা গোনাহ্। হিম্মতসমূহের সমাবেশই হজ্জের রহস্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। হিম্মতসমূহের একত্রিত হওয়া এবং এক জায়গায় একই সময়ে অন্তরসমূহের একে অন্যকে সাহায্য করা– আল্লাহর রহমত নামিয়ে আনার এর চেয়ে উত্তম পন্থা আর নেই।

কংকর নিক্ষেপের মধ্যে ইচ্ছা করবে, বন্দেগী প্রকাশ করার জন্যে আদেশ পালন করছ। এ কাজে বিবেক ও মনের কোন আনন্দ নেই। এর স্থলে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে বিতাড়িত শয়তান আত্মপ্রকাশ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর হজ্জে কিছু সন্দেহ সৃষ্টি করা অথবা তাঁকে কোন গোনাহে লিপ্ত করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিতাড়িত এবং তার আশা বিনষ্ট করার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কংকর

নিক্ষেপের আদেশ করেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে সামঞ্জস্যের ইচ্ছা করবে। যদি কেউ বলে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের আত্মপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিধায় তাকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। আমাদের সামনে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে না, এমতাবস্থায় কংকর মারার উদ্দেশ্য কি? এর জওয়াব হচ্ছে, এই আপত্তি শয়তানের পক্ষ থেকে। সে-ই আমাদের মনে এটা জাগ্রত করেছে– যাতে আমাদের কংকর মারার ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমরা মনে করি, এটা তো খেলাধুলার মত একটা নিষ্ফল কাজ। এটা আমরা করব কেন? সুতরাং আপ্রাণ চেষ্টা সহকারে মজবুত হয়ে শয়তানকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশে কংকর নিক্ষেপ করতঃ তাকে প্রতিহত করতে হবে। এখানে বুঝতে হবে, আমরা প্রস্তরের উপর কংকর নিক্ষেপ করলেও বাস্তবপক্ষে তা শয়তানের মুখে মারি এবং তার পিঠ ভেঙ্গে দেই। কেননা, যে আদেশ পালনে মন ও বিবেকের কোন আনন্দ নেই, তা পালন করার মধ্যেই শয়তানের লাঞ্ছনা ও অবমাননা নিহিত রয়েছে।

কোরবানীর জন্তু যবেহ্ করার সময় জানবে, এ কাজ আদেশ প্রতিপালনের কারণে নৈকট্যশীল এবাদত। এ কারণেই জন্তুটি এবং জন্তুর অঙ্গসমূহ উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত। এতে আশা করা উচিত, আল্লাহ তাআলা এর প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে আমাদের প্রত্যেক অঙ্গকে অগ্নি থেকে মুক্ত করবেন। এরূপই ওয়াদা হয়েছে। সুতরাং জন্তুটি যত বড় হবে এবং তার অঙ্গ যত বেশী সবল হবে, ততই দোযখের অগ্নি থেকে রেহাই বেশী হবে।

মদীনা মুনাওয়ারার প্রাচীরসমূহের উপর নজর পড়লে মনে মনে ধ্যান করা উচিত, এটি সেই শহর, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী (সাঃ)-এর জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাঁর দারুল হিজরত করেছেন। এ স্থানেই তিনি আল্লাহ তাআলার ফরয ও সুনান জারি করেছেন এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন। এখানেই তিনি আল্লাহর ধর্ম প্রচার করেছেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর সমাধি রচনা করেছেন। রসূলের দু'জন উযীরের কবরও এখানে রেখেছেন, যারা তাঁর পরে সত্য প্রচারে ব্রতী হন। এর পর মনে মনে কল্পনা করবে,

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল মদীনার মাটিতে পড়ে থাকবে এবং তাঁর পা পড়েনি এমন কোন জায়গা নেই। এরূপ কল্পনা করার পর গাম্ভীর্য ও ভয় সহকারে মাটিতে পা রাখবে এবং চিন্তা করবে, পাক মদীনার প্রত্যেক অলিগলিতে তিনি বিচরণ করে থাকবেন। এর পর তাঁর চলাফেরার গতিতে মিনতি ও গাম্ভীর্য কল্পনা করবে। আরও কল্পনা করবে, আল্লাহ তাআলা নিজের কি পরিমাণ মারেফত তাঁর অন্তরে গচ্ছিত রেখেছিলেন। তিনি তাঁর যিকিরকে কতটুকু উচ্চ করেছেন যে, নিজের যিকিরের সাথে তাঁর যিকির সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যেব্যক্তি তাঁর তাযীম করে না, আল্লাহ তার আমল বাতিল করে দেন। এর পর ধ্যান করবে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ তাদের প্রতি যারা তাঁর সংসর্গ লাভ করেছেন এবং সৌন্দর্য দর্শন ও বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। এর পর নিজের জন্য আফসোস করবে যে, এ দৌলত তোমার নসীব হয়নি এবং সাহাবীগণের সঙ্গও নসীব হয়নি। এর পর ধ্যান করবে দুনিয়াতে তো তাঁর যিয়ারত ভাগ্যে জুটল না, আখেরাতে জুটবে কিনা সন্দেহ। গোনাহের কারণে সম্ভবতঃ পরিতাপের দৃষ্টিতেই তাঁকে দেখতে হবে। এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে– কেয়ামতের দিন কিছু লোককে আমার সম্মুখে আনা হবে। তারা বলবে ঃ হে মুহাম্মদ! আমি বলব ঃ ইলাহী, এরা আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন ঃ আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি সব নতুন কর্ম উদ্ভাবন করেছে। তখন আমি বলব ঃ দূর হয়ে যাও। দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, সুতরাং যদি তুমিও তাঁর শরীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে থাক, তবে তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। তবে আশা এটাই রাখবে, আল্লাহ তাআলা তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবেন না। কেননা, আল্লাহ তোমাকে ঈমান দান করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারতের জন্যে তোমাকে তোমার দেশ থেকে বের করে এনেছেন। কোন ব্যবসা বাণিজ্য অথবা জাগতিক আনন্দ তোমার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল তাঁর মহব্বত এবং তাঁর পবিত্র কীর্তি দেখার আগ্রহ তোমাকে টেনে এনেছে। কেননা, তাঁকে দেখা যখন তোমার নসীব হল না, তখন তাঁর কবরের প্রাচীরের উপর দৃষ্টি পতিত হওয়াতেই তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ। আল্লাহ তাআলা এসব আয়োজন যখন তোমার জন্যে করেছেন, তখন তোমার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন– এটাই তাঁর জন্যে উপযুক্ত।

যখন তুমি মসজিদে নববীতে পৌঁছবে তখন ধ্যান করবে, এ স্থানকেই আল্লাহ তাআলার নবী (সাঃ) এবং মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বোত্তম লোকদের জন্যে মনোনীত করেছেন। আল্লাহর ফরযসমূহ প্রথমে এস্থানেই পালিত হয়েছে। এস্থানেই সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিবর্গ জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পরেও সমবেত আছেন। এমন স্থানে প্রবেশ করায় তোমার খুব আশা হওয়া উচিত, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহমতই করবেন। এর পর খুশু ও সম্মান সহকারে মসজিদে প্রবেশ করবে। এ পবিত্র ভূমি খুশু ও নম্রতা করারই উপযুক্ত। আবু সোলায়মান বর্ণনা করেন, হযরত ওয়ায়স কারনী একবার হজ্জে এসে মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করেন। তিনি মসজিদের দরজায় দণ্ডায়মান হলে লোকেরা তাঁকে বলল ঃ রসূলে পাক (সাঃ)-এর কবর শরীফ এটা। একথা শুনেই তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসার পর বললেন ঃ আমাকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও। যে শহরে মুহাম্মদ (সাঃ) মাটির অভ্যন্তরে রয়েছেন, সেই শহর আমার ভাল লাগে না। দাঁড়ানো অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যিয়ারত করা উচিত; যেমন তাঁর জীবদ্দশায় এভাবেই করা হত। তাঁর জীবদ্দশায় যতটুকু তাঁর দেহের নিকটবর্তী হবে, কবরেও ততটুকু নিকটবর্তী হবে। জীবিত অবস্থায় যেমন তাঁর দেহ স্পর্শ করা ও চুম্বন করা বেআদবী মনে করতে, তেমনি এখনও করা উচিত। কেননা, স্পর্শ করা ও চুম্বন করা খৃস্টান ও ইহুদীদের রীতি। জানা উচিত, রসূলে পাক (সাঃ) তোমার উপস্থিতি, দণ্ডায়মান হওয়া এবং যিয়ারত করার বিষয় অবগত হন এবং তোমার দরূদ ও সালাম তাঁর খেদমতে পৌঁছে। সুতরাং যিয়ারতের সময় তুমি কল্পনা কর, তিনি তোমার সম্মুখে কবরে বিদ্যমান আছেন। এর পর মনে মনে তাঁর মহান মর্তবার কথা চিন্তা কর। দরূদ ও সালাম পৌঁছার বিষয়টি এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তার কাজ হল উম্মতের সালাম তাঁর কাছে পৌঁছানো। এটা সেই লোকদের জন্যে, যারা তাঁর কবর শরীফে উপস্থিত হয়নি। অতএব যারা কবর শরীফ যিয়ারত করার আগ্রহে স্বদেশ ত্যাগ করে দুর্গম পথ অতিক্রম করে সেখানে উপস্থিত হয়, তাদের সালাম কিরূপে পৌঁছবে না?

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرا যেব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করে,

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশ বার দরূদ প্রেরণ করবেন। এটা কেবল মুখে দরূদ পাঠ করার প্রতিদান। কিন্তু যেব্যক্তি তাঁর যিয়ারতের জন্যে কায়মনোবাক্যে উপস্থিত হয়, তার প্রতিদান কিরূপ হবে?

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মিম্বরের কাছে যাবে এবং কল্পনা করবে, তিনি মিম্বরে দণ্ডায়মান আছেন এবং বিপুল সংখ্যক মুহাজির ও আনসার তাঁর চার পাশে বৃত্তাকারে বসে আছেন। তিনি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা কর, যেন কেয়ামতে তোমার ও তাঁর মধ্যে দূরত্ব না থাকে।

এ পর্যন্ত হজ্জের ক্রিয়াকর্মে অন্তরের ওযিফা বর্ণিত হল। হজ্জ সমাপনান্তে অন্তরে চিন্তা ও ভয় অপরিহার্য করে নেবে। আশংকা করবে, কে জানে তোমার হজ্জ কুবল হল কিনা! তুমি প্রিয়জনদের তালিকাভুক্ত হয়েছ, না বিতাড়িতদের দলে গ্রথিত হয়েছ। এ বিষয়টি নিজের অন্তর ও কাজকর্ম দ্বারা জেনে নেবে। অর্থাৎ, হজ্জের পর যদি অন্তরকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত, আল্লাহর মহব্বতের দিকে অধিক আসক্ত দেখ এবং আমল শরীয়তের নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হতে দেখ, তবে হজ্জ কবুল হয়েছে বলে ধরে নিতে পার। কেননা, আল্লাহ তাআলা তার হজ্জ কবুল করেন যাকে প্রিয় মনে করেন। তিনি যাকে প্রিয় মনে করেন তার পরিচালক হয়ে যান, মহব্বতের চিহ্ন তার উপর প্রকাশ করেন এবং আপন শত্রু ইবলীসের চাপ তার উপর থেকে সরিয়ে দেন। সুতরাং এ ধরনের বিষয় প্রকাশ পেলে বুঝতে হবে, হজ্জ কবুল হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ব্যাপার উল্টা হয়, তবে বিচিত্র নয়, এ সফরে দুঃখ, কষ্ট ও গ্লানি ছাড়া অন্য কিছুই অর্জিত হয়নি। (নাউযু বিল্লাহ)

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত